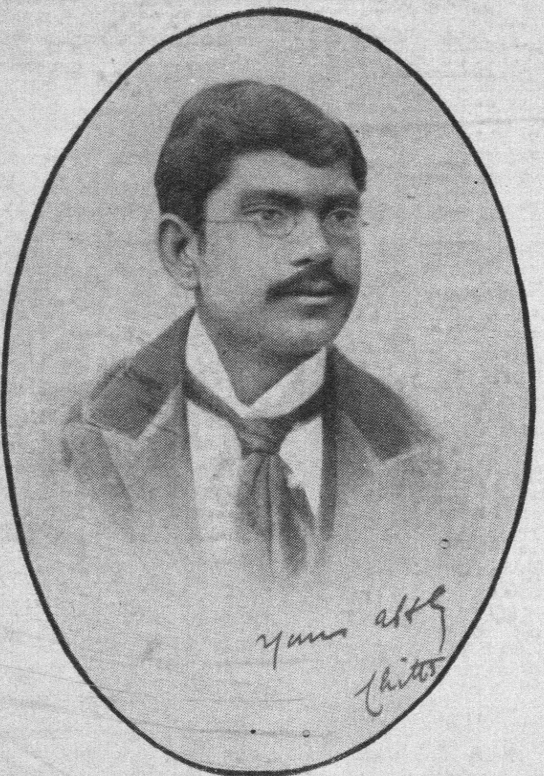
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৬



চিত্তরঞ্জন দাশ



বাসন্তী দেবী

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

—রবীন্দ্রনাথ



মধ্যম ভ্রাতা নিশীথরঞ্জন (নশু)



কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রদোষরঞ্জন (বুধা)



কনিষ্ঠা ভগ্নী অন্নপূর্ণা (বুড়ি)



বিলাতে ছাত্রাবস্থায় লেখক



কুমারী স্বপনা মজুমদার

উৎসর্গ

প্রাচীন বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত অধুনা কীর্তিনাশা
পদ্মার কুক্ষিগত তেলিববাগ গ্রামের
অভিজাত দাশ-গোষ্ঠীর
এক অকিঞ্চন সন্তানের এই
স্মৃতিচয়ন
তদীয় সহধর্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী
কল্যাণীয়া শ্রীমতী স্বপনা দেবীর করকমলে
সাদরে সস্নেহে ও শ্রদ্ধায়
অর্পিত হইল।

সুধী

পিতা রাখালচন্দ্র

মাতা বিনোদিনী



শশিভূষণ মজুমদার



জ্ঞানদা মজুমদার

কৈফিয়ত

হঠাৎ আমার জীবনকাহিনী লেখবার ঘটা ও ধুম উঠল কেন এই প্রশ্ন উঠতে পারে ভেবে আসল কারণটা খুলে বলে রাখাই সমীচীন মনে করছি। আমার নাতিনাতনীদের কাছে আমি একটি আদর্শপুরুষ, 'হিরো' বললেও চলে। তাঁরা অনেক সময় আমার জীবনকাহিনী শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কবে, কোথায়, কেমন করে তাদের দিদাভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় এবং পরে বিবাহ হল সে বিষয়ে তাঁদের বিশেষ কৌতূহলও লক্ষ্য করেছি। তাঁদের মনোরঞ্জন ও চিত্তোৎকর্ষের জন্যে অনেক সময় পুরোনো দিনের স্মৃতিকথা গল্পের মতো বলে তাঁদের শুনিয়েছি। পুরাতন বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রাম— যার চিহ্ন পর্যন্তও আজ আর নেই— সেই গ্রামের অভিজাত দাশ-বংশ সম্বন্ধে তাঁদের মনে একটা শ্রদ্ধা ও গৌরব বোধ সৃষ্টি করারও একটু বাসনা যে আমার মনের মধ্যে ছিল না তা-ও বলতে পারি নে। পরে মনে হল যে সেইসব বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিকে যথাসম্ভব ক্রমান্বয়ে পর পর সাজিয়ে একটি কাহিনী লিখে রাখলে উত্তর-বংশীয়দের চিত্তবিনোদনেব কাজে আসবে। একমাত্র এই কারণেই এই স্মৃতিচয়ন-প্রচেষ্টা করা গেল। নিজেকে জাহির করার জন্যে যে এই কার্যে হাত দিই নি সে কথা নিছক সত্য।

আমার মানসপটে আত্মজীবনের যে চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়ে আছে তারই কয়েকটি স্মৃতিকুসুম এই জীবনকাহিনীতে চয়ন করা হয়েছে। বার্ধক্যহেতু স্মৃতিশক্তির যে প্রভূত ক্ষয় হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক সময়ে হয়তো দেখা যাবে যে অনেক ঘটনা যা বহু আগে ঘটেছে তার স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় সেই ঘটনাটি কাহিনীর ধারায় পিছিয়ে পড়েছে এবং অনেক ঘটনা যা পরে ঘটেছে তার স্মৃতি সুস্পষ্ট থাকায় সে-সকল ঘটনা গায়ের জোরে ঠেলেঠুলে এগিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। এইরকম কালের ক্রম-বিপর্যয় ইতিহাসে অচল হলেও গল্পে চলতে তত বাধা নেই। ঘটনা-বিন্যাসগুলি ভালোভাবে করতে পারলে গল্পে রসধারা ব্যাহত না হয়ে

সাবলীল গতিতেই অগ্রসর হতে পারে। সেইজন্যে পাঠকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন কৃপা করে মনে রাখেন যে আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি; এই লেখাগুলি নিতান্তই আমার জীবনের স্মৃতিচয়ন। ঘটনাপরম্পরা যথাযথভাবে অনুস্তত না হলেও স্মৃতিচয়ন অশুদ্ধ হবে না। গল্পের রসভঙ্গ না হলেই যথেষ্ট হবে।

এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে 'বিক্রমপুর' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি লিখতে শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশায়ের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড এবং শ্রদ্ধেয় হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় মশায়ের 'বিক্রমপুর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে বিস্তর সাহায্য লাভ করেছি। এই কারণে সেই দুই বিক্রমপুরভক্ত উৎসাহী ঐতিহাসিকদের কাছে আমার অজস্র ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

এই গ্রন্থের নামকরণ করে আমার পরম স্নেহাস্পদা কনিষ্ঠা সহোদরা অন্নপূর্ণা সেনগুপ্তা তাঁর সাহিত্যরস-রুচিরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রচ্ছদপটটি এঁকেছেন শ্রীঅহিভূষণ মল্লিক।

বইখানি যাঁদের জন্যে লেখা এবং প্রকাশ করা, তাঁদের ভালো লাগলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ধরে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করব।

স্বপনপুরী। কালিম্পং

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

উপক্রমণিকা

সচরাচর এটা হয়ে ওঠে না কিন্তু সেবার এটা ঘটেছিল। আমাদের সব নাতিনাতনিরাই একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে কদিন ছিলেন। বেশ জমেছিল আড্ডা তাঁদের সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যার সময় আমার আফিস-ঘরের বড়ো চওড়া সোফাটার উপর ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আমি শুয়ে ছিলাম। আমাদের বড়ো ছেলে সুবঞ্জন (খোকন)এর বড়ো মেয়ে রঞ্জির্তা (আমাদের ছোটদিমণিভাই) সোজা এসে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার গায়ের সঙ্গে লেগে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন যেন আমার পাশের খালি কালি জায়গাটুকু ওঁরই প্রাপ্য। তাঁর ভাই আমাদের ভাইটি এসে বসলেন আমার হাঁটুর পাশে। আমাদেব মেয়ে অঞ্জনা ওরফে কাজল (আমাদের মা'টা)ব দুটি মেয়ে ও দুটি ছেলে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দেখলেন যে সোফাটা ভর্তি। বড়ো মেয়েটি কৃষ্ণা (আমাদেব দিদু) একটা চেয়ার কাছে এনে বসে পড়লেন। শ্যামলী (আমাদের মেজদিমণিভাই)ও নিলেন আব-একটি চেয়ার। মা'টাব বড়ো ছেলে অনিন্দ্য (আমাদের বড়োবাবু), যাঁকে আমরা মাঝে মাঝে ডাকতাম সুপার ফাইন বলে, তিনি বসলেন আমার পায়ের কাছে আমার পা দুটাকে একটু ঠেলেঠুলে সরিয়ে। আর ছোটো ছেলে আদিত্য (আমাদের ছোটোবাবু), যাঁকে আমি অনেক সময় ডাকি একস্ট্রা স্পেশাল বলে, তিনি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা এসে বসলেন আমারই বসবার বড়ো চেয়ারটায়। ঐ চেয়ারটার একটু ইতিহাস আছে। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম তখন আমার বৌঠান (বাসন্তী দেবী) আমাকে সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং গোটা ছয়েক চেয়ার দিয়েছিলেন আফিস সাজিয়ে বসতে। বৌঠানকে বললাম যে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)এর ব্যবহার করা একটা কিছু আফিস-ঘরে থাকলে পয়মন্ত হবে। তখন খুঁজে পেতে গুদাম থেকে পাওয়া গেল ঐ চেয়ারটা। মস্ত মোটা কাঠের ভীষণ ভারি চেয়ার— পেছনটা খাড়া উঁচু। সেটাকে পালিশ করিয়ে নূতন চামড়ার গদি বসিয়ে বৌঠান আমাকে বললেন, "তোর দাদা ঐ চেয়ারটাতে বসে কাজ করতেন। তুই নে এটা।"

সেই থেকে আমি ঐ চেয়ারে বসে বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছি। এখনো সেই চেয়ারটি আমার আফিস-ঘরের টেবিলে রয়েছে। আমাদের ছেলেরা কেউই ব্যারিস্টার হলেন না। আমাদের ভাইটি ছোটো বয়স থেকেই তাঁর বাপের মতো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হাওয়াই জাহাজের ডিজাইন করবেন এবং চালাবেন বলে মন ঠিক করেছেন। বড়োবাবু, সুপার ফাইন, শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছেন তিনি ডাক্তারই হবেন। ছোটোবাবু তাঁর বাপের মতো একটা বড়ো ব্যারিস্টার হয়ে টাকা রোজগার করবেন বলে রটনা করলেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হল যে ঐ পয়মন্ত চেয়ারটাতে ওঁরই দাবি ন্যায়সংগত। সেজন্যে আমি ওটাতে বসে নেই দেখলেই তিনি ওই চেয়ারটাতে বসবেনই। অন্তরা তাঁর এই দাবিটা এখন সবাই মানেন বিনা ওজরে। আমাদের ছোটো ছেলে সুহৃদরঞ্জন (মাণিক)এর দুটি মেয়ে মাটিতে বসে কি খেলছেন আর ইস্কুলে শেখা ইংরেজি ছড়া বলছেন। ছোটোজন (আমাদের মণিদিদি) তাঁর ঠাকুমার অনুকরণ করে হঠাৎ আমার কাছে এসে "দাদু জল খাবে?" কিংবা "দাদু তুমি এত কথা বোলো না" বলেই আবার তাঁর বড়ো বোন আমাদের রানীদিদির সঙ্গে গিয়ে খেলতে বসলেন। মাণিকের বউ, আমাদের মামণি রমা, তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে বসে উপরে কি কাজ করছেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে আমার আফিস-ঘরে যখন সোনার হাট বসে গেছে এমন সময় মেজদিমণি কথাটা পাড়লেন। "দাদুভাই, একটা গল্প বলো।" সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা গল্প বলতেই হবে।" আমি বললাম, "আমি কি ভাই গল্প জানি? কি গল্প বলব?" ছোটদিমণি বললেন, "দাদু, শুনেছি যে আমাদের বংশে অনেক ভালো ভালো ছেলেমেয়ে জন্মেছেন। বড়োদাদু (দেশবন্ধু)র কথা তো শুনেইছি। তা ছাড়া এই তো সেদিন লেডী বোসের জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল। তিনিও তো তোমার দিদিই ছিলেন। তা ছাড়া আরো কত নাম শুনেছি। তাঁদের গল্প বলো-না, ভাই।" আমি বললাম, "সে তো খুব বড়ো হবে। তা ছাড়া সেটা তো ইতিহাস হবে।" ছোটদিমণি বললেন, "ইতিহাসই তো সব চেয়ে ভালো গল্প।" ভাইটি আমার হাঁটুর পাশ থেকে বললেন, "দাদু, আমি বলি কি, তুমি একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলো।" আমি মাথা চুলকিয়ে বললাম, "অ্যাডভেঞ্চারের কি গল্প জানি মনে করতে তো সময় লাগবে।" ছোটোবাবু ঈষৎ মুচকি হেসে বললেন, "দাদু, দিদাভাইয়ের সঙ্গে তোমার

কোথায় আলাপ হল, কেমন করে তাঁর সঙ্গে ভাব হল— সেই-সব কথা একটু রসিয়ে কসিয়ে বললেই তো রোমান্টিক গল্প হয়ে যাবে।"

বড়োবাবুর রোমান্সের ধারণা বোধ হয় একটু কম। তিনি বললেন, "তুমি তো শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পড়েছ। তাঁর এবং সেই সময়ের কথাই নাহয় বলো।" মেজদিমণি বললেন, "দাদু, তোমার বিলেতে যাওয়া, পড়া, বেড়ানো— এইসবের গল্পই নাহয় বলো।" আমাদেব দিদু দিল্লীতে ল' কলেজে পডছেন। তিনি বললেন, "দাদু, এই তো সেদিন আমাদের ক্লাসের স্যার তোমাবই একটা জাজমেন্টেব ব্যাখ্যা করছিলেন। আচ্ছা, তুমিও তো প্র্যাকটিসের সময় অনেক মজার মজার কেস করেছ এবং জজ হয়ে অনেক মামলাব ফয়সালা করেছ। তার থেকে বেছে বেশ চটকদার দু-একটা মামলাব গল্পই বলো-না।"

আমি বললাম, "ভাই, তোমবা যে-সব ঢালা অর্ডার দিচ্ছ— আমার বংশের ইতিহাস, অ্যাডভেঞ্চাব, রোমান্স, আমাব ছাত্রজীবন— এ-সব তো বলতে গেলে আমার জীবনীই হয়ে যাবে। সেটা গল্প হবে কি?" ছোটোবাবু আবার মুচকি হেসে বললেন, "কেন হবে না? একেবারে জ্যান্ত গল্প হবে।" সবাই বলে উঠলেন, "সে বেশ হবে। আমরা তাই শুনব— সেই আমাদের ভালো লাগবে।" একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, "গল্প তো বলব, কিন্তু গল্পের নায়িকা না হলে যে জমবে না।" অমনি সবাই "দিদাভাই, দিদাভাই" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। মেজদিমণি তো নিজে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে তাঁদের দিদাভাইকে একবারে বগল-দাবা করে হিড় হিড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন। দিদাভাইয়ের চোখে হাসি, মুখে রাগ। গজ গজ করতে করতে বললেন, "বুড়োমানুষের কাজ নেই বলে যেন আর কারুরই কাজ নেই।" বলে মেজদির পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। আমি গলা সাফ করে নিয়ে বললাম, "তবে শোনো আমার গল্প।"

ল' কলেজে পড়ুয়া দিদু তাঁর ঠোঁটের উপর ডান হাতের তর্জনীটা রেখে বললেন, "দাদুভাই, তুমি এখন সাক্ষীব কাঠগড়ায়— সত্য বই মিথ্যা বলিবে না— কোনো কথা গোপন করিবে না।"

ছোটোবাবু চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, "হ্যাঁ, মনে রেখো— কোনো কথা গোপন করবে না।"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমার সুদীর্ঘ জীবনের স্মৃতিচয়ন শুরু করলাম :

"আমার পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুরবাসী ছিলেন।...

প্রথম পর্ব

আদি নিবাস ও বংশপরিচয়

প্রথম অধ্যায়

বিক্রমপুর

আমার পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুরবাসী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিক্রমপুরের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার অন্নজলবায়ুতে দেহমন পরিপুষ্ট করে বিক্রমপুরেই দেহরক্ষা করে গেছেন। বিক্রমপুরের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী আমার মা-বাবার কাছে অনেক শুনেছি। তাঁরা যে বিক্রমপুরবাসী এই গৌরববোধ যেন তাঁদের মজ্জাগত ছিল। আমি বিক্রমপুরে জন্মাই নি বটে, কিন্তু শৈশবে বিক্রমপুরস্থ স্বগ্রামে বাস করেছি ও গ্রামের স্কুলেও পড়েছি। আমি যে বিক্রমপুরের সন্তান এই বোধ সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে সজাগ ছিল। একটু বড়ো হয়ে যখন কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে পড়তাম এবং বিশেষ করে পরে যখন কলকাতায় কলেজে পড়তাম তখন কলকাতার ছেলেরা আমাকে 'বাঙাল' বলে পরিহাসের চেষ্টা করত। সেই পরিহাসে দমে যাওয়া তো দূরের কথা আমি যে 'বাঙাল' এবং বিশেষ করে বিক্রমপুরের বাঙাল সেই কথাটা বেশ জোর গলাতেই আমার পশ্চিমবঙ্গের সতীর্থদের— যাদের আমি ও আমার মতো অন্যান্য বাঙালরা 'ঘটি' বলতাম— তাদের গায়ে পড়েই বুঝিয়ে দিতাম। এই কারণে আমার জীবনকাহিনী সম্যক উপলব্ধি করতে হলে বিক্রমপুরের বিষয় কিছুটা জানা দরকার। আমার জীবনকথা বিক্রমপুরের পটভূমিকাতেই অনুধাবন করতে হবে।

বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন নাম নাকি ছিল 'সমতট'। সমতট বলতেই তটভূমির আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিনা বিক্রমপুর বা সমতট সমুদ্রের পারেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই তটভূমি ঐতিহাসিকদের মতে হিমাচলের পাদদেশ থেকে অল্পই দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। বঙ্গোপসাগর তখন যেন তার আঙুলগুলি প্রসারিত করে স্বল্পপরিসর সমতটকে আঁচড়ে ফেলবার চেষ্টা করত। ক্রমে শত শত শতাব্দী ধরে পূর্বে মেঘনাদ বা মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-প্রশাখাগুলি, উত্তরে ধবলেশ্বরী বা ধলেশ্বরী নদী এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখাগুলি নিরন্তর পলিমাটি বহন করে এনে প্রলেপের পর প্রলেপ লাগিয়ে সেই সমতটের দক্ষিণ তীরভাগকে ক্রমশ

দক্ষিণে বিস্তৃত করে সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরকে আর সমতট বলা চলে না, কেননা বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশে অনেক নূতন জেলা দেখা দিয়েছে।

সমতটের নাম পরিবর্তিত হয়ে কবে কি করে বিক্রমপুর হল সে কথা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে অনেক মতভেদ আছে। তা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সমতট কোনো-না-কোনো সময়ে বিক্রমপুর নাম পেয়ে হিন্দু রাজাদের আমলে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে, মুসলমান রাজত্বকালে পরগণে বিক্রমপুর নামে সোনারগাঁয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইংরেজ আমলে বিক্রমপুর পরগণার উত্তরাংশ ঢাকা জেলার মধ্যে এবং দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার মধ্যে পড়ে। একটা কথা কেবল মনে রাখতে হবে যে বিক্রমপুরের সীমা ও আয়তন সব সময়ে এক ছিল না। দেশের সীমা নানা কারণে বদলায়। প্রথমত প্রাকৃতিক কারণে এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কারণে। বিক্রমপুর নদীমাতৃক দেশ। নানা নদী-নালা বিল-খাল এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর গতি পরিবর্তনে বিক্রমপুরের বহুস্থান ভেঙে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। উত্তরে ধলেশ্বরীর ভাঙনে এবং পশ্চিমে পদ্মার উদ্দাম গতিবেগে বিক্রমপুরের সীমানার অনেক অদলবদল হয়ে গেছে। সব চেয়ে বড়োরকমের পরিবর্তন হয়েছিল আনুমানিক দুশো বছর পূর্বে। আগে পদ্মা নদী, যা গঙ্গারই একটি শাখা, তা দক্ষিণবাহিনী ছিল। কিন্তু সে নদী মোড় ফিরে পূর্ববাহিনী হয়ে একটি প্রাচীন মরা নদী— কেউ কেউ বলেন তার নাম ছিল কালীগঙ্গা— তারই শুকনো খাতে দুর্বার স্রোতে প্রবাহিত হয়ে বিক্রমপুরকে দ্বিধাবিভক্ত করে পূর্বদিগন্তে মেঘনার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই গতি পরিবর্তনে প্রাচীন বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশের অনেক জমি পদ্মার জলগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার পর এই দীর্ঘ দুশো বছর ধরে কত যে পল্লী, কত যে দেবমন্দির, মঠ ও মসজিদ পদ্মার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। বিক্রমপুরের স্বাধীন বারভুঁইয়ার মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর ও তদীয় মাতৃদেবীর চিতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রাজাবাড়ির মঠ ও মহারাজা রাজবল্লভের রত্নমণ্ডিত রাজনগর গ্রাম ও কার্তিকপুরের মসজিদ গ্রাম নষ্ট করে পদ্মা নদী কীর্তিনাশা নামে অখ্যাতি অর্জন করেছে। ১৮৬৯ সালে পদ্মার

দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ ঢাকা জেলা থেকে আলাদা হয়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত হয়েছে নেহাৎ প্রশাসনিক কারণে। প্রাচীন বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও দুই ভাগের বাসিন্দারা আচারে-বিচারে একই রীতিনীতি অনুসরণ করে আসছেন। সুতরাং এই দুই ভাগকেই আমরা উনিশ শো সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টি হবাব পূর্বে পর্যন্ত একই বিক্রমপুর বলে ধবে নিতাম। বঙ্গ-বিভাগেব সময় পর্যন্ত বৃহৎবিক্রমপুরের চৌহদ্দি ছিল মোটামুটি এইরকম— পূর্বসীমা মেঘনাদ বা মেঘনা নদ, উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পশ্চিমে পদ্মা নদী ও চন্দ্র প্রতাপের কতকাংশ, দোহার, গাজিমপুব প্রভৃতি স্থান ও দক্ষিণে ইদিনপুব। আয়তনে উত্তর-বিক্রমপুব ছিল ৩৮৬ বর্গমাইল এবং তার মধ্যে ছিল প্রায় ১০১২টি গ্রাম। দক্ষিণ-বিক্রমপুরেব আয়তন ছিল ৩৫০খানা গ্রাম নিয়ে ১০০ বর্গমাইল। দুই ভাগ হবাব পর কালক্রমে উত্তব-বিক্রমপুব আবার পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগ হয়ে যায়, কেননা কীর্তিনাশা নদীটিব একটি শাখা উত্তরবাহিনী হয়ে বহর, বালিগাঁও, তালতলা দিয়ে উত্তরে ধলেশ্বরীর সঙ্গে গিয়ে মিশে গেল।

নদনদী ছাড়া অনেক প্রশস্ত খালও বিক্রমপুরের মধ্যে প্রবাহিত হত। তার মধ্যে তালতলাব খাল, যা বহবের পাশ দিয়ে গেছে, মীবকাদিমের ও হলদিয়ার খাল উল্লেখযোগ্য। বিলও ছিল অনেক যাব মধ্যে আইরল বিলই ছিল সব চেয়ে বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। হাসাডাব বিল এই আইরল বিলেরই একটি অংশ মাত্র। নদ নদী ও খালের পারে বেশ বড়ো বড়ো হাট বা বন্দর ছিল যার মধ্যে ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ বা তারপাশা, তালতলা ও মীরকাদিমেব বন্দব নামকরা বাণিজ্যেব জায়গা ছিল। বিক্রমপুবের হাটে বাজাবে বাইরে থেকে সোনা রুপা লোহা কাপড় জামা জুতা ছাতা ও বহু মনিহাবী দ্রব্যাদি আমদানি হত। তা ছাড়া আসত কাঠ ডাল তামাক নারকেল চিনি গুড ইত্যাদি। আর বিক্রমপুর থেকে রপ্তানি হত পিতলের বাসন, জোলার কাপড, ছিট, পাট, চামড়া, ঘি, মাছ ও মাটির বাসন এবং রামপালের বিখ্যাত কলা ও মূলা। সেখানে বিদেশাগত বহু ব্যবসায়ী স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানপাট সাজিয়ে বসতেন। এর মধ্যে অনেক পুরানো হাট ও বন্দর নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বা ভাঙনেব জন্যে সরে গিয়েছে। এ ছাড়া খালপারের হাটগুলিতেও বড়ো বড়ো বাজার

বসন্ত এবং বিদেশের বণিকদের যাতায়াত হত। এই-সব হাট ও বন্দরের মাধ্যমে বিক্রমপুরবাসীদের বাইরের লোকেদের সঙ্গে বাণিজ্য ও ভাবের আদান-প্রদান করবার সুযোগ-সুবিধে ঘটত। এতে করে বিক্রমপুরের লোকেরা কূপমণ্ডুক না হয়ে বাইরের জগতের লোকেদেরও সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হতেন। তাঁরা বাইরের লোকেদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং বিদেশকে তাঁবা ভয় করতেন না। প্রয়োজনবোধে তাঁরা অবাধে বহু দূর দূর দেশে গিয়েছেন ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে। এই কথাটা মনে রাখা দরকার বিক্রমপুরবাসীদেব চরিত্র বুঝতে গেলে।

সমুদ্রের উপকূলে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার ব-দ্বীপের উত্তরাংশে বিক্রমপুর অবস্থিত ছিল। ব-দ্বীপের যে অংশটুকুকে বিক্রমপুর বলা হত তা সমুদ্র থেকে খুব বেশি উঁচু ছিল না। প্রাচীনকালে বিক্রমপুব ও তন্মধ্যস্থিত গ্রামগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সাপ বাঘ ও অন্যান্য বন্যজন্তুর উৎপাতও ছিল প্রচুর। এই-সকল শত্রু থেকে নিজেদের রক্ষা করা বিক্রমপুর-বাসীদের নিত্যকর্ম ছিল বলা যায়। গ্রামে পানীয় জলের অবস্থাও একেবাবেই ভালো ছিল না। বর্ষাব সময়ে গ্রামের আশেপাশের খালগুলি স্ফীত হয়ে পুকুরেব মধ্যে ঢুকে পড়ে পুকুরগুলিকে দূষিত করে তুলত। তা ছাড়া নদীতে প্লাবন হলেই বর্ষাকালে সমস্ত বিক্রমপুর একেবাবে জলে থৈ থৈ হয়ে যেত। গ্রামগুলি ছোটো ছোটো দ্বীপেব মতো কোনোমতে মাথা উঁচু কবে থাকত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বর্ষাকালে নৌকা করে যাওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না। অত্যন্ত গরিব, যাদের নৌকা ছিল না তারা মাটিব পোড়ানো গামলা— যাকে বলা হত ‘চাড়ি’— তাইতে চড়ে যাতায়াত করত। এমন-কি জলস্রোত বেশি উঠলে বাড়ির উঠানও জলে ভরে যেত এবং তখন এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হত নৌকা বা চাড়ি বেয়ে। বিক্রমপুরে বর্ষাকাল আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত একটানা পাঁচ মাস ধবে চলত। তাব পর জল সরে গিয়ে কাদা দেখা গেলে মাঠে ঘাটে যাতায়াত দুষ্কর হয়ে উঠত। এই সময়ে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্যও চরম দুর্দশাপ্রাপ্ত হত। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্তাদি সংক্রামক ব্যাধিতে বহু লোক প্রাণ হারাত। বর্ষার সময় মৃতদেহের সৎকারও দুরূহ হয়ে উঠত। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ছ মাস খরা থাকত। তখন ইচ্ছে করলে পায়ে-হাঁটা পথে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যাতায়াত

চলত। সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ বা মেয়েরা পালকিযোগে যেতে পারতেন এবং গরিব ঘবের মেয়েরা ডুলি করেই যেতেন। বাকি সকলে পদব্রজেই যেতেন। কেউ কেউ নৌকা করে ঘুবপথে নদী ও খাল বেয়েও যেতেন।

বছরে পাঁচ মাস দেশ জলে ডুবে থাকত বলে পাকা সড়ক বা রাস্তার বালাই তেমন ছিল না বিক্রমপুরে। দু-একটি রাস্তা যে ছিল না তা-ও না— তবে নেহাৎ আঙুলে গোনা যায়। একটি বাজপথ ছিল যা বিক্রমপুরের মুলফতগঞ্জ থেকে রাজগঞ্জ হয়ে একেবাবে ঢাকা পর্যন্ত চলে যেত। আরেকটি রাস্তাকে বলা হত কাচকীব দবজা। এ ছাড়া কিছুকাল পবে একটি নূতন রাস্তা— যাব নাম হয়েছিল মুন্সিগঞ্জেব বাস্তা— মুন্সিগঞ্জ থেকে ধলেশ্বরীর তীরবর্তী বারুণী ঘাট পর্যন্ত যেত। আবো যে ছোটোখাটো সড়ক ছিল না তা-ও নয়। তবে বিক্রমপুব বছবেব প্রায় অর্ধেক সময় জলে ও কাদায় ভরা থাকত বলে নদী ও খালেব মধ্যে নৌকা কবেই যাতায়াতেব রেওয়াজ ছিল। এতক্ষণ যা বললাম তাব থেকে সহজেই অনুমান কবা যাবে যে প্রাকৃতিক শত্রু, যেমন বাদল ও বন্যা ও তাব আনুষঙ্গিক অসুখবিসুখ এবং দস্যুতস্কর ও হিংস্র জন্তুব অত্যাচাব থেকে নিজেদেব রক্ষা করবাব জন্যে বিক্রমপুর-বাসিগণেব সর্বদাই সতর্ক থাকতে হত এবং সেইজন্যে স্বভাবতই তাঁদের কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভবশীল হতেই হত। তা ছাড়া হাটে, বাজাবে, বন্দরে তাঁদেব সঙ্গে বাইবেব লোকেদের যোগাযোগ হওয়ায় তাঁদেব মনের প্রসার ও বিকাশ তো ঘটতই, তাঁদের বাইবে যাবাবও কোনো ভয় থাকত না। এই দুই কাবণে বিক্রমপুবেব অধিবাসীবা ইংরেজিতে যাকে বলে এণ্টার-প্রাইজিং তা-ই হয়ে উঠতেন।

উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে পূর্ব পাকিস্তান সৃজন হবার আগের দুইটি আদমসুমাবী বিপোর্ট থেকে বিক্রমপুবেব জনসংখ্যাব যে খবর পাওয়া যায় তা মোটামুটি অনেকটা এইবকম—

	মুসলমান			অমুসলমান		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৯৩১	২,৪৩,১৮৭	২,৫১,৪৮২	৪,৯৫,৬৬৯	২,০১,৬৫৮	২,১৭,৪০৯	৪,১৯,০৬৭
১৯৪১	৫,০৭,১৮৮	৫,২০,২৩৪	১০,২৭,৪২২	৩,৩৮,৯৭০	৩,৭৬,৬০২	৭,১৫,৫৭২

উল্লিখিত সংখ্যাগুলি থেকে দুটি জিনিস জানা যায় যে বিক্রমপুরে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমান, কি অমুসলমান এদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি পুরুষদের চেয়ে। শেষোক্ত বিষয় থেকে পুরুষের

একাধিক বিবাহের সপক্ষে যুক্তি বা সমর্থন পাওয়া যায় কি না তা সমাজ-তত্ত্ববিদরাই বলতে পারবেন।

বিক্রমপুরে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যেব কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রথমত পাঠান রাজত্বের বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মুসলমান পরিবার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে বিক্রমপুবে উপনিবেশ স্থাপন কবে বসেছিলেন। দ্বিতীয়ত শ্রীহট্টে সাধু শাহ জালাল এবং বিক্রমপুবের বাবা আদম প্রভৃতি ধর্মপবায়ণ মুসলমানদেব উদাব ধর্মমত ও তাব প্রচাবের জন্যে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। তৃতীয়ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেব পূর্বে হিন্দুসমাজেব মধ্যে যাদেব স্থান অতি নীচে ছিল বা যাবা কৃতকর্মের জন্যে পতিত হয়েছিল তাদেব অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ কবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কবে পাঠান রাজাব জাতভাই হয়ে গিয়ে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যতা লাভ কবত। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইটেই লক্ষ্য কবাব বিষয় যে বিক্রমপুবে দুই ধর্মসম্প্রদায়েব লোকই পাশাপাশি একত্রে বসবাস কবে একে অপবেব উপব যে ভালো প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়েব সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়েব লোকেদেব মধ্যে আজকালকাব দিনেব অসুহৃদ মনোভাব ছিল না। উভয় সম্প্রদায়েব লোকেদেব মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ছিল। পাঠান কর্তৃত্বেব অবসানে সুদূব দিল্লীব মোগল বাদশাহগণ যখন বঙ্গদেশ আপন শাসনাধীনে আনবাব প্রয়াস পান তখন বাংলাদেশেব ছোটো ছোটো রাজন্যবর্গ একে একে সকলেই দিল্লীশ্বরেব বশ্যতা স্বীকাব করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রমপুবেব বাবভুঁইঞা চাঁদ রায় ও তাঁব ভ্রাতা কেদার রায় এবং যশোহবেব প্রতাপাদিত্য নতিস্বীকাব কবেন নি। চাঁদ রায় ও কেদাব বায়েব নেতৃত্বে বিক্রমপুববাসী হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ সম্রাট আকবরেব বিশ্বস্ত সেনাপতি দিগ্বিজয়ী মানসিংহেব মোগল ও বাজপুত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মবণপণ যুদ্ধ কবে যে অদ্ভুত বণকৌশল, বিশেষ করে নৌযুদ্ধের পারদর্শিতা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং অসাধারণ সংঘবদ্ধতার পরিচয় বেখে গেছেন তা বাঙালী জাতির ইতিহাসে চিরস্মবণীয় হয়ে থাকবে এবং বিক্রমপুরবাসী নরনাবী, হিন্দু ও মুসলমানদের, আবহমান কালতক উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করবে। তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেদের অদম্য সাহস ও সংঘবদ্ধতা যে হিন্দুসমাজের জনগণের মনেও

সাহস ও নিয়মানুবর্তিতা এনে দিয়েছিল এ কথা কোনোরকমেই অস্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপে হিন্দু গৃহস্থগণও সাহসী ও বীর্যবান হয়েছিলেন এবং তাতে করে তাঁদের চরিত্র গঠনে বিস্তর সাহায্য করেছে।

বিক্রমপুরবাসীদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি আব-একটি কারণে নূতন করে উদ্দীপনা পেয়েছিল। বিক্রমপুব অত্যন্ত জনবহুল পরগণা ছিল। যেখানে ঢাকা জেলার প্রতি বর্গমাইলে সাধারণত ৯৩৫ জন লোক বাস করত সেখানে বিক্রমপুবের বিভিন্ন থানায় অনেক বেশি লোকেয় বসতি ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টাঙ্গিবাড়ি থানায় ৩০৪৪, লৌহজঙ্গ থানায় ৩২২৮, মুন্সিগঞ্জে ২৪১৩ এবং শ্রীনগবে ১৮৯৫ থেকে ২০০০ লোক বাস করত প্রতি বর্গমাইলে। এই জনাকীর্ণতাব দরুণ অচিবে প্রশ্ন দেখা দিল যে কি করে এতগুলি লোকেব ভবণপোষণ চলবে। বিক্রমপুব ছিল কৃষি-প্রধান দেশ, কিন্তু বেশিব ভাগ পবিবাবেই চাষের জমি এমন পর্যাপ্ত ছিল না যাতে কবে ক্ষেতেব উৎপন্ন পণ্যে সেই পবিবারেব সকল ব্যয়ভাব মেটে। তা ছাডা নদীব গতি পবিবর্তনের জন্যে অনেকের পৈতৃক জমিজমা যা-ও বা ছিল তা-ও জলগর্ভে যাওয়ায় অনেক পরিবাবকেই পুনঃপুনঃ এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে বহু অর্থব্যয়ে নূতন বাডিঘর করে নিতে হয়েছিল। এই কাবণে এই-সব বিধ্বস্ত পরিবাবের নগদ অর্থবল বা ক্ষেতখামাব তেমন কিছুই থাকত না। এঁরা তবে করেন কি? কেমন করে এঁবা সংসাব চালাবেন? একমাত্র উপায় তখন ছিল নগদ টাকা উপার্জন করে আনা। সুতবাং দলে দলে এই-সব পরিবারের সন্তানদের বাপ-পিতামহের ভিটা ফেলে সুদূর বিদেশে অর্থোপার্জনের জন্যে যেতেই হত। আগেই বলেছি বিক্রমপুরবাসীদের সঙ্গে হাটে বাজারে বন্দরে বাণিজ্যেব মাধ্যমে বাইরের লোকেদের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ হত। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কাবণে তাঁবা সৎসাহসী কষ্টসহিষ্ণু এবং আত্মমর্যাদায় আত্মনির্ভরশীল ও উৎসাহী— এণ্টারপ্রাইজিং— মানুষ ছিলেন। তাঁরা ভাগ্য-লক্ষ্মীব সন্ধানে রওনা হতেন বিদেশপানে অকুতোভয়ে ও উন্নতশিরে। এই জয়-যাত্রায় তাঁদের খুবই সহায়তা কবেছিল তাঁদের পরিবাবের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিক্রমপুব বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশের নানা স্থানে অনেক টোল ও পাঠশালা ছিল। ন্যায়

জ্যোতিষ কাব্য ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ সুবিখ্যাত ছিলেন। বস্তুতঃ বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে খুব প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে এবং বিশেষ করে বিক্রমপুরের অধিবাসাদের উপর যে পড়েছিল তাতে সন্দেহমাত্রও নেই। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এক সমতটের মধ্যেই ৩৭টি বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেছিলেন বলে লিখে গেছেন। শ্রীবিক্রমপুরীবিহার সে সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার বলে প্রখ্যাত ছিল। এই-সকল বিহারগুলির প্রত্যেকটিই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। পর পর দুটি রাজবংশ, যথাক্রমে পাল ও বর্ম রাজবংশ, বিক্রমপুরে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে আপন বংশের ধর্ম, বৌদ্ধধর্মকে, বিশেষ করে নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এতে করে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিক্রমপুর ও সারা বাংলাদেশে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই রাজন্যবর্গ শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী থেকে রাজ্যশাসন করতেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই রাজধানী রামপাল নামক জায়গাতেই ছিল। সে যাই হোক, এ কথায় ভুল নেই যে এই-সকল রাজাদের শাসনকালে বিক্রমপুরে লেখাপড়ার চর্চা বেশ ভালো-ভাবেই চলছিল।

গঙ্গাতীরে অবস্থিত শ্রীবিক্রমপুরীবিহার অনুমান করা যায় মহারাজ গোপালদেবের জীবিতকালেই নির্মিত হয়েছিল। 'এই বংশেরই মহারাজ নয়পালদেবের রাজত্বকালে সুবিখ্যাত জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আনুমানিক ৯৮০ কিংবা ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে ব্রাহ্মণবংশীয় কল্যাণশ্রীর ঔরসে তদীয় পত্নী প্রভাবতীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার প্রদত্ত নাম তাঁর হল চন্দ্রগর্ভ। প্রভাবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন এবং পরে এই সন্তানই বলেছেন যে তাঁর মা-ই তাঁকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। বাল্যজীবন থেকেই চন্দ্র-গর্ভের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিভারও ক্রমবিকাশ হতে লাগল। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরীবিহারের আচার্য পরম পণ্ডিত শীলরক্ষিতের কাছে এই যুবক ভিক্ষুব্রতে দীক্ষালাভ করে দীপঙ্কর নামে পরিচিত হন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে

অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করে তর্কযুদ্ধে অন্যান্য প্রধান পণ্ডিতদের পরাস্ত করে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধিপ্রাপ্ত হন। ভিক্ষু হবার কিছুকাল পরেই দীপঙ্কর বিক্রমশীলাবিহারের আচার্যদের কাছে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে সুবর্ণদ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) গিয়ে অভীষ্ট বিদ্যালাভ করে দেশে ফিরে আসেন এবং বিক্রমশীলাবিহারের অধ্যক্ষ হন।

সকলেই জানেন এর পর দীপঙ্কর তিব্বতের অধিপতির একান্ত অনুরোধে সেখানকার তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্যে ৫৯ বছর বয়সে বিপদ-সঙ্কুল পার্বত্য পথে তিব্বতে যান। সেই যাত্রাপথের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তিব্বতের অধিপতি দীপঙ্করকে 'অতীশ' অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করলেন। দীপঙ্করের পুরা উপাধি-সম্বলিত নাম হল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিনি তিব্বতে গিয়ে কি কি কাজ করেছিলেন এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করে মহাযান মত প্রচার করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যে তিব্বতীয় লোকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেবতার আসনেই বসিয়েছিল। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতন দীপঙ্করের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখ হলেই দালাই লামা ও চীনের সম্রাট পর্যন্ত সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতেন তিনি বিক্রমপুরেরই সুসন্তান, জ্ঞানী ও পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। দীপঙ্করের কাহিনী একটু বড়ো মনে হলেও উল্লেখ না করে পারা গেল না, কেননা বিক্রমপুরের শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে দীপঙ্করের নাম ও কীর্তি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক তো নয়-ই সে নাম ও কীর্তি বিক্রমপুরবাসীদের কাছে এক অবিস্মরণীয় গৌরবের বস্তু। আধুনিক গবেষকদের মতে দীপঙ্কর বাঙালীই ছিলেন না। কিন্তু সে-সকল তর্কের মধ্যে যাবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কেননা আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি।

বৌদ্ধযুগের প্রভাব অনেকটা কমে গিয়েছিল সেন-রাজবংশের রাজা বল্লাল সেনের আমলে। তখন কিন্তু আবার হিন্দুদের বেদ বেদান্ত পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা ও প্রচার খুব জোরের সঙ্গে চালু হল। বিক্রমপুরের এই শেষ হিন্দু-রাজবংশের লোপ করে এল পাঠান ও মোগল রাজত্ব। হিন্দুদের টোল পাঠশালা ও বৌদ্ধদের বিহারের পরেই স্থাপিত হল মক্তব—

আরবী ও পারসী শিক্ষাদানের জন্যে। তার পরে এল ইংরেজ আমল। ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে কত পাঠশালা ও স্কুল খোলা হল গ্রামে গ্রামে। গ্রামের উন্নতিকল্পে বিক্রমপুরের বহুদূরদর্শী জমিদার আপন আপন গ্রামে এই-সব বিদ্যালয় স্থাপন করে রাজভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করে খ্যাতি অর্জন কবে গেছেন। সংক্ষেপে সমাপ্তি করবার জন্যে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে হিন্দু আমলের টোলে ও পাঠশালায়, বৌদ্ধবিহারে, মুসলমানের মক্তবে ও ইংরেজ শাসনকালে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসাতে বিক্রমপুরবাসী অসংখ্য নরনাবী উচ্চবিদ্যা লাভ কবে উন্নতির পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই অর্জিত বিদ্যাশিক্ষা খুবই কাজে লেগেছিল যখন বিক্রমপুরবাসী ভাগ্যানুসন্ধানীরা বেরিয়ে পড়লেন জীবনের জয়যাত্রায়। বিক্রমপুরবাসী নরনারী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও মেধাবী হওয়ায় এবং তাঁদের কর্মতৎপরতা অসাধাবণ ছিল বলে তাঁরা বাইরে গিয়ে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে বিক্রমপুরবাসীবা যে অনুপাতে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তেমন অন্য কোনো জায়গার লোকই হতে পারে নি। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন বর্ধিষ্ণু জায়গা এখনো খুব কমই আছে যেখানে অন্তত দুই তিন ঘব বিক্রমপুববাসী লোক নেই। এঁরা কেউ-বা নদীর ভাঙনে বাস্তুহীন হয়ে অন্য জেলায় বা প্রদেশে গিয়ে নূতন বসতি স্থাপন করে সেখানেই কাজে লেগে গেছেন, কেউ-বা কর্মব্যপদেশে অর্থোপার্জনের জন্যে বিদেশে বসবাস কবছেন। কিন্তু সর্বদাই দেখা যায় এই-সব প্রবাসী বিক্রমপুরের বাসিন্দারা বিবাহাদি সম্বন্ধ বিক্রমপুরবাসীদের সঙ্গেই বহুলাংশে করে থাকেন এবং নিজেদের বিক্রমপুরবাসী বলে পরিচয় দিতে তাঁরা খুবই গৌরববোধ করেন। বিক্রমপুববাসিগণ পিতৃপুরুষের বাসস্থানকে কিরকম অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন তা বোঝা যায় ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে বিক্রমপুর সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বিক্রমপুরের সুসন্তান ও ভারতের অন্যতম প্রধান জননায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর সভাপতির ভাষণে উচ্চকণ্ঠে যা বলেছিলেন তার থেকে :

> যে দেশেই থাকি-না কেন, যত বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াই-না কেন, যখনই মনে করি আমি বিক্রমপুরবাসী তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব অনুভব করি, বিক্রমপুব যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের

প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব যাহা সকল ভাব ভাবনা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়; এই যে স্মৃতি যাহা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে, এই ভাব ও স্মৃতিকে সর্বদা জাগ্রত দেবতার মত আমাদেব হৃদয়মন্দিরে জাগাইয়া বাখিতে হইবে— যেমন সমস্ত বাংলাদেশেব একটা চিরন্তনবাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরেরও সেইরূপ একটা বিশিষ্ট বাণী আছে। আমরা কান পাতিয়া তাহা শুনিতে চাই। সে বাণী শুধু আমাদেব জন্যে। কর্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক কবিতে হইলে সে বাণীকে বুঝা চাই, শুনা চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই।

এই ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে অসংখ্য বিক্রমপুববাসীদের মর্মবাণীটিকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ কবেছেন— আমি নিজেকে তাদেরই একজন বলে গণ্য করি।

বাঘেব সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমবা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগের মাথায় নাচি।

... ...

এক হাতে মোবা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আব হাতে
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

... ...

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিবি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

তেলিরবাগ

আগেই বলেছি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-প্রবাহিনী পদ্মা নদী একদিন তার গতি পরিবর্তন করে হঠাৎ পূর্ববাহিনী হয়ে একটি মরা নদীর প্রাচীন খাতে পড়ে দুর্বার স্রোতে বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে কত জনপদ ও পল্লীকে বিধ্বস্ত ও কত প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করে পূর্ব দিকে প্রবাহিত মেঘনা নদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিল। এই কীর্তিনাশা পদ্মার উত্তর পারে বহর নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। 'ছিল' বলছি এইজন্যে যে, সে গ্রামের চিহ্ন পর্যন্তও আজ আর নেই। এই গ্রামটি আয়তনে বেশ বড়োই ছিল। শ্রদ্ধেয় হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় মশায়ের 'বিক্রমপুর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট থেকে জানা যায় যে যখন তিনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেই সময়ে অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ বরাবর বহর গ্রামের ঘর ও লোকসংখ্যা ছিল মোটামুটি এই ধরণের :

মোট ঘরের সংখ্যা	৪০৭		
মোট জনসংখ্যা	২১৭৪		
হিন্দু পুরুষ	৪৫১	মুসলমান পুরুষ	৬৩৫
স্ত্রী	৪৮১	স্ত্রী	৬০৭

এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি বেশ বড়ো জলপথ— ছোটোখাটো নদী বললেই চলে— পদ্মা নদী থেকে উত্তর দিকে গিয়ে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হত উত্তর-বিক্রমপুরকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ করে। এই খালটি বিখ্যাত তালতলার খাল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমরা বলতাম বহরের খাল। পদ্মা ও এই খালের সঙ্গমকোণে ছিল প্রখ্যাত বহরের বন্দর। এখানে বহু লক্ষ টাকার আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় হত এবং বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকানপাট ছিল যেখানে খুচরা ও পাইকারী বেচাকেনা চলত। বহু বিদেশী বণিক এখানে আসত তাদের পসরা নিয়ে। এক কথায় বহর গ্রাম ও বন্দর বিক্রমপুরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল।

কীর্তিনাশা পদ্মার উত্তর পারে প্রখ্যাত বহর গ্রামের উত্তর-পূর্বে ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম যার নাম ছিল তেলিরবাগ। তেলিরবাগের বসতি অঞ্চলটুকু আয়তনে বেশ ছোটোই ছিল। দৈর্ঘ্যে আধ মাইল ও প্রস্থে সিকি মাইলের সামান্য একটু বেশি হয়তো হবে। তারই চারি পাশে কতগুলি ক্ষেত ছিল পাট ধান ইত্যাদি চাষের জন্যে। বহরের পশ্চিম পাশে যে বড়ো খাল ছিল সেইখান থেকে একটি অনতিপ্রশস্ত খাল তেলিরবাগ গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে মোড় ঘুরে তেলিরবাগের বসতি অংশের পশ্চিম ধার ঘেঁষে সোজা উত্তরের সীমান্তে পৌঁছে আবার ডাইনে বেঁকে বসতি অংশের উত্তর দিক প্রদক্ষিণ করে পূর্বদিগন্তে ধান ও পাট ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এই খালেরই একটি প্রশাখা গ্রামের বসতি অঞ্চলের মাঝামাঝি বরাবর পূর্ববাহিনী হয়ে গ্রামটিকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ধান ও পাট ক্ষেতে মিলিয়ে যেত। এইখানে বর্ষার সময় বেশ জলস্রোত আসত এবং নৌকা চলাচলও বেশ অনায়াসেই হতে পারত। কিন্তু শীতকালে জল নেমে গেলে খবা দেখা দিলে খালটি একেবারে শুকিয়েই যেত এবং তখন হেঁটেই এপার ওপার করতে হত, বাঁশের সাঁকোর প্রয়োজনই হত না। এই খালের উপর বাঁশ পুঁতে পার থেকে তার উপরে দুটা বাঁশ ফেলে সারা গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির অনেক শৌচাগার থাকত সামান্য ছিটে বেড়ার আব্রুর অন্তরালে। দুটি বাঁশের উপর বসে সামনে একটা বাঁশের হাতল ধরে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে হত এক এক করে। সময় সময় যে পা পিছলিয়ে নীচে পড়ে যাওয়ায় অঘটন ঘটত না তা-ও বলা যায় না। যে বালক পড়ত তাকে নাকি দু'দিন শুধু চিড়ে দই ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না। তার যে খাবার ইচ্ছে দুদিন হত না সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। শীতকালে যখন খাল শুকিয়ে যেত তখন এই-সব জায়গা পূতিগন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর স্থান হয়ে নানা রোগের বীজাণু ছড়াত। কিন্তু বর্ষার প্লাবনে সমস্ত সঞ্চিত আবর্জনা ও ময়লা ধুয়ে সাফ হয়ে যেত।

খালপারে অসংখ্য বেত গাছ ছিল। তাদের ছড়ানো ডালগুলি অনেক সময় নৌকার উপর এসে পড়ে আরোহীদের গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিত। কিন্তু বেত গাছে ফল ধরলে খুব সুন্দর দেখতে হত। পাকা বেথইন ফলের উপরে চমৎকার চিকনপাটির বোনটের মতো একটা খোসা থাকত। পাকা

বেথইনগুলি খোসা ছাড়িয়ে ডালায় ভরে অল্প নুন দিয়ে ডালার মুখটা কোঁচার কাপড় দিয়ে ঢেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ছেলেরা ছড়া বলত সমস্বরে :

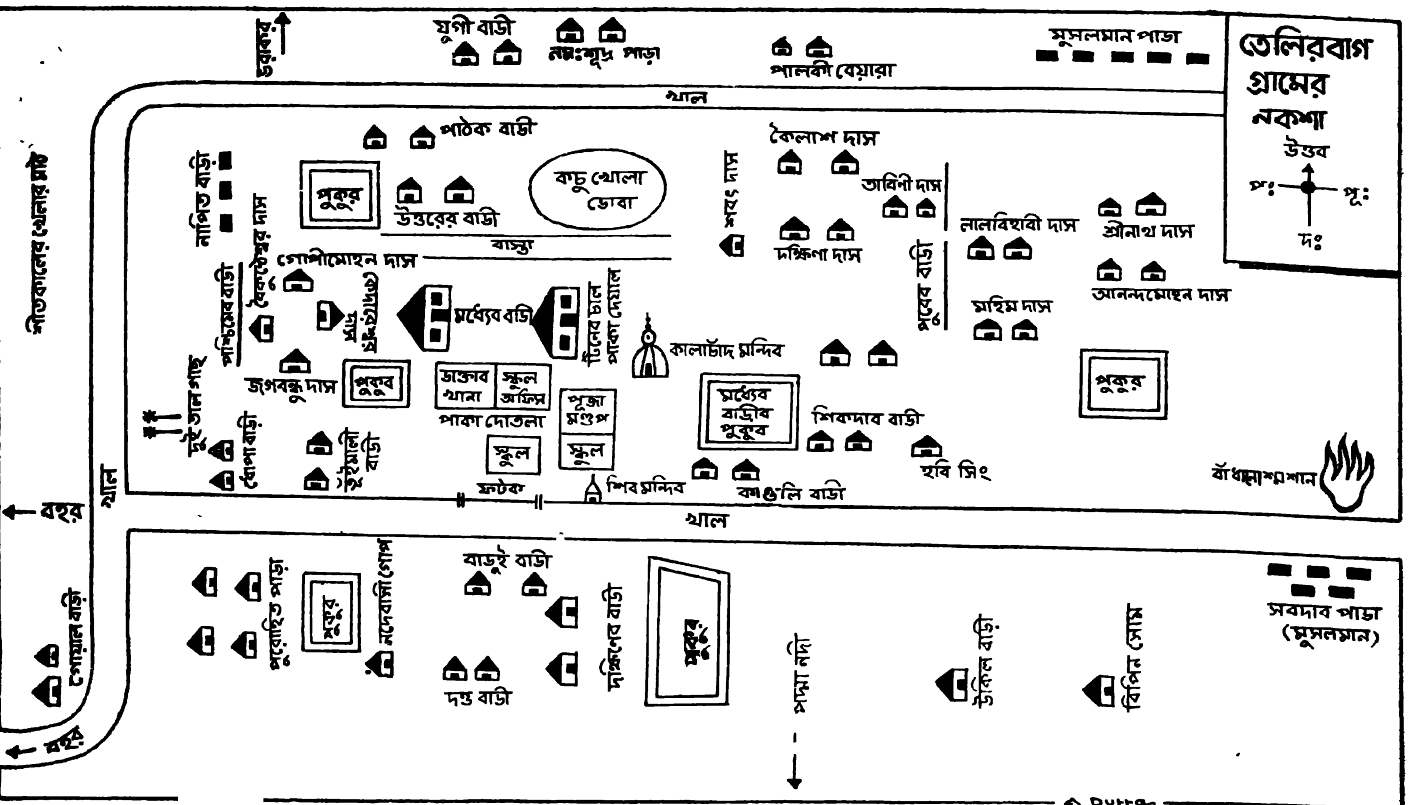
"আম পাকে জাম পাকে মামাবাড়ির বেথই—ন পাকে।"

ঝাঁকানির চোটে ও নুনের সংস্পর্শে ফলগুলি সত্যি সত্যি নরম হয়ে সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়ে উঠত। খালের মধ্যে বর্ষাকালে পুঁটি ট্যাংরা বেলে ভ্যাদা ইত্যাদি নানা ছোটো ছোটো মাছ পাওয়া যেত অজস্র এবং বিনি পয়সায়। আলপিন বেঁকিয়ে কাঁটা তৈবি করে ছিপের সুতায় সেই কাঁটা বেঁধে ছিপ-হাতে বসে যেত যত গ্রামেব ছেলেবুড়োব দল—তাদের হাতে থাকত একটু মাত্র পিঠালী। ছিপ ফেলত, টানত, পুঁটি মাছ উঠত এবং সেই পিঠালী কাঁটায় একটু লাগিয়ে আবার ছিপ ফেলত। এইরকম চলত ঘণ্টাভব। কয়েকজন বৃদ্ধা দেখেছি এ ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ পটু। গ্রামে বেশ বড়ো ও মাঝারি আয়তনের কয়টি পুকুর ছিল। তাইতে গ্রামবাসীদের পানীয় জল বেশ চলে যেত। এ ছাড়া ডোবা ও কচুখোলা তো ছিলই। পুষ্করিণীগুলিব মধ্যে বেশ বড়ো মাছও থাকত। বর্ষাকালে ট্যাঁটা অর্থাৎ সরু বাঁশের আগায় বাঁধা লোহার ধারালো ত্রিশূল ছুঁড়ে মাছ মারা এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক হয়ে আমরা ছোটোরা দেখতাম।

গ্রামের খাল ও পুষ্কবিণী কেটে মাটি তুলে জমি উঁচু কবে সেই উঁচু জমির উপবে ঘর তুলে গ্রামবাসীবা বসবাস করত। সাধাবণত বাড়িগুলি হত মাটির দেয়ালের উপর খড়ের বা টিনের চৌচালা। অবস্থাপন্ন বাড়িতে টিনের দেয়ালও কেউ কেউ কবে নিত। গোটা গ্রামটায় মাত্র একটি বাড়িতে চুন-সুড়কি ও ইট দিয়ে গাঁথা পাকা দোতলা বাড়ি ও তৎসংলগ্ন পাকা ঠাকুরদালান ছিল। গ্রামের মধ্যে বিস্তব ও নানাবকমেব আম, কাঁঠাল জাম, ফলসা ও অন্যান্য বড়ো ছোটো গাছ গ্রামটিকে ছায়াশীতল করে রাখত। বেশ কয়েকটা কদম্ব ফুলের গাছও ছিল। ঘোব বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দিকে মাঠ ও ক্ষেতগুলি জলে ডুবে যেত প্রায় মানুষের কোমর পর্যন্ত কিন্তু গ্রামখানি ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো মাথা উঁচু করে থাকত কোনোমতে। বর্ষায় প্লাবন কোনো বছর প্রচণ্ড হলে গ্রামের বাড়ির উঠানেও জল থৈ থৈ করত। আগেই বলেছি বর্ষাকালে এ-গ্রাম ও-গ্রাম যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা বা চাড়ি। চাড়ি বলতে বোঝায় ভালো করে পোড়ানো মাটির বেশ বড়ো গামলা। তাতে বসে দুই হাতে সামনের দিকে বৈঠা দিয়ে বেয়ে

এগিয়ে চলা এক অদ্ভুত মজার ব্যাপার। কিছুটা বিপজ্জনক হলেও ছেলেরা চাড়ি চালাতে খুবই আগ্রহী ও উৎসাহী ছিল বলে মনে পড়ে। দারুণ বর্ষার সময়ে মৃতদেহের সৎকার এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ত বলে মধ্যের বাড়ির মেজোবাবু দুর্গামোহন নিজ খরচায় গ্রামের বাইরে পুবদিকে পাকা ইটের মোটা উঁচু ভিতের উপর মাটি ফেলে প্রশস্ত শ্মশানঘাট করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের আশেপাশের লোকদেব সুবিধের জন্যে।

তেলিববাগ গ্রামখানি আয়তনে ছোটো হলেও তাবই মধ্যে বাস কবত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ। সেখানে গ্রামের ভুঁইঞারা বা জমিদারেরা বাস করতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভুঁইঞাদেব এক-একটি শাখা তেলিরবাগের এক-একটি প্রান্তে আলাদা আলাদা বাড়িঘব তুলেছিলেন। প্রত্যেক শাখা থেকে যে প্রশাখা বেব হত সেই-সব প্রশাখাব লোকেরা তাদেব মূল শাখার কাছাকাছি স্থানেই বাসা বেঁধে নিতেন। এইবকম করে ভুঁইঞারা গ্রামেব পাঁচ দিকে ছড়িয়ে বসেন। ভুঁইঞারা ছাড়াও গ্রামে অন্য লোকেবও বসতি ছিল। সমাজে বাস কবতে হলে অন্যান্য লোকের সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হত বাবুদেব। সেইজন্যেই বাবুবা নানা কাজে লাগে এমন নানা সম্প্রদায়েব লোকেদেব তাঁদেব গ্রামে স্থান দিয়েছিলেন। গৃহবিগ্রহ কালাচাঁদ ঠাকুবেব নিত্য পূজাব জন্যে ছিল এক ঘব পূজারী। পূজা পার্বণ দোল দুর্গোৎসব বিবাহ চূড়া ও শ্রাদ্ধাদিব জন্যে লাগে পুবোহিত। সেইজন্যে কয়েক ঘব পুবোহিত বসানো হয়েছিল 'পুরৈত পাড়া'তে। গ্রাম পরিষ্কাব রাখতে ও পূজামণ্ডপলেপনেব কাজে খুবই প্রয়োজন হয় যে-শ্রেণীব লোক তারা স্থান পেল 'ভুঁইমালী পাড়া'য়। পূজাব সময় এবং বিয়ে চুড়োতে বাজনা না হলে চলে না; সুতরাং তাদেরও থাকার বন্দোবস্ত করতে হল। তাদের পাড়াব নাম পড়ল 'কাওলিবাড়ি'। বাবুদের চাকব-বেহাবা নিতান্তই প্রয়োজন—তাবা ঠাঁই পেল 'সিকদাববাড়ি'তে। এরা বংশানুক্রমিক ভুঁইঞাদের ভৃত্যের কাজ করে গেছে। দুধ দই ঘি সববরাহ কববাব জন্যে এল 'গোয়ালবাড়ি'র লোকেরা। কলুর ঘানির বলদ ঘুরত 'তেলিবাড়ি'তে এবং খাঁটি সরিষার তেল পাওয়া যেত তাদের কাছে ন্যায্য দামে। পবনের কাপড় বুনত যে-সকল তাঁতি তাদের পাড়ার নাম ছিল 'জোলাবাড়ি' বা 'যুগীবাড়ি'। এ ছাড়া ধোপা নাপিত নমঃশূদ্র-পাড়া তো ছিলই। ঐটুকু গ্রামের আবার


তেলিরবাগ গ্রামের নকশা
উত্তর
পূঃ
পঃ
দঃ
মুসলমান পাড়া
পালকী বেয়ারা
নমঃশূদ্র পাড়া
যুগী বাড়ী
ঢাকা
খাল
পাঠক বাড়ী
কৈলাশ দাস
তারিণী দাস
লালবিহারী দাস
শ্রীনাথ দাস
আনন্দমোহন দাস
মহিম দাস
পুবের বাড়ী
দক্ষিণা দাস
শরৎ দাস
কচু খোলা ডোবা
উত্তরের বাড়ী
পুকুর
রাস্তা
নাপিত বাড়ী
গোপীমোহন দাস
কৈলাসেশ্বর দাস
পশ্চিমের বাড়ী
মধ্যের বাড়ী
টিনের চাল পাকা দেয়াল
কালাচাঁদ মন্দির
জগবন্ধু দাস
ডাক্তার খানা
স্কুল অফিস
পাকা দোতলা
পূজা মণ্ডপ
স্কুল
মধ্যের বাড়ীর পুকুর
শিকদার বাড়ী
হরি সিং
বাঁধঘাট শ্মশান
দুই তাল গাছ
ধোপা বাড়ী
ফটক
শিব মন্দির
কাণ্ডলি বাড়ী
শীতকালের খেলার মাঠ
বহর
বাড়ুই বাড়ী
পুরোহিত পাড়া
নদেবাসী গোপ
দত্ত বাড়ী
দক্ষিণের বাড়ী
পদ্মা নদী
উকিল বাড়ী
বিপিন সোম
সবদার পাড়া (মুসলমান)
গোয়াল বাড়ী

তিন-তিনটি দেওয়ানজী ছিলেন এবং তাঁদেরও বাসের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আর-একটি শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবার গ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে থাকতেন, তাঁদের বাড়িকে বলা হত 'উকিল বাড়ি'। তাঁরা পেশাদার ব্যবহারজীবী ছিলেন বলে যে তাঁদের বাড়িকে 'উকিল বাড়ি' বলা হত তা মোটেই নয়। তাঁদের পদবীই ছিল 'উকিল'। তাঁরা কোন্ সুবাদে এবং কখন তেলিরবাগ গ্রামে বসতি করলেন তার হদিস আজ পর্যন্ত জানতে পারি নি। এ-সব ছাড়া ছিল বেশ কয়েক ঘর মুসলমান ও নমঃশূদ্র যাদের আমরা চলতি ভাষায় চাঁড়াল বলেই জানতাম। এরা থাকত গ্রামের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বসতি অংশের বাইরে। মুসলমান ও নমঃশূদ্রেরাই চাষের কাজ করত। ভুঁইঞারা ছাড়া গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীরা ভুঁইঞাদেরই প্রজা ছিলেন। পুরোহিত-গোষ্ঠী এবং দেওয়ানজীরা বোধ হয় নিষ্কর প্রজা এবং অন্যান্য সকলে নামমাত্র একটু খাজনা দিত— সেকালে যেমন রেওয়াজ ছিল। শ্রদ্ধেয় হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিক্রমপুর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট থেকে তেলিরবাগ গ্রামের ঘর ও লোক-সংখ্যা ১৩৩৮ সাল বরাবর এইরকম ছিল বলে জানা যায়:

মোট ঘরের সংখ্যা		৩১১			
মোট জনসংখ্যা		১২৫৬			
হিন্দু	পুরুষ	৪০৫	মুসলমান	পুরুষ	২৯৩
	স্ত্রী	৩৫১		স্ত্রী	২০৭

এই যে নানান 'বাড়ি' বা 'পাড়া'র নাম করলাম সেগুলি কোন্‌টা কোন্ জায়গায় ছিল তা বোঝবার সুবিধের জন্যে মন থেকে একটি অত্যন্ত খসড়া নকশা পাশের পাতায় দেওয়া গেল।

এই ছোট্ট তেলিরবাগ গ্রামেই ছিল আমার পূর্বপুরুষদের বসতি। এই গ্রামের মধ্যেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, এরই জল বাতাস ও অন্নে তাঁরা পুষ্ট হয়ে এই গ্রামেই তাঁদের দেহরক্ষা করে গেছেন। তাঁদের নশ্বর দেহ মিলিয়ে গেছে এই গ্রামেরই মাটিতে। বড়ো পুণ্যময় এই লতাগুল্ম সুশোভিত, নয়নাভিরাম ছোট্ট গ্রামখানি।

সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ
সে মাটি সোনার বাড়া।—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় অধ্যায়

তেলিরবাগের দাশগোষ্ঠী

তেলিরবাগেব ভুঁইঞারা যদুনন্দন বংশজাত মৌদ্গল্যগোত্রীয় বৈদ্যসন্তান। এঁদের পদবী 'দাসগুপ্ত'। বেশিব ভাগ বাবুবা পুবা 'দাসগুপ্ত' পদবীই লিখে থাকেন, তবে কেউ কেউ 'গুপ্ত'টি উহ্য বেখে কেবলমাত্র 'দাস'ই লেখেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে প্রথমে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যাবত্নেব এবং আবো পবে স্বর্গীয় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়েব নেতৃত্বে বৈদ্যগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করবাব যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই বৈদ্যব্রাহ্মণ আন্দোলনের আগে 'দাসগুপ্ত' পদবীধাবী বৈদ্যগণ নিজেদেব পদবীব বানান দন্ত্য 'স' দিয়েই কবতেন অর্থাৎ 'দাসগুপ্ত' বা 'দাস' লিখতেন। ওই আন্দোলনেব সময় থেকেই 'দাসগুপ্ত' বা 'দাস' পদবীব বেশিব ভাগ বৈদ্য-সন্তানই তালব্য 'শ' দিয়ে 'দাশগুপ্ত' বা 'দাশ' লিখতে শুরু কবেন। তেলিববাগেব বাবুদেব মধ্যে অনেকেই সেই হতে তালব্য 'শ' দিয়ে 'দাশগুপ্ত' বা 'দাশ' লিখে আসছেন। কেউ কেউ— আমি তার মধ্যে একজন— পুবানো অভ্যাসমতে দন্ত্য 'স' দিয়েই 'দাস' লিখে থাকেন এবং 'গুপ্ত' কথাটাও পদবীর সঙ্গে ব্যবহাব কবেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে সে পুরানো অভ্যাস বদলানো সহজসাধ্য নয়। তবে এই জীবনকাহিনীতে তেলিববাগ বৈদ্যগোষ্ঠী সম্পর্কে বেশিব ভাগ জ্ঞাতিদের মতানুসারে তালব্য 'শ' দিয়েই 'দাশ' লিখব যেমন লিখেছি এ অধ্যায়ের মাথায়।

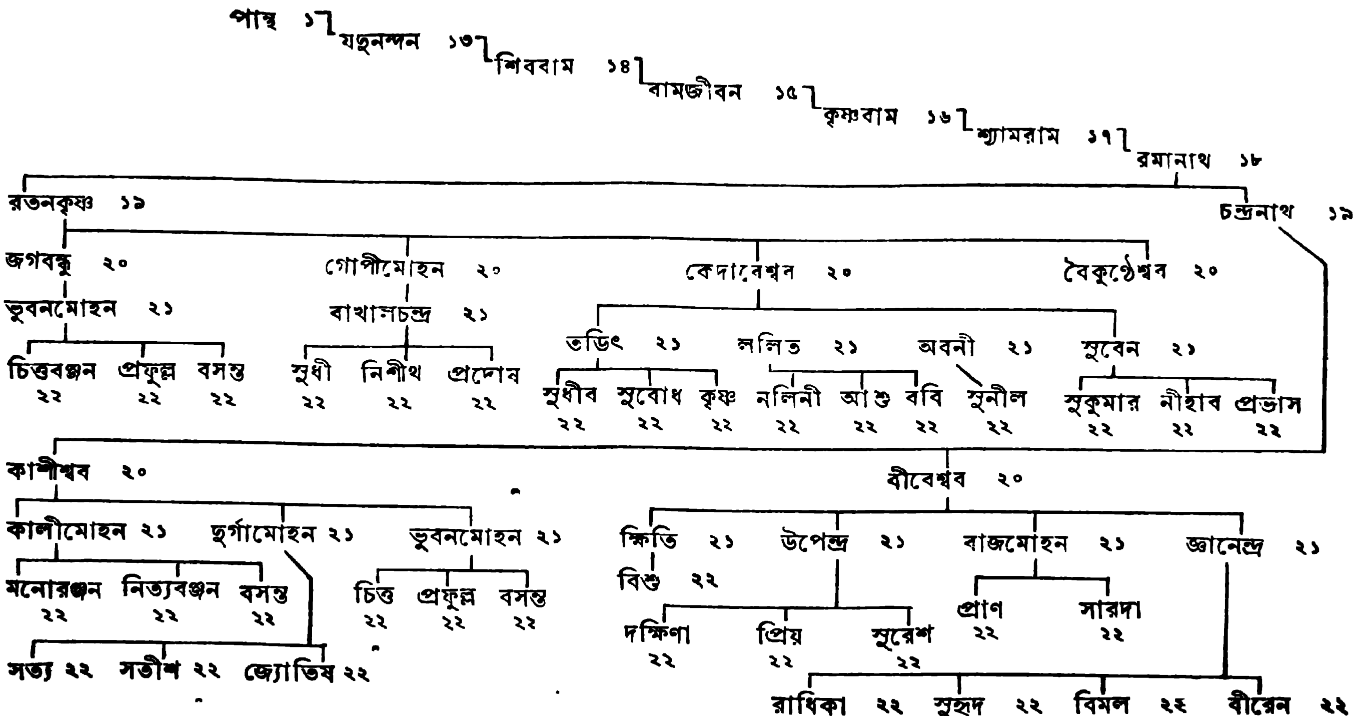
যদুনন্দন বংশজাত 'দাশ'গোষ্ঠীব সন্তানেরা কোন্ সময়ে, কেমন কবে তেলিরবাগ গ্রামে বসতি কবতে এসেছিলেন তা সঠিক এখনো জানি না। বহুকাল পূর্বে শুনেছিলাম— কোথায এবং কাব কাছে তা মনে নেই— যে মহারাজা বাজবল্লভ সেনেব আমলে তাঁব এক বোন কি অন্য কোনো এক আত্মীয়াব সঙ্গে যদুনন্দন বংশেব কোনো-এক সন্তানেব বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহেব যৌতুকস্বরূপ নাকি তেলিরবাগ গ্রামখানিকে নূতন জামাইকে দান কবা হয়। সেই থেকে নাকি দাশবাবুরা তেলিরবাগে আস্তানা স্থাপন করলেন পুরোহিত, সিকদারাদি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। এই জীবনকাহিনী লিখবার আগে এই শোনা কথাটাকে যাচাই করে দেখবার

চেষ্টা করেছি কিন্তু সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। কথাটা সত্য হলে তেলির-বাগেব বাবুদের এই গ্রামে আসার আগে যে অন্য কোথাও একটা আস্তানা ছিল তা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সে পুরাতন আস্তানার কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। এই শোনা কথাব সপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেল কোনো দলিলে কি বইয়ে কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তির মৌখিক ভাষণে। এমতাবস্থায় শোনা কথাটাব সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে এ বিষয়ে গবেষণা কবে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন মনে কবি।

তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীই ছিলেন সেই গ্রামের ভুঁইঞা বা জমিদাব। এই বংশ যেমন বাডতে লাগল বংশের বিভিন্ন শাখা তেলিরবাগ গ্রামেব ভিন্ন ভিন্ন দিকে আলাদা বাড়ি তুলে বসতি কবতে লাগলেন। এইবকম কবে এই বংশেব সন্তানেবা গ্রামেব পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পডেন এবং সেই মূল পাঁচটি বাড়িব নাম ছিল— মধ্যের বাড়ি, দক্ষিণের বাড়ি, পশ্চিমেব বাড়ি, উত্তবেব বাড়ি ও পুবেব বাড়ি। যদুনন্দন বংশেব যে-কয়টি শাখা গ্রামের পূর্ব দিকে বসতি কবেছিলেন তাদেব সবগুলি বাড়িকেই সমষ্টিগত-ভাবে 'পুবের বাড়ি' আখ্যার মধ্যেই ধরে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়িতেই আবাব একাধিক ভিটা ছিল। এব পবের অধ্যায়ে সেই-সব বাড়িব কর্তাদের ও তাঁদেব বংশধবদের কথা বলব।

মধ্যেব বাড়িব মেজোবাবু দুর্গামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষরঞ্জনের উৎসাহে ও চেষ্টায় তেলিরবাগের দাশগোষ্ঠীর একটি বংশাবলি বহুদিন আগে তৈরি কবা হয়েছিল। পবে সেটিকে পরিশোধিত করেন দক্ষিণের বাড়ির শ্রীশবঞ্জন। ইদানীং সেই বংশাবলিটিকে পরিবর্ধিত কবে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন পুবেব বাড়িব উষানাথ। সেই সম্পূর্ণ বংশাবলিব একটি কপি এই জীবনকাহিনীব পবিশিষ্টে সন্নিবেশিত কবা গেল উষানাথের অনুমতিক্রমে। সেই বংশাবলি-দৃষ্টে জানা যায় যে এই বংশ পান্থ নামক এক ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত। সেই আদি পুরুষ পান্থ থেকে দ্বাদশ পুরুষ নীচে এক সন্তান ছিলেন হৃদয়ানন্দ নামে। সেই হৃদয়ানন্দেব দুইটি সংসার ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে জন্মান দুটি সন্তান— যদুনন্দন ও জগদানন্দ। এঁরা দুইজন ঐ বংশতালিকায় ত্রয়োদশ পুরুষ বলে বর্ণিত হয়েছেন। যদুনন্দনের উত্তরবংশীয়েরা বসতি করতেন বিক্রমপুরে এবং জগদানন্দের

তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ি, দক্ষিণের বাড়ি ও পশ্চিমের বাড়ির বাবুদের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী



এই বংশাবলীতে বীরেশ্বরের পুত্র রাজমোহনের পরে যোগ হবে— প্যারী ২১। প্রাণ ২২ স্থলে হবে শ্রীশ ২২

বংশধরেরা গেলেন মানিকগঞ্জে। হৃদয়ানন্দের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে যে একটি পুত্রসন্তান জন্মে তাঁর নাম ছিল রতিনাথ। আগেই বলেছি, তেলিববাগের দাশগোষ্ঠী যদুনন্দনের বংশজাত। সুতরাং জগদানন্দ ও রতিনাথ কিংবা তাঁদের বংশধবদেব কথা এখানে আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এই জীবনকাহিনীব সঙ্গে তাঁদেব কোনো সম্পর্কই নেই। তা ছাড়া তেলিববাগেব সুবৃহৎ দাশগোষ্ঠীভুক্ত জ্ঞাতিবর্গেরও অনেকেব সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। তেলিরবাগ গ্রামে কিংবা অন্যত্র যে-সকল জ্ঞাতিদেব দেখেছি বা যাঁদেব কথা খুব বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি এবং যাঁদেব চবিত্রেব উৎকর্ষ আমাব মানসপটে ছায়াপাত কবেছে আমাব এই জীবনকাহিনীতে তাঁদেরই কথা আমি বলে যাব।

আগেই বলেছি তেলিববাগেব বাবুবা গ্রামেব পাঁচ দিকে আলাদা বাড়ি কবে বসতি কবেছিলেন। সেই পাঁচ বাড়ির মধ্যে মধ্যের বাড়ি, দক্ষিণেব বাড়ি ও পশ্চিমেব বাড়িব বাবুবা জ্ঞাতি হিসেবে উত্তরেব ও পুবেব বাড়িব বাবুদেব চেয়ে ঢের বেশি নিকট-সম্পর্কীয় ছিলেন এবং আসা-যাওয়া ও মেলামেশায় তাঁবা বেশি ঘনিষ্ঠই ছিলেন।

এই তিন বাড়িব বাবুদেব সম্পর্কটা সহজে বোঝাবার জন্যে বৃহৎ বংশাবলী থেকে কিছু বাদছাদ দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বংশাবলী সংকলন করে পাশেব পাতায় দেওয়া গেল। এই সংক্ষিপ্ত বংশাবলী থেকে দেখা যাবে যে যদুনন্দনের অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্যায়ে ছিলেন একজন যাঁব নাম ছিল বমানাথ দাশ। বড়ো বংশাবলীতে কথিত আমাদেব আদি পুরুষ পান্থ থেকে এই বমানাথ দাশ ছিলেন অষ্টাদশ পুরুষ নীচে এবং যদুনন্দন থেকে ইনি পাঁচ পুরুষ অধস্তন ছিলেন। বড়ো বংশাবলী থেকে আরো জানা যাবে যে এই বমানাথ দাশেব ছিল ছয় পুত্র এবং তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ পুত্রেব বংশলোপ পেয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তান ছিলেন বতনকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ। শেষোক্ত চন্দ্রনাথেব ছিল দুই ছেলে— কাশীশ্বব ও বীবেশ্বব। বমানাথেব পৌত্র এবং চন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীশ্বর ও তাঁব সন্তানেবা গেলেন মধ্যেব বাড়িতে এবং কাশীশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর বীবেশ্বব বাসা বাঁধলেন দক্ষিণেব বাড়িতে। রমানাথের পুত্র রতনকৃষ্ণেব চারিটি পুত্র জগবন্ধু, গোপীমোহন, কেদারেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর গেলেন পশ্চিমের বাড়িব চাব ভিটায়। প্রথমে এই তিন বাড়ির বাবুদের

কথা বলে তাব পর উত্তরের ও পুবের বাড়ির কর্তাদের ও তাঁদের সন্তানদের কথা বলব।

এখানে বলে রাখা ভালো যে তেলিরবাগের বাবুরা নামেই মাত্র ভুঁইঞা ছিলেন। জমিজমা তাঁদের খুব বেশি ছিল না। গ্রামের আশে-পাশে সংলগ্ন কিছু কিছু ক্ষেত-খামাব ছিল বটে তবে জমিদারী বলতে যা বোঝায় তেলিববাগের দাশেদের তা ছিল না। যেটুকু ক্ষেত-খামার ছিল তাতে কয়েক ঘর প্রজা বাস কবত এবং চাষের উপযুক্ত জমিতে সেইসব প্রজারাই ধান, পাট, খেঁসাবি ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদন কবত। বাবুরা নিজে কখনো হাতে লাঙল নিয়ে চাষ কবেছেন বলে শুনি নি। চাষ করত মুসলমান ও নমঃশূদ্র প্রজাবাই। জমি বিলি কবাব ফলে যে মুনাফা আসত আদায়ী খাজনা থেকে তাতে বাবুদেব সংসাব চলত না। বড়োজোব দোল-দুর্গোৎসবেব খবচাটা কুলিয়ে যেত কোনোমতে। যদি পূজাপার্বণে গাঁট থেকে টাকা বেব কবে দিতে না হত তবেই বাবুবা খুশী থাকতেন। নিজ নিজ সংসাবের ব্যয়ভাব বহন কববাব উদ্দেশ্যে তাঁবা বাইবে যেতে বাধ্য হতেন টাকা বোজগাবেব ধান্ধায়। অনেকে কর্মস্থলেই নূতন বাসা বেঁধে হয়তো রয়েই গেছেন। বাইবে টাকা বোজগার কবা সেকালেও খুব সহজসাধ্য ছিল না। এইজন্যে তেলিরবাগেব বাবুবা লেখাপড়াব দিকে খুব মনোযোগী হতেন এবং তাঁদের অর্জিত বিদ্যা ও ঈশ্ববদত্ত মেধার জোবে তাঁরা নিজ নিজ কর্মজীবনে প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ কবেছিলেন। বিক্রমপুর-বাসীদেব স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও অদম্য সৎসাহসের বলে তাঁরা কঠিন প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পেবেছিলেন। পবের পরিচ্ছেদগুলিতে তেলির-বাগেব বাবুদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পডলেই অতি অনায়াসে বোঝা যাবে যে কিবকম শিক্ষিত বিদ্বান ও মেধাবী পুরুষ তাঁবা ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বিক্রমপুববাসীদেব সকল সদ্‌গুণবাজিই ফুটে উঠেছিল এবং তাঁদেব মধ্যে অনেকে প্রবাসী হলেও তাঁবা যে বিক্রমপুবস্থ তেলিববাগ গ্রামের যদুনন্দন বংশজাত খ্যাতনামা দাশগোষ্ঠীব সন্তান এ আভিজাত্যাভি-মান তাঁরা কখনোই বিস্মৃত হন নি।

চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যের বাড়ি

১

রমানাথ দাশের পঞ্চম পুত্র চন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে কাশীশ্বর ছিলেন তেলিববাগের মধ্যেব বাড়িব কর্তামশায়। তিনি বেশ উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি ওকালতি পাস কবে ভাগ্যান্বেষণ করতে ববিশালের সদর কোর্টে গিয়ে ওকালতি শুরু কবলেন। অচিরেই তাঁব সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর অধ্যবসায়ে ও অদম্য উৎসাহে। কালক্রমে তিনি ববিশালেব সবকারী উকিলেব পদে নিয়োজিত হয়ে কৃতিত্বেব সঙ্গে কাজ করে গেছেন। ওকালতি কবে তিনি বেশ পসার জমিয়েছিলেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জন কবে ববিশাল অঞ্চলে কিছু বিষয়-সম্পত্তিও কিনেছিলেন। কাশীশ্বব খুবই অতিথিবৎসল ছিলেন। নিজ গ্রাম তেলিববাগে আপন গৃহে বিনা আড়ম্বরে কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকাবে তিনি একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। তাঁব সুযোগ্য পুত্রদ্বয় কালীমোহন ও দুর্গামোহন আজীবন সেই অতিথিশালার কাজ চালিয়ে গেছেন এবং তাঁদের মৃত্যুব পব যাতে সে পুণ্যকর্ম অব্যাহত থাকে সেজন্যে বন্দোবস্ত কবে গিয়েছিলেন। আমিও এই অতিথিশালা চালু দেখেছি শৈশবে।

কালক্রমে মধ্যেব বাঁড়িব বাবুবা সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠলে তাঁবা তাঁদের বসতবাড়িটিকে চুন সুবকি ইটেব পাকা দ্বিতল বাড়ি করে নিয়েছিলেন। এই দোতলা বাড়ির দক্ষিণের বাবান্দা থেকে অদূরে দেখা যেত পদ্মা নদী ও তাতে ভ্রাম্যমাণ পালতোলা জেলে নৌকা ও সময় সময় কোম্পানির যাত্রী ও স্টীমে চলা মালবাহী বড়ো বড়ো জাহাজ। সেই দোতলা বাড়ির দক্ষিণে ছিল প্রকাণ্ড উঠান একেবাবে মধ্যের খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। খাল-পাড়ে ছিল একটি মঠ বা শিবমন্দিব। সামনের উঠানের পুব দিকে ছিল পূজা-মণ্ডপ এবং উঠানের ডাইনে ও বাঁয়ে পরে হয়েছিল স্কুলের বড়ো বড়ো গোটা দুই টিনের চালওয়ালা ঘব। দোতলার উত্তরে ছিল অনেকখানি জমি একেবারে উত্তরের বাড়ির সীমানা পর্যন্ত। উত্তর-পুব কোণায় ছিল একটা পাকা শৌচাগার। উত্তর দিকের এই বিরাট জমির উপর দুই দিকে

ছিল দুটি পাকা দেওয়ালের উপর টিনের চাল দেওয়া দুটি প্রকাণ্ড ঘর। আমি ছোটো বয়সে যখন তেলিরবাগে থাকতাম তখন সেই দুটি ঘরের পশ্চিমের ঘরটিতে থাকতেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার অখিলচন্দ্র সেন মশায়। দোতলার পূর্বে একটি পাকা ঠাকুরদালানে ছিল গৃহদেবতা কালাচাঁদ বিগ্রহের নাটমন্দির। সেই ঠাকুরদালান ছাড়িয়ে আরো পূর্বে ছিল পাকা শান-বাঁধানো ঘাটওয়ালা প্রশস্ত দীঘি যাকে বলা হত 'মৈধ্যের বাড়ির পুখৈর'। আশেপাশের সব বাড়ির পানীয় জল সরবরাহ হত এই পুকুর থেকে।

কাশীশ্বরের ছিল তিন ছেলে— কালীমোহন দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। পিতামহ চন্দ্রনাথের অগ্রজ রতনকৃষ্ণ দাশের জ্যেষ্ঠপুত্র জগবন্ধু নিঃসন্তান ছিলেন। সেই পিতৃব্যপুত্র জগবন্ধুর বংশরক্ষার্থে কাশীশ্বর তাঁর আপন কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে জগবন্ধুর কোলে দত্তকপুত্ররূপে দান করেন। এই দত্তকসূত্রে আইনতঃ ভুবনমোহন মধ্যের বাড়ি থেকে পশ্চিমের বাড়িতে গেলেন বটে তবে রক্তের বন্ধন ছিন্ন হয় নি। তিন ভাইয়ে বরাবরই খুব কাছাকাছি এবং হৃদ্যতার সঙ্গেই জীবনযাপন করে গেছেন।

কাশীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬০ শকাব্দের ১৭ শ্রাবণ মঙ্গলবারে। তাঁর প্রাথমিক লেখাপড়া স্বগ্রাম তেলিরবাগেই গুরুমশায়দের কাছেই হয়েছিল। পরে কলকাতায় হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে আইন পরীক্ষায় পাস করে তিনি পিতা কাশীশ্বরের কর্মক্ষেত্র বরিশালেই ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। কালীমোহন বিবাহ করেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কাকুলিয়া গ্রামের ধন্বন্তরী গোত্রীয় বিকর্তন বংশোদ্ভব গঙ্গাদাস সেন মহাশয়ের কন্যা চন্দ্রমণি দেবীকে। কিছুদিন পরেই তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সরকারী উকিল পদ লাভ করেছিলেন। বরিশালে তাঁর বেশ পসার জমার পর ১৮৬২ সালে কলকাতায় নূতন হাইকোর্ট খুললে কালীমোহন কলকাতায় এসে হাইকোর্টের উকিল হলেন। হাইকোর্টের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কালীমোহনের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। আপন চেষ্টা, অধ্যবসায় ও মেধার গুণে কালীমোহন ধীরে ধীরে ওকালতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। ইনি প্রথিতযশা জজ সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র ও সার্ চন্দ্র-মাধব ঘোষ মহাশয়দের সমসাময়িক উকিল ছিলেন। তখনকার দিনে

এমন কোনো বড়ো মামলা ছিল না যাতে কোনো-না-কোনো পক্ষে কালী-মোহন না নিযুক্ত হতেন। পুরাতন ল রিপোর্টে প্রায়ই দেখা যাবে 'বাবু কালীমোহন ডস'এর নাম উকিল হিসেবে। কালীমোহন আইন-জ্ঞানে ও বাগ্মিতায় খুব উঁচুদরের উকিল তো ছিলেনই তিনি অসমসাহসী ও তেজস্বী পুরুষও ছিলেন। একবার হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজের সঙ্গে আইন-সংক্রান্ত কোনো একটি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়ে তিনি জজসাহেবের আইনের ব্যাখ্যাটিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"এমন সহজ আইনের কথাটা যা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাও বোঝে তা ধর্মাবতার কেন বুঝছেন না তা বুঝি না।" আর যায় কোথায়। আদালতের অবমাননার জন্যে তাঁর উপর নোটিস জারি হল। বিষয়টা অনেক দূর এগোচ্ছে দেখে অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁকে পরামর্শ দিলেন—"কাজ কি ঘাঁটিয়ে, একটু মাপ চেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ হবে।" কিন্তু কালীমোহন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তিনি অটল হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত চীফ জাস্টিস সার্ বার্নস পীকক তাঁকে খালাস দিলেন এই কটি কথা বলে—

"No doubt Kalimohan Babu was intemperate in his language but the principle of law he was arguing was right. So no action is called for."

জয়জয়কার পড়ে গেল দেশময় এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে গেল কালীমোহনের বাগ্মিতা। বড়ো হয়ে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জন এর মুখে কালীমোহনের এই তেজস্বীতার কথা অনেকবার শুনেছি। এবিষয়ে কালীমোহন ছিলেন দাদাবাবুর আদর্শ পুরুষ। চরিত্রের দৃঢ়তা ও আচরণের মাধুর্যে কালীমোহন সমসাময়িক সতীর্থমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে অগ্রণী বলে স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেন নি। এখনো তাঁর তৈলচিত্রখানি কলকাতা হাইকোর্টে বার্ অ্যাসোশিয়েশনের বড়ো ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালটি সুশোভিত করে রেখেছে।

আইন-ব্যবসায়ে কালীমোহন বিস্তর অর্থোপার্জন করেছিলেন। এত অল্পবয়সে এত আর্থিক উন্নতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তিনি ভবানীপুরে বিস্তৃত জমি কিনে একটি চকমেলানো সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ

করেছিলেন নিজে বসবাস করবার জন্যে। সেই বাড়িটির পরে নম্বর হল ১৪৮ রসা রোড সাউথ। সেটি ছিল বেলতলা ও রসা রোডের মোড়ে অবস্থিত। পরে সেই বাড়িটির নাম হয়েছিল 'কালীমোহন আলয়' এবং উত্তরকালে সেখানেই প্রথম পত্তন করা হয় 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'। বাড়ির মধ্যে ছিল দুটি পুকুর ও অসংখ্য নারকেল ও অন্যান্য ফলের গাছ। পুকুরের বাঁধানো ঘাটের উপরেই ছিল শিবমন্দির। ভবানীপুর পদ্মপুকুরের মিত্তির পাড়ার রমেশ মিত্রের বাড়ি, হরিশ মুখুজ্জে রোডের চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ি ও রসা রোডের কালীমোহন দাশের বাড়ির লোকজনদের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা ও যাতায়াত ছিল। বড়োদের মুখে শুনেছি যে কালীমোহনের বাড়ির প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর তৎকালীন সাহিত্যিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠত। আরো শুনেছি যে সেই সকল মনীষীমহলে সমাগত হতেন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দও।

কালীমোহন ও তাঁর অন্য দুই ভাই এক সময়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে খুবই আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা দেশের উন্নতি ও সমাজ-সংস্কারের কাজে পরম উৎসাহী ছিলেন। আপন গ্রাম তেলিরবাগ ও তার চারি দিকের গ্রামের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যে কালীমোহন স্বগ্রামে আপন পাকা বসতবাটীর একতলায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। কত দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা আসত ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বিনা পয়সায় ঔষধ নিতে। বর্ষার সময় মধ্যের বাড়ির সামনের খালে কত নৌকা ভিড়ত রোগী নিয়ে তা নিজের চোখেও দেখেছি। তা ছাড়া একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ বাসগৃহ মধ্যের বাড়ির দক্ষিণের মস্ত উঠানটায় গ্রামের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্যে। সেই গ্রামের স্কুলে আমিও শৈশবে কিছুকাল পড়েছি বলে স্পষ্ট মনে পড়ে। আর ছিল একটি অতিথিশালা পিতা কাশীশ্বরের আমল থেকেই। সেখানে দূরাগত অতিথিরা আহার ও বিশ্রাম পেতেন। কালী-মোহন নিয়মিত স্বগ্রামে আসতেন ও আত্মীয়স্বজন, প্রজা, সিকদার, ইত্যাদি সবাইকে দেখতেন ও সাহায্য করতেন। অচিরেই তিন ভায়ের সংকল্প পরীক্ষার দিন এল। নিজ গৃহেই উঠল সমাজ-সংস্কারের প্রশ্ন। বিষয়টা খুলেই বলি।

কাশীশ্বর শেষ বয়সে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি কন্যা শ্যামাসুন্দরী জন্মাবার অল্পপরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতাব কি ব্যবস্থা হবে সেই চিন্তা নিয়ে কালীমোহন ও তাঁর ভাইয়েরা খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক চিন্তার পর ও দুর্গামোহনেব নির্বন্ধাতিশয্যে তিন ভাই ঠিক করলেন যে তাঁরা সেই বালবিধবা বিমাতাব পুনর্বিবাহ দেবেন। বিমাতাবও সম্মতি হল। চারি দিকে হৈ হৈ পড়ে গেল, জ্ঞাতিমহলে ঘোব আপত্তি উঠল। কিন্তু তাঁরা তিন ভাই তাঁদের সংকল্পে অটল হয়ে রইলেন এবং ববিশালের ডাক্তাব জগৎ গুপ্তেব সঙ্গে বিমাতার পুনর্বিবাহ দিলেন। কত কুৎসা এঁদের নামে রটল এবং কত ছড়া এঁদের নামে মুখে মুখে চালু হল। ছোটো বয়সে যে-সব ছড়া শুনেছিলাম তাব একটা এখনো মনে আছে—

কালীমোহন, দুর্গামোহন মা বলিবা কাবে
তোমাব মায়েরে বিয়া দিছ কৈলকাতা সহরে।

আপন পিতৃব্য বীরেশ্বব তাঁদের একঘবে করে ধোপানাপিত বন্ধ করলেন। কিন্তু এইসব অত্যাচাবেও তাঁরা আপন সংকল্পভ্রষ্ট হলেন না। এই বিবাহের পব বিমাতার তিনটি ছেলে হয়েছিল এবং উত্তরকালে তাঁবা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে খ্যাতিমানও হয়েছিলেন।

কালীমোহনের দুইটি ছেলে হয়েছিল—মনোরঞ্জন ও নিত্যবঞ্জন। নিত্যরঞ্জন খুব অল্প বয়সেই মাবা যান। বড়ো ছেলে মনোবঞ্জন দেখতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন ও লেখাপড়ায় এবং বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মনোরঞ্জনেব বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনা-রঙ গ্রামের লস্কর বাড়িব এক অপরূপ সুন্দবী কন্যা দুর্গাসুন্দরীর সঙ্গে। সেই বড়ো বধূঠাকুরানীকে আমি যখন দেখি তখন তিনি মাঝবয়সী বিধবা, কিন্তু তখনো তাঁর কী রূপলাবণ্য ছিল— দেখে দেখে চোখ ফেরানো যেত না। এরকম সুন্দরী রমণী বাংলা দেশে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ভগবানের মার কে খণ্ডাতে পারে। চব্বিশ বছর বয়সে মনোরঞ্জন তদীয় পত্নী দুর্গাসুন্দরী ও একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারীকে রেখে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। এই নিদারুণ পুত্রশোক শেলসম আঘাতে কালী-

মোহনকে জীবন্মৃত করে দিয়েছিল। ফুৎকারে যেন প্রদীপ নিভে গেল। কালীমোহনের সাজানো বাগান এক নিমিষের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। এই বিষম দুর্বিপাকে প্রথমত কালীমোহন রাগে ও ক্ষোভে এমন আত্ম-হারা হয়ে গিয়েছিলেন যে শুনেছি সেবারকার পূজার সময় দুর্গা প্রতিমাকে তিনি আপন বিধবা পুত্রবধূ দুর্গাসুন্দরীর মতোই সাদা থান কাপড় পরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতেও তাঁর রাগ মেটে নি। সেই বছর থেকে মধ্যের বাড়ির দুর্গাপূজায় জীব-বলি নিষেধ কবে দিয়ে তিনি দেবীকেও আপন পুত্রবধূর মতো নিরামিষাশী করার ব্যবস্থা করেছিলেন। মধ্যের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় জীব-বলিব পবিবর্তে আখ, চালকুমড়া ইত্যাদি বলি হতে আমিও দেখেছি স্বচক্ষে।

জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর সময় কালীমোহনের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছব। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি যে দুবছর বেঁচে ছিলেন সে সময় তিনি নিজের স্বাস্থ্যেব প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর কয় বছর পূর্বেই তিনি শাস্ত্রবিধি-অনুসাবে ঘটা কবে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুসমাজে ফিবে যান সমাজের সকলের সঙ্গে একত্রে বাস কবতে। কিন্তু পুত্রেব মৃত্যুর পর তিনি কাজকর্ম ছেড়ে বাইরের কাবোর সঙ্গেই মিশতেন না। সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি যেন একাকী তাঁর মৃত্যুর দিন গুণতেন। অবশেষে ১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়াব রাজত্বকালের জুবিলি অনুষ্ঠানের দিনে সেই তেজস্বীপুরুষ নিজেকে শান্তিময় মৃত্যুর মধ্যে বিলীন করে দিলেন। বিক্রমপুরের একটি কৃতী সন্তান তাঁব জীবনের কাজ শেষ না করেই মোটে পঞ্চাশ বছর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করলেন পত্নী চন্দ্রমণি ও জ্যেষ্ঠপুত্র মনোরঞ্জনের বিধবা পত্নী দুর্গাসুন্দরী ও তাঁর একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারীকে রেখে।

কালীমোহনের উইলে প্রদত্ত অনুমতিবলে চন্দ্রমণি ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমারকে আপন স্বামীর দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে কুসুমকুমারীব নামে তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ রায় কোর্টে মামলা করেছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে মামলা শেষ পর্যন্ত আপসে মিটে যায়। বসন্তকুমার বড়ো হয়ে উঠে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি শিখে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। এর পরই তিনি বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ঋষিকল্প সার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শিক্ষিতা কন্যা

সরযূবালাকে বিবাহ করেন।

বসন্তকুমার ছিলেন খুবই হাসিখুসী আমুদে মানুষ। আমি তাঁকে 'ভোলাদাদা' বলে ডাকতাম। অত্যন্ত দয়ালু, হৃদয়বান যুবক ছিলেন ভোলা-দাদা। পরের দুঃখে তিনি নিরতিশয় পীড়া বোধ করতেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'দেশবন্ধু -স্মৃতি' গ্রন্থে লিখে গেছেন—'কালীমোহনের ন্যায় তেজস্বী, দুর্গামোহনের ন্যায় সামাজিক, ভুবনমোহনের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক সর্ববিষয়েই কালীমোহনের বংশ উজ্জ্বল করিতেন এই গৌর, সৌম্য ও উজ্জ্বলতম রত্ন।' জীবনের সর্বাঙ্গীণ সফলতার সকল উপাদান নিয়েই তিনি জীবন-সংগ্রামে নেমেছিলেন। কিন্তু হায়, বিধির বিধান কে খণ্ডাতে পারে। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে দার্জিলিং পাঠানো হয়েছিল। সেখানে অল্প একটু সেরে উঠবার পরই তাঁর টাইফয়েড জর হয় এবং সেই কালব্যাধিতে মে মাসের ২১ তারিখে বাপ মা ভাই-বোন স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন। তেলিরবাগ দাশগোষ্ঠীর একটি উজ্জ্বলতারা উদয় হতে না হতেই অস্ত গেল এবং কালীমোহন দাশের বংশে বাতি দেবার আর কেউই রইল না। এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সে-সময়ে দার্জিলিং সহরের শ্মশানঘাটে যাবার পথটি ছিল দুর্গম। পায়েহাঁটা কাঁচা পথ বেয়ে খাড়া নামতে হত শববাহীদের অত্যন্ত অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে দিয়ে। এই কথা জানতে পেরে পরে চিত্তরঞ্জন নিজ খরচায় সেই শ্মশানের পথটিকে পাকা ও সুগম করে দিয়েছিলেন সর্বসাধারণের সুবিধের জন্যে।

২

কাশীশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র দুর্গামোহন জন্মেছিলেন ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ইংরেজি ১৮৪১ সালে তেলিরবাগ গ্রামেই। শৈশবেই মাতৃহীন হয়েছিলেন দুর্গা-মোহন। তিনি বরিশালের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বৃত্তি পেয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন এবং পড়াশুনা করতেন আপন পিতৃব্য বীরেশ্বরের কালীঘাটের বাড়িতে থেকেই। দুর্গামোহন বিবাহ করেন খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ

গ্রামের ধন্বন্তরীগোত্রীয় কন্দর্পবংশোদ্ভব গঙ্গাধর সেনের কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবীকে। যথাকালে ওকালতি পবীক্ষায় পাস করে তিনিও কালীমোহনের মতো বরিশালেই প্রথম কাজ শুরু করেন। সেখানে বেশ পসাব জমার পরই বোধ হয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন। অনতিকাল পরেই তিনি হাইকোর্টে নিজ ধীশক্তি বলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন কবেছিলেন।

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি প্রফেসার কাওয়েল বলে একটি সংস্কৃতজ্ঞ ও ধার্মিক খৃষ্টান অধ্যাপকেব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং সে সময় খৃষ্ট-ধর্মের দিকে খুবই আকৃষ্ট হন। ববিশালে প্র্যাকটিস আরম্ভ করার পর অগ্রজ কালীমোহনেব নির্দেশে দুর্গামোহন মার্কিন দেশীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ও নামকরা চিন্তাশীল লেখক থিয়োডোর পার্কারের বচনাবলী অতি মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন কবেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন তখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল কেবল বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষেব নানা প্রদেশেও। দুর্গামোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পবিকল্পনা পবিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মের সেই মহান আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। পরে কালীমোহন ও দুর্গামোহন দুই ভাই-ই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে নানা জনহিতকর কাজে লেগে গিয়েছিলেন। নিজের গ্রামেব বাড়িতে অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয়— যার পবে দুই ভাইয়ের নামে নাম হয়েছিল কে. এম. ডি. এম. এইচ. ই. স্কুল তলিরবাগ— এইসব কাজেই তিনি কালী-মোহনেব দক্ষিণহস্ত ছিলেন। অর্থে সামর্থ্যে তিনি সর্বদাই সাহায্য করেছেন এইসকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে। তা ছাড়া বর্ষার সময় যখন জলে সমস্ত দেশ ভেসে যায় তখন মৃতদেহ সৎকারের সুবিধের জন্যে দুর্গামোহন গ্রামের পূর্বদিগন্তে মাঠের মধ্যে খুব উঁচু করে পাকা দেয়াল দিয়ে ঘিরে মাটি ফেলে একটি পাকা শ্মশানঘাট তৈরি করে দিয়েছিলেন। দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান সতীশবঞ্জন ও ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্ত-রঞ্জন মুক্তহস্তে এইসব অতিথিশালা, দাতব্যচিকিৎসালয় ও হাই স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন যতদিন তেলিরবাগ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। এইসব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তেলিরবাগ ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যে কত উপকার হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের পিতৃদেব পরলোকগত রাখালচন্দ্রও এই স্কুলের

সেক্রেটারীরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

গ্রামের ও সর্বসাধারণের কল্যাণকর এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাড়াও দুর্গামোহন কত আত্মীয়, অনাত্মীয় স্বগ্রামবাসীদের সুখে দুঃখে অর্থে ও সামর্থ্যে ও সমবেদনা দিয়ে আজীবন সেবা করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আত্মীয়দের মধ্যে আমাদের পিতামহ ও পিতামহী যে দুর্গামোহনের মমতা পেয়েছিলেন সে কথা আমাদের মায়ের মুখে শুনেছি বড়ো হয়ে। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার জন্যে অনেক চিন্তা ও অর্থব্যয় করে গেছেন। নিজের কন্যা তিনটিকে তো উচ্চশিক্ষা দিয়েইছিলেন, অন্য অনেক সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় বালিকা ও বালবিধবাদের আপন গৃহে রেখে দুর্গামোহন তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং আপন উইলপত্রেও বালিকাদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। দুর্গামোহন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। যখন তিনি খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে উঠেছেন তখনো গোলপাতার ঘরে পুরানো গোয়ালা বন্ধুর সঙ্গে অনেক সময় গল্প করে আসতেন। সেই বন্ধুর মৃত্যুর পর তার সন্তানদেরও সাহায্য করতেন।

স্বগ্রামের সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও দুর্গামোহনের যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিটি জনকল্যাণ কাজে দুর্গামোহনের পূর্ণ সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্য ছিল। তিনি ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। সমাজসংস্কারের কাজে ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ ও সৎসাহস। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ হয়েছিল। এই ঘটনায় তাঁদের আপন পিতৃব্য যে তাঁদের একঘরে করে ধোপানাপিত বন্ধ করেছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনেরা নানা কুৎসা, ছড়া ও মিথ্যাপবাদ দিয়ে তাঁদের বিব্রত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার কথা আগেই বলেছি। এই সমস্ত সামাজিক উৎপীড়ন সত্ত্বেও যা তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেছেন সে সংগত কর্ম থেকে দুর্গামোহন একচুলও বিরত হন নি।

এইখানে আমার মায়ের মুখে শোনা একটি ঘটনা যার থেকে দুর্গামোহনের সৎসাহসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তা না বলে পারছি না। বরদানাথ হালদার যিনি উত্তরকালে বিজনীর রানীদের বিশ্বস্ত দেওয়ান বলে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি তখন তরুণ ব্রাহ্মযুবক। তাঁর এক জ্ঞাতিভগিনী বিধুমুখীর তখনো বিয়ে না হওয়ায় সেই কন্যার অভিভাবকেরা সমাজে পতিত

হবার ভয়ে তাঁকে একজন বহুবিবাহিত বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছিলেন। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং সেই কারণে তাঁরও যে এই বিয়েতে একেবারেই সায় ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। সৎসাহসী যুবক বরদানাথ এই খবর পেয়ে ভগিনীর অনুরোধে বিয়ের পূর্বাহ্নেই সেই ভগিনীটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে নৌকাযোগে পালিয়ে গিয়ে একেবারে দুর্গামোহনের বাড়িতে নিয়ে উপস্থিত করেন। গ্রামে সোবগোল পড়ে গেল এবং বরদানাথের উপর কত যে অকথ্য অশ্লীল কুৎসা আরোপিত হল তার সীমা ছিল না। এমন-কি শুনেছি যে কন্যাটির আত্মীয়েরা আক্রোশভবে গুণ্ডা লাগিয়ে লাঠির বাড়িতে বরদানাথের মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই-সকল নোংরা নিন্দা, তিরস্কার ও অত্যাচার চরিত্রবান বরদানাথকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি এতটুকুও। দুর্গামোহন সেই কন্যাকে পূর্ণ সহানুভূতি দিয়ে আশ্রয় দিলেন নিজ গৃহে। কন্যার অভিভাবকেবা মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়ে অভিযোগ কবলেন বরদানাথ, দুর্গামোহন ও অন্যান্য কয়েকজনের নামে ফৌজদারী আদালতে। মামলা অনেক দিন ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত রায়ে সাব্যস্ত হল যে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা এবং নিজে বাজিখুসী মতে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে গেছেন। সুতরাং আসামীরা সবাই বেকসুর খালাস হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল এই ভগিনীর কি ব্যবস্থা হবে। একটি নব্য ব্রাহ্ম যুবক, রজনীনাথ রায়, যিনি তখন ডাক ও তার বিভাগে কাজ করতেন তিনি বিধুমুখীর পাণিগ্রহণেচ্ছুক হওয়ায় তাঁদেব বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঘটা করে। সেই রজনীনাথ বায় কালক্রমে পোস্টমাস্টার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং পরে তাঁর ভবানীপুরেব বাসভবনেব সামনের রাস্তাটির নাম হয়েছিল 'রে স্ট্রীট'। এঁদের একমাত্র পুত্র বজতনাথ রায় ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলকাতায় দিনকতক কাজ করবার পর নিতান্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা থেকেও দুর্গামোহনের চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনিষ্ঠ আচার্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখে গেছেন যে 'দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন'।

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও দুর্গামোহনের প্রখর দৃষ্টি ছিল। দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে দেশবাসীদের আগ্রহশীল করে তোলাই

ছিল সে-সময়কার শিক্ষিত লোকেদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সেই সময়ে দেশের চা-ব্যবসায় ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া ছিল। পূর্বে নীলকর কুঠিতে আড়কাঠিদের সাহায্যে প্রলোভন দেখিয়ে যেমন কুলি নিয়ে যাওয়া হত, চা-বাগানেও পরে সেইরকম করে কুলি চালান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বিদেশী কোম্পানিগুলিব ইংরেজ ম্যানেজারের কুলিদের উপর অত্যাচারের কত যে কাহিনী শোনা যেত তার ইয়ত্তা ছিল না। লোকে বলত যে কুলিদের খাটিয়ে রক্তশোষণ কবে কোম্পানিগুলি নিজেদের মোটা মুনফা লাভের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকত। বিখ্যাত ব্যবহাবজীবী ও দেশনেতা আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন একযোগে কয়েকটি চা-বাগান কিনে দেশী চা-ব্যবসায় ও কুলিদের অবস্থাব উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে সময়ে এ দেশের জীবনবীমার ব্যবসায় বিদেশীযদের হাতেই ছিল। বোম্বাই অঞ্চলে একটি দেশী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানেব সূত্রপাত হয় 'এম্পায়াব অফ ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি' নামে। দুর্গামোহন সেই কোম্পানির কাছ থেকে সাবা বাংলার চীফ এজেন্সী নিয়ে আপন জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনকে সেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

দুর্গামোহনের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর কথা যে কত শুনেছি আমার মায়ের মুখে তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি ছিলেন খুলনা জেলাব ভট্টপ্রতাপ গ্রামের গঙ্গাধব সেনেব দুহিতা। তিনি রূপে ও গুণে সকলের চিত্তহরণ করেছিলেন। এইরকম দয়াময়ী, আশ্রিতবৎসলা মহিলা সচরাচর দেখা যায় না। বছর চারেক বয়সেব সময় নাকি বিবাহ হয়ে তিনি তেলিরবাগের দাশ-বংশে এসেছিলেন বধূরূপে। সেই থেকে তিনি আজীবন তাঁর স্বামী দুর্গামোহনের সকল শুভ কাজেই উৎসাহ দিয়ে ধর্মপরায়ণা সাধ্বী রমণীর কর্তব্যকে মহিমান্বিত কবে গেছেন। তাঁব গৃহে অগণিত নিরাশ্রয়া আত্মীয়া ও অনাত্মীয়া বালিকা ও বালবিধবাদেব তিনি জননীস্বরূপিণী হয়ে সস্নেহে লালন-পালন করে গেছেন। কি করে এই মহিলাটি তাঁর আজন্মেব সকল সংস্কাবকে বর্জন করে স্বামীর সমাজ-সংস্কারের কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করতে পেরেছিলেন সে কথা ভাবলেও বিস্ময়বোধ হয়। স্বগ্রামে ও ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মময়ীব স্নেহাশীর্বাদ পায় নি এমন লোক ছিল না। ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মময়ী মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে এই মহীয়সী রমণীর ভূয়সী প্রশংসা-বাদ করে গেছেন। দুর্গামোহন ও তদীয় পত্নী ব্রহ্মময়ীর চরিত্রমাধুর্য ও স্বার্থ-

পরায়ণতার প্রভাব খুব বেশি রকম প্রতিভাত হয়েছিল তাঁদের স্বীয় পুত্র-কন্যাদের এবং তখনকার দিনের দাশবংশের সকল ছেলেমেয়েদের জীবনে। ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে দুর্গামোহন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন কাওরাইদের ধর্মপরায়ণ কালীনারায়ণ গুপ্তমশায়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমন্তশশীকে। এই হেমন্তশশী দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বিমলার বড়ো ভগিনী ছিলেন বলে এই বিবাহে যে তাঁর পরিবারের অনেকেই মত দিতে পারে নি তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, এই বিবাহের অল্পকাল পরেই বাংলা ১৩০৪ সালে দুর্গামোহন ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি যে তেলিরবাগের দাশগোষ্ঠীর একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন এ কথা তাঁর স্বগ্রামবাসী ও বিক্রমপুরের অনেক অধিবাসীই অকুণ্ঠভাষায় স্বীকার করেন আজ পর্যন্ত।

৩

দুর্গামোহনের প্রথমা সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী রত্নগর্ভা ছিলেন। তিনি ছয়টি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। এই ছয় সন্তানের মধ্যে তিনটি ছিলেন ছেলে— সত্যরঞ্জন, সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জন এবং তিনটি ছিলেন কন্যা— সরলা, অবলা ও শৈলবালা। এই ছয়টি সন্তানের প্রত্যেকটিকে নিষ্কলঙ্ক মুক্তা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে কোনো দেশের যে কোনো অভিজাত বংশের সন্তানদের তুলনায় এরা প্রত্যেকেই সম্মানার্হ। এদের প্রত্যেককেই আমি দেখেছি এবং এদের স্নেহও আমি কিঞ্চিদধিক পরিমাণে পেয়েছি। সম্পর্কে তাঁরা আমার দাদা ও দিদি হলেও আমি তাঁদের ছেলেদের সমবয়সী ছিলাম। তাঁদের চরিত্রের মহানুভবতা ও উদারতা ও তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত যে ভিতরে ভিতরে আমার অজানিতে আমাকে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করেছে তা স্বীকার করবই।

দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করেন। তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন! বেশ লম্বা ও বাইরে থেকে দেখতে বেশ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর চেহারা। অতি অমায়িক, হাস্যরসিক, উদার ও চরিত্রবান মানুষ ছিলেন সত্যরঞ্জন— যাঁকে আমরা 'বড়দাদা' বলতাম। তিনি বিবাহ করেন কাওরাইডের সুবিখ্যাত জমিদার ও পরম ধার্মিক ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্তমশায়ের একটি বিদুষী

কন্যা বিমলাকে। সত্যরঞ্জন গোড়ার দিকে সেন্ট্রাল প্রদেশের খাণ্ডোয়া কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। তিনি আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিখ্যাত টেগোর ল লেকচারার পদে বরণ করে বক্তৃতা দিতে আহ্বান কবেছিলেন। এ সম্মান যে-কোনো আইনজীবীব একান্ত কাম্য ছিল। সত্যরঞ্জনের বক্তৃতামালাব বিষয়বস্তু ছিল 'দি ল অব আলট্রাভাইবিস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'। সেই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে এখনো আইন জীবীদের বিশেষ কাজে লাগে এবং আইনজ্ঞদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে।

সত্যরঞ্জন বেশিদিন আইন-ব্যবসায় কবতে পারেন নি। দুর্গামোহন যখন এম্পায়াব অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসুবেন্স কোম্পানির চীফ এজেন্সী নেন তখন সেই কোম্পানির কাজ দেখাশুনা করবাব দায়িত্ব সত্যরঞ্জনকেই দেন। সেই শুরু অবস্থা থেকে সত্যরঞ্জন সেই ব্যবসায়টিকে আপন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমেব গুণে দ্রুত উন্নতিব পথে দাঁড় কবিয়ে যান।

সত্যরঞ্জনেব সহধর্মিণী, আমাদের বিমলা বৌঠান, ছিলেন খুবই শিক্ষিতা মহিলা। তিনি সদাহাস্যময়ী, কাব্যবসগ্রাহী ও স্বজনবৎসলা ছিলেন। উত্তর-কালে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ কবে এসেছিলেন। তিনি কিছু কিছু বইও লিখে গেছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কাব্যেব যে বাংলা তর্জমা তিনি করেছিলেন তার খুব সুনাম হয়েছিল। সত্যবঞ্জন বেশ কম বয়সেই তদীয় স্ত্রী বিমলা ও এক-মাত্র কন্যা মায়াকে রেখে পবলোকগমন কবেন। পরে মায়াব বিয়ে হয়ে-ছিল সুবিখ্যাত আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অজিতমোহন বসুব সঙ্গে। বিমলা বৌঠান ও মায়া এখন আব ইহজগতে নেই। মায়াব ছেলে দিলীপ দার্জিলিং শহবেই বসবাস কবছেন।

দুর্গামোহনেব দ্বিতীয় পুত্র সতীশরঞ্জন তার অন্য দুই ভাইয়ের মতো লম্বা-চওড়া চেহারা পান নি। বলতে গেলে তিনি বেশ বেঁটেই ছিলেন। শেষ বয়সে আবাব তাব উপর কিছু মোটাসোটাও হয়ে গিয়েছিলেন। সতীশরঞ্জনের মুখের দিকে চাইলে প্রথমেই চোখে পড়ত তাঁর টানাটানা বড়ো দুটি চোখের ভাবব্যঞ্জনা। মুখে একটি সুন্দর হাসিহাসি ভাব লেগেই থাকত। কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্ট এবং ব্যবহার ছিল সৌজন্যপূর্ণ। এঁর গলার টনসিল অপারেশনের জন্যে এঁকে বারো বছব বয়সে বিলেতে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারের পরে তিনি সেইখানেই রয়ে গেলেন এবং প্রথমে স্কুলের

পাঠ সাঙ্গ করে ব্যারিস্টারি পাস করে বারো বছর পরে দেশে ফিরে আসেন, বয়েস যখন তাঁর চব্বিশ কি পঁচিশ।

সুদীর্ঘ বারো বছর বিলেতে বাস করে সতীশরঞ্জনের বাহ্যিক চাল-চলন ও জীবনযাত্রা প্রণালী কিছুটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর ভিতরের বাঙালিত্বটা একেবারেই ম্লান হয় নি। আজীবন তিনি তাঁর গরিব দুঃখী আত্মীয় অনাত্মীয় গ্রামবাসীদের সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। বহু দুঃস্থ ছাত্রদেব তিনি পড়ার খবচ, বই-কেনার টাকা, পবীক্ষার ফিস ইত্যাদি দিতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি। তেলিরবাগের দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও হাইস্কুলেব ব্যযভার বহুলাংশে তিনি স্বীয় উপার্জন থেকেই বহন কবে গেছেন। তিনি ছেলে-মেয়েদের ভালো ও উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। এখন যেটিকে আমবা ডুন পাবলিক স্কুল বলে জানি সে স্কুলটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় আলিপুরের হেস্টিংস হাউসে এবং সতীশ-রঞ্জনই ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সেই স্কুলেই তাঁর ছেলে দুজনের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়। পরে সেই স্কুলটি ডেরাডুনের বিস্তৃত প্রান্তরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ স্কুলের জন্যে সতীশরঞ্জন অনেক পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরলা রাযের প্রতিষ্ঠিত 'গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল'এর জন্যে তিনি অকাতবে অর্থ জুগিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ সতীশ-রঞ্জনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ মেয়ে স্কুলটি দাঁড়াতই না। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সংস্কাব ও অন্যান্য কাজেও তাঁর দান কম ছিল না। নিজে দেখেছি তাঁর আফিস ঘরের টেবিলের একধারে একটি চাঁদার বাক্স থাকত যার মধ্যে মক্কেলদের সাধ্যমত কিছু দিতেই হত, নইলে কাজই আরম্ভ হত না।

সতীশরঞ্জন আপন প্রতিভায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রভূত খ্যাতি ও যশ অর্জন করেছিলেন। প্রথমে হাইকোর্টেব স্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী এবং পরে অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে তিনি ব্যারিস্টারদের মধ্যে অগ্রণী বলে সম্মান লাভ করেছিলেন। অ্যাডভোকেট জেনারেলের কার্যকাল শেষ হতে-না-হতেই তিনি দিল্লীতে ভাইসবয়ের অর্থাৎ বড়োলাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ল মেম্বর অর্থাৎ আইন-সদস্য পদে নিযুক্ত হয়ে আইনজীবীদের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতারই মতো

ধর্মপরায়ণ, নির্ভীক ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবটি ছিল তাঁর খুবই শান্ত, গম্ভীর এবং অত্যন্ত নম্র, মধুর ছিল তাঁর ভাষা। নিজ স্বভাব-গুণে তিনি সতীর্থমহলে খ্যাতিমান পুরুষ বলে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাগ্মিতা, সততা ও সৌজন্যের জন্যে জজেরাও তাঁকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা দিতেন।

বিলেত থেকে ফেববাব পব কিছুদিন আমি সতীশদাদার চেম্বারে কাজ শিখতে যেতাম এবং তাঁর ব্রীফ পড়ে তাঁব সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে গিয়ে তাঁর কাজের ধাবাটা লক্ষ্য কবতাম। কোর্টের কাজে তাঁর অসাধারণ পটুতা ছিল। কখনো তাঁকে ধাপ্পা দিয়ে জজেদের মন বিভ্রান্ত কববার প্রয়াস করতে দেখি নি। তাঁর কাজেব মান সর্বদাই উঁচুদরের ছিল এবং তিনি সবসময়ে বেশ তৈবি হয়েই কোর্টে যেতেন। কোর্টে তাঁকে কখনো বিচলিত হতে অথবা কাগজ হাতড়ে বেড়াতে দেখি নি। কখনো কোনো হাকিম উঁচু গলায় অধৈর্য হয়ে তাঁব বক্তৃতাব ব্যাঘাত ঘটালে তিনি ঈষৎ হেসে কিন্তু অত্যন্ত সংযতভাবে তাঁকে বলতেন, "আপনি অনর্থক অধৈর্য হচ্ছেন— উত্তেজনাব কোনো কারণই তো ঘটে নি।" অমনি রাগারাগি থেমে যেত। 'একবার অপব পক্ষের কৌন্সুলী যখন সওয়াল জবাব করছিলেন সতীশরঞ্জন চোখ বুঁজে শুনছিলেন। তাঁব সঙ্গে সেবাব দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের জামাতা সুধীব বায় ছোটো কৌন্সুলী ছিলেন। তিনি মনে করলেন যে সতীশরঞ্জন বোধ হয় ঘুমচ্ছেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রায়সাহেব সতীশ-রঞ্জনের কনুইয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, "দেখুন, দেখুন, ওঁবা অবান্তর কথা— যা বেকর্ডে নেই তা বলে যাচ্ছেন।" সতীশরঞ্জন একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, "বলতে দাও। আমরাও বলব'খন।" বলেই তিনি আবার চোখ বুঁজে রইলেন। উল্টোদিকেব কৌন্সুলীকে তিনি পারতপক্ষে ওজর তুলে তাব সওয়াল জবাবের ব্যাঘাত কবতেন না। সতীশরঞ্জন ব্যাবিস্টাবদের মধ্যে খুব প্রিয় ছিলেন। আজও তাঁব বড়ো ছবি বার লাইব্রেরীর ছোটো ঘরে যেখানে অ্যাডভোকেট জেনারেল বসেন সেই চেয়ারের পিছনে পূবের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি লিবাবেল অর্থাৎ নরমপন্থী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে স্বাধীনতা লাভের আগে দেশবাসীদের শিক্ষায়-দীক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করতে হবে, স্বভাবকে সুসংযত করে মনকে শক্তিশালী করতে হবে।

এই জন্যে তিনি আগে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন মনে করতেন। তিনি খুবই স্বাভাবিকভাবে সমানে সমানে ইংরেজদের সঙ্গে মিশতে পারতেন। তাঁর বাড়িতে বহু গণ্যমান্য ইংরেজ অতিথি দেখেছি। ইংরেজদের সঙ্গে দহরম-মহরম এবং তাঁর লিবারেল রাজনৈতিক মতের জন্যে তাঁকে 'খয়ের খাঁ' ইত্যাদি নানারকম কটূক্তিও শুনতে হয়েছে। তিনি কিন্তু এ-সব অপপ্রচারে একেবারেই বিচলিত হতেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষমহলে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল যে তিনি ইচ্ছে করলেই নানা খেতাবই পেতে পারতেন। বহুবার কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'সার্' উপাধি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে এ-সব খেতাব নিলে দেশের জনতার থেকে তিনি দূরে সরে যাবেন। সেই আমলে এই মানসিক শক্তি খুব কম লোকেরই ছিল।

সতীশরঞ্জন যে অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন তার একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। পূর্ববঙ্গের একটি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মুসলমান জমিদারের সঙ্গে দুর্গামোহনের খুবই সদ্ভাব হয়েছিল। দুই পরিবারের শুধু ছেলেদের নয় মেয়েদের মধ্যেও আসা-যাওয়া ছিল। সেই জমিদারের ছিল দুটি ছেলে। বড়োছেলের সঙ্গে ছিল সতীশরঞ্জনের বিশেষ বন্ধুত্ব। এই হিন্দু-মুসলমান প্রীতির নিদর্শনস্বরূপে সতীশরঞ্জনের বড়ো-ছেলের নামকরণ হয়েছিল ধ্রুবরঞ্জন আহমেদ দাশ। সেই জমিদারের ছোটোছেলে করতেন পাটের না কিসের ব্যবসায়। কারবারের প্রয়োজনে তাঁকে ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার করতে হয়। উপযুক্ত জামিন না থাকলে ব্যাঙ্ক অত টাকা আগাম দিতে অস্বীকৃত হলে তিনি সতীশরঞ্জনের শরণাপন্ন হলেন। বলামাত্র সতীশরঞ্জন সেই ঋণের জামিন হয়ে কাগজে দরখাস্ত করলেন অনেক আত্মীয় ও শুভার্থীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে। যা বাড়ির লোকেরা ভেবেছিলেন হলও তাই। অচিরে সে কারবার ফেল পড়ল। ব্যাঙ্ক কড়ায় গণ্ডায় তার পাওনা টাকার জন্যে নালিশ করে ডিক্রি পেলেন লক্ষাধিক টাকার জন্যে। প্রধান দেনদারের সকল সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হওয়ায় সমস্ত দেনাটার দায় পড়ল একা সতীশরঞ্জনেরই ঘাড়ে। সতীশরঞ্জনের কলকাতার ময়রা স্ট্রীটস্থ নূতন সুন্দর বসতবাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল সে দেনার দায়ে। সেই বাড়ি-বেচা টাকা দিয়ে বন্ধুর ভায়ের ব্যাঙ্কের কাছে দেনা শোধ দিয়ে সতীশরঞ্জন ঋণমুক্ত হলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর

মুখে সেই বন্ধু-পরিবার সম্বন্ধে কটূক্তি কেউ কখনো শোনে নি।

সতীশরঞ্জন প্রথমে বিবাহ করেন রেঙ্গুনের নামকরা ব্যবহারজীবী পি. সি. সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে। কিন্তু সরলা অল্প বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। কিছুকাল পরে সতীশরঞ্জন প্রবীণ আই. সি. এস. বিহারীলাল গুপ্ত (বি. এল. গুপ্ত) মশায়ের এক কন্যা বনলতাকে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে সতীশরঞ্জনের দুইটি ছেলে জন্মে— ধ্রুবরঞ্জন ও মহীরঞ্জন। ধ্রুব প্রথম ডুন স্কুলে, পরে বিলেতে একটি পাবলিক স্কুলে পড়ে শেষে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে ও লণ্ডনে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করেন। তিনি আমার চেম্বারে মাঝে মাঝে আসতেন কাজ শিখতে এবং সেই সূত্রে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখবার ও জানবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ধ্রুবরঞ্জনের মনটি ছিল খুবই সাদা ও নরম। আত্মীয়স্বজনদের তিনি জানতেন এবং সামাজিকতা তিনি সর্বদা রক্ষা করতেন। এদিকে নরম হলেও ধ্রুবরঞ্জন অম্লানবদনে লোককে হক কথা শুনিয়ে দিতে পারতেন দরকার হলে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। বিক্রমপুর তেলিরবাগ গ্রামের জন্যে তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। তিনি যে তেলিরবাগের দাশগোষ্ঠীর সন্তান এই গৌরববোধ ছিল তাঁর অজস্র। 'আমরা দাশেরা'— এই কথাটা প্রায়ই তাঁর মুখে শুনতাম ও আনন্দে আমার মন ভরে উঠত।

তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডুন স্কুলে ধ্রুবরঞ্জন নিজেও পড়েছিলেন তা আগেই বলেছি। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি সেই স্কুলের স্বার্থের দিকে সর্বদা মনোনিবেশ করতেন। যতদূর মনে আছে তিনি সেই স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি নয়তো একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মনে পড়ে একবার তাঁর অনুরোধে আমি ডুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা-দিবসে বার্ষিক অধিবেশনে একটি ভাষণ দিয়েছিলাম ও একটি বড়ো হলের শিলান্যাস করেছিলাম। আমি যেতে রাজি হয়েছিলাম বলে ধ্রুব খুবই খুসী হয়েছিলেন। ধ্রুবরঞ্জনকে সরকার ডিস্ট্রিক্ট জজ পদে নিয়েছিলেন কিন্তু মেডিক্যাল পরীক্ষায় তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। হাইকোর্টে ভালো করে প্রতিষ্ঠালাভের আগেই অতি অকালে তিনি মারা যান।

সতীশরঞ্জনের দ্বিতীয় পুত্রের নাম মহীরঞ্জন। মহীরঞ্জনও প্রথমে ডুন স্কুলে ও পরে বিলেতে পাবলিক স্কুলে পাঠ শেষ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভর্তি হন। সেখানে ট্রাইপজ পাবার পরেই তিনি জগদ্‌বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানি পি অ্যাণ্ড ও-র ম্যানেজিং এজেন্টস ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানিতে সিনিয়র একজিকিউটিভ হয়ে যোগদান করেন। এইরকম নামী কোম্পানিতে বাঙালি ছেলের ভর্তি হওয়া সে সময়ে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল, এমন-কি কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু মহীরঞ্জন ঐ প্রতিষ্ঠানে স্থান পেয়েছিলেন এই কাবণে যে সেখানকার কর্মকর্তা লর্ড ইঞ্চকেপের সঙ্গে সতীশরঞ্জনের খুবই সদ্ভাব ছিল। দেশে ফিরে এসে মহীবঞ্জন ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানিব কাজে লেগে গেলেন। তাঁর কাজের ক্ষেত্র এবং আমার কর্মক্ষেত্র পৃথক হওয়ায় মহীরঞ্জনকে খুব কাছাকাছি দেখবার সুযোগ-সুবিধে আমাব হয় নি। তিনি ধ্রুবর মতো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা কবতে পাবেন নি। এমন-কি অনেক জ্ঞাতিবর্গ যাঁদের তাঁর বাবা মা এবং দাদা জানতেন এবং অনুগ্রহ করতেন মহীরঞ্জন হয়তো তাঁদের জানতেনই না। কিন্তু মহীরঞ্জনের মধ্যে তাঁর পিতার কতকগুলি সদ্‌গুণ দেখেছি। যাঁদের পছন্দ করতেন তাঁদেব সঙ্গে বেশ হাসিমুখে মিষ্টি কথা বলতেন এবং সোহাগও জানাতে পাবতেন। তাঁর মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ কবতে দ্বিধাই করতেন না। একবার কোনো ইঙ্গবঙ্গ ক্লাবে এক বিদেশী সভ্য ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে একটা ইতর মন্তব্য করায় মহীবঞ্জন তৎক্ষণাৎ তাব প্রতিবাদ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও যখন সেই ব্যক্তি সেই মন্তব্যের পুনরুক্তি করেন তখন মহীরঞ্জন তাকে ঘুঁষি মেরে ঠেলতে ঠেলতে ক্লাবের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসেন। ইংরেজ কোম্পানির চাকুরে হয়ে মহীরঞ্জন একজন ইংবেজকে এরকমভাবে শিক্ষা দেবেন এ কথা কেউ ভাবতেই পারেন নি। দুই দলের কতিপয় বন্ধু মহীরঞ্জনকে বললেন যে তাঁর রাগ হবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও তিনি ঘুঁষোঘুঁষিটা না কবলেই ভালো করতেন। সেই ইংবেজের সঙ্গে একবার হাত মিলিয়ে দুটো কথা বললেই ব্যাপারটা মিটে যেত। মহীরঞ্জন বললেন, "কোনো অপরাধই করি নি, তবে কেন আপসোস করব।" ব্যাপারটা ফৌজদারী কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং মহীরঞ্জন বেকসুর খালাস হলেন। এটা খুবই সুখের বিষয় যে এই ঘটনায় মহীরঞ্জনের আফিসের উপরওয়ালারা একেবারেই বিচলিত হন নি। মহীরঞ্জন নিজের কর্ম-তৎপরতায় ও সততায় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কলকাতা আফিসেব

সর্বাধ্যক্ষ কর্তা হয়েছিলেন এবং এখন তিনি অবসর নিয়েছেন। ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির পয়লা নম্বরের পদ বাঙালির স্বপ্নেরও অতীত ছিল। মহীরঞ্জন সে পদ লাভ করেছিলেন। মহীরঞ্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ও তাঁকে জানবার সময় ও সুযোগ আমার ঘটে নি। তবু তাঁর কর্মকৃতিত্বের জন্যে ও তিনি যে তেলিববাগ দাশগোষ্ঠীর সন্তান ও আমার জ্ঞাতি সেই কথা ভেবে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করি। মহীবঞ্জন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাতি সুনন্দ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেছেন।

দুর্গামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষরঞ্জনকে আমি খুব কাছাকাছি থেকে দেখি নি। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার বাবাব কাছে অনেক কথাই শুনেছি এবং তাঁর চরিত্রের উৎকর্ষের কথা জেনেছি। তিনি বেশ লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। গায়েব বং তিন ভাইয়েরই শ্যামবর্ণই বলতে হয়। জ্যোতিষবঞ্জনও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস কবে এসে কলকাতা হাইকোর্টে কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকটায় তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সতীশদাদা ছিলেন লিবাবেল বা মডাবেটের দলে, কিন্তু জ্যোতিষদাদা জাতীয় কংগ্রেসেব দিকে ঘেঁষা ছিলেন এবং বাবার কাছে শুনেছি একটু চরমপন্থী হয়েই উঠেছিলেন। এ বিষয়ে জ্যোতিষরঞ্জন অনেকটা চিত্তরঞ্জনের মতাবলম্বীই ছিলেন। সতীশবঞ্জন প্রথমে বেঙ্গুনের নামকরা আইনজীবী পি.সি. সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে বিয়ে কবেছিলেন, জ্যোতিষ-রঞ্জনও সেই পি. সি. সেনের দ্বিতীয়া কন্যা সুশীলাকে বিয়ে করেছিলেন। জ্যোতিষরঞ্জন বাজনৈতিক প্লাবনে ভেসে যাবার যোগাড়ে আছেন দেখেই বোধ হয় তাঁর শ্বশুরমশায় তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে কাজে যোগ দেবার জন্যে সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষরঞ্জনকে যেতেই হল। রেঙ্গুন ব্যারিস্টাররা কলকাতার অ্যাটর্নীদের মতো আফিস খুলে অংশীদার নিয়ে ফার্ম করতে পারতেন। সেখানে গিয়ে জ্যোতিষরঞ্জন অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে তিনি বম্বের এক পার্শী আইন-জীবীর সঙ্গে মিলে একটি যৌথফার্ম গড়ে তুলেছিলেন 'কাওয়াসজী অ্যাণ্ড দাশ' নাম দিয়ে। এ সময়ে পসারও তাঁর হয়েছিল প্রচুব এবং রেঙ্গুনে ইংবেজ, বর্মী ও বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করে-ছিলেন। আইনজীবীরা তাদের পেশায় সাফল্য অর্জন করলে যা ঘটে থাকে জ্যোতিষরঞ্জনের ভাগ্যেও তাই ঘটল—অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তাঁর ডাক পড়ল

রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজিয়তি পদে। বিস্তর আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁকে সে ডাকে সাড়া দিতে হয়েছিল। নেহাৎ কোনো অনিবার্য কারণ না থাকলে ব্যারিস্টারেরা কর্তব্যের এই ডাককে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। খুব সুনামের সঙ্গে কয়েক বছর জজিয়তি করে জ্যোতিষরঞ্জন অবসর গ্রহণ করেন এবং তার অল্পকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।

জ্যোতিষরঞ্জনের ছেলে ছিল না। হয়েছিল চারিটি কন্যা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা সকলেই জীবিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা রমাকে খুব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রথমে তাঁকে দেখি শিলং শহরে। সে বছর পূজাবকাশে আমি সপবিবারে শিলংএ গিয়েছিলাম ছুটি কাটাতে। সেখানে তখন বমার স্বামী কর্নেল প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত কাজ করছিলেন সিভিল সার্জেন রূপে। শুনলাম জ্যোতিষদাদা ও তাঁর স্ত্রী যাঁকে আমরা সিসি বৌঠান বলতাম তাঁরা দুজনেই বমার বাড়িতে রয়েছেন। তখনো তিনি জজ হন নি। তেলিরবাগের একজন বিশিষ্ট মাননীয় জ্ঞাতি শিলংএ বয়েছেন জেনে তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হল। এইরকম বক্তের টান পুবানো দিনেব দাশগোষ্ঠীব লোকেদের মধ্যে বেশ সহজভাবেই প্রকাশ পেত। মনে হল তাঁর সঙ্গে দেখা কবা কর্তব্য। রেঙ্গুন হাইকোর্টের খবর জানবার ঔৎসুক্যও যে একেবারে ছিল না তাও বলতে পারি না। চলে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি পাজামা ও রাতকোটের উপর একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে বর্মা চুরুট মুখে কবে চটি একটা গল্পের বই পড়ছেন। পরে জেনেছিলাম যে ছুটিছাটার দিনে তিনি হালকা ধরণের গল্পের বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস ইত্যাদি পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন— কত পুরানো দিনের কথা— আমার বাবা-মায়ের কত কথাই জিজ্ঞাসা কবলেন। সেই দিনই বোধ হয় রমাকে প্রথম দেখি। রমার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে শান্তভাব ফুটে উঠেছিল। পরে রমা ও তার স্বামীর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল সিমলা পাহাড়ে, সে কথা পরে বলব। জ্যোতিষদাদাব সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ছে সেটা বলেই ফেলি। একবার কথা উঠেছিল যে আমি বেঙ্গুনে গিয়ে জ্যোতিষদাদার ফার্মে যোগ দেব। তিনি লিখেছিলেন—ইচ্ছে করলে আসতে পার, তবে অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো হয়ে আসতে হবে এবং আমার আত্মীয় বলে কোনো

অতিরিক্ত সুবিধে চাইতে পারবে না।' কি কারণে ঠিক মনে নেই আমার রেঙ্গুনে যাওয়া ঘটে ওঠে নি। এখন মনে হয়— ভাগ্যিস যাওয়া হয় নি। ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।

৪

দুর্গামোহনের কন্যাদেব কথা না বললে আমার এই স্মৃতিচয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁদের যে ছবি আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে তার আভাস দিয়ে মধ্যের বাড়ির কথা শেষ করব।

দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সবলা তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা। দুর্গামোহনের পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর পিতৃব্য বীরেশ্বরের কালীঘাটের বাড়িতেই দুর্গামোহনেব প্রথম সন্তান সরলাব জন্ম হয়। মায়ের মুখে শুনেছি যে সরলা অতি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। সচরাচর তেমনটি নাকি চোখে পড়ে না। দেহসৌষ্ঠবে ও লাবণ্যে সরলা নাকি তাঁর মায়েব মতোই ছিলেন। তিনি সম্পর্কে আমাব দিদি হলেও আমি কেন আমার বাবাও তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর পঞ্চম সন্তান ও একমাত্র পুত্র সরলের চেয়েও আমি ছোটো ছিলাম। আমি তাঁকে সরদিদি বলে ডাকতাম। বড়ো হয়ে যখন সবদিদিকে দেখি তখনো তাঁর কি উজ্জ্বল রঙ এবং মুখ চোখেব কি অপূর্ব সুষমা ছিল। দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছিল বিদুষী নারীব জ্ঞানোজ্জ্বল দীপ্তি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মেয়েদেব এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। সে বছর যে দুটি মেয়ে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন সরলা ছিলেন তার একটি। তাঁর সর্বাঙ্গে যেন ছিল একটা উচ্চ আভিজাত্যের ছাপ। বহু জনসমাগমে মুখবিত সম্মেলনে হাজাব লোকেব মধ্যে তাঁকে চোখে পড়তই এবং তিনি ঘরে ঢুকলে উপস্থিত সবাই সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াত এমনই ছিল তাঁব ব্যক্তিত্বের প্রভাব। অথচ কোনো বাহ্যিক জাঁক তাঁব ছিল না। অত্যন্ত দরদী ও স্নেহশীলা মহিলা তিনি ছিলেন। তেমনি যোগ্য পাত্রেই পড়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ তখন তাঁব সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল স্বনামধন্য বিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় (পি. কে. রায়) মহাশয়ের। সকলেই জানেন ডাক্তার পি. কে. রায়ের বিদ্যাবত্তার কথা। শুনেছি বিলেতে দর্শন পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় পরে যিনি লর্ড হ্যালডেন

বলে খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁকেও ইনি হার মানিয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার রায় বোধ হয় আই. ই. এস. পর্যায়ে প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। নামকরা দার্শনিক ও সুদক্ষ অধ্যাপক বলে ডাক্তার রায়ের খ্যাতি ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়েছিল। সরদিদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে যখন যেখানে গেছেন সেই জায়গার ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তাঁকে অনেক ভাবতে ও পরিশ্রম করতে হত। তিনি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সুখে দুঃখে নানারকম সাহায্য করে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা -ভাজন হয়েছিলেন।

সবদিদি নিজেও বিদুষী ছিলেন এবং দেশের নাবীশিক্ষার বিস্তারের জন্যে তিনি অসাধাবণ পরিশ্রম কবে গেছেন জীবনেব শেষ দিনটি পর্যন্ত। বহুদিন তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েব সম্পাদিকারূপে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল 'গোখেল মেমোবিয়াল গার্লস্ স্কুল'এর প্রতিষ্ঠা। অতি সামান্যভাবে নিজেব ৭নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড বাসভবনে এই স্কুলটি প্রথম খোলা হয়। কিছু পরে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেই বিদ্যালয়টি ছাত্রীদেব কল্যাণার্থে হাজাবিবাগে তাঁর আপন বাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। বোর্ডিংয়েব সব মেয়েদেব সেই হাজারি-বাগের বাড়িতে রেখে তাদেব খাওয়াদাওয়া পড়াশুনা দেখতেন সবদিদি নিজে। তাঁর মৃত্যুর পর সেই সময়কাব বহু প্রাক্তন ছাত্রীবা তাঁব হৃদয়ের মহানুভবতা ও পরম স্নেহশীলতাব সাক্ষী দিযেছেন অকুণ্ঠভাষায় ও ভক্তি-গদগদ চিত্তে। এই স্কুলেব কাজে তাঁব প্রধান সহায় হয়েছিলেন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সতীশরঞ্জন। এই দুই ভাই-বোনের অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলটি ক্রমেই উন্নতির সোপান বেয়ে উঠতে লাগল। সতীশরঞ্জন ছাড়া আর তিনটি দেশের বিশিষ্ট নেতা সরদিদিকে তাঁর এই মহান কাজে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সার্ এস. পি. সিনহা, সার্ রাজেন্দ্র মুখার্জি ও সার্ বিনোদ মিত্র।

তার পরে হল হরিশ মুখার্জি রোডে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের পূর্ব দিকে এই স্কুলের বিরাট পাকা গৃহ নির্মাণ। চাঁদা তুলে এবং নিজের গাঁট থেকে অজস্র আর্থিক সাহায্য করেছিলেন সতীশরঞ্জন এবং ঐ তিনজন বিশিষ্ট দেশনেতা। এই সুন্দর গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন বাংলাদেশের

তদানীন্তন রাজ্যপাল সার্ স্ট্যানলি জ্যাকসন। এই গৃহের হলে ঐ তিনজন দাতা ও সতীশরঞ্জনের ছবি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। আমার বন্ধু সুধীর মিত্র সাহেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কাছে শুনেছি যে লাটসাহেব সরদিদির অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সেই গৃহনির্মাণ কার্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন সরদিদি ও তাঁব মেয়েরা। আমরা আজকে চোখের সামনে সেই স্কুলের যে বিরাট অট্টালিকা দেখছি সেটা একদিনে হয় নি। বহু বৎসরের পরিশ্রমে, বহু বিনিদ্র রজনীব চিন্তায় এটি গড়ে উঠেছে। সমস্ত জিনিসটি গড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে এবং অনেক সাধনার পর। এব পিছনে ছিল দেশের মেয়েদেব জন্যে সবদিদিব অপরিসীম ও অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা। আমাদেব দেশেব আধুনিক মেয়েদের শিক্ষাব জন্যে যাঁবা নীববে কাজ করে গেছেন সরদিদিকে তাঁদেব মধ্যে পথিকৃৎ বলা যায়। যাঁবা এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কেউ-ই এখন এই মবজগতে নেই। কিন্তু জনহিতকারীদেব কীর্তি ও তাঁদের জীবন দৃষ্টান্ত আমাদের স্মৃতিপটে এবং ভবিষ্যতে বহু দেশবাসীর অন্তবে বহুকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কল্যাণকর্ম কোনো কালে কোনো দেশে নিষ্ফল হয় না— ভগবানের এমনি অমোঘ বিধান।

তাঁর মৃত্যুব পর তাঁব আবব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছেন তাঁর কন্যারা— বিশেষ করে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখার্জিব সহধর্মিণী, স্বর্গত প্রশান্ত ও স্বর্গত এয়ার চীফ মার্শাল সুব্রতের জননী চারুলতা মুখার্জি, যাঁর ডাকনাম মিনি এবং স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ বায়েব পত্নী কনকলতা বায়, যাঁর ডাকনাম বুলু। এঁবা দুজনেই উচ্চশিক্ষিতা এবং পিতামাতার হৃদয়েব উদারতা ও চরিত্রেব মাধুর্য যেন উত্তরাধিকাবসূত্রে পেয়েছেন। মিনি বোধ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম ছাত্রী যিনি ছেলেদের সঙ্গে ক্লাসে বসে পড়া শিখে বি. এ. পাস করেছিলেন। এঁদের আগ্রহাতিশয্যে এবং সরদিদির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার টানে আমি এক বছর ঐ স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। সরদিদির একমাত্র পুত্র সবল যাঁকে সবাই 'খোকা রায়' বলে ডাকত তিনি সরদিদিব জীবদ্দশাতেই মারা যান।

সরদিদির কথা শেষ করবার আগে একদিনের কথা যা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল তা বলা প্রয়োজন মনে করি। সে আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা। সরদিদি তখন কর্মক্লান্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও

তিনি তখনো হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর স্কুলের একাংশে বাস করতেন এবং রোগশয্যা থেকেই স্কুলের যাবতীয় কাজে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। আমি তখনো কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছিলাম এবং উদীয়মান ব্যারিস্টার বলে সামান্য একটু খ্যাতিও বোধ হয় হয়েছিল। একদিন শুনলাম সরদিদির শরীর মোটেই ভালো নেই। কিরকম একটা ইচ্ছে হল তাঁকে দেখে আসতে—রক্তের টানই হবে বোধ হয়। কোর্টফেরতা নামলাম স্কুলের গেটে এবং উপরে উঠে গেলাম তাঁর ঘরের দিকে। খবর দিতেই ডাক পড়ল ভিতরে যাবার। ঘরে ঢুকলাম। কী খুসী যে হলেন আমাকে হঠাৎ দেখে যে বলতে পারি না। বড়ো বড়ো চোখ দুটি তাঁর জলজল করে উঠল। তিনি খাটে বালিস ঠেসান দিয়ে একটু উঁচু হয়ে শুয়ে ছিলেন। আদর করে খাটের পাশে একটা যে চেয়ার ছিল ইশারা করে তাতে বসতে বললেন। তার পর সরদিদি কথা বলতে আরম্ভ করলেন—যেন মনের মধ্যে তাঁর আনন্দের বান ডেকে গেল এবং অজস্র জলধারার মতো তাঁর কথা বের হতে লাগল তাঁর মুখে। কতকালের কথা—তাঁর বাবা মায়ের কথা, ঠাইন খুড়ি (চিত্তরঞ্জনের মা) এর কথা, নিজের ভাইয়েদের কত প্রাচীন স্মৃতিকথা, দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)এর এবং আস্তে আস্তে আমার বাবা মায়ের কত বিস্মৃতকাহিনী—সরদিদি বলেই চললেন এবং আমি অবাক হয়ে নীরবে তা শুনে গেলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। প্রত্যেকটি কথায় বাপের বাড়ির গৌরব-কীর্তনে তাঁর ভাবব্যঞ্জক চোখ দুটির ঔজ্জ্বল্য যেন ঠিকরিয়ে পড়ছিল। কেমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ যেন গড়ে উঠল আমাদের দুজনের মধ্যে ক্ষণিকের মতো। ক্লান্ত হয়ে শেষ করলেন এই বলে—'দেখ সুধীরঞ্জন, আমার বাপের বাড়ি তেলিরবাগের দাশ বংশ খুব উঁচু বংশ। যাঁরা এই বংশের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তাঁরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সেরে একে একে চলে গেছেন। তোমার কথা কিছু কিছু শুনেছি এবং মনে মনে খুসী হয়েছি। এই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার এখন তোমাকেই নিতে হবে। বংশের নাম উজ্জ্বল রেখো।' স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সেই মহীয়সী নারীর পিতৃভক্তি ও বাপের বাড়ির গৌরববোধ দেখে। নতমস্তকে দিদিকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। সেই শেষ দেখা তাঁর সঙ্গে। রাস্তায় তখন গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আকাশে দু চারটে তারা ধক্ ধক্ করে জলছিল। কেবল কানে বাজতে লাগল সারাটা পথ এবং তারও পরে

সরদিদির শেষ কথাগুলি— 'তেলিরবাগের দাশ বংশ খুব উঁচু বংশ— বংশের নাম উজ্জ্বল রেখো।' সার্থক হয়েছে কি সে বাণী আমার জীবনে? ভগবানই জানেন।

বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার সার্ জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর সহধর্মিণী লেডি অবলা বসুকে বাংলাদেশ কেন সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে না চেনে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যায়। সেই লেডি অবলা বসুই ছিলেন দুর্গামোহনের দ্বিতীয়া কন্যা। ১৮৬৫ সালেব ৮ই আগস্ট তাবিখে অবলা জন্ম-গ্রহণ কবেন ববিশাল শহবে। আমবা তাঁকে ডাকতাম অবুদিদি বলে। গায়ের রং সবদিদিব মতো ফরসা ছিল না। বলতে গেলে শ্যামবর্ণই বলতে হয়। কিন্তু চোখেমুখে একটি আশ্চর্যবকম লাবণ্যেব দীপ্তি ছিল এবং কণ্ঠস্বব ছিল মিষ্টি আর নরম। অবুদিদিকে কর্কশ স্ববে কথা বলতে আমি তো কখনো শুনি নি। তিনি অত্যন্ত বিদুষী রমণী ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব এনট্রান্স পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেছিলেন এবং দুই বছব পবে তখনকার দিনেব এফ. এ. পাস কবেন। সে আমলে কলকাতাব মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদেব প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় তিনি মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পডতে যান। কিন্তু সেখানে ডাক্তারীব শেষ পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয় নি, কেননা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় বিলেত থেকে সদ্য প্রত্যাগত সুদর্শন কান্তি জগদীশ বসুর সঙ্গে। বিবাহের পব অবুদিদির সংসাবেব কাজকর্মে শিক্ষানবিশী হয় তাঁর স্বামীব কাছেই। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি উৎকৃষ্ট সুগৃহিণী। সংসারের সকল কাজেই ছিল তাঁব প্রখব দৃষ্টি এবং তাঁব স্বামীর সেবায় তিনি ছিলেন অনন্যমনা। স্বামী একনিষ্ঠ সাধকেব মতো তাঁব গবেষণাগাবে বিজ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থাকতেন আব এই সাধ্বী নারী তাঁব স্বামীর শাবীরিক সুখসুবিধা বিধানেব জন্যে নিয়ত যত্নবতী থাকতেন। স্বামী কখন কি চাইবেন বা চাইতে পারেন আগে থেকে তা ভেবে নিয়ে তিনি সব ব্যবস্থা করে রাখতেন যাতে করে মুখ থেকে কথা বেব না হতে হতেই স্বামী হাতেব কাছে ঈপ্সিত জিনিসটি পান।

অবুদিদির বাড়িতে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আত্মীয়তার কথা সকলেই জানে। তাঁদের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হত তা পড়লেই তাদের সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া

যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় বসুপরিবারের বাড়িতে যেতেন দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করতে এবং বসুদম্পতীও কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের পান্সী নৌকায় বা শিলাইদা কুঠিবাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। সিস্টার নিবেদিতা বেশ কিছুদিন বসুপরিবারে বাস করেছেন। অধ্যাপক গেডিস ও অন্যান্য বহু মনীষীব্যক্তিরা বসুপরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করে গেছেন। অবুদিদির বাড়ি বিদ্বজ্জনসমাগমে মুখরিত হয়ে উঠেছে এবং মাননীয় অতিথিগণ তাঁর আদর-আপ্যায়নে বিমোহিত হয়েছেন। বসুগৃহ জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্যে শিক্ষিতমহলে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিল। অবুদিদি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। ভগবৎ-উপাসনা তিনি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যহ করেছেন। অসুখে বিসুখেও এর ব্যত্যায় ঘটে নি। ব্রাহ্মসমাজের সকল সদনুষ্ঠানেই তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।

ভগবান এই বসুদম্পতীকে যে একটি সন্তান দিয়েছিলেন তার শিশু কালেই তাকে এঁরা হারান। তার পর এঁদের আর কোনো সন্তান হয় নি। হয়তো তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপে ভগবান দেশের দুঃস্থ শোকাতুর ও অসহায় নারীদের ভার এই মহীয়সী মহিলার উপরই দিয়েছিলেন। তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ১৯১০ সালে সরদিদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে যাওয়ায় অবুদিদিকেই সে শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল বহু বছর ধরে। অবুদিদি তার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুবার ভ্রমণ করে সে সব দেশের নারীকল্যাণ কর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এসেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে তিনি 'নারী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে নারী শিক্ষা সমিতির আওতায় কিছু কিছু স্কুল খোলা হয়েছিল মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্যে। পরে এই সমিতির কার্যক্রম ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। মেয়েদের হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের অর্থোপার্জনক্ষম করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।' 'বিদ্যাসাগর বানী ভবন' 'শিল্পভবন' ও অন্যান্য কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল অবুদিদির অনুপ্রেরণায়। এই-সকল নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান দ্বারা কত যে অসহায় বিধবা নারীর শিক্ষা ও জীবিকার্জনের পথ সুগম করে গেছেন অবুদিদি তা দেশবাসী সবাই জানে। এই প্রতিষ্ঠানে গোড়ার দিকে আমার সহধর্মিণীর

জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রতিভা সেনগুপ্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অবুদিদির মৃত্যুর পর আমাদের এক বৌঠান তরুলতা হয়েছিলেন এইসব প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা। এই সেদিন লেডি বসুর শতবার্ষিকী উৎসবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশবাসী সকলে যে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেটা তাঁর প্রাপ্যই ছিল। সরদিদির মতো অবু-দিদির মুখেও শুনেছি তার বাপের বাড়ির গৌরবের ভূয়সী প্রশংসার কথা।

দুর্গামোহনের কনিষ্ঠা কন্যার নাম ছিল শৈলবালা। বড়োরা তাঁকে ডাকতেন 'খুসী' বলে, আর আমরা ডাকতাম 'খুসীদিদি'। খুসীদিদি শ্যামবর্ণা, বেশ মোটাসোটা মহিলা ছিলেন। তিনিও খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি সমবয়সী মহিলাদের সঙ্গে বেশ মিশতে পারতেন এবং তাঁর অনেক সহপাঠী বান্ধবী ছিলেন। শুনেছি স্বর্গীয় সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষের কন্যা ও সার্ অশোক রায়ের জননী যাঁকে আমাদের দাদারা ও দিদিরা 'দিদিমণি' বলতেন, তাঁর সঙ্গে খুসীদিদির খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পিতৃব্য ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা তরলা যাঁকে আমি 'দিদিমণি' বলে ডাকতাম তিনি খুসীদিদির সহপাঠী ছিলেন। খুসীদিদি সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর বড়ো ভগিনীপতি পি. কে. রায়ের ছোটো ভাই দ্বারিকনাথ রায় (ডাক্তার ডি. এন. রায়)এর সঙ্গে। সদাহাস্যময়ী খুসীদিদির মনটি সত্যই সাদা ও খুসীতে ভরা ছিল। তিনিও সুগৃহিণী ছিলেন। স্বামীর অর্থবলের অভাব ছিল না। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পেশার উচ্চ শিখরে তিনি উঠে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে গেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য খুসীদিদির চরিত্রের মাধুর্য খর্ব করে নি। তাঁর একমাত্র কন্যা মালতীর বিবাহ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথ বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা করে দেশে ফিরে 'ডাকব্যাক' ওয়াটারপ্রুফের কারখানা স্থাপন করে খুব বিস্তৃত ব্যবসায় করে বিস্তর অর্থ ও যশ অর্জন করে গেছেন। ছেলে দুটি— রণজিৎ ও অমিয়নাথ দুজনেই— চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট হয়ে এসে 'রে অ্যাণ্ড রে' নামে ফার্ম করে খুব সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে অল্পবয়সেই মারা গেছেন। এঁরা দুই ভাই-ই আমাকে অজস্র ভালোবাসতেন এবং আমার জীবনের প্রতিটি উন্নতিতে এঁরা খুসী হতেন। বিশেষ করে অমিয় যাঁর ডাকনাম ছিল পুঁটু তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ির এই একটি শাখা থেকেই কতজন খ্যাতিমান সন্তান— ছেলে ও মেয়ে— উদ্ভূত হয়েছিলেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই শাখাব ছেলেরা তাঁদের স্বগ্রাম তেলিরবাগ ও সেই গ্রামবাসীদের কখনো ভোলেন নি। এই শাখার প্রত্যেকটি মেয়েই বিদুষী এবং সুগৃহিণী এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বাপেব বাড়ির গৌরবে আজীবন গরবিনী ছিলেন এবং তাঁরা যে দাশগোষ্ঠীর কন্যা এই কথা ভেবে মনে এবং বাক্যে শ্লাঘা বোধ করতেন।

পঞ্চম অধ্যায

দক্ষিণের বাড়ি

রমানাথ দাশের পঞ্চম পুত্র চন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র এবং মধ্যের বাড়ির কাশীশ্বরেব ছোটো ভাই বীবেশ্বব বসতি করেছিলেন তেলিরবাগ গ্রামের মাঝখান দিয়ে যে খালটি বইত পূর্বদিগন্তেব দিকে তারই দক্ষিণ পাড়ে। সে বাড়ি ছিল খুব ছড়ানো এবং বাড়িব পুব দিকে যে পুষ্করিণী ছিল সেটি ছিল গ্রামের অন্যান্য সব পুকুরেব চেয়েই বড়ো। এতবড়ো ছিল সে পুকুব যে উত্তব থেকে দক্ষিণ পাড় ঝাপসা দেখাত। এই বাড়িরই নাম ছিল দক্ষিণেব বাড়ি।

বীবেশ্বব ছিলেন আইনজীবী। মোক্তাবী পবীক্ষা পাস কবে তিনি কলকাতায় ব্যাপৃত হলেন ভাগ্যলক্ষ্মীব সন্ধানে। পসাব যখন বেশ জমল তখন তিনি কালীঘাটে অনেক বিঘা জমি কিনে মস্ত বাড়ি তৈরি করে নিয়েছিলেন। শুনেছি তিনি আপন অধ্যবসায় ও বুদ্ধিব বলে বর্ধমান ও দ্বাবভাঙ্গাব মহাবাজাদেব বাঁধা মোক্তাবরূপে বিস্তব অর্থ উপার্জন কবতেন। বর্তমান হাজবা বোড যেখানে কালীগঙ্গাব উপবেব পোল দিয়ে আলিপুরের পুলিস ও জজ কোর্টেব দিকে গেছে সেই পোলেব এ পাবেই একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কালীমন্দিরের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার এখন নাম হয়েছে কালীঘাট বোড।• ঠিক হাজবা বোড ও কালীঘাট বোডের মোড়ে ছিল বীবেশ্বরেব বসতবাটি। হাজবা বোড থেকে কালীঘাট বোডে ঢুকে অল্প একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে একটি ফটকেব মধ্য দিয়ে ড্রাইভ অর্থাৎ গাড়ি যাবার রাস্তা সোজা চলে যেত তাঁর বাড়িব গাড়িবাবান্দার সামনে। কালীঘাট রোড থেকে বাড়ি পর্যন্ত পুব দিকে ছিল অনেকটা জমি এবং তাতে ছিল কত ফল ও ফুলের গাছ। উত্তবে বাড়ির সীমানা ছিল সেই পোল পর্যন্ত। দক্ষিণেও অনেকটা সংলগ্ন জমি ছিল। পশ্চিমে ছিল কালীগঙ্গা অথবা টলিস নালা। সেই গঙ্গায় বাঁধানো ঘাট ছিল এঁদের মেয়েদের স্নান ও পূজার জন্যে।

বাড়িটি ছিল চকমেলান অর্থাৎ মাঝখানে একটি বড়ো বাঁধানো উঠানের চারি দিকে অসংখ্য ঘর। পিছন দিকে একটি বেশ ভালো সিঁড়ি ছিল

কিন্তু দক্ষিণ-পূবে ছিল একটা খুব উঁচু উঁচু ধাপওয়ালা এক পাল্লা সরু সিঁড়ি। ছেলেপিলেদের সে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার যথেষ্ট ভয় থাকত। ওটা বোধ হয় পরে কোনোরকমে তৈরি করা হয়েছিল বাহির বাড়ি থেকে দোতলায় যাবার জন্যে। বাড়ির দক্ষিণের দিকে ছিল প্রধান বৈঠকখানা এবং তার সামনে বারান্দা। বৈঠকখানা ঘরখানি ছিল অন্যান্য ঘরের চেয়ে উঁচু। সুতরাং দেখাত যেন দেড়তলার সমান। তার উপরে যখন ঘর হল তার ছাদও দোতলার অন্যান্য ঘরের ছাদের চেয়ে অনেক উঁচু হয়ে দেখতে হল যেন আড়াইতলা। এই বাড়িতে বাস করতেন বীরেশ্বর তাঁর বিশাল পরিবার নিয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্গামোহনও সস্ত্রীক এ বাড়িতে থাকতেন এবং কলেজে পড়তেন। এই বাড়িতেই ভূমিষ্ঠা হন দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা। সেই প্রকাণ্ড বাড়ির চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রশস্ত জমিগুলি সবই ধীরে ধীরে বিক্রি হয়ে গিয়ে খোলার মাঠকোটা মাথা তুলে দাঁড়ানোতে রাস্তা থেকে সে বাড়ি এখন আর দেখাই যায় না। সেই জাঁক-জমকালো বাড়িটি সংস্কারের অভাবে এখন ভগ্নপ্রায় হয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছি নাকি তা-ও বিক্রী হয়ে বাড়িটি বংশের সন্তানদের হাতের বাইরে চলে যাবে।

বীরেশ্বরের ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মোহিনীমোহন খুব কম বয়সেই মারা গেছেন। তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বড়ো ছেলে ক্ষিতিমোহনকেও আমি নিজ চক্ষে দেখি নি। শুনেছি তিনি হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনিই হলেন এ বাড়ির কর্তা। শোনা কথা যে তিনি নাকি খুব মজলিসি ও আমুদে মানুষ ছিলেন। পাড়ায় অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁর ছিল, যাদের প্রতি কটাক্ষ করে বাড়ির লোকেরা নেপথ্যে বলত মোসাহেব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাকি মজলিস বসত এবং সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও নাকি তাদের জল-যোগে খরচা হত দিনে অন্তত দশ টাকা। ক্ষিতিমোহন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র বিশ্বরঞ্জনকে রেখে মারা যান।

বিশ্বরঞ্জনের লেখাপড়া খুব বেশি এগোয় নি। কিন্তু তিনি খেলাধূলায়, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায়, খুবই নাম করেছিলেন এবং বন্ধুমহলে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। সবাই তাঁকে দলপতি বলে মেনে তাঁর হুকুম তামিল করত। একবার অর্ধোদয় যোগে কলকাতায় অসম্ভব লোক সমাগম

হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেসের তরফ থেকে যাত্রীদের সুবিধের জন্যে হাসপাতাল ও অন্যান্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। দুই সহস্রাধিক কিশোব যুবক— আমিও ছিলাম ছোটোদের মধ্যে— নাম লিখিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক হবাব জন্যে। সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দলপতি হয়েছিলেন বিশ্ববঞ্জন। স্বেচ্ছাসেবকদেব কাজ ছিল বিস্তর। যাত্রীদের রাস্তা দেখিয়ে স্নানেব জন্যে সব চেয়ে কাছের ঘাটে নিয়ে যাওয়া, প্রয়োজন হলে তাদের তল্পিতল্পা মাথায় বা পিঠে বয়ে নেওযা, অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দলপতিব আদেশেব অপেক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকেবা উন্মুখ হয়ে থাকত। হুকুম যখন আসত তখন 'না' বলবাব যো নেই। একেবারে ফৌজী সংযম। বলতেই হবে যে স্বেচ্ছাসেবকদল সেবার অর্ধোদয় যোগে অসাধাবণ কষ্ট কবেছিলেন এবং দলপতি বিশ্বরঞ্জনেব আদেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষবে পালন কবেছিলেন। বিশ্ববঞ্জনেবও সেই সব শখের সেনাদের সুখ-দুঃখের দিকে বিশেষ নজর ছিল দেখেছি। সত্যই তিনি দলপতি হবার যোগ্যব্যক্তিই ছিলেন। বিশ্বদাদার পুত্রসন্তান ছিল না। ছিল দুটি ফুটফুটে সুন্দব মেয়ে— ইলা ও লীলা। তাঁরা এখন ইহজগতে আছেন কি না জানি না।

বীবেশ্ববের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রমোহন নিজেব নামের ইংরেজি বানানে 'ইউ' না লিখে 'ডব্লিউ' লিখতেন। সেজন্যে সংক্ষেপে সবাই তাঁকে বলত 'ডব্লিউ. এম. দাশ'। তাঁকে দেখেছি। গায়েব রং ময়লা, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেশ বড়োই এবং খুব ভাবিক্কি ধবণের এবং চবিত্রবান মানুষ তিনি ছিলেন। ব্যাবিস্টারী ছিল তাঁব পেশা। তিনি বাঁকীপুরেব আদালতে প্র্যাকটিস কবতেন এবং পসাবও কিছু জমিয়ে ছিলেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। পিতা বীরেশ্বব যিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্ররা ব্রাহ্ম হলে তাঁদের একঘবে কবেছিলেন তিনি বেঁচে ছিলেন না এই সময়ে, এই যা রক্ষা। আমাব যতদূব মনে পড়ে তাঁর ছেলেদের ও মেয়েদের ব্রাহ্মমতেই বিবাহ হয়েছিল।

উপেন্দ্রমোহনের চার ছেলেব মধ্যে তিনজনকে আমি দেখেছি। দেখি নি প্রবোধরঞ্জনকে— তিনি বোধ হয় বালক বয়সেই মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে দেখেছি বেশ কাছাকাছি থেকেই। তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাস করে বিলেতে যান উচ্চশিক্ষার জন্যে। সেখানে

ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করে তিনি বিখ্যাত রোটাণ্ডা প্রতিষ্ঠানে প্রসূতি বিজ্ঞান শিক্ষা করে দেশে ফিবে এসে কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করতেন। তিনি যখন ক্যাম্পবেলে পড়তেন তখন আমাদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসতেন। আমার মায়ের তখন ছিল হজমেব গোলমাল। মোটা রবারের নল মুখ দিয়ে গিলে পাকস্থলী গবম জল দিয়ে ধোয়ানো দক্ষিণা দাদাই মায়েব জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজে বসে দক্ষিণা দাদা মাকে নির্দেশ দিতেন কেমন কবে পেট ধোয়াতে হয় এবং অজীর্ণ ভাতগুলি বের করে আনতে হয়। বিলেত থেকে ফিবে এসেও তিনি মায়েব কাছে অনেক সময় আসতেন। প্রসূতি ডাক্তার বলে দক্ষিণা দাদা সাবা কলকাতায় বিস্তব খ্যাতি লাভ কবেছিলেন। অতি অমায়িক ধর্মপবায়ণ মানুষ ছিলেন দক্ষিণা দাদা। পরিবাবের যাবতীয় জ্ঞাতিদেব যখন প্রয়োজন হত দক্ষিণাবঞ্জনেব সাহায্য ও সেবা সবসময়েই সবাই পেতেন। তাঁব একমাত্র পুত্র দিলীপবঞ্জনও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তাবী পাস কবে বিলেত গিয়ে প্রসূতি বিজ্ঞানে বিশেষ পাবদর্শিতা লাভ কবে ফিবে এসে এখন কলকাতায় নিজেব বাড়িতেই নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা কবে বেশ পসাব জমিয়েছেন। চিত্তবঞ্জন সেবাসদনেও তিনি যোগ্যতাব সঙ্গে কাজ কবে যাচ্ছেন। পিতাব অনেক সদ্‌গুণ তিনি উত্তবাধিকাবসূত্রে পেয়েছেন।

উপেন্দ্রমোহনেব দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়বঞ্জন ডিগ্রী পবীক্ষায় পাস কবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পবয়সেই তিনি মাবা যান। তৃতীয় পুত্র সুবেশবঞ্জন যাঁকে আমরা 'বুলিদাদা' বলতাম তিনি এদেশে বি. এ. পাস কবে বিলেতে যান উচ্চশিক্ষাব জন্যে। সেখানে অল্পকাল পড়ার পবই তিনি বেলে এ. টি এস পদপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিবে আসেন। তিনি রেলের কাজে বেশ উন্নতি কবে ডি. টি এস. পদ লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও বেশি বয়স পান নি এবং বলতে গেলে অকালেই মাবা গেছেন। তাঁব তিনটি ছেলে— প্রদীপ, কমল ও সুজিত। তিনজনই নামকরা মার্চেন্ট অফিসে সিনিয়র একজিকিউটিভ পদে কাজ করে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছেন।

বীরেশ্বরের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল রাজমোহন। দেখতে অনেকটা তাঁর নিজের দ্বিতীয় ভ্রাতা উপেন্দ্রমোহনের মতন ছিলেন। তিনি এখানে বি. এ. পাস না করায় কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি পরীক্ষায় বসবার

অধিকারী ছিলেন না। সেই কারণে তিনি অ্যাটর্নি হবার জন্যে বিলেতে গিয়ে ইনকবপোরেটেড ল' সোসাইটিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সে দেশের জলবায়ু তাঁর সহ্য না হওয়ায় তিনি তাঁর আর্টিকেল কলকাতার এক অ্যাটর্নির কাছে বদলি করে এনে পরে বিলেতের অ্যাটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার অ্যাটর্নিশিপের কড়া আইনেব মুখে তুড়ি মেরে কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু কবেন। কিন্তু আইনজীবীব পেশা থেকে ঘোড়দৌড়ের দিকেই ছিল তাঁব বেশি ঝোঁক। ঘোড়দৌড়ের আগের দিন থেকেই কালীঘাটেব বাড়ি লোকে লোকারণ্য হত। শুধু ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। তাঁর নিজেরও ঘোড়দৌডেব ঘোড়া ছিল। কালীঘাটের বাড়িব পুবে উত্তরে যে জমি ছিল তাতে ঘোড়ার আস্তাবল আমিও দেখেছি। তখনো ইলেকট্রিকেব বন্দোবস্ত তেমন চালু হয় নি। আস্তাবলে ঘোড়দৌডেব ঘোডাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে হাতে টানা পাখার বন্দোবস্ত দেখে অবাক হয়ে পডতাম। কোন্ ঘোড়ার বাপ কটা দৌড় জিতেছে, তাব মা-ই বা কে ছিল এবং তাবই বা কৃতিত্ব কত এই-সব নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা কবে ঠিক হত এই ঘোড়াটা দৌড়ে কি স্থান লাভ কববে। সে এক ব্যাপাব। সেই সঙ্গে দিন শেষে ভূরি-ভোজন। এটা সহজেই অনুমান কবা যায় যে আইন এবং ঘোড়দৌড দুই-ই একসঙ্গে চলতে পাবে না এবং তাতে কোনোটাই ভালো চলে না। হলও তাই। একে একে তাঁব ঘোডা সব বিকিয়ে গেল। বাড়ির সংলগ্ন জায়গাজমির বেশিব ভাগই লাটে না উঠলেও তাঁর নিজেবই বিক্রি করতে হল এবং অ্যাটর্নি অফিসও সেই সঙ্গে বন্ধ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাজমোহনকে যেতে হয়েছিল ভাগ্যলক্ষ্মীব অনুসন্ধানে বেঙ্গুনে যেখানে ছিলেন পিতৃব্যপুত্র দুর্গামোহনেব কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষবঞ্জন। বেঙ্গুনে রাজমোহন বেশ পসার জমিয়েছিলেন কিন্তু কয়েক বছব পরেই তিনি মাবা যান।

রাজমোহনেব প্রথমা স্ত্রী মাবা যাবাব কিছু পরে রাজমোহন দ্বিতীয়বার দার পবিগ্রহ কবেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল কমলা। এই জেঠিমার মত সুগৃহিণী খুব কমই দেখা যায়। ঘরকন্নার কাজেব তো কথাই নেই, নানাবকমেব হাতের কাজে এই জেঠিমা ছিলেন একেবাবে পারদর্শী। তাঁর হাতের সূচীশিল্প ছিল অদ্ভুত সুন্দব। কি চমৎকার কাঁথা যে তিনি সেলাই করতেন তা দেখবার মতো হত— কত রকমের সেলাইয়ের প্যাটার্ন। তা

ছাড়া ঝুনো নারকোলের ছাঁই দিয়ে গঙ্গাজলি ও কতরকমের অপূর্ব সুস্বাদু নাড়ু করে তিনি ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন। আমিও তার থেকে বঞ্চিত হই নি। তালের আঁটির ছোবড়া ও নারকোলেব ছোবড়া দিয়ে হাতে বুনে কতরকমের পাখী-বসানো ঝাড়লণ্ঠন তিনি করতেন। কমলা জেঠিমাকে শেষ দেখি যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগে জাপান ঘুবে বাড়ি ফেবার পথে তাঁর রেঙ্গুনের বাড়িতে কয়েকদিন ছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাষী এবং ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে তাঁর মাথাব উপর দিয়ে কিন্তু কিছুতেই তাঁর মানসিক বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে নি। এই অসীম সহনশীলতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁব মায়ের কাছ থেকে যাঁর কথা পরে বলব।

রাজমোহনেব জ্যেষ্ঠপুত্র বসিকবঞ্জন অল্পবয়সেই মাবা যান। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশরঞ্জন রেঙ্গুন পোর্ট কমিশনাবেব অফিসে সুপাবিনটেনডেন্ট অব ল্যাণ্ডস্-এর কাজ কবতেন— বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচাবী। এবকম আত্মপবভোলা মানুষ সংসাবে বিরল। সার্থক তাঁব মা তাঁকে 'ভোলা' নাম দিয়েছিলেন। ছেলেবুড়ো সবাইয়ের সঙ্গে আমাদের কালীঘাটেব এই ভোলাদাদা মিশতে পারতেন এবং এখনো পাবেন। তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীব বংশাবলি প্রণয়নে এঁব অনেক অবদান বয়েছে। তিনি গবিব দুঃখীব জন্য সর্বদা ভাবেন। বেঙ্গুনে কাজ কববাব সময় সেখানে তিনি নিজ অর্থব্যয়ে বামকৃষ্ণ মিশনেব যে ল্যাববেটবি গৃহটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন তা নিজে দেখে এসেছি। রামকৃষ্ণ মিশনেব প্রতি গভীব শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে তাঁব ও তাঁর সহধর্মিণীব। ভগবৎ-কৃপায় দুজনেই এখনো আমাদেব মধ্যে জীবিত আছেন। দাশগোষ্ঠীর অগ্রজেবা একে একে পবলোকে চলে যাবাব পর ভোলাদাদা যে এখন এই পবিবারেব পয়লা নম্বব হয়ে পডেছেন সেই গৌরবেব কথাটা তিনি বলে বেড়াতে ভোলেন না, ভোলা নাম হলে কি হয়। তাঁর দুটি ছেলে সুশীল ও সুভাষ। সুশীল ওরফে শৈল কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। এখন তিনি পূর্ব আফ্রিকাব কেনিয়া অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এব জেনারেল ম্যানেজাব হয়েছেন। খুবই স্নেহপ্রবণ ও জ্ঞাতিবৎসল এই ছেলেটি। আমাকে কেনিয়া গিয়ে তাঁর কাছে থাকবাব জন্যে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। রক্তের টান একেই বলে। কালীঘাটের ভোলা-দাদার ছোটো ছেলে সুভাষ আছেন ভারতীয় ফৌজে। পদমর্যাদায় এখন

তিনি লে. কর্নেল।

রাজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র সারদারঞ্জনেব প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল রেঙ্গুনে। তার পর তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে রেঙ্গুনেই প্র্যাকটিস করতেন। যুদ্ধের পর যখন রেঙ্গুন ছাড়তে হল তখন তিনি কলকাতায় এসে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্টে সহাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। তিনি একটি ইংরাজ মহিলার (ডরোথী) পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ডবোথী একেবারে এঁদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। জেঠিমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন এবং শুনেছি যে তিনি জেঠিমার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা পূজাও কবতেন। ইনি এখন বিলেত ফিরে গেছেন। সারদারঞ্জনের চাবটি মেয়ে ও একটি ছোটো ছেলে। মেয়েদের সবাইয়ের বেশ ভালো ভাবেই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটির নাম সুস্মিতরঞ্জন— ডাকনাম রতন। কালীঘাটের ভোলাদা এঁর ছোটো বয়সে এঁকে পাদ্রি সাহেব বলে ঠাট্টা কবতেন। বতন এখন ভারতীয় ফৌজেব গ্রিনেডিয়ার্স গার্ডে পদমর্যাদায় মেজব।

দক্ষিণের বাড়ির বীরেশ্বরের চতুর্থ পুত্র ছিলেন প্যাবীমোহন। তিনি বি. এ. পাস কববার কিছু পবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আফিসে ঠিকে গাড়ি বিভাগে ইনস্পেক্টব হয়েছিলেন। পরে সে কাজ ছেড়ে তিনি কাঠের ব্যবসায়ে মন দেন। কালীঘাটের বাড়ির পুবের জমি যেটুকু তখনো তাঁদের আয়ত্তে ছিল সেখানে কাবখানা বসল। বৈদ্যুতিক করাতে কাঠ চেলা করা হত। নূতন বাড়ির জন্যে দরজা জানালা ও কাঠের নূতন আসবাবপত্র সেখানে তৈরি হত। পি. এম. দাস অ্যাণ্ড কোং-এর বেশ খ্যাতিও রটেছিল। কালীঘাটের বাড়ির হৃতগৌরবও যেন খানিকটা ফিরে এল। বাড়িতে আবার লোক-সমাগম শুরু হল ও খাওয়াদাওয়ার হৈহুজ্জত আবার ফিরে এল। কালীঘাটের বাড়িতে বিধবাদের রান্নাঘরে বামুনঠাকুব দিয়ে রান্না করাতে হত। আবার হবি তো হ, ঠিক এই সময়ে প্যারীকাকার দোতলায় দক্ষিণের বড়ো শোবার ঘরের দক্ষিণ বারান্দার আলিসায় এসে বাসা বাঁধল একটি সাদা লক্ষ্মী পেঁচা : বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেল— সেই পেঁচার বাসের জন্যে সুন্দর করে কাঠের ঘর করে দেওয়া হল। কালীঘাটের বাড়ির বৌয়ের ও মেয়েরা একবাক্যে বললেন যে 'মা লক্ষ্মী ফিরা আইছেন'। আমরা উৎসাহ সহকারে দেখে এলাম সেই লক্ষ্মী পেঁচা। সারাদিন সে তার ঘরের

এককোণে চুপ করে বসে থাকত এবং অবাঞ্ছিত দর্শকদের দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করত। রাত্রে সে বের হয়ে যেত খাবাবের ধান্ধায়, কিন্তু নিয়মিত ফিরে আসত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। প্যারীমোহনের দ্বিতীয়া পত্নীকে আমরা 'নয়া খুড়িমা' বলতাম। তাঁকে নিয়ে প্যারীমোহন বিলেতে চিকিৎসাব জন্য গিয়েছিলেন। নয়া খুডিমা যে একবর্ণ ইংরাজী না পডেও কেমন কবে বিলেত ঘুরে এলেন তা ভেবে আমরা অবাক হতাম। প্যারীমোহন নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু রাজমোহন দাশেব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশরঞ্জন ওবফে আমাদের ভোলাদাদার মধ্যমা কন্যা রমাকে তিনি আপন মেয়েব মতই যত্নে স্নেহে মানুষ করেছিলেন। রমা নয়া খুড়িব মেয়ে বলেই নিজেকে জানত এবং সেই সূত্রে ভোলাদাদাকে সে বাবা না বলে ডাকত দাদা এবং এখনো ডাকে দাদা বলে এবং আমাদের কাকা না বলে ডাকে দাদা বলে। নযা খুডিমা প্যারীকাকাব মৃত্যুর অল্প পরেই তাঁকে অনুসরণ কবেন।

বীবেশ্বরের চতুর্থ পুত্রেব নাম ছিল জ্ঞানেন্দ্রমোহন। ওকালতি পাস করবার পব স্বর্গীয় বরদানাথ হালদাব, যাঁর কথা আগে বলেছি, তাঁর সাহায্যে জ্ঞেনুকাকা বিজনীব রানীদের সহকারী দেওয়ান হন। তার পর বরদা-বাবুব মৃত্যুব পরে তিনি কিছুদিন মুখ্য দেওয়ানও হয়েছিলেন। দেশী রাজ্যগুলিব মধ্যে নানাবকম দলাদলি থাকে এবং তারই ঝামেলায় জ্ঞানেন্দ্র-মোহনকে বিজনীর দেওয়ানী ছেড়ে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরতে হয়। জ্ঞেনু কাকাব স্ত্রীকে বেশ কাছাকাছিই দেখেছি— বেশ কমনীয়, ছোট্টোখাট্টো মহিলা। মুখে বা নেই, যেন স্তব্ধ। কখনো কাউকে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনি নি। তাঁর চোখ দুটি একটু কটা এবং চোখের তাবাব চারপাশে দুটি সরু চক্র থাকত। তাঁর দুটি ছেলে নলিনী যাঁকে হারুদা বলতাম এবং প্রমথ যাঁব ডাকনাম ছিল ফটিক— তাঁবা দুজনেই লেখাপডায় বেশ ভালো ছিলেন। ফটিক আমার বয়সীই ছিলেন। আমি কালীঘাটের বাড়িতে তাদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যেতাম। সেই ছোটো খুডিমা বডোই দুঃখিনী ছিলেন। একে একে তাঁর বড়ো দুটি ছেলেই চলে গেলেন। তার পরে জ্ঞেনুকাকার আরো চার পাঁচটি ছেলে হয়েছিল। তাঁদের নাম ছিল রাধিকা (ডাকনাম কার্তিক), সুহৃদ (ডাকনাম গণেশ), অমিয়, বিমল, বীরেন ও খোকা। মেয়ে ছিল চার জন। কার্তিক বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে আসেন। প্যারীকাকা বেঁচে

থাকতেই কার্তিক ও গণেশ তাঁর কাঠের কারবার চালিয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না সে কারবার ফেল হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। মনের কুসংস্কার কি না বলতে পারি নে, কিন্তু শুনেছি ঠিক এই দুর্দিনের সময় সাদা লক্ষ্মী-পেঁচাটি সেই যে একদিন রাত্রে বের হয়ে গেল সে আর ফিরল না। সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটের বাড়ির দীপশিখা যেটি আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা যেন ফুৎকারে নিভে গেল। বাড়িতে ভাড়াটে বসল ঘরে ঘরে, বাইরের আঙিনায় হল গোরুমহিষের খাটাল। সংস্কারের অভাবে সে গম্‌গমে অট্টালিকা ভগ্নপ্রায় হয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছি এবার নাকি বাড়িটি বিক্রি হয়েই যাবে।

দক্ষিণের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে ঐ বাড়ির কয়েকটি মেয়ের কথা। বীরেশ্বরের দুইটি মেয়েই অল্পবয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বড়ো পিসিমা ছিলেন নির্বিবাদী মানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কোনো কিছুরই মধ্যে তিনি থাকতেন না। ছোটো পিসিমা, নাম ছিল তাঁর শশীমুখী, তিনি ছিলেন একেবারে অন্যরকম। যা তিনি ন্যায্য মনে করতেন তার জন্যে গলা বাড়িয়ে কোন্দল করতে তিনি পিছুপাও হতেন না। তাঁর বাপের বাড়ির গরব ছিল বিস্তর এবং কোনো-রকম বেচাল দেখলে তিনি ছেলেমেয়েদের বেশ ধমকে দিতেন। যাঁরা ধ্যাতানি খেত তাঁরা ছোটো পিসিমার চোখের ভঙ্গীটার দিকে ইঙ্গিত করে নেপথ্যে বলত, 'ঐরে, ট্যারা-পিসি আসছে।' ছোটো পিসিমার ভাইয়েদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন তাঁর ছোটো ভাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে জেনুকাকার দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশ। কার্তিক গণেশের জন্যে ছোটো পিসিমা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর বোধ হয় আশঙ্কা ছিল প্যারীকাকার মৃত্যুর পর কালীঘাটের বিশাল বাড়ি ও যাবতীয় সম্পদ নয়া খুড়ির বাপের বাড়ির দিকেই চলে যাবে। কতবার আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে বলে গেছেন, 'রাখাল, তোরা দেখস না, দাশগুষ্টির চিহ্নটুকুও লোপ পাইবো। প্যারীকে বল্ যে বাড়িটা ও কারবারটা কার্তিক গণেশের নামে লেইখ্যা দেউক অখনি।' দুই পিসিই চলে গেছেন।

মনে পড়ে রাজু জ্যাঠামশায়ের বড়ো মেয়ে নেড়িদিদিকে যাঁর ভালো নাম সুহাসিনী। যেমন তিনি ভালো তেমনি উদার ছিলেন তাঁর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ছিলেন লোক্যাল অডিটার। পরে তাঁকে রাজ-

মোহন রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেন পোর্ট কমিশনারের আফিসে। সেই কাজে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করে অবসর গ্রহণ করে কয় বছর হল তাঁর কলকাতার বাড়িতেই দেহরক্ষা করেছেন। সেই যে রেঙ্গুনে গেলেন সেই ইস্তক নেড়িদিদি ও সুরেনবাবু স্বামী স্ত্রীতে মিলে রাজমোহনের পরিবারের গার্জিয়েনস্বরূপ হয়ে সকল ধাক্কা নীরবে বয়ে এসেছেন। নেড়ি-দিদিরও ছিল বাপের বাড়ির গৌরববোধ এবং ভাইঅন্ত প্রাণ। নিঃসন্তান দম্পতি ভাইয়েদের ছেলে-মেয়েদেরই মানুষ করে তুলেছেন। সুরেনবাবু চলে গেছেন। কিন্তু নেড়িদিদি তাঁর রুগ্ন ভগ্ন দেহমনে যতটুকু পাবেন ভাইয়েদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণ কামনা করেই যাচ্ছেন।

আর মনে পড়ে চিরদুঃখিনী মুকুলকে। জ্ঞেনুকাকার মেয়েদের মধ্যে মুকুল হল দ্বিতীয়া। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটো। খুব অল্প-বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর প্রথম সন্তান সম্ভাবনা হতে হতেই তিনি বিধবা হলেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সেই অন্তঃসত্ত্বা অভাগিনী কন্যার। বাপের বাড়িতে তিনি এলেন আশ্রয় নিতে। একটি ছেলে জন্মাবার কদিন পরেই সে চলে গেল। সেই ছেলের মৃতদেহটিকে আঁকড়ে ধরে মুকুলের সে কি মর্মন্তুদ কান্নাই না শুনেছি। তাঁর আপন ভাইয়েরা পেছপা হওয়ায় আমাকেই মুকুলের সেই ছেলেটিকে তাঁর বুক থেকে টেনে নিতে হয়েছিল। অসহায় ভগিনীর সে কাতর গোঙানি আমি জীবনে এখনো ভুলতে পারলাম না। তার পর মুকুল রয়েই গেলেন কালীঘাটের বাড়িতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা বাঙালি বালবিধবা কন্যা। এখন মুকুলের অনেক বয়েস হয়েছে। রোগে শোকে তিনি জর্জর হয়ে পড়েছেন। দেহমনের ক্লান্তিতে তিনি বোধ হয় এখন নিষ্কৃতির অপেক্ষায় দিন গুনছেন। সর্বশেষে মনে পড়ে কালীঘাটের বাড়ির পুরানো দাসী শ্যামা ঝিকে। একেবারে পরিবারের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। দুনিয়ায় তাঁর কেউ ছিল না। কালীঘাটের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই ছিলেন তাঁর সকল হৃদয়ের ভালোবাসার ধন। মৃত্যুর সময় তাঁর যা কিছু সামান্য সঞ্চয় ছিল শুনেছি তিনি সে-সব দিয়ে গেছেন রাজু জ্যাঠামশায়ের ছোটো মেয়ে আমাদের টিটিদিদিকে। এত মায়া, এত দরদ সচরাচর দুর্লভ এ জগতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিমের বাড়ি

১

রমানাথ দাশের চতুর্থ পুত্র এবং চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রতনকৃষ্ণ দাশ ছিলেন তেলিরবাগের পশ্চিমের বাড়ির কর্তা। তাঁর ছিল চারটি ছেলে— জগবন্ধু, গোপীমোহন, কেদারেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর। পশ্চিমের বাড়িতে এই চার ভায়ের ছিল চারটি পৃথক ভিটা। পশ্চিমের বাড়ির দক্ষিণ-পুব কোণে ছিল একটি পুষ্করিণী যাকে 'পশ্চিমের বাড়ির পুখৈর' বলা হত। পশ্চিমের বাড়ির চারি দিকে ছিল কয়েক বিঘা জমি যাতে আমকাঁঠালের অনেক গাছ ছিল। পশ্চিম দিকে খালপাড়ে ছিল দুটি উঁচু তালগাছ যা বহুর থেকে দেখা যেত দুটি সজাগ প্রহরীর মতো। এই পশ্চিমের বাড়ির একটি ভিটাই ছিল আমাদের পিতামহের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ি।

জগবন্ধু ওকালতি পাস করে রাজসাহীতে প্র্যাকটিস করতেন এবং কালক্রমে সেখানকার সরকারী উকিল হয়ে বেশ পসার প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে তাঁর খুল্লতাত কাশীশ্বর আপন কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে তাঁর কোলে দত্তকপুত্র স্বরূপে দান করেন। এই দত্তকসূত্রে ভুবনমোহন মধ্যের বাড়ি থেকে পশ্চিমের বাড়ি চলে এলেন। রক্তের সম্পর্কে ভুবনমোহন সত্যরঞ্জন সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জনের আপন কাকা ছিলেন কিন্তু দত্তকদানের পর আইনবলে তিনি আমার পিতৃদেব রাখালচন্দ্রের আপন জ্যেঠতুত ভাই হলেন। অর্থাৎ বংশাবলীতে তিনি পশ্চিমের বাড়ির বাবুদের এক ডিগ্রি কাছে চলে এলেন। ভুবনমোহন তাঁর দত্তকগ্রহীতা পিতা জগবন্ধুর পত্নীকে আপন মায়ের মতোই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন এবং পশ্চিমের বাড়ির খুড়তুত ভাইয়েদেরও আপন ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন। দত্তকদান সত্ত্বেও ভুবনমোহনের আপন মায়ের পেটের ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কেরও কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। কালীমোহনকে তিনি খুবই ভক্তি করতেন ও মানতেন। দুর্গামোহনের সঙ্গে প্রথম দিকে অনেক-কাল একত্রেই বসবাস করতেন। তার পর তিনি পটুয়াটোলা লেনে একখানা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে ভবানীপুরে যথাক্রমে কাঁসারি-

পাত্রা রোড, পিপুলপটি লেন এবং শেষে কালীমোহন আলয়ের উত্তর সংলগ্ন জমিতে নিজ বাড়ি ১৪৭ নং রসা রোডে যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গোয়েন্কা ব্লক তৈরি হয়েছে সেইখানে বাস করতেন।

ভুবনমোহনও তাঁর দুই অগ্রজের ন্যায় ওকালতি পাস করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। পরে তিনি অ্যাটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টে অ্যাটর্নি বলেও নাম লেখান এবং অ্যাটর্নি আফিস খোলেন। এক সময়েআমার পিতৃদেব সেই আফিসে তাঁর দাদার কাছে 'আর্টিকেল ক্লার্ক' হয়ে অ্যাটর্নির কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। ভুবনমোহনের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এবং এমন কি গ্রামের লোকেরাও আসত যেত এবং বাসও কবত। আমার পিতাও সপরিজনে তাঁর আশ্রয়ে অনেক বছর ছিলেন, সে কথা পবে বলব। ভুবনমোহন পরম ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। তিনি খুব উচ্চশিক্ষিত এবং সাহিত্যরসিক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তিনি খুব প্রাঞ্জল প্রবন্ধাদি লিখতে পারতেন। তিনি কিছু কিছু ধর্মসংগীতও লিখে সুর দিয়েছিলেন। তিনি দুর্গামোহনের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। তিনি দেশের আবহমানকালের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য বা বর্জন করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি অনেকাংশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলেন। বহু পূর্বে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' বলে যে কাগজ ছিল ভুবনমোহন ছিলেন তারই সম্পাদক এবং তাতেই তিনি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখতেন ধর্ম সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে। এই কাগজই যখন পরে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' বলে নাম পাল্টাল তখনো ভুবনমোহনই তার সম্পাদনা করতেন। এই কাগজের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য রাজনৈতিক হয়ে যাওয়ায় এরই পরিপূরক অন্য একটি কাগজও তিনি সম্পাদনা করতেন যার নাম ছিল 'মেসেঞ্জার'। সেই কাগজে তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার আলোচনা করতেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি অতি সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হয়েছিল। তিনি যে কেবল ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধই লিখতেন তা নয়। দেশের রাজনৈতিক সমস্যার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল এবং সেই সূত্রে তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন'এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি একজন কমিশনারও হয়েছিলেন।

ভুবনমোহন বেশ খরচে ছিলেন। অনেক ছিল তাঁর পোষ্য— আত্মীয় ও

অনাত্মীয়। তা ছাড়া তিনি মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারতেন না। অনেক মক্কেলের জন্যে জামিন হয়ে তাঁকে খেসারতের দায়ে পড়তে হয়। দেনা যখন তাঁর পরিশোধের সাধ্যের বাইরে চলে গেল তখন তাকে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই দুর্দিনেও তিনি একটি পোষ্যকেও বলতে পারেন নি তার নিজের পথ দেখতে। কত লোকের ছেলের পড়াশুনার খরচ, চিকিৎসার খরচ যে তিনি অকাতরে নীরবে দিয়েছেন তার কোনো হিসেবই নেই। দান ও বদান্যতা ছিল জ্যাঠামশায়ের স্বভাবেরই ধর্ম।

দেউলিয়া নাম লেখানোর পর অ্যাটর্নি আফিসও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে পুরুলিয়াতে গিয়ে সস্ত্রীক বসবাস করতে লাগলেন। সে সময়ে দেখেছি তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে উপনিষদাদি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। পুরুলিয়ার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে তক্তপোষে বসে তিনি লেখাপড়া করতেন তাব পাশেই নীচু আলমারিতে থাকত ম্যাক্সমূলারেব 'সেক্রেড বুকস্ অব দি ইস্ট' বলে একটি গ্রন্থের সিরিজ। সেগুলি আমিও দেখেছি। এই সময় জ্যাঠামশায়েব যাবতীয় খরচাদি চিত্তবঞ্জনই সববরাহ করতেন। ভুবনমোহনের সহধর্মিণীর মৃত্যুর পর তাঁর নিজেরও শবীব ভেঙে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষাব জন্যে। কলকাতায় যখন তিনি রোগশয্যায় পড়ে আছেন তখন পুত্র চিত্তরঞ্জন আইনগতভাবে বাধ্য না হলেও পাওনাদারদের সমস্ত বাকী পাওনা শোধ করে পিতাকে ও নিজেকে ঋণমুক্ত করেন। ভুবনমোহন যেন এই দিনটির জন্যেই উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এর অল্পকাল পরেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেব জুন মাসে ভুবনমোহন অমৃতধামে মহাপ্রয়াণ করেন। জীবনে জ্যাঠামশায়েব সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে খুব কমই এসেছিলাম। আমার বাবা ও মায়েক মুখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি এবং নিজেও তাঁকে সামান্য যেটুকু দেখেছি ও জেনেছি তারই ভিত্তিতে অসঙ্কোচে বলতে পাবি যে জ্যাঠামশায়ের মতো এমন নিবহংকার, অমায়িক, শিক্ষিত, চরিত্রবান, দানশীল পুরুষ জগতে কমই দেখা যায়।

জ্যাঠামশায়ের সহধর্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবীর কথা এবং তাঁর নির্মল চরিত্রের গুণাবলী বলে শেষ করা যায় না। এরকম মায়া মমতা ও এত গভীর আশ্রিতজনবাৎসল্য অন্য কারো মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইনি ছিলেন খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘর (খড়দিয়া)

গ্রামের ধন্বন্তরী গোত্রীয় লক্ষ্মণ সেন বংশোদ্ভব পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা। জ্যেঠিমা সামান্যই বাংলা পড়তে জানতেন। অতি অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বলে তাঁর লেখাপড়া বিশেষ এগোয় নি। তা ছাড়া সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন রেওয়াজও ছিল না। বিয়ের পব সুবৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার নিতে হয়েছিল বলে তিনি বাড়িতে বসে লেখাপড়া শেখবার সময় ও সুযোগও তেমন পান নি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তাঁর মনের যে প্রসার ও হৃদয়েব যে উদাবতা দেখেছি তা আজকালকাব শিক্ষাভিমানী শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। অসাধারণ ছিল তাঁর মনের জোর ও সত্যনিষ্ঠা। এরকম ধর্মপবায়ণা, আশ্রিতবৎসল, মিষ্টভাষিণী, মহীয়সী নাবী জীবনে কমই দেখেছি। দুর্গামোহনেব প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পব তাঁব শেষ তিনটি শিশুসন্তান সতীশবঞ্জন, জ্যোতিষবঞ্জন ও শৈলবালার তত্ত্বাবধানের ভাব পড়েছিল চিত্তবঞ্জনজননী নিস্তাবিণী দেবীর উপর। তিনি তাঁর অন্তবেব সকল স্নেহমমতা দিয়ে এই মাতৃহাবা শিশু তিনটিকে আপন সন্তানদের মতই বড়ো কবে তুলেছিলেন। এই শিশুবা বড়ো হয়ে মুক্তকণ্ঠে বলে গেছেন—'ঠাইনখুড়ির যত্নে ও স্নেহে আমবা মায়ের অভাব অনুভব কবি নাই।' আমার পিতা ছিলেন তাঁর সম্পর্ক হিসেবে খুড়তুতো শ্বশুরের ঘবের দেওর। আজকালকার দিনে এই সম্পর্ক ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনা এবং অনেকে বোধ হয় এই সম্পর্ককে স্বীকারও করেন না। কিন্তু সন্তানপ্রতিম দেওবটিব উপবে জ্যেঠিমা তাঁর অন্তবের স্নেহমমতা অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন এবং সুখে দুঃখে তাঁকে আগলিয়ে রেখেছেন যেমন কবে পক্ষীমাতা তাব শাবককে নিজ ডানাব আশ্রয়ে ঢেকে রাখে। এইবকম পিতামাতার সদ্‌গুণবাজি নিয়ে জন্মেছিলেন চিত্তবঞ্জন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বব তাবিখে বাসপূর্ণিমা তিথিতে পুরুলিয়ার বাসভবনে মহাপ্রয়াণ কবেন এই সাধ্বী সতী রমণী পবিবারস্থ সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। মার মুখে শুনেছি জ্যেঠিমা মারা গেলে বাবা যেরকম ছেলেমানুষের মতো কেঁদেছিলেন তাঁব আপন মায়ের মৃত্যুতেও নাকি তেমন কাঁদেন নি। জ্যেঠিমার হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ বাবাই কবেছিলেন।

২

ভুবনমোহনের ছিল তিন পুত্র— চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তকুমার

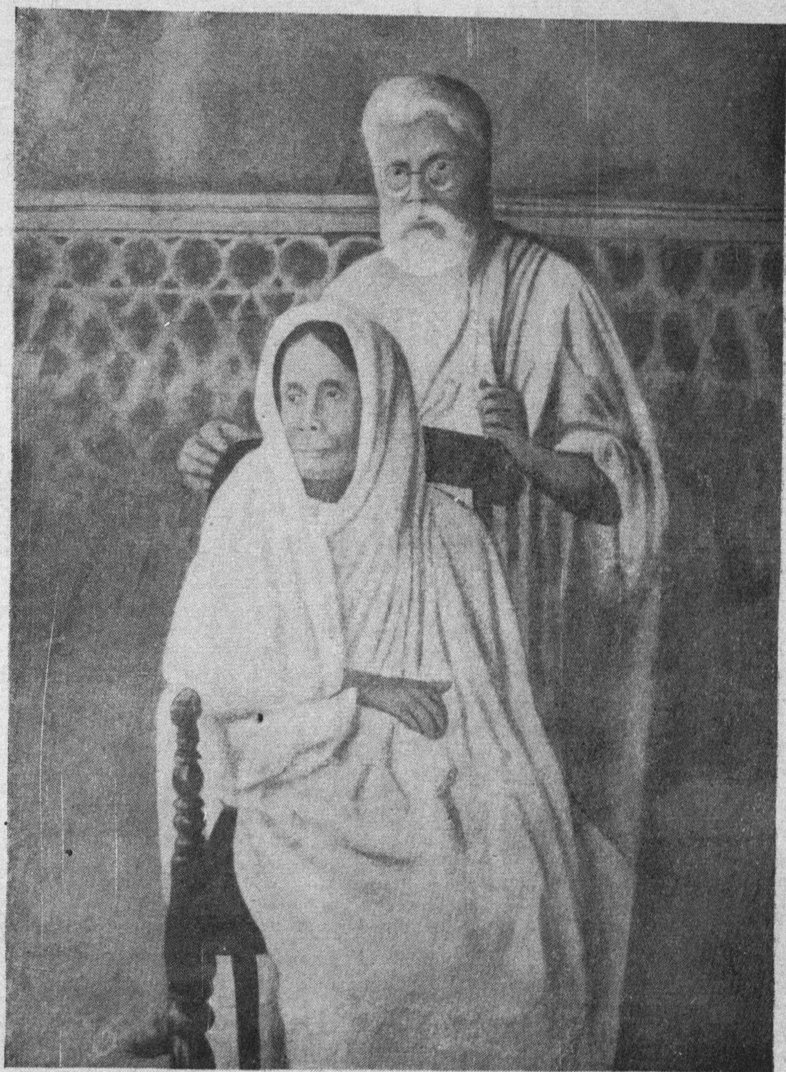
এবং পাঁচটি কন্যা— তরলা, অমলা, প্রমীলা, ঊর্মিলা ও মুরলা। মধ্যের বাড়ির কালীমোহনের আপন দুই ছেলেই তাঁর জীবদ্দশায় পর পর মারা যাওয়ায় কালীমোহন তাঁর উইলের দ্বারা তাঁর পত্নী চন্দ্রমণিকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান এবং সেই অনুমতিবলে বিধবা চন্দ্রমণি বসন্ত-কুমারকে আপন স্বামীর দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তকের সূত্রে বসন্তকুমার পশ্চিমেব বাড়ি থেকে মধ্যেব বাড়ি চলে যান। মধ্যের বাড়ির কাছে পশ্চিমেব বাড়িব যে পুত্রঋণ হয়েছিল ভুবনমোহনকে দত্তক নিয়ে বসন্তকুমারকে মধ্যের বাড়িব কালীমোহনকে দত্তক দিয়ে যেন সেই পুত্রঋণ শোধ হয়ে গেল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেব ৫ই নভেম্বব (বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তিক) ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার পটুয়াটোলা লেনস্থ একটি ভাডাটে বাড়িতে যেখানে ভুবনমোহন তখন বাস করতেন। সেদিন কে জানত যে তাঁব ঘরে একটি দিকপাল এসে দেখা দিলেন। চিত্তবঞ্জনের জন্মের অল্প পবেই ভুবনমোহন ভবানীপুরে উঠে আসেন। কাজেই চিত্তবঞ্জনেব প্রথম শিক্ষা হয় ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। ঐ স্কুল থেকেই তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতাব প্রেসিডেন্সী কলেজে পডতে যান। আমাব পিতৃদেব চিত্তরঞ্জনের খুল্লতাত হলেও বয়সে প্রায় তাঁর কাছাকাছি, নয়তো বডো জোর দু'তিন বছরের বডো ছিলেন এবং তাদের মধ্যে বেশ একটি মধুর হৃদ্যতা ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে বাবা চিত্তরঞ্জনেব সহপাঠী ছিলেন। আর সে-সময়ে সেই কলেজে তাঁদের সঙ্গে পড়তেন দক্ষিণের বাডির জ্ঞানেন্দ্রমোহন, প্রখ্যাত বিচারপতি সার্ বমেশচন্দ্র মিত্রের মধ্যম পুত্র বিনোদচন্দ্র মিত্র (পরে যিনি সার্ বি. সি. মিটার নামে খ্যাতিলাভ করেন), হরিদাস বসু (পরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার এইচ. ডি. বোস), বিচারপতি সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (পরে যিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি হয়েছিলেন)। স্কুল ও কলেজে পডার সময় চিত্তরঞ্জনের এমন-কিছু অসাধারণ মেধা পরিলক্ষিত হয় নি। বাবাকে বলতে শুনেছি—'চিত্তের ক্লাসের পড়ার চাইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ও খুব ভালবেসে পড়ত। ইংরেজী বিতর্ক সভায় চিত্ত ভালোই বলত।' চিত্তরঞ্জনের এই সাহিত্যবোধ উত্তরকালে

ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে তাঁর 'মালঞ্চ' 'মালা' 'সাগরসংগীত' 'অন্তর্যামী' ও 'কিশোর কিশোরী' কাব্যগ্রন্থে ও তাঁর নানা ভাষণে। বাবার মুখে আরো শুনেছি যে চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সী কলেজের স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন এবং সকলকে নিয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার ক্ষমতা তিনি তখন থেকেই অর্জন করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ও আমার বাবা দুজনেই বি. এ. পরীক্ষায় পাস হলেন। চিত্তরঞ্জন তখন গেলেন বিলেতে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্যে আর আমার বাবা তাঁর জ্যেঠতুত দাদা ভুবনমোহনের আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হয়ে অ্যাটর্নি পরীক্ষা দেবার জন্যে তাঁরই অফিসে বের হতে শুরু করলেন।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে গেলেন যুবক জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (পরে নামকরা আই. সি. এস. জে. এন. গুপ্ত) মশায়। বহুকাল পরে আমি যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি তখন এক বছর পূজার ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কালিম্পং শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। তিনি 'শান্তি' বলে একটা বাড়িতে থাকতেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম। আমি যেতাম তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো হলেও প্রাচীন আভিজাত্যের অভ্যাসে তিনি আমার বাসায়ও আসতেন সৌজন্য বিনিময় করবার জন্যে ঘোড়ায় চেপে। কত কথাই না তাঁর কাছে শুনেছি চিত্তরঞ্জন ও সতীশরঞ্জন সম্বন্ধে। একদিন কথা বলতে বলতে পুরানো দিনের স্মৃতি যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। বিশুদ্ধ বাংলায় অনেক কথা বলে শেষ করলেন এই কয়টি কথায়—'বাবা, তুমি জান না চিত্ত ও সতীশের সঙ্গে ও তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কি প্রীতিবন্ধন ছিল। বহুদিন হয়ে গেছে, আজ তাঁরা দুজনেই চলে গেছেন। আমাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হওয়ায় আমরা দেখা দ্রষ্টব্য কিছুটা তফাৎ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কি যেতে পারে?' দেখলাম বলতে বলতে যেন বৃদ্ধের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। অতি সশ্রদ্ধ চিত্তে সেদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

চিত্তরঞ্জন আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন নি—কেন তা পরে বলব। জে. এন. গুপ্ত পরীক্ষায় পাস করে সে চাকুরিতে ঢুকে



লেখকের জ্যেষ্ঠতাত ভুবনমোহন ও জ্যেঠিমা নিস্তারিণী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতামাতা

গেলেন। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন ইনার টেম্পল ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে দেশে ফিরে এসে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কলকাতা হাইকোর্টে তখন বড়ো বড়ো উকিল কৌঁসুলীতে ভরা। ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল পরস্পরের মধ্যে এবং সেখানে দন্তস্ফুট করে পসার জমানো এক কঠিন ব্যাপার ছিল। তার উপরে চিত্তরঞ্জনকে দৈবদুর্বিপাকে পড়তে হল। তাঁর পিতা ভুবনমোহনের বাড়িতে আত্মীয় অনাত্মীয় অনেক পোষ্য পালিত হতেন। ভুবনমোহন নিজেও খরচে ছিলেন বেশ। তার উপরে বন্ধু বান্ধব ও মক্কেলের খাতিরে তাদের জন্যে জামিন হয়ে অনেকবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে ভুবনমোহনকেই দায়ী হয়ে স্বীয় মস্তকে বিপুল ঋণভার গ্রহণ কবতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। চিত্তবঞ্জন যখন দেশে ফিরে সবে কাজে লেগেছেন তখন ভুবনমোহনের অনেকগুলি ঋণ পরিশোধের দিন এসে পড়েছিল কিন্তু অর্থাভাবে তা শোধ দেবার সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না। পাওনাদারদের কাছে সময় প্রার্থনা করলে তাঁরা সময় দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে ভুবনমোহনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও হ্যাণ্ডনোট পাল্‌টে নূতন হ্যাণ্ডনোটে সই দেবেন। গত্যন্তর ছিল না। পাল্টান হ্যাণ্ডনোটে সই দিয়ে দম ফেলবার মতো কিছুটা সময় পেলেন পিতাপুত্রে। এই ঋণভারে সাধারণ মানুষ মুষড়িয়ে যেত। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দমলেন না। একাগ্রচিত্তে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন আইনব্যবসায়ে অর্থ উপার্জনের ধান্ধায়।

হ্যাণ্ডনোট পালটিয়ে নূতন হ্যাণ্ডনোটে সই দিয়ে কিছুটা সময় পেয়েও শেষ পর্যন্ত নূতন হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদের মধ্যেও সে ঋণ পরিশোধ করা গেল না। পিতাপুত্রের দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আব কোনো উপায় ছিল না। ১৬ই জুন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দুজনেই দেউলিয়া নাম নিয়ে পাওনাদারদের তাগিদ থেকে তখনকার মতো রেহাই পেলেন। কিন্তু উদীয়মান ব্যবহারজীবীর পক্ষে দেউলিয়া দুর্নাম যে কতখানি মর্মন্তুদ দুঃখ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা হয়তো বুঝবেই না। একে তো আপন মনের মধ্যে দেউলিয়া নামের গ্লানি নিত্য নিয়ত পুঞ্জীভূত অভিশাপের মতো চেপে থাকে, তার উপরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ও কুৎসাকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টিপ্পনী টিটকারী ও শ্লেষ যে কি ভীষণ যন্ত্রণা এনে দেয় তা অনুমান

করা কঠিন নয়। পিতা ভুবনমোহন কাজ থেকে অবসর নেওয়ায় সংসারের সকল গুরুদায়িত্ব পড়ল একলা চিত্তরঞ্জনের উপর। মাথা গুঁজে যুবক চিত্তরঞ্জন সে গ্লানি বহন করে গেছেন নীরবে পিতার মুখ চেয়ে। সেই সময় তাঁর মনে যে সংযম ও দৃঢ়সংকল্প এসেছিল তা তাঁর জীবনের পরম পাথেয় হয়েছিল। জীবনেব এই কঠিন সংগ্রামে তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন এবং সকলেই জানেন যে তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই চিত্তবঞ্জন সমস্ত দেনা কডায়গণ্ডায় শোধ দিয়েছিলেন যদিও আইন অনুসাবে তা দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার বছর তিন চারেক পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয় বিক্রমপুরস্থ নওগাঁ গ্রামের ধর্মনিষ্ঠ ও চরিত্রবান বরদানাথ হালদারেব জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তীব সঙ্গে। বরদানাথেব ও তাঁর সৎসাহসের কথা আগেই বলেছি। ভুবনমোহনের সঙ্গে ববদানাথের খুবই সৌহার্দ্য ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মসমাজেব নামকরা সভ্য। বরদানাথ জানতেন ভুবনমোহন ও চিত্তবঞ্জনের আর্থিক অনটনেব কথা। দেউলিয়াব ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বরদানাথকে অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু নিষেধ করেছিলেন। এ সমস্ত কথা জেনেশুনেও ববদানাথ আপন প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চিত্তরঞ্জনেব হাতেই সমর্পণ করেছিলেন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যে চিত্তবঞ্জন জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করবেনই। ভগবানের দয়ায় তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁব এই আশার সাফল্য দেখে গিয়েছেন। এই কল্যাণময়ী মহিলা, বাসন্তী দেবী, আপন স্বামীব সকল কর্তব্যসাধনেই নিত্য যত্নবতী থাকতেন। যখন চিত্তবঞ্জন তাঁর প্র্যাকটিসের উচ্চশিখরে আরোহণ কবে প্রভূত অর্থোপার্জন কবছিলেন এবং দেশাত্মবোধে রাজাব মত ঐশ্বর্যের মোহ এক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীব অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফকির হয়ে গেলেন তখনো এই সাধ্বী রমণীর মুখে এতটুকুও ভ্রুকুটি দেখি নি। স্বামীর সঙ্গে তিনিও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইংরাজের জেলে যেতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দাদাবাবু ও তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন (ভোম্বল) যখন জেলে তখন চট্টগ্রামে যে রাজনৈতিক কনফারেন্স হয় তাতে বাসন্তী দেবীই সভানেত্রী পদ অলঙ্কৃত কবেছিলেন। ভগবানের দয়ায় তিনি এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং এখনো আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ

করে থাকেন।

যাঁরা হাইকোর্ট সম্বন্ধে এতটুকুও খোঁজখবর রাখেন তাঁরা সবাই জানেন যে যদিচ হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কৌঁসুলীদের বিস্তর আয় হয় তথাপি এই বিভাগে প্র্যাকটিস জমান সময়সাপেক্ষ এবং জুনিয়ারদের কপালে কিসের টাকা অ্যাটর্নি আফিস থেকে আসে ঢাকেঢোলে অর্থাৎ ঈস্টারের ছুটির আগে যখন চড়কে ঢাকের বাজনা বাজে এবং শারদীয়া বন্ধের আগে যখন পূজায় কাঁসর ঘণ্টা ও ঢোল বেজে ওঠে। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই বিভাগে পসার জমাতে গেলে দাঁতে দাঁত দিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়। ঘরে যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের এই বিভাগে হা-পিত্যেস করে পড়ে থাকা সহজ তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। পরন্তু ফৌজদারী এবং মফস্বলের আদালতের কাজের দক্ষিণাটা নগদানগদী পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক অবস্থা তখন একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না: তাঁর পুরানো সহপাঠী বি. সি. মিটার ও এইচ. ডি. বোস সাহেবরা অনেক চেষ্টা করতেন হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কাজে তাঁকে টেনে রাখবার জন্যে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ছিল শিরে সংক্রান্তি এবং নগদ টাকার প্রয়োজন। এইজন্যে তাঁকে কলকাতার পুলিস কোর্টে এবং মফস্বল আদালতে ফৌজদারী মামলা করতে যেতে হত। অনেক সময়ে সংসারের তাগিদে দক্ষিণাটা ন্যায্য না হলেও তাঁকে কম ফীসেই কাজ নিতে হত। মাঝে মাঝে যখন বাইরের কাজ হাতে থাকত না তখন তাঁর ঐ দুটি সুহৃদ তাঁকে নিজেদের ব্রীফ দিতেন তাঁদের হয়ে করে দেবার জন্যে। এটাকে হাইকোর্টের চলতি কথায় বলে ব্রীফ 'হোল্ড' করা। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে অ্যাটর্নি ও জজেরা যেন চিত্তরঞ্জনের গুণপনা দেখতে পায় এবং অ্যাটর্নিরা সরাসরি চিত্তরঞ্জনকেও ব্রীফ দেয়। এরকম বন্ধুবাৎসল্য সত্যই বিরল। যাই হোক, সংক্ষেপে বলি যে সাংসারিক কারণে চিত্তরঞ্জনকে নগদ ফীসের লোভে ফৌজদারী মামলাই বেশি নিতে হত এবং ফৌজদারী মামলায় তিনি বেশ সুনাম অর্জন করে ফেলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এই সময়ে আলিপুর জজ কোর্টের উকিল শরৎচন্দ্র সেন মশায় যিনি পরে চিত্তরঞ্জনের তৃতীয়া ভগিনী প্রমীলাকে বিবাহ করেন তিনি অনেক মোকদ্দমা জুটিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জনকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে খুবই সাহায্য করেন। শরৎবাবু ছিলেন ভূকৈলাস রাজবাড়ির বাঁধা উকিল। তাঁর

সুপারিশে ভূকৈলাসের সব মামলাই আসতে লাগল চিত্তরঞ্জনের কাছে। ১৯০৭ সালে এল চিত্তরঞ্জনের পসারের পরতা।

১৯০৭ সালে হল 'বন্দেমাতরম্' মামলা শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে। সে মামলায় সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পাল গেলেন ছয় মাসের জন্যে জেলে এবং প্রমাণাভাবে শ্রীঅরবিন্দ পেলেন খালাস। তার পর এল 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েব নামে মামলা রাজদ্রোহের দায়ে। চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষ সমর্থন কবেছিলেন। তার পর এল বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শ্রীঅরবিন্দ ও পঁয়ত্রিশ জন যুবকের বিরুদ্ধে। কি হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল সেই মামলাব সময়। আমরা তখন ছোটো। সরকাবী তরফে ছিলেন বিখ্যাত কৌস্‌লী ইয়াডলি নর্টন সাহেব। শ্রীঅরবিন্দেব তবফে প্রথমে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কুমুদনাথ চৌধুরী ও অনেক জুনিয়াব ছিলেন। চাঁদা তুলে যে টাকা উঠেছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে বড কৌস্‌লীদের সম্ভব হল না ঐ মামলায় কাজ চালিয়ে যাওয়া। তখন ডাক পড়ল চিত্তরঞ্জনেব। তিনি সব ছেড়েছুডে দিয়ে ঐ মামলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত লডেছিলেন। অনেক মাস মামলা চলার পর দুপক্ষের সওয়াল জবাব হল। চিত্তবঞ্জনেব শেষ বক্তৃতাটিব তুলনা নেই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ ও অনেক জন আসামী খালাস হলেন। বাকিদেব মধ্যে শ্রীঅববিন্দেব ছোট ভাই বাবীন্দ্র এবং উল্লাসকর দত্তের হল প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য ক'জনেব হল সশ্রম কারাবাস দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে। পরে হাইকোর্টের আপিলে বাবীন্দ্র ও উল্লাসকবের প্রাণদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হয়েছিল। এর পর এল ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা, ট্রাঙ্ক খুনের মামলা এবং আরো কত কি। এই-সব মামলায় চিত্তরঞ্জনের ফৌজদারী মামলা চালানোর কৃতিত্বের খ্যাতি ছডিয়ে পডল সারা ভারতবর্ষময়।

ইতিমধ্যে দেওয়ানী মামলায় হাইকোর্ট আদিম বিভাগেও চিত্তরঞ্জনের বেশ প্রতিষ্ঠা হয়ে আসছিল। ১৯০৯।১৯১০ সালে আরা জজ কোর্টে এল ডোমরাঁও রাজ-গদীর মামলা। কলকাতায় ছিল এক বিখ্যাত অ্যাটর্নি আফিস ম্যানুয়েল আগরওয়ালা। তার বড়ো সরিক তখন ছিলেন ধনুলাল আগরওয়ালা। তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পরামর্শে কেশবপ্রসাদ যিনি ডোমরাঁও গদী দাবি করে

মামলা এনেছিলেন তিনি চিত্তরঞ্জনের শরণাপন্ন হন। এই মামলা চলে প্রায় বছর খানেক। বহু বিজ্ঞ আইনজ্ঞ লোকেরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে এ মামলায় কেশবপ্রসাদের জিতবার কোনো আশাই নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রাণপণ পরিশ্রম করে এই মামলায় জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর মক্কেল ডোমরাঁও রাজ-গদীতে আসীন হন। এই ডোমরাঁও রাজ-সংক্রান্ত আরো দুটি বড়ো মামলায়ও চিত্তরঞ্জন নিযুক্ত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের ডাক পড়েছিল লছমীপুর কেসে, মহেশপুর রাজ কেসে এবং আরো কত কি মামলায়। এই-সব মামলার সাফল্যের জন্যে চিত্তরঞ্জনের দেওয়ানী মামলার কৃতিত্বেরও প্রভূত খ্যাতি রটে। এর পর থেকে তিনি মফস্বলে গেলে অ্যাটর্নিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন দাশ সাহেব কবে কলকাতায় ফিরবেন। যেদিন সকালে কলকাতায় ফিরতেন সেই দিনই সকালে বাড়িতে কন্সালটেশন হত এবং সেই দিনই কোর্টে হাজির হতেন চিত্তরঞ্জন।

তৃতীয় ডোমরাঁও কেস শেষ হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই মোকদ্দমায় জয়লাভের পরেই নাগপুরে চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেন। সেই সময়ে তিনি দুইটি মামলা করবার অধিকার সংরক্ষিত করেছিলেন—একটি এই ডোমরাঁও কেসের পাটনা হাইকোর্টে আপিল, আর কলকাতার বিখ্যাত মিউনিসন বোর্ডের মামলা যা করতে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন গভর্নমেন্টের কাছে। শেষ পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট তাঁকে শেষোক্ত মামলা থেকে অব্যাহতি দেন এবং তিনি নানা কারণে ডোমরাঁও কেসের আপিলে পাটনা যেতে পারেন নি। এই অসহযোগব্রত গ্রহণের পর চিত্তরঞ্জন আর কখনো আদালতে প্র্যাকটিস করতে যান নি। দেশের জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া 'দেশবন্ধু' আখ্যাকে সকল অন্তর দিয়ে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ত্যাগ ও দেশপ্রীতির প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রচার করেন। তৃতীয় ডোমরাঁও কেসে তাঁর ফীস ছিল মাসিক ৪৫,০০০ হাজার টাকা ও আরায় থাকার যাবতীয় খরচ। আমি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ন্যায্য গর্বভরে পরে আমাদের হাসতে হাসতে বলেছেন—'তোরাও তো প্র্যাকটিস করতেছিস্—দেখি কি রোজগার করিস। আমার হাতের এই পাঁচ আঙুলের মধ্যে দিয়ে মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা গৈলা গেছে রে।' কথাটা

নিছক সত্য। আইনজীবী মহলেও চিত্তরঞ্জন খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অ্যাটর্নি কিশোর ঘোষের অঙ্কিত চিত্তরঞ্জনের মস্ত বড়ো তৈলচিত্রটি আজো বার লাইব্রেরীর বড়ো ঘরের দক্ষিণের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে।

•

আমি যখন কলকাতায় ফিরে ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে হাইকোর্টে ভর্তি হই তখনো চিত্তরঞ্জন কলকাতাতেই কাজ করছিলেন। তৃতীয় ডোমরাঁও কেস করতে যাবার আগে প্রায়ই তখন সেসন্স কোর্টে তিনি আসামীদের পক্ষে নিযুক্ত হতেন—দৈনিক দক্ষিণা দুটি হাজার টাকা। দুর্গামোহনের পুত্র সতীশরঞ্জন তখন স্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী। দুই ভাই বিপরীত দিকে থাকলেই খুঁটিনাটি কথাকাটাকাটি লেগেই থাকত। এই-সব আইনের তর্ক ছিল শোনবার মতো, শেখবার মতো। দুপক্ষেরই আইনজ্ঞানের গভীরতা ছিল বিস্তর। কয়েকবারই এইরকম তর্কবিতর্ক শুনেছি হাইকোর্টের উত্তর দিকে নূতন সেসন্স কোর্টে। তখন এ-সব আইনের প্রসঙ্গে কাথাবার্তা বোঝবার মতো জ্ঞান আমার সামান্য একটু হয়েছিল বলেই তাঁদের তর্কবিতর্কে কার হার কার জিত তা বুঝতে পারতাম। দুইজনেরই কাজের ধারা বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখেছি। চিত্তরঞ্জনের ছিল অসাধারণ জেরা করবার ক্ষমতা এবং যে-কোনো লিখিতআইনের ধারা-গুলির বিশ্লেষণ করে তার নিহিতার্থ বের করা। আইনজ্ঞ হিসেবে চিত্তরঞ্জন ও সতীশরঞ্জনের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। সতীশরঞ্জনের আইন প্রসঙ্গে বিতর্কশক্তি ও বাগ্মিতার মধ্যে উষ্মা বা ভাবাবেগ দেখি নি। সমস্ত কাগজপত্র তন্নতন্ন করে পড়ে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ঘটনাবিন্যাসগুলি তিনি জজের সামনে খুব আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। বিপক্ষের উকিলের সওয়াল জবাবে তিনি পারতপক্ষে বাধা দিতেন না। তাঁর নিজের সওয়াল জবাবে বিশেষ কোনো তাপ-উত্তাপ থাকত না। শান্তভাবে খুব মনোগ্রাহী করে তিনি মক্কেলের বক্তব্যটি আদালতে পেশ করতে পারতেন। তাঁর কর্মধারার একটি বেশ উচ্চ মান ছিল। কখনো তার নীচে তিনি নামতেন না এবং খুব অল্প সময়ই তার উর্ধ্বে উঠতেন। অর্থাৎ সতীশরঞ্জন একটানা সমান তালেই মামলা করতেন— উঠতেনও না নামতেনও না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ধারা ছিল ভিন্নরকমের। চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতায় একটা

ভাবাবেগ দেখা যেত। তাঁর সওয়াল জবাবের কোনো নির্দিষ্ট মান ছিল না। আগেই বলেছি জেরায় ও আইনের ধারার বিশ্লেষণে চিত্তরঞ্জনের জুড়ি মেলা শক্ত ছিল। যে মামলায় তাঁর মন বসত সেই মামলায় তাঁর জেরা ও বহাস শুনবার মতো হত। ঐ ধরণের মামলায় তাঁর বাক্যবিন্যাস ইংরেজিতে যাকে বলে 'brilliant' তা-ই হত। আবার, যে মামলায় তাঁর মন ঠিক বসত না সে মামলাটা কোনোরকমে দুকুড়ি সাতের খেলার মতো চালিয়ে নিতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনো কোনো মামলায় চিত্তরঞ্জন বাগ্মিতায় ও কর্মকুশলতায় ব্যবহারজীবীর কৃতিত্বের উচ্চশিখরে উঠে যেতেন, আবার কোনো কোনো মামলায় অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের কৌঁসুলীর মতো সওয়াল, জবাব করতেন। আগেই বলেছি দুই ভাই সাধারণতঃ বিপক্ষ দলেই থাকতেন এবং কোর্টে দুজনের মধ্যে বচসা লেগেই থাকত। তাঁদের মধ্যে পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ছিল কিন্তু তাতে করে তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের মনোমালিন্য বা আত্মীয়তার অভাব কখনো ঘটে নি।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও দেখেছি সতীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মতভেদ। সতীশ-রঞ্জন ছিলেন লিবারেল দলে অর্থাৎ যাকে বলা হত নরমপন্থী। তিনি মনে করতেন যে দেশ বা দেশবাসীদের আস্তে আস্তে তৈরি করে নিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশের লোকের উন্নতিসাধন প্রথম কর্তব্য এবং তা যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন স্বাধীনতা দাবী করবার অধিকার আমাদের নেই। চিত্তরঞ্জন ছিলেন চরমপন্থী, কংগ্রেসের একজন দেশমান্য নেতা। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা না পেলে দেশের শিক্ষা, ব্যবসায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব নয়— কেননা, রাজশক্তি তাতে বাগড়া দেবেই। তিনি জানতেন যে স্বাধীনতা দানস্বরূপে কেউ কখনো পায় নি এবং আমাদেরও সে সম্পদ নিজের জোরে দখল করে ছিনিয়ে নিতে হবে অনিচ্ছুক রাজশক্তির হাত থেকে। দুই ভায়ের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং লোকে বলত যে আলি ইমাম ও হাসান ইমামের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল সতীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও সেইরকম প্রভেদ ছিল। দুই ভাই একত্র হলেই তর্কবিতর্ক, টেবিল চাপড়ান ও উচ্চৈঃস্বরে হাঁকডাক লেগে যেত। মনে আছে একবার সাধারণ নির্বাচনের সময় সতীশরঞ্জন বড়বাজার এলাকা থেকে বাংলার আইন সভায় নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। চিত্তরঞ্জন তখন বাংলার কংগ্রেসের একচ্ছত্র সম্রাট। যতীন

সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র, নির্মল চন্দ্র ইত্যাদি তাঁর বিশ্বস্ত সামন্ত। তাঁরা তখনকার দিনের এক অজ্ঞাতকুলশীল উকিলকে সতীশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করালেন কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে। অনেকে বললেন যে বড়বাজার অঞ্চলে সতীশরঞ্জনের বহু বিশিষ্ট ধনী মক্কেল আছে, সুতরাং তাঁর জয় অনিবার্য। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গেল। ভোটের দিন এল। চিত্তরঞ্জন প্রত্যেকটি পোলিং বুথের সামনে নীরবে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন অল্প সময়ের জন্যে। অগণিত ভোটাররা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে ভিতরে গিয়ে ভোট দিয়ে এল। ভোটের গণনা হল— দেখা গেল সতীশরঞ্জন হেরে ভূত হয়ে গেছেন এবং সেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে শ্রীসাতকড়িপতি রায় যশস্বী হয়ে পড়লেন। বাস্তবিকপক্ষে জয়টা কিন্তু হয়েছিল চিত্তরঞ্জনেরই এবং তাঁর অসাধারণ ত্যাগের। দুষ্ট লোকেরা বলেছে যে অনেক ভোটার সতীশরঞ্জনের গাড়ি চেপে তাঁরই বিপক্ষে ভোট দিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক অনৈক্য আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নি এবং দুজনের মধ্যে পারিবারিক মনোমালিন্য সৃজন করে নি।

আর-একটি বিষয়ে সতীশরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে প্রভেদ দেখেছি। দুইজনেই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। আগেই বলেছি তেলিরবাগের অতিথিশালা, দাতব্য ঔষধালয় ও কে. এম. ডি. এম. হাই স্কুলের জন্যে দুজনেই মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করেছেন আজীবন। এও বলেছি যে ব্রাহ্মসমাজের জন্যে এবং সরদিদির গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের জন্যে সতীশরঞ্জন অনেক টাকা তুলে দিয়েছেন নিজের মক্কেলদের কাছ থেকে এবং নিজেও অকাতরে দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনও তেমনি মুক্তহস্তে দান করে গেছেন। কত দুঃস্থ ছেলেদের পড়া খরচা, পরীক্ষার ফিস, বইয়ে দাম, দুই ভাই যে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাদের দানের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। কোনো ছেলে সতীশরঞ্জনের কাছে সাহায্য চাইতে এলেই তাকে বলা হত যে স্কুলের হেডমাস্টারের কাছ থেকে কিংবা সতীশরঞ্জন চেনেন এমন কারো কাছ থেকে একটি লিখিত সুপারিশ-পত্র আনতে হবে। সেইরকম চিঠি আনলে তবে সে সতীশরঞ্জনের কাছ থেকে সাহায্য পেত। অর্থাৎ সতীশরঞ্জন দেবার আগে জেনে নিতেন যে টাকাটা সৎপাত্রে পড়ল কি না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কাছে সুপারিশ-পত্রের দরকারই হত না। চাইবার

মতো চাইতে পারলেই প্রার্থী পেয়ে যেত সাহায্য— সে পড়ার জন্যেই হোক, মেয়ের বিয়ের জন্যেই হোক, কি বাপমায়ের শ্রাদ্ধের জন্যেই হোক। অনেক সময় দেখা গেছে যে প্রার্থীটির আরজি একেবারে সর্বৈব মিথ্যা এবং দু এক-বার এও হয়েছে যে টাকাটা পেয়েই সেই প্রার্থীটি ১৪৮ নং থেকে বেরিয়ে চড়কডাঙার মোড়ে যেখানে এখন পূর্ণ থিয়েটার হয়েছে সেখানে যে দিশী মদের দোকান ছিল তাইতে ঢুকে পড়েছে। চিত্তরঞ্জনকে সে কথা বলায় তিনি বলতেন 'আমার দানেই সুখ, দানই আমার ধর্ম। যে আমাকে ঠকিয়ে ধাপ্পা মেরে টাকা নিয়ে গেল সে হয়তো ভ্রষ্টাচার বা পাপ করল। কিন্তু তার বিচারের ভার ভগবান আমার উপর দেন নি—আমাকে দিয়েছেন দেবারই কর্তব্য।' এর উপরে কথা চলে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে চিত্তরঞ্জনের দান অনেক সময় অপাত্রেই পড়েছে এবং মিথ্যারই প্রশ্রয় দিয়েছে।

৪

অসহযোগব্রত গ্রহণ করায় একদিনে চিত্তরঞ্জনের সমস্ত আয় বন্ধ হয়ে গেল। স্বভাবতঃই তাঁকে ব্যয় সংকুলান করতে হল এবং তাইতে বাড়ির পুরাতন রাজসিক চালচলন কেটেছেঁটে ফেলতে হয়েছিল। যখন তিনি সচ্ছলতার উচ্চশিখরে উঠেছেন তখনই তাঁকে ঝপ করে নেমে আসতে হল কৃচ্ছ্রসাধনের পথে। নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল বাবুগিরির চাল ও বন্ধুবান্ধবদের খাওয়া-দাওয়ার ঢালা নিমন্ত্রণ। বন্ধ হয়ে গেল বাবুর্চিখানা এবং উঠে গেল ইংরেজি কায়দায় সাজানো খাবারঘরের মস্তবড়ো টেলিস্কোপিক খাবার টেবিলে ঠাসাবোনা মারসিবাইসড সাদা চাদর ও ছুরি কাঁটা চামচের ঝকঝকে বাহার আর বাবুর্চিখানার চব্যচোষ্য পরিপাটি খানা। নিজে দেখেছি তাঁকে কালীমোহন আলয়ের উত্তরপূব কোণের দিশী রান্নাঘরের বিজলী পাখাহীন বারান্দায় মাটিতে আসন পেতে প্রশান্তচিত্তে আহার সমাপন করতে। পুরানো খানা কামরার একমাত্র চিহ্নস্বরূপ টিঁকে রইল মুসলমান বয় 'ভুলু'। এইরকম কৃচ্ছ্রসাধন অনভ্যস্ত চিত্তরঞ্জনকে যে খুব বেশিরকম পীড়া দিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কোনোদিন তাঁকে অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুনি নি সেই সময়কার অনটনের জন্যে। এইরকম দৈহিক কষ্টের উপর পড়েছিল অসাধারণ কর্মভার। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের

রাজনৈতিক আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্বই পড়েছিল তাঁর ঘাড়ে। প্রায়ই মফস্বলে যেতে হত নিজেকে এবং অনেক সময় সস্ত্রীক এবং অন্য সহকর্মীদেরও পাঠাতে হত। সেই অনটনেব সময়ও তাঁর আপন তহবিল থেকে সঞ্চিত অর্থেব উপবেও প্রায়ই টান পডত এই-সব খবচা মেটাতে। অনটন পবিশ্রম দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে চিত্তবঞ্জনেব স্বাস্থ্যেব উপব অসহনীয় চাপ পড়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পডলেন।

তৃতীয ডোমর্বাও কেসেব প্রতিদ্বন্দ্বী কৌন্সুলী সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সবকাবেব সনির্বন্ধ অনুবোধে চিত্তবঞ্জন গেলেন দার্জিলিং পাহাডে বায়ু-পবিবর্তনেব উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাসে। সার্ নৃপেন্দ্রনাথ চিত্তবঞ্জনকে আপন বাড়ি 'স্টেপ এসাইড' ছেড়ে দিলেন বসবাস করবাব জন্যে এবং এমনকি দৈনিক বাজাব ও যাবতীয় খবচা যাতে চিত্তবঞ্জনেব না লাগে সেই মর্মে তাঁব বিশ্বস্ত সম্পত্তি-তত্ত্বাবধাযক ও সর্বজনপ্রিয় অনুপলাল গোস্বামী (ন্যাডাবাবু) মশায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীব প্রতি সবকাব সাহেবেব এই সৌজন্য ও বদান্যতা সত্যই প্রশংসনীয়। কয়েকদিন দার্জিলিং শহবে বেশ ভালো থেকে চিত্তবঞ্জনেব শাবীবিক অবস্থা উত্তবোত্তব খাবাপ হয়েই চলল। সপ্তাহান্তে একটু একটু জ্বব হতেই লাগল। অবশেষে ১৫ই জুনেব বাত্রিতে এল ভীষণ জ্বব এবং ১৬ই জুন বিকেলে দেহসাথে সব ক্লান্তি অপনোদন কবে তাঁব আবব্ধ কাজ অসমাপ্ত থাকতেই মৃত্যু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। দেশবন্ধুব মুক্ত আত্মা পবমাত্মাব মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল। খসে পড়ল বিক্রমপুব তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীব গৌববেব উজ্জ্বল মুকুটেব মধ্যমণিটি। ডুবে গেল ভাবতেব ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হাহাকাব উঠল দেশময়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সান্ত্বনাব বাণী লিখলেন—

এনেছিলে সাথে কবে মৃত্যুহীন প্রাণ
মবণে তাহাই তুমি কবি গেলে দান।

দেশবাসী আপামব সাধাবণ নবনাবীব কাছে অবিস্মবণীয় হয়ে বইল ১৬ই জুন, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

চিত্তবঞ্জনেব অশ্রুতপূর্ব ত্যাগ ও দেশেব স্বার্থে তাঁব আত্মবলিদান সোনার অক্ষবে লেখা হয়ে থাকবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। তাঁর আইন-ব্যবসায়ে কৃতিত্ব ও কর্মকুশলতা, ভারতেব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অজস্র অবদান,

তাঁর স্বদেশপ্রীতি, তাঁব হৃদযেব তেজস্বিতা, কাবাববণ, নিঃস্ব গবিবেব প্রতি তাঁর আন্তবিক সহানুভূতি, নাবীজাতির কল্যাণে আপন শেষ সম্বল বসত-বাড়িটুকুও দান— এই-সব কাহিনী এখন ইতিহাসেব বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। এত সমবেদনাবোধ, ন্যায়পবায়ণতা তিনি পেলেন কোথা থেকে, তাঁব জীবনে পিতা ভুবনমোহনেব ও মাতা নিস্তাবিণী দেবীব প্রভাব কতটা প্রকট হয়েছিল এবং সহধর্মিণী বাসন্তীদেবীব সাহচর্য ও সহযোগিতা তাঁব জীবনে কতটা সহায়তা কবেছে এই-সব প্রশ্নেব বিশ্লেষণ বিচাব-বিবেচনা ঐতিহাসিকবাই করবেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষযে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ কবতে পাববেন তাঁর ভক্ত সহকর্মী স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তেব বাংলায় লেখা 'দেশবন্ধু স্মৃতি' ও ইংবেজিতে লেখা 'দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন' গ্রন্থে। চিত্তবঞ্জনেব পাবিবাবিক জীবনেব কথা, তাঁব মহামানবিকতাব কাহিনী ও তাঁব বাজ-নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ কবেছেন তাঁবই জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁব 'মানুষ চিত্তবঞ্জন' গ্রন্থে।

আমি তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীব কিংবা দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জনেব জীবনেব ইতিহাস লিখতে বসি নি। আমাব এই স্মৃতিকথায় আমি শুধু বলব সেই ভুবনমোহন ও সেই নিস্তাবিণী দেবীব কথা— যাঁদেব স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন আমাব পিতামাতা। আমি শুধু বলব সেই চিত্তবঞ্জনেব কথা, যিনি ছিলেন আমাব দাদাবাবু, আমি বলব সেই বাসন্তীদেবীব কথা যিনি আমাব স্নেহময়ী বৌঠান হযে এখনো আমাদেব মধ্যে ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন। আমাব সকল শিক্ষা এবং আমাব জীবনে যদি এতটুকুও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেবে থাকি তবে সেই প্রতিষ্ঠাটুকুও সম্ভব হয়েছে এঁদেব আনুকূল্যে উপদেশে ও উৎসাহে। জীবনেব এই গোধূলি-লগ্নে দাদাবাবু ও বৌঠানেব কাছ থেকে যে স্নেহ ও অনুকম্পাব দান পেয়েছি জীবন ভবে আমাব এই স্মৃতিচয়নে তাব অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ কবে তাঁদেব কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মবণে বেখে নিজেকে পবিত্র কবে চলে যেতে চাই!

৫

চিত্তবঞ্জনেব ছিল দুইটি কন্যা ও একটি মাত্র পুত্র। বড়ো কন্যা অপর্ণা দেবীব ডাকনাম মোনা। সুসাহিত্যিক বলে তাঁব খ্যাতি আছে। আপন পিতার

কবিতা আমি পড়েছি তাতেই তাঁর ভ বানুভূতির স্পর্শ পেয়েছি। তিনি বিলেতে পঠদ্দশাতেই সেখানকার এক ডাক্তারের কন্যা ডবথীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সেই ইংরেজ-কন্যা পুত্রবধূরূপে দাশ-পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি খুব ধীর ও শান্তস্বভাবা মহিলা ছিলেন এবং আপন শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবীকে খুব সমীহ করে চলতেন। এ দেশে এসে তিনি বেশির ভাগ সময়েই বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি পড়তেন। গোড়ার দিকে প্রফুল্লরঞ্জন কলকাতায় তেমন পসার জমাতে পারেন নি। এক সময়ে তিনি বেনারস জেলা কোর্টে প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিলেন। পরে যখন পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হল তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদ (পরে যিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন), দুই ইমাম ভ্রাতা ও অন্যান্য বহু ব্যবহার-জীবীদের সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জন ও পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে যান। সেখানে তাঁর পড়তা খুলে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করে সেই হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হন। বেশ কয় বছর জজিয়তি করার পর তিনি সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে সেখানেই আবার প্র্যাকটিস শুরু করে সারা ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো মামলায় নিযুক্ত হতেন। তাঁর আইনজ্ঞান অতি গভীর ছিল এবং নিজ মক্কেলের কেসটি অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে কোনো-না-কোনো প্রাচীন নজিরের ছকের মধ্যে ফেলে জয়লাভ করতেন। দাদাবাবুকে একাধিকবার বলতে শুনেছি,—"প্রফুল্ল আমার চেয়ে ঢের বেশি আইন জানে"। আমি যখন জজ হলাম কলকাতা হাইকোর্টে তখন তিনি আমার কোর্টেও দু-একবার মামলা করতে হাজির হয়েছেন। পরে যখন সুপ্রীম কোর্টে গেলাম, তখন সেখানেও প্রফুল্লরঞ্জনকে মামলা করতে দেখেছি। অসাধারণ ছিল তার ঘটনাবিন্যাসের কায়দা ও আইনের অন্তর্নিহিত নীতির বিশ্লেষণ-ক্ষমতা। সুপ্রীম কোর্টে বিহার ল্যাণ্ড রিফরম আইনটিকে সংবিধানের বিরোধী বলে খণ্ডাবার যে একটি সওয়াল জবাব তিনি করেছিলেন, খুব কম কৌঁসুলীই সেরকম চিত্তাকর্ষকভাবে তা করতে পারত। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি ও আমার সতীর্থ জজেরা একমত হতে পারি নি কিন্তু তাঁর অসাধারণ আইনগত নৈপুণ্য দেখে আমরা জজেরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। দান-ধ্যানও ছিল তাঁর মন্দ নয়। বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি সম্প্রতি ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে মারা গেছেন। তাঁর ছিল দুটি কন্যা গৌরী (পিকো) ও উমা (মণি) ও একমাত্র পুত্র শংকর। শংকর মোটর-

দুর্ঘটনায় বিহারে মারা যান। মণির বিয়ে হয়েছিল রণজিৎ গুপ্তর সঙ্গে। যিনি পরে পশ্চিম বাংলার প্রধান সচিব হয়েছিলেন; মণিও অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। বেঁচে আছেন খালি পিকো। এঁর স্বামীর নাম সুরেন্দ্র-নাথ লাহিড়ী। তিনি আই. এম. এস. হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ফৌজী ডাক্তার হয়ে-ছিলেন। পরে সে চাকুরি ছেড়ে তিনি রেল কোম্পানির ডেপুটী চীফ মেডিক্যাল অফিসারের পদে মোতায়েন হন। সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি বড়ো বড়ো চা-বাগানের চীফ মেডিক্যাল অফিসাররূপে কাজ করেছেন। পিকোর একটি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে। বড়ো মেয়ে মিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুবিখ্যাত আইনজীবী ও প্রাক্তন ল' মেম্বার বি এল. মিটারের ছেলে ভাস্কর মিত্রের, যিনি অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত প্রধান কর্মী।

৭

এইখানে ভুবনমোহনের কন্যাদের কথা না বললে মনে তৃপ্তি পাব না। আগেই বলেছি ভুবনমোহনের ছিল পাঁচটি মেয়ে। যিনি সব চেয়ে বড়ো ছিলেন তিনিই হলেন ভুবনমোহনের প্রথম সন্তান। নাম ছিল তাঁর তরলা। বড়োরা ডাকতেন তাঁকে 'তরু' বলে এবং আমরা সব ভাইয়েরাই ডাকতাম 'দিদিমণি' বলে। দিদিমণি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও তেজস্বিনী রমণী। সকালে সন্ধ্যায় ভগবত-উপাসনা তিনি নিবিষ্টচিত্তে নিয়মিতভাবে করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি ছোটোদের সঙ্গে সর্বদাই হাসিমুখেই কথা কইতেন কিন্তু অন্যায় কাজের জন্যে তিরস্কার করতেও পরাঙ্মুখ হতেন না। দুষ্টাচার করলে দিদিমণি রাগ করবেন, অসুখী হবেন এই দুশ্চিন্তা থাকত সবাইয়ের মনে। দুর্নীতির প্রশ্রয় তিনি কখনোই দিতেন না। কারো আচরণে দুর্নীতির প্রকাশ পেলে তার সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করবারও সৎসাহস তাঁর ছিল। অসত্যকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর মনের বল। কাউরাইদের জমিদার ভক্ত ব্রাহ্ম কালী-নারায়ণ গুপ্তের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহন গুপ্তের সঙ্গে দিদিমণির বিবাহ হয়েছিল। তিনি ছিলেন সিভিল সার্জেন ডাক্তার। প্যারীবাবুকে আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তিনি বেশির ভাগ সময়ই মফস্বলে কাজের জায়গাতেই থাকতেন। আমার বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি প্যারীবাবু অত্যন্ত

চরিত্রবান ও সংযতচিত্ত মানুষ ছিলেন। জ্যাঠামশায় ও দাদাবাবুব আর্থিক সংকটেব দিনে দিদিমণি ও প্যাবীবাবু তাঁদেব অনেক সহায়তা কবেছেন। সেই দুর্দিনের ঋণ দাদাবাবু কখনো ভোলেন নি। দাদাবাবু খুবই ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা কবতেন দিদিমণিকে। প্যাবীবাবু অল্পবয়সেই মারা যেতে দিদিমণির সাজানো সংসাব একেবাবে ওলটপালট হয়ে গেল। অনেকগুলি সন্তান নিয়ে দিদিমণি অকূল সাগবে ভাসলেন। কিন্তু ভগবত ভক্তি ও বিশ্বাস তিনি কখনো হাবান নি। সংসাবেব কোনো বিপর্যয়ই তাঁকে বিধ্বস্ত কবতে পাবে নি। বড়ো মেয়ে বন্নু (মলিনা) অল্পবয়সেই মাবা যান। কোলেব ছোটো মেয়ে শনি (লীনা) প্যাবীবাবুব মৃত্যুব কিছুদিন পবেই চলে গেলেন। কিন্তু দিদিমণি অটল বইলেন এবং আপন কর্তব্যপথে বদ্ধপবিকব হয়ে এগিয়ে চললেন। সেই দুর্দিনে দিদিমণিকে আপন বক্ষেব মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন দাদাবাবু পবম স্নেহভবে এবং কর্তব্যবোধে। সংসাবেব সকল ঝড়ঝাপটা থেকে তিনি দিদিমণিকে আগলিয়ে বাখতেন। দিদিমণিব মুখেব কথা বেব হতে না হতেই তাঁব ইচ্ছা পূবণ কবতেন দাদাবাবু। এবকম ভাই জগতে বিরল। দিদিমণিব ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে নিজেব ছেলেমেয়েদেবকোনো তফাত করতে দেখি নি দাদাবাবু ও বৌঠানকে। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে নিজেদেব সন্তানদেব যদি-বা কোনো বায়না উপেক্ষা করেছেন, দিদিমণিব ছেলেমেয়েদেব এতটুকু আবদাব ও আবেদন দাদাবাবু ও বৌঠান কখনো প্রত্যাখ্যান কবেছেন বলে মনে পড়ে না। দিদিমণিব সব কটি কন্যাব বিবাহেব যাবতীয় ব্যয়ভাব বহন কবেছিলেন দাদাবাবু, এবং দিদিমণিব একমাত্র পুত্র সুধাংশুকে নিজ ব্যয়ে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টাব কবে এনেছিলেন তিনিই। সুধাংশু পাটনা হাইকোর্টে বেশ পসাব জমিয়ে শেষে ইনকাম ট্যাক্স ট্রাইবুন্যালেব জুডিসিয়াল মেম্বব হয়ে অনেক দিন সুনামের সঙ্গে কাজ করে কিছুদিন হয় অবসব নিয়ে পাটনা শহবে আপন বাড়িতেই বসবাস করছেন। দাদাবাবু মাবা যাবাব পব তাঁব শব শোভাযাত্রাব ভিড যখন দিদিমণিব রসা বোডেব বাড়িব সামনে দাঁড়াল তাঁকে ভাইয়েব শেষ দর্শন কবাবাব জন্যে তখন জনতাব মধ্যে থেকে দেখেছি দিদিমণিব আত্মনিবদ্ধ শান্তমুখশ্রী ও সংযত ব্যবহাব। বোধ হয় মনে মনে তিনি একটু প্রার্থনা করলেন এবং তাব পর হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন জনতাকে এগিয়ে যাবাব জন্যে। এতবড়ো স্থৈর্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁব পিতার কাছ থেকে।

অসাধারণ ছিল দিদিমণির ভগবানের বিধানের উপব বিশ্বাস।

দিদিমণিব বড়ো মেয়ে বন্নু (মলিনা) মারা যান ছোটো বয়সে। আমি তাঁকে দেখি নি— দেখলেও মনে নেই। আমি দেখেছি দিদিমণিব পবের পাঁচটি মেয়ে ও সুধাংশুকে। এই পাঁচটি মেয়েব মধ্যে সব চেয়ে ছোটো শনি (লীনা) প্যাবীবাবুর মৃত্যুব অল্পকাল পবেই মাবা যান। বাকি চারজনেব মধ্যে যিনি বড়ো তাঁব নাম অমিয়া— ডাকনাম টুনু। টুনুব মুখে এমন একটি বমণীয় লাবণ্য দেখেছি যা ভোলা যায় না। একটি মিষ্টি হাসি তাঁব মুখে লেগেই থাকত। তাঁব সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কালীঘাটেব কেশবচন্দ্র মুখার্জিব। কেশবচন্দ্র বহু বছব বর্মাতে ব্যাবিস্টাবী কবে যুদ্ধেব সময দেশে ফিবে এসে এখন অবসব জীবন যাপন কবছেন।

দিদিমণির তৃতীয়া কন্যাব নাম মলিনা— ডাকনাম ববুস। ববুস একটু গম্ভীব প্রকৃতিব বলে মনে হয়েছে। কি অপূর্ব গানেব গলা ছিল ববুসেব। এখনো মনে আছে আমার বিয়েতে তিনি গান কবেছিলেন। ববুসেব বিয়ে হয়েছিল অবসবপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট জজ বায়বাহাদুব যোগেন্দ্রনাথ ঘোষেব মেজো ছেলে খগেন্দ্রনাথ ঘোষেব সঙ্গে। খগেনবাবু ছিলেন বিলেতফেবত ডাক্তাব। তিনি ভবানীপুব ও কালীঘাটেই প্র্যাকটিস কবতেন। এবকম বিজ্ঞ ও হাত-যশওয়ালা ডাক্তার দেখি নি। অত্যন্ত দযালু ছিল তাঁব মন। অনেক সময দেখেছি যে বোগীব কাছ থেকে দক্ষিণা তো নেনই নি ববং তাকে নিজেব গাঁট থেকে পয়সা দিয়ে ওষুধ পর্যন্ত কিনে দিয়েছেন। আমি এবং আমাদেব পবিবাব যে খগেনবাবুব কাছে নানাবকমে ঋণী সে কথা স্বীকাব কবে মনটা হাল্কা কবে নিতে চাই। আমাদেব বাড়িব সব অসুখে চিকিৎসা কবতেন খগেনবাবু। একটি পয়সাও নিতেন না। বাড়িতে কারুব অসুখ কবলে খগেনবাবুকে একবাব খববটা দিতে পাবলেই সবাই নিশ্চিন্ত। তাব পব রোগীব ভাব থাকত খগেনবাবুব উপব সম্পূর্ণভাবে। আমাদেব আব কিছু ভাববাবই দবকার থাকত না। খগেনবাবু আমাকে নিবতিশয় স্নেহ কবতেন এবং আমাব প্র্যাকটিসে উন্নতি হচ্ছে জেনে খুশি হতেন। প্রায়ই বলতেন, "তুমি বহু দূব উঠবে— এ কথা আমি বলে গেলাম— দেখে নিও সম্বন্ধীব পো।" বাবাব সঙ্গে ছিল তাব নাতজামাই সম্পর্ক এবং সেই সূত্রেই এই সম্বোধন। যখন আমি কিছু কিছু টাকা বোজগাব কবতে আবম্ভ কবেছি তখন একদিন খগেনবাবুকে বললাম, "খগেনবাবু, এখন তো আমি পাবি

আপনাব ফিস দিতে— কি বলেন ?" বেশ একটু হেসে বললেন, "পার তো দিও, তোমাব কাছ থেকে নিতে আপত্তি নেই।" এব পব আমাব, কি আমাব স্ত্রীব, কি আমাব ছেলেমেয়েদেব অসুখে খগেনবাবুকে সাধ্যমত ভিজিট দিয়েছি, কিন্তু আমাব সচ্ছল অবস্থাব সময়ও খগেনবাবু আমাব বাবা-মায়েব অসুখে কখনো ফিস নেন নি। হেসে বলতেন, "ওঁদেব জন্যে তো তুমি দায়ী নও, তোমাব কাছ থেকে ওঁদেব জন্যে টাকা কেন নেব।" আমাব বাবা-মাকে খগেনবাবু খুবই শ্রদ্ধা কবতেন। তবে বাবা সম্পর্কে তাঁর দাদাশ্বশুব হওয়ায় তাঁব সঙ্গে খগেনবাবুব বসিকতাও চলত বেশ। বাবা যখন খগেনবাবুব প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে মুখ তুলতেন অমনি খগেনবাবু বুঝতেন যে কোনো একটা ওষুধ কিংবা তাব ডোজ সম্বন্ধে বাবার একটু খটকা বা ভয় হয়েছে। আব যাবে কোথায়। দড়াম কবে বলতেন, "কর্পোবেশনেব চাকবি ছেড়ে এইবাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব একটা বই আব এক বাক্স ওষুধ কিনে কলে বেব হও গিয়ে।" একবাব আমাব মেজো বোন সুনীতি (গুগু) যিনি তখন ববিশালে তাঁব স্বামীব কর্মস্থলে বাস কবছিলেন তাঁব খুব অসুখ কবেছিল। আমি সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিবে বাবাব মুখেব কালিমা দেখেই বুঝতে পেবেছিলাম যে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। জিজ্ঞাসা কবায় একখানা টেলিগ্রাম আমাব হাতে দিলেন। টেলিগ্রামটা পড়ে আমি বললাম, "খগেনবাবুকে বলেছ ?" বাবা বললেন, "খগেনকে তাব সব কাজকম ফেলে ববিশালে যেতে কি কবে বলি, কি ভাববে।" আমি তখনই গেলাম খগেনবাবুব বসা'বোডেব বাড়িতে। সব কথা শুনে তক্ষুনি একটা ফর্দ কবে দিলেন— "এই-সব ওষুধ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি কিনে এখনই প্যাক কবে দাও— আর ঐ সম্বন্ধীকে বোলো আজই বাত্রে আমাব সঙ্গে ববিশাল যেতে হবে। আমি ততক্ষণ এখানকাব বোগীদেব একটা-কিছু ব্যবস্থা কবে বাখছি।" ফিবে এসে বাবাকে সে খববটা দিতে বাবাব মুখে যে কী অনির্বচনীয আনন্দেব ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম তা বর্ণনা কবা যায় না। সমস্ত জিনিসপত্র নিযে বাবা ও খগেনবাবু ববিশালে চলে গেলেন। ঠিক সময়ে চিকিৎসা হওয়ায় আমাব বোন গুগু সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। খগেনবাবু সেবাবে ববিশালে তিন দিন ছিলেন কলকাতাব সব কাজ ফেলে। কী-ই বা দিতে পেবেছিলাম তাঁকে। সে ঋণ তো টাকায় শোধ হয় না। খগেনবাবু অকালে কি এক বিজাতীয বোগে মারা গেলেন।

আমি তখন ছুটিতে বাইরে ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কোনো সেবা আমি করতে পারি নি। তাঁর একমাত্র ছেলে অমলেন্দু (খোকা) কলকাতাতেই আছেন।

দিদিমণির সেজো মেয়ে অরুণা (বিরনু) বাইরে থেকে দেখতে একটু যেন গম্ভীর কিন্তু অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর রঙ্গরসের অন্ত ছিল না। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র মিত্রের। তিনি আরাতে প্র্যাকটিস করতেন বলে তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ আমার জমে নি। তিনি কয়েক বছর আগে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছোটো মেয়ে সাহানার (ঝুনু) নাম বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে সবাই জানে। কি গানের গলা! যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উঠানে ১১ই মাঘের সান্ধ্য ব্রহ্মোপাসনার সময়ে সমবেত সহস্রাধিক জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝুনু একক সংগীত করতেন তখন ঝুনুর মধুর কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত ব্রহ্ম-সংগীতের অপূর্ব মূর্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে একটি শান্ত শুদ্ধ স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করত শ্রোতাদের অন্তরের মধ্যে। ঝুনু সুসাহিত্যিকও বটে। তাঁর লেখা কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী। এক্ষণে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর স্মৃতিকথা লিখছেন। পড়ে আনন্দ পাই। তাঁর স্বামী বিজয় বসুও ডাক্তার কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। দিদিমণির চারটি কন্যা যাঁরা জীবিত রয়েছেন তাঁরা সবাই এখন পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আছেন। তাঁদের সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হবে কি না ভবিতব্যই জানেন। রবুস ও ঝুনুর গান এখনো কানে বাজে। দিদিমণির ছেলে সুধাংশু ও তাঁর ছোটো দুই মেয়ে বিরনু (অরুণা) ও ঝুনুর (সাহানা) সঙ্গে আমার অতি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনে তাঁদের প্রভাব যে কত সুগভীর ছিল তা পরে বলব।

ভুবনমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা অমলা দেবীর নাম বাংলাদেশের শিক্ষিত-সমাজে অজানা নয়। আমরা এঁকে ডাকতাম 'বড়দিদি' বলে। আমরা বড়দিদিকে ভয়ও করতাম ভালোও বাসতাম। কড়া শাসন ছিল বড়দিদির। কোনো অপকর্ম চোখে পড়লে অমনি শাস্তি দিতেন। কিন্তু মজা ছিল এই যে, তিনি মনে করতেন যে তিনি ভালোবাসেন বলেই তিনি শাস্তি দেবার অধিকারী। যদি অন্য কেউ তাঁর পেটোয়া কোনো ছেলেমেয়েদের শাসন করতেন বড়দিদির সেটা মোটেই পছন্দ হত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত

করে বলতেন, "শাসন কবা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।" বড়দিদি খুব সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশও দেখেছি। তাঁর রচিত দুইখানি নাটক তিনি আমাকে পডতে দিয়েছিলেন। প্রথমটির নাম ছিল 'ভিখাবিণী'— সেটি বোধ হয কলকাতাব কোনো এক থিয়েটাবে মঞ্চস্থ কবা হয়েছিল। শেষেবটির নাম দিয়েছিলেন 'শক্তি'। এটি ছাপা হয়েছিল কি না স্মবণ নেই। শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়েব পবস্পববিবোধী হিংসাত্মক মনোভাবের মধ্যেও একটি অপূর্ব সুন্দব প্রীতিব কাহিনী ছিল এই নাটকেব বিষয়বস্তু। এ ছাডা কত গান বড়দিদি নিজেই বচনা কবে সুব দিয়েছেন। বডদিদিব গানেব তুলনা নেই। আজকাল দেখি আমাদেব বেশ ভালো ভালো নামকবা গাইয়েবা— তিনি পুরুষই হোন কি মেয়েই হোন— মুখের সামনে একটা মাইক না হলে গাইতেই পাবেন না এবং গান কববার সময় খেই হাবিয়ে যাবাব ভয়ে গানেব বই কি খাতা হাতে ধবে থাকবেনই থাকবেন। এতে যে গানেব বস কতটা কমে যায তা তাঁবা হযতো উপলব্ধিই কবেন না। তা ছাডা গানটা গাইতে গাইতেই মুখস্থ হযে যায় এবং মন থেকে যখন কথাগুলি বেব হয়ে আসে তখন তাব মধ্যে যে দবদেব স্পর্শটুকু থাকে বই হাতে কবে সাবাক্ষণই সেই দিকে তাকিয়ে গান কবলে সে দবদ তো থাকেই না, গানেব বসভঙ্গ হতেই হয়। বডদিদিব আমলে মাইকেব বেওয়াজ ছিল না এবং তাঁব যা গলা ছিল তাতে মাইকেব কোনো প্রযোজনই হত না। বিশাল কংগ্রেস প্যাণ্ডেলেব এক প্রান্ত থেকে সুদূব প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেত বড়দিদিব গলায় 'বন্দেমাতবম্' গানখানি। সব গানেবই কথাগুলি শোনা যেত স্পষ্ট এবং তা যেন তাঁব অন্তবেব উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেবিয়ে আসত। বেশ অনুভব কবা যেত যে গানেব ভাবার্থটি তাঁব হৃদয়ে প্রবেশ কবেছে। সে গানের তুলনা নেই। আমি যত গান শুনেছি তাব মধ্যে দিদিমণিব (তবলা) মেয়ে ঝুনুব (সাহানা) গান বড়দিদিব গানের কাছাকাছি এসে পডেছিল গলাব সুমিষ্ট লালিত্য, উচ্চাবণের সুস্পষ্টতায় ও অন্তবেব অনুভূতিতে। জোড়াসাঁকোব ঠাকুব-পরিবাবেব সঙ্গে আমাদের দাশ-পবিবাবেব সদ্ভাব ও যাতাযাত ছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়দিদি ও ঝুনুকে অত্যন্ত স্নেহ কবতেন। বডদিদিব কথা বথীন্দ্রনাথেব লেখা 'অন দি এজেস অব টাইম্' গ্রন্থে বিশেষ কবে উল্লিখিত আছে। যে সময় আমাদেব দেশে গ্রামোফোন প্রথম চালু হল তখন রেকর্ডে গান দিত যত

থিয়েটারের অভিনেত্রী এবং বাঈজীরা। ভদ্রঘরের ছেলের মধ্যে স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালই বোধ হয় প্রথম গ্রামোফোনে গান দেন এ দেশে। ভদ্র-পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বড়দিদিই (অমলা দাশ) প্রথম গান রেকর্ড করান। সে কি গান—'একি আকুলতা ভুবনে', 'ওহে জীবনবল্লভ', 'চির সখা হে', 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর', এবং আরো কত কি। গানের মতো গানই বটে। সে সুরগুলি আজও যেন কানে বাজে। আমি যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়ি তখন ছুটিতে বাড়ি এলেই বড়দিদিকে শোনাতে হত তাঁর রবিকাকার নূতন গানগুলি। বড়দিদির বিয়ের কথা হয়েছিল শুনেছি কিন্তু অভিভাবকদের আপত্তি হওয়ায় সে বিয়ে হয় নি। বড়দিদি চিরকুমারীই রয়ে গেলেন। শেষ বয়সে বড়দিদি দাদাবাবুর পুরুলিয়ার বাড়িতে থাকতেন এবং সেখানে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গরিবদুঃখীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই পুণ্য কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন আমাদের প্রমদাদিদি যিনি ছিলেন মধ্যের বাড়ির কাশীশ্বর দাশের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কন্যা শ্যামাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। বলাই বাহুল্য যে, বড়দিদির এই লোকহিতকর কর্মে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হত এবং বহুলাংশেই তা সরবরাহ করতেন দাদাবাবু হাসিমুখে ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে। বড়দিদির এতটুকু ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকত না দাদাবাবুর দাক্ষিণ্যে। অনাথ আশ্রমের একটি মেয়ে—নাম ছিল তার নন্দরানী—তাকে বড়দিদি সন্তানের মতো পালন করেছিলেন। সেই নন্দরানীর বিয়েতে দাদাবাবুই সব ব্যয়ভার বহন করেছিলেন রুগ্না ভগিনীর ইচ্ছার চরিতার্থতাকল্পে। সেই সময়ই বড়দিদি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে তাঁকে যখন কলকাতায় আনা হয়েছিল তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে যে অনেক সময় বসতাম তা বেশ মনে আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বড়দিদি পরলোকগমন করেন।

ন'দিদি প্রমীলা ছিলেন ভুবনমোহনের তৃতীয়া কন্যা। শুনেছি ছোটো বয়সে ন'দিদি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আলিপুরের অতি বিচক্ষণ উকিল ও দাদাবাবুর একজন পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু শরৎচন্দ্র সেন যাঁর কথা আগেই বলেছি। শরৎবাবুর মতো এমন বন্ধুবৎসল, পরোপকারী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। ভাইঝিদের মধ্যে এই ন'দিদির সঙ্গেই বাবার বেশি সম্প্রীতি ছিল। ঝগড়াও হত হামেশাই। সে-সব মজার গল্প বলব

পরে। ন'দিদিব নিজের সন্তান হয় নি। একটি কুড়ানো ছেলে— তার ভালো নাম কি ছিল শুনি নি বা মনে নেই, কিন্তু তাকে ডাকত সকলে 'ভগা' বলে— তাকে পেলেছিলেন ন'দিদি। ভগা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষ মানল না। সে খেলত যত বাস্তার ছেলেদেব সঙ্গে এবং তাব চালচলনে কোনো উন্নতিই দেখা যায় নি। ন'দিদি মাবা যাবাব পবে না আগে ভগা কোথায় যে অন্তর্ধান করল কেউ জানে না।

দাদাবাবুব চতুর্থ সহোদবা ছিলেন আমাদেব উর্মিলা দেবী। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আয়কবেব তদানীন্তন অ্যাসেসাব অনন্তনাবায়ণ সেন মশায়েব। উর্মিলা দেবী, যাঁকে আমবা ছটুকীদিদি বলেই ডাকতাম, বেশ লেখাপডা-জানা বিদুষী মহিলা ছিলেন। খুবই সহজভাবে হক কথা শুনিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা কবতেন না। তাঁব কাছে ঢাকঢাক গুবগুব কিছু ছিল না। তিনি দাদাবাবুব সঙ্গে দেশসেবায় ব্রতী হযেছিলেন। 'নাবী কর্মমন্দিব' প্রতিষ্ঠানটি ছটুকীদিদিই কবেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেব কল্যাণ-কাজ দাদাবাবুব বাজনৈতিক আন্দোলনের পবিপূবক হয়েছিল। বাজরোষ এ জন্যে এই প্রতিষ্ঠানেব এবং এই প্রতিষ্ঠানেব প্রাণস্বরূপিনী উর্মিলা দেবীব উপবও পডেছিল এবং আখেবে তাঁকেও জেলে যেতে হয়েছিল। আগেই বলেছি যে তিনি বেশ স্পষ্ট বক্তা ছিলেন এবং সেই কাবণেই বাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাতব্ববদেব সঙ্গে সুব মিলিয়ে চলা তাঁব পক্ষে সম্ভব হত না; ক্রমে তিনি বাজনীতিব সেই পঙ্কিল আবর্তন থেকে সবে দাঁভিয়েছিলেন। পাবিবাবিক দিক থেকে তিনি আমাকে এবং আমাব সহধর্মিণীকে খুবই স্নেহ কবতেন। তিনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসেব ১০ই তাবিখে দেহরক্ষা কবেন। তাঁব একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাবাযণ এক্ষণে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক বলে খ্যাত হয়েছেন।

ছোড়দিদি মুবলাব (বেবুলা) মতো ভালো মানুষ জগতে বিবল। তাঁব সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বৌঠান বাসন্তীদেবীব পিসতুতো ভাই বিবাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের। বিবাজবাবু ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্যাবিস্টাব ও সুলেখক বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব তৃতীয় ভ্রাতা। বিবাজবাবু বিলেত থেকে বয়ন-শিল্প শিখে ফিবে এসে বঙ্গলক্ষ্মী মিলে কাজ কবতেন। পবে তিনি নিজেই কয়লাব খনি ও নানাবিধ ব্যবসা খুলে প্রচুব অর্থোপার্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই ব্যবসায় টি কল না এবং বিরাজবাবুকে দেনাব দায়ে বিব্রত হতে হয়েছিল। কিন্তু এই ভাগ্যবিপর্যয়ে আমাদের বেবুলাদিদির মুখে

এতটুকুও ভাববৈষম্য দেখি নি। মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকুব মধ্যে একবিন্দুও কালিমাপাত হয় নি। যখন বেবুলা-দিদি ঐশ্বর্যেব উচ্চশিখরে আসীন, যখন তাঁব বাড়িতে মান্যগণ্য লোকেব সমাগমেব অন্ত ছিল না তখনো ছোড়দিদি তাঁব গবিব ভাই আমাদেব কথা ভোলেন নি। প্রতি বৎসব তাঁব বাড়িতে খুব ঘটা কবে ভাইফোঁটা হত। কলকাতায় থাকলে সতীশদাদা ও দাদাবাবু তাঁব সব ভাইয়েবা আসতেন বেবুলাদিদিব আমন্ত্রণে ফোঁটা নিতে। আমাব ও আমাব ভাইদেবও ডাক পড়ত এই অনুষ্ঠানে। সরু বোনা পাটি বিছিয়ে এক লাইনে সব ভাইদেব বসিযে বেবুলাদিদি খুব নিষ্ঠাব সঙ্গে আমাদেব কপালে চন্দন, কাজল ও ঘিয়েব ফোঁটা দিয়ে আমাদেব যমদুয়াবে কাঁটা দিতেন যেমন কবে যমুনা নাকি যমকে দিতেন ফোঁটা। তাব পব ঠাসা বোনা শান্তিপুবেব কালোপেড়ে কোঁচানো ধুতি-চাদব ও ভুবিভোজন। একবাব আমাব বড়ো ছেলে সুবঞ্জনকেও বসিয়ে বেবুলাদিদি তাঁব মেয়ে মৈত্রেয়ী (বুড়ী)কে দিয়ে ফোঁটা দেবাব ব্যবস্থা কবেছিলেন। এই-সব আদব-আপ্যায়ন জীবনে ভোলাব নয়। আমাব বাবা-মাকে ও আমাদেব ভাইবোনদেব বেবুলাদিদি ভালোবাসতেন আপনজনেব মতো। বেবলাদিদিব এক ছেলে বাহুল ব্যবসায় কবতেন। তাঁব মেয়ে মৈত্রেয়ীব বিয়ে হযেছে দীনু ব্যানার্জিব সঙ্গে। বিবাজবাবু, বেবুলাদিদি ও রাহুল এখন ইহজগতে নেই কিন্তু বেবুলাদিদিব স্মৃতিব সৌবভ আজিও আমাব চিত্তে ভবে বয়েছে। মৈত্রেয়ী (বুড়ী) এখন পণ্ডিচেবীতে শ্রীঅববিন্দ আশ্রমে বাস কবছেন।

৮

রমানাথেব পুত্র পশ্চিমেব বাড়িব বতনকৃষ্ণ দাশেব দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন গোপীমোহন। ইনি হলেন আমার পিতামহ। আমাব পিতা বাখালচন্দ্র গোপীমোহনেব একমাত্র ছেলে, যিনি গোপীমোহনের মৃত্যুকালে ও তাব পর বহুদিন বেঁচে ছিলেন। এঁদেব কথা পবে একটু খুঁটিয়ে বলাব প্রয়োজন হবে। আপাতত এইখানে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে আমাব পিতামহ গোপীমোহনেব পেশা ছিল মুন্সিয়ানা। তিনি একসময়ে বর্ধমানেব মহারাজাধিবাজেব জমিদাবী সেবেস্তায় সামান্য মুন্সিয়ানী চাকবি কবতেন। পবে চক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি কাজকর্ম ছেড়ে তেলিরবাগেই বাস করে সেইখানেই দেহবক্ষা করেন। আমার বাবা রাখালচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ

থেকে দাদাবাবুর সঙ্গে বি. এ. পাস করে তাঁর জ্যেঠতুতো-ভাই ভুবনমোহনের আর্টিকেল ক্লার্ক হয়ে অ্যাটর্নিগিরি পডতে তাঁব আফিসেই বেব হতেন। ভুবনমোহন দেউলিয়া হওয়ায় যখন তাঁর আফিস উঠে গেল তখন বাবাও অ্যাটর্নি পড়া ছেডে দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকবি নেন এবং সেই চাকরিতে উন্নতি কবে লাইসেন্স অফিসাব হয়ে অবসর গ্রহণ কবেন।

আমবা এখন তিন ভাই ও তিন বোন। আমি বি এ. পাস কবে দাদাবাবুব অনুকম্পায় বিলেত গিয়ে ব্যাবিস্টাবী পরীক্ষায পাস কবে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস আবম্ভ কবি। বছব তেইশ প্র্যাকটিস কববার পব আমি কলকাতায় জজ হই এবং পবে এক বছব পাঞ্জাবেব প্রধান বিচাবপতির কাজ কবে সুপ্রীম কোর্টেব জজ হই। সেখানে চাব বছব ভাবতেব প্রধান বিচাবপতিব কাজ কবে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অবসব নিয়ে ছয় বছর রবীন্দ্রনাথেব বিশ্বভাবতীব উপাচার্যরূপে কাজ কবে এখন অবসর জীবন-যাপন করছি কালিম্পঙে এবং এই স্মৃতিচয়ন কবছি। আমার দুটি ছেলে ও একটি কন্যা। বডো ছেলে সুবঞ্জন আমাদেব বাযুসেনায় গ্রুপ ক্যাপটেন ও চীফ টেস্ট পাইলট বলে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন কবেছেন। এখন বাযুসেনা তাঁকে বাঙ্গালোবে যেখানে জেট প্লেন সব তৈবি হচ্ছে সেখানে চীফ টেস্ট পাইলটরূপে কাজ কবতে পাঠিয়েছে। ছোটো ছেলে সুহৃদবঞ্জন বি. এ. পাস করে বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টাবী পডতে এবং সেইখানে পাঠ্যাবস্থাতেই বিখ্যাত অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানিতে কাজ পেয়ে লণ্ডনে তাদেব হেড আফিসে এক বছর শিক্ষানবিসী কবে তাদেব কলকাতাব আফিসে একজন সিনিয়ব একজিকিউটিভরূপে কাজ কবেছেন। সম্প্রতি মোটর দুর্ঘটনায় তিনি ও তাঁব বডো মেয়েটি একযোগেই মাবা গেছেন। আমাব একমাত্র মেয়ে অঞ্জনা (কাজল)এব সঙ্গে বিয়ে হয়েছে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমাব সেন মশায়েব কনিষ্ঠ পুত্র অশোককুমাব সেনেব। অশোক ব্যাবিস্টাবী ব্যবসায়ে বিশেষ সুনাম অর্জন কবে বাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের লোকসভাব সভ্য হয়ে বছব নয়েক আইনমন্ত্রী থেকে এখন আবাব ফিবে এসেছেন ব্যাবিস্টাবী ব্যবসায়ে। আমাব কন্যা অঞ্জনা চাব ছেলে-মেয়েব মা হয়েও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েব বি. এ. এবং ল' পবীক্ষায় কৃতিত্বেব সঙ্গে পাস করেছেন নিজের অধ্যবসায়গুণে। আমার মেজো ভাই নিশীথবঞ্জন (নস্তু) বি. এস্-সি. পাস করে বেনাবস বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর দুয়েক পড়ে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতা কর্পোরেশনে স্টুডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঢুকে ক্রমান্বয়ে অ্যাসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ওঠেন। সেখানে আপন কৃতিত্বে ও আপন সততা ও চরিত্র বলে উন্নতি লাভ করে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন এবং তার পরই তিনি কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চলে যান। সেখানে তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খুব সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁর কাজের মেয়াদ তাঁরা তিন তিন বার বাড়িযে দিয়েছিলেন এবং যখন ট্রাস্টীরা তাঁকে চতুর্থ বছরের জন্যে থাকতে অনুরোধ করেন তখন তিনি তাঁদের সে অনুরোধ স্বাস্থ্যের জন্যে রক্ষা করতে না পেরে কাজে ইস্তফা দেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বভারতীর অবৈতনিক চীফ ইঞ্জিনিয়াররূপে গুরু-দক্ষিণা দিচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্স্টিটিউটের ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা। তিনি বিয়ে করেছেন আমার সহধর্মিণীর সহোদর বোন বেণুকাকে। তাঁদের একটি মাত্র কন্যা রঞ্জনা। আমার ছোটো ভাই প্রদোষরঞ্জন (বুধা) কলকাতায় বি. এস্-সি. পাস করে বছর খানেক ল' কলেজে পড়ে বিলেতে যান ব্যারিস্টারী পড়তে। সেখান থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে ফিরে এসে তিনি কলকাতাতেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। মাঝে তিনি ছোটো আদালতে বার তিনেক অস্থায়ী জজীয়তি করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুন্যালের অ্যাসেসর হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে দুই টার্ম অর্থাৎ চার বছর (১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত) কাজ করে এখন আবার ব্যারিস্টারী করছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে প্রসাদরঞ্জন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর্কিটেকচার কোর্সের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভালোভাবেই পড়াশুনা করছেন।

আমার বড়ো বোন সুমতি (খুকী)র জন্ম হয় মামাবাড়ি হাসারা গ্রামে ১৮৯৬ সালে। তিনি আমার চেয়ে প্রায় দু বছরের ছোটো। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মধ্যপাড়া গ্রামের ৺রামাচরণ গুপ্তের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রমোহন গুপ্তের সঙ্গে। বিয়ের সময় খুকীর বয়স ছিল নয় থেকে দশের মধ্যে। উপেন-বাবু এম. বি. ডাক্তারী পাস করে বিহার সরকারের অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জেনের কাজে ঢোকেন। তিনি বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি. ও ডি. টি. এম. পাস করে পাটনা মেডিক্যাল কলেজের বীজাণু-বিষয়ক অধ্যাপক (প্রফেসর) হন। এক্ষণে অবসর নিয়ে তিনি পাটনাতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন প্রভৃত

সুনামের সঙ্গে। এঁদের তিনটি ছেলেই সুযোগ্য। বড়োটি অরুণ এফ. আর. সি. এস. পাস করে হাড়ের সার্জেন ও কানপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর। দ্বিতীয় ছেলে অশোক আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করছেন। ছোটো ছেলে অলোক পাটনায় এবং পরে বিলেতে ডাক্তারী ডিগ্রী এবং পরে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে পাটনাতেই ডাক্তারী করছেন।

আমার মেজো বোন সুনীতি (গুগু)র জন্ম হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরের টঙ্গিবাড়ি গ্রামের ৺ভুবনমোহন গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমচন্দ্র গুপ্তের। হেমবাবু এম. এ. পাস করে সরকারি লোকাল অডিটার হয়ে কাজকর্ম করে অবসর নিয়ে পুণায় তাঁদের বড়ো কন্যার কাছেই ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে ও চরিত্রের বিশুদ্ধতায় ও মাধুর্যে হেমবাবু আত্মীয় অনাত্মীয় সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। তিনি এই ক'মাস হল পুণাতেই পরলোকগমন করেছেন। তাঁদের একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ বিলেতে কয়লার খনিতে সহ-ম্যানেজারী করছেন।

আমার ছোটো বোন অন্নপূর্ণা (বুড়ী)র জন্ম হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। তাঁর বিয়ে হয় চট্টগ্রামের পড়ইকোড়া গ্রামের ৺যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে। অবিনাশ বিভাব সার্ভে জানতেন এবং কলকাতা পোর্ট কমিশনে বেশ কয়েক বছর উচ্চপদে কাজ করে সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজেই ব্যবসায় করতেন। অকালেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং বুড়ীর অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতাতেই পরলোকগমন করেন। তাঁদের একমাত্র ছেলে দেবব্রত (গৌতম) বি. এ., এল. এল. বি. পাস করে বিখ্যাত বিড়লা প্রতিষ্ঠান কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড কটন মিলস কোম্পানিতে বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে স্বভাবগুণে সকলের শুভেচ্ছা লাভে সমর্থ হয়েছেন।

৯

পশ্চিমের বাড়ির রতনকৃষ্ণ দাশের তৃতীয় পুত্র ছিলেন কেদারেশ্বর। তিনি ওকালতি পাস করে মুন্সেফী চাকরি নিয়েছিলেন এবং ক্ষমতাগুণে কার্যে উন্নতি লাভ করে সব-জজ হয়েছিলেন। সে আমলে সব-জজ হওয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না এবং তখনকার দিনে সব-জজেদের খ্যাতি-

প্রতিপত্তি ছিল বিস্তর। কৃতিত্বেব সঙ্গে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে তিনি অবসর নেবাব পবে পবলোকগমন কবেন। কার্যব্যপদেশে তাঁকে নানা জেলায় ঘুবতে হয়েছিল। তাঁবই বাসায় থেকে আমাব পিতা ঢাকায় ও পরে হুগলীতে লেখাপডা কবতেন। এই ঠাকুর্দাকে আমার মনে নেই কিন্তু এঁব সহধর্মিণীকে আমাব বেশ স্মবণ আছে। আমাদেব এই ঠাকুমা ছিলেন বেশ ফবসা এবং মস্ত সংসাবেব উপযুক্ত গৃহিণীই তিনি ছিলেন। যখন এঁব পুত্রবধূবা সংসাবেব ভাব নিতে সমর্থ হলেন তখন এই ঠাকুমা মন দিয়েছিলেন নানা টোট্‌কা ওষুধ তৈবি কবে বিলিয়ে দেবাব কাজে। তিনটি জিনিসেব কথা আমাব এখনো মনে আছে। প্রথমটি ছিল গাধাব দুধেব চাল। গাধাব দুধেব মধ্যে চালগুলি ভিজিয়ে বাখবাব পব যখন চালগুলি সব দুধটা শুষে নিত তখন সেই চালগুলিকে ঠাকুমা আমাদেব কলকাতায় ও মফস্বলে যেখানে যত জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছে সবাইয়েব বাডিতে কৌটায় ভবে পাঠিয়ে দিতেন। এই চাল নাকি বসন্ত বোগেব প্রকৃষ্ট নিবামক। ঠাকুমাব অনুশাসনে শীত শেষে গবম পডতে আবম্ভ কবলেই নিত্য সকালেই আমাদেব তিন-চাবটি চাল মুখে দিয়ে জল খেতে হত। অন্যথা কববাব যো ছিল না। আব-একটি জিনিস যা ঠাকুমা পাঠাতেন সেটা হল বিশুদ্ধ কবিবাজী মতে তৈবি পাকেব বডি। বাডিতে ভূবিভোজন হলেই বাত্রে শোবার আগে আস্ত কি অর্ধেক বডি সেবন ছিল আমাদেব অবশ্যকর্তব্য। খেতেই হত। তবে খেয়ে দেখেছি মন্দ নয়— বেশ নোন্‌তা ও কষা আস্বাদ। আব আসত বডো বডো টিনে ভবা দাঁতের মাজন প্রায় সাবা বছবেব মতো। খুব মিহি কবে বাটা খডিব গুঁড়াব সঙ্গে পিপাবমেণ্ট ও সুপাবিপোডা ছাই এবং আবো কত-কি মালমসলা দেওযা দাঁত মাজবাব পাউডাব। দাঁতে লাগাতেই বেশ সিবসিব কবে উঠত পিপাবমেণ্টেব ঝাঁঝ। বৃদ্ধা খুব যত্নেব সঙ্গে এই-সব জিনিস তৈবি করতেন এবং বিলিয়ে দিতেন। এই ঠাকুমা মাবা যান কামবাঙাতলাব আনন্দ চ্যাটার্জি লেনেব বাডিতে। মনে আছে তাঁব মৃতদেহ বহনেব জন্যে আমিও কাঁধ দিয়েছিলাম। এই বোধ হয় আমাব প্রথম শব পবিবহন।

কেদাবেশ্ববেব ছিল চাব ছেলে— তডিত, ললিত, অবনী ও সুরেন্দ্র। কলকাতায় এঁরা সব ভাই কটি একসঙ্গে থাকতেন প্রথমে জেলেপাড়ায়। সে রাস্তাটার এখন নাম হয়েছে গিরীশ মুখার্জি বোড। সে বাড়িটা

ছিল তিন মহল্লা। বাস্তার উপবেই প্রথম মহল্লায় থাকতেন জ্যাঠামশায় তড়িতমোহন। একটা উঠান পেবিয়ে ছিল দ্বিতীয় মহল্লা— সেখানে বোধ হয় থাকতেন ললিত জ্যাঠামশায়েব ছেলেমেয়েবা। তাব পব আর-একটা উঠান পেবিয়ে ছিল তৃতীয় মহল্লা। সেখানে থাকতেন অবু ও সুরু কাকা। সামনেব বড়ো বাস্তাব ওপাবেই ছিল একটা মস্তবড়ো পুকুব। তাব পাড়ে উঁচু বাঁশেব মাচায় ঝুলত জেলেদেব বড়ো বড়ো মাছ ধবাব জাল বোদে শুকোবার জন্যে। অনেকদিন এখানে থাকাব পব এঁবা উঠে যান ভবানীপুবে যদুবাবুব (লোকে যাকে জগুবাবুব বলে থাকে) বাজাবেব উত্তবে কামবাঙাতলাব আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে অনেকখানি জমিওয়ালা ভাড়াটে বাড়িতে। আমি আব তড়িত জ্যাঠামশায়েব মেজো ছেলে সুবোধ ঘুড়ি উড়িয়েছি বিস্তব ঐ বাড়িতে। ঐ বাড়িতেই মাবা যান ঐ বাড়িব ঠাকুমা।

কেদাবেশ্ববেব বড়ো ছেলে তড়িতমোহন ওকালতি পাস কবে অল্প কিছুদিন প্র্যাকটিস কবেছিলেন। খুব মুখচোবা মানুষ ছিলেন বলে সে জ্যাঠামশায় হাইকোর্টেব ট্রানস্লেটারেব চাকুবি নেন। তাঁব তিন ছেলে —সুধীব, সুবোধ ও কৃষ্ণ। সুধীবদাদা কি একটা আফিসে স্টেনোগ্রাফাবের কাজ করতেন। খুব অল্প বয়সেই মাবা যান একটি মাত্র ছেলে অনিলকে বেখে। সুবোধ ছিলেন আমাবই বয়সী। ঝাড়গ্রামে অনেকটা জমি কিনে তিনি সেখানে চাষবাস কবতেন। সুবোধেব সঙ্গে আমাব খুবই সদ্ভাব ছিল। ছোটো ছেলে কৃষ্ণবঞ্জন যাঁকে 'কেশা' বলা হত তিনি হাইকোর্টেব আফিসে কাজ কবতেন। ইনিও অল্প বয়সেই মাবা যান। এঁদেব মা, এ-বাড়িব বড়ো জ্যেঠিমাকে আমাব বেশ মনে আছে। তিনি খুব হাসিখুশি, স্নেহশীলা মহিলা ছিলেন। মাকে খুব পছন্দ কবতেন।

কেদাবেশ্ববেব দ্বিতীয় পুত্র ললিতমোহন ওকালতি পাস কবে বাপেবই মতো মুন্সেফী চাকবিতে ঢুকে সব-জজ হয়ে অবসব নেন। এঁব সহধর্মিণী, আমাদেব মেজো জ্যেঠিমা ছিলেন তখনকাব দিনেব আযকব কমিশনাব বমেশচন্দ্র সেনেব ভগিনী। এই জ্যেঠিমা বাবাকে খুব স্নেহ ও যত্ন কবতেন বাবা যখন হুগলীতে তাঁদের বাড়ি থাকতেন সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। ললিত জ্যাঠামশায়েব তিন ছেলেব মধ্যে বড়ো ছিলেন নলিনীবঞ্জন। তিনি মধ্যের বাড়ির প্রফুল্লবঞ্জন এবং আমার ছোটো পিসতুতো ভাই টোনাদাদার সমবয়সী ছিলেন। নলিনদাদার বিয়েব কথা আমার অল্প

অল্প মনে আছে। উত্তরপূব কলকাতায়, মির্জাপুর স্ট্রীট না কোথায় যেন, এঁর বিয়ে হয়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তবে বিয়ের পরের দিন আমরা যে তাঁর বউকে এনেছিলাম লোয়ার সার্কুলার রোডের জোড়া গির্জের সামনে দিয়ে তা বেশ মনে আছে। আমাদের এই বৌঠানের গায়ের রঙ বলতে গেলে একরকম শ্যামবর্ণই ছিল কিন্তু ভারি সুন্দর একটি হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত এবং তাইতে তাঁর মুখে একটি অপূর্ব লাবণ্য উছলে উঠত। পরে যখন ওঁরা উঠে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে, এখন যেখানে সাদার্ন অ্যাভেনিউ হয়েছে, সেখানে নিজ বাসায় গেলেন তখন সময় পেলে মাঝে মাঝে গিয়ে মেজো জ্যাঠামশায়, মেজো জ্যেঠিমা, এই বৌঠান ও অন্য ভাইবোনেদের দেখে আসতাম। খুব গম্ভীর মুখ করে বৌঠানকে বলতাম, 'দাদাকে বিয়ে দিয়ে তোমায় নিয়ে এলাম তো।' মর্মার্থ হচ্ছে যে সেই সুবাদে আমাকে একটু বেশি খাতির করতে হবে। বৌঠান হাসিমুখে বলতেন, 'ইস্।' সেই হাসিটুকুই হত বেশি খাতির। নলিনদা কোন্ একটা গভর্নমেণ্ট আফিসে কাজ করতেন ভুলে গেছি। নিত্যনিয়মিতভাবে লেকের রাস্তায় সকালবেলা হেঁটে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে সেখানেও দেখা হত। নলিনদার দুটি ছেলের কেউই আইনের লাইনে আসেন নি। তাঁরা বোধ হয় বিজ্ঞানের দিকে ঘেঁষেছেন।

ললিত জ্যাঠামশায়ের দ্বিতীয় ছেলের নাম আশুতোষ। তিনি এতগুলি 'রঞ্জন'এর ব্যূহ ভেদ করে কি করে যে শুধু আশুতোষ হয়ে গেলেন জানি নে। আশু ছেলে বয়েস থেকেই লেখাপড়ায় ভালো ছেলে ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি ওকালতি না করে পৈতৃক কাজেই ঢুকলেন অর্থাৎ মুনসেফ হলেন। উপর্যুপরি তিন পুরুষের হাকিম। আশু ক্রমে কাজে উন্নতি করে পাকা ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখে সরকার তাঁকে অবসর গ্রহণ করবার সময় থেকেই নানা লেবার ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান বা মেম্বর নিযুক্ত করেছেন। এই কাজে আশু খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর দু-একটি অ্যাওয়ার্ড এখনো 'দাশগুপ্ত অ্যাওয়ার্ড' বলে খ্যাত ও প্রশংসিত। আশুর তিনটি কন্যা কিন্তু ছেলে নেই।

ললিত জ্যাঠামশায়ের ছোটো ছেলে রবিরঞ্জনও হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট এবং এখন বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। তাঁর বড়ো ছেলে অসিতরঞ্জনও

অ্যাডভোকেট। শুনেছি তিনিও নাকি মুন্সেফী নেবেন। নিলে হবেন চার পুরুষের হাকিম। অন্য দুটি ছেলে এখনো কলেজে পড়ছে।

কেদারেশ্বরের তৃতীয় পুত্র অবনীমোহন অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে একটা বাংলা স্কুলে মাস্টারি করতেন। তাঁর একটি-মাত্র ছেলে সুনীল রেলে কাজ করেন। অনেকদিন গোমো স্টেশনে অ্যাসিস্টাণ্ট স্টেশন মাস্টার ছিলেন। এখন কোথায় আছেন খবর জানি না। তাঁর মা, আমাদের সেজো খুড়িমা, খুব স্নেহশীলা মহিলা ছিলেন।

কেদারেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রমোহন কোন্ একটা সরকারি আফিসে কাজ করতেন। তিনি খুব গম্ভীর ধরণের মানুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করে-ছিলেন আমার মায়ের আপন জ্যেঠতুতো বোন এবং আমাদের কুমুদিনী মাসীমার একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী গোড়ায় ছিলেন আমাদের দিদি, হয়ে গেলেন আমাদের ছোটো খুড়িমা। সুরুকাকার তিনটি ছেলেই পড়াশুনায় খুব ভালো হয়েছিলেন। বড়োটিকে আমরা প্রথমে প্রবোধ বলেই ডাকতাম— বোধ হয় সুবোধের ভাই বলেই, কিন্তু পরে তাঁর পোষাকী নাম হয়েছিল সুকুমাররঞ্জন। সুকুমার বরাবরই ছিলেন ক্লাসের ভালো ছেলে। বি এ. পরীক্ষায় বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অঙ্কেতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। খুব পড়তেন। সুবোধ আর আমি যখন কামরাঙাতলার বাড়িতে ঘুড়ি ওড়াবার যোগাড় করতাম ঠিক সেই সময়ে সুরুকাকা আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছেড়ে একটু জলযোগ সেরে সুকুমারকে নিয়ে বসতেন পড়াতে। বেচারা সুকুমার আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতেন। প্রথমটা চাইতেন একটু হাপুস চোখে কিন্তু পরে অভ্যাসবশে তাঁর খেলার ইচ্ছেই বোধ হয় চলে গিয়েছিল। পড়ার ঠেলায় তাঁর চোখে উঠল চশমা এবং ক্রমে চশমার কাঁচ মোটা হয়েই চলল। আমি বিলেত চলে যাবার পর সুকুমার দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)এর বেশ ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। দাদাবাবু তখন কলকাতার মেয়র এবং স্বরাজ পার্টির কাউন্সিলারদের মধ্যে সুকুমারও ছিলেন একজন কিছুদিন পর্যন্ত। পরে তিনি দিল্লীতে কোন্ একটা কলেজে ভালো চাকরি পেয়ে সেখানেই অধ্যাপনা-কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অল্প বয়সেই সুকুমার মারা যান। সুকুমারের দুটি ছেলেই খুব ভালো ছেলে হয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন। বড়োটি, সুহাসরঞ্জন, আই. ই. এস. পরীক্ষায় পাস করে নানা জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে

এখন বোধ হয় বেঙ্গল গভর্নমেন্টেব অর্থসচিব হয়েছেন। ছোটো ছেলে মনোজও ভালো পাস কবে উচ্চ সবকারি কাজ কবছেন। সুরুকাকার মেজো ছেলে নীহাববঞ্জনকে আমবা নীরু বলেই ডাকি। তিনি একেবাবে সুরুকাকারই মতো গম্ভীব প্রকৃতিব মানুষ। বাবা যখন কলকাতা কর্পোবেশনের লাইসেন্স অফিসাব তখনই নীরু কর্পোরেশনেব লাইসেন্স ইন্‌স্‌পেক্‌টব হয়ে কাজে ঢোকেন। এখন তিনি অবসব নিয়ে নিজেব আলাদা বাড়িতেই বাস কবছেন। সুরুকাকার ছোটো ছেলে সবোজবঞ্জনও লেখাপড়ায় ভালো। তিনি ওকালতিব দিকে না গিয়ে একটা স্কুলেব হেডমাস্টাবী কবছেন। তিনি বিয়ে কবেন নি।

পশ্চিমেব বাড়িব বতনকৃষ্ণেব ছোটো ছেলে বৈকুণ্ঠেশ্বব ছিলেন আমাব ছোটো ঠাকুর্দা। তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে ছোটো ঠাকুমাকে দেখেছি— ছোট্টখাট্ট ফবসা মানুষটি ছিলেন তিনি। ছোটো ঠাকুর্দা আমার মাকে খুবই স্নেহ কবতেন। তিনি অপুত্রকই মাবা গেছেন। এই হল সংক্ষেপে পশ্চিমেব বাড়িব কথা।

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরের বাড়ি ও পুবের বাড়ি

১

রমানাথ দাশ যাঁর নাম আগে অনেকবার বলেছি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন মনোহর। মনোহরের ছেলে রামরমণের ছেলে না থাকায় তিনি এক দত্তকপুত্র নেন যাঁর নাম ছিল রামকিশোর। এই রামকিশোরের দুই ছেলে— রামকমল ও দুর্গানন্দ। এঁরাই হলেন তেলিরবাগের বাবুদের উত্তরের বাড়ির দুই ভিটার কর্তা। রামকমল কি তাঁর পুত্র অক্ষয়কে আমি দেখি নি। কিন্তু অক্ষয়দাদার তিন ছেলেকে আমি বেশ ভালো করেই জানতাম। জ্ঞাতি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আমার ভাইপো। কিন্তু বয়সে তাঁরা তিনজনই ছিলেন আমার চেয়ে বড়ো। বড়ো ভাইপো বিভুরঞ্জন যাঁকে বলতাম 'বিভুভাইয়ের ব্যাটা' তাঁকে বেশ মনে আছে। তিনি দাদাবাবুর (চিত্তরঞ্জনের) কোর্টের মুহুরীর কাজ করতেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ভালো মানুষ ছিলেন বিভুভাইয়ের ব্যাটা। তাঁর পোষাকে কাপড়ে কোনো বাবুগিরি দেখি নি। মোটা গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়ে তিনি কোর্টে যেতেন। খুব পান খেতেন এবং পানের পিক অনেক সময় জামায় কাপড়ে লেগে যেত। অনেক সময় দাদাবাবু কি বৌঠানের কথাটা ঠিকমত না বুঝে উল্টো কিছু একটা করে ফেললে যখন বকুনি খেতেন তখন মুখে কথাটি কইতেন না। সবাই জানে উকিল ও ব্যারিস্টারের বাবুরা মক্কেলদের কাছ থেকে তহুরী আদায় করেন এবং অনেক সময় একটু হয়তো জুলুমও করেন বড়ো উকিল কৌন্সুলীর বাবুরা। কিন্তু বিভুভাইয়ের ব্যাটার কিরকম একটা আভিজাত্যজ্ঞান ছিল। তিনি মক্কেলদের কাছে টাকা চাইতে পারতেন না। কেউ যদি বলত চাইতে তখন তিনি জবাব দিতেন, 'চেহারা দেখছ না, দিব কই'খনে।' ফলে দাঁড়াল এই যে, বড়ো কৌন্সুলীর বাবু হয়েও বিভুভাইয়ের ব্যাটা অর্থ উপার্জন তেমন করতে পারেন নি। কিন্তু সংসার পালন করে গেছেন তিনি হাসিমুখে সবাইকে নিয়ে। অদ্ভুত দেখেছি নিজের ভাইয়েদের উপরে তাঁর স্নেহাসক্তি। তাঁকে হাজার কথা শোনাও তাঁর মুখে রা বের

হত না, কিন্তু তাঁর ভাইয়েদেব যদি কেউ মন্দ বলত বিভুভাইয়ের ব্যাটা কিছুতেই তা ববদাস্ত কবতে পাবতেন না, একেবারে রেগে ফোঁস করে উঠতেন। বিভুভাইয়ের ব্যাটাব স্ত্রীকেও খুব মনে আছে। বেশ লম্বা-চওড়া মহিলা তিনি ছিলেন। মনটিও ছিল তাঁর স্নেহবসে ভবা। তাঁর দেওব ইন্দুভূষণের প্রথমা স্ত্রী মাবা যেতে তাঁব সন্তানদেব ইনিই মানুষ করেছিলেন আপন সন্তানদেব মতোই। বিভুভাইয়েব ব্যাটাব দুই ছেলে অমিয়বঞ্জন ও বিনয়বঞ্জন। অমিয়ব ডাকনাম দিয়েই আমি তাকে চিনি। সে ডাকনাম ছিল 'ধুম্বইল্লা'। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম যে তাঁদেব বাড়িতে পালাকীর্তনেব শুরুতে যেই-না খোল-কবতালেব ধুম্বল বা বোল উঠল ঠিক সেই সময়েই অমিয় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং সেই থেকেই তাঁব নাম হল 'ধুম্বইল্লা'। ধুম্বইল্লা অনেকদিন হয় কলকাতাব উত্তবপুব অঞ্চলেই বসবাস কবছেন এবং কংগ্রেস কর্মীমহলে বেশ তাঁব প্রতিষ্ঠা আছে। এঁবও তাব বাপেবই মতো একটা আভিজাত্যজ্ঞান আছে। ধুম্বইল্লাব একটা ভালো চাকুবি হলে তাঁদেব পবিবাবের একটা সুবাহা হবে ভেবে একজন শুভার্থী একবাব তাঁকে বললেন, 'ওবে ধুম্বইল্লা, নির্মল চন্দ ত এখন কইলকাতাব মেয়ব— তাঁব লগে ত তব খুবই জানাশোনা কছ্। তাঁবে ধইবা কর্পোবেশনে একটা ভালো চাকরি দেওয়াইতে কইলে ত পাবছ।' ধুম্বইল্লা তার দিকে খানিকটা চেয়ে বললেন, 'জানছ্ না, হ্যায় আমাব কো-ওয়ার্কাব। তাব কাছে খোসামোদ করুম নেকি চাকবিব লেইগ্যা।' শেষ পর্যন্ত ধুম্বইল্লা কংগ্রেসকর্মীই বয়ে গেলেন। মান নিশ্চয়ই কিছু সঞ্চয় কবেছেন কিন্তু ধনস্থানে হয়েছে তাঁব শনি।

বিভুভাইয়েব ব্যাটাব মেজোভাই ইন্দুভূষণ কোনো একটা নির্দিষ্ট বাঁধা চাকবি কবতেন না। শেয়াব বাজাবে ঘুবে দালালী কববাব চেষ্টা কবতেন। আমি কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হবাব অল্প পবেই আমাব বাবা মনে কবলেন যে ইন্দুভূষণ খুব কাজেব এবং তিনি আমাব মুহুবী হলেই নাকি আমাব পসাবেব আব ভাবনা থাকবে না। বিভুভাইয়েব ব্যাটা দাদাবাবুর মুহুবী ছিলেন বলে দাদাবাবু বড়ো কৌন্সুলী হয়েছিলেন এবকম কোনো ভাব বাবাব মনে ছিল কি না জানি নে। যাই হোক বাবাব কথামত ইন্দুভূষণ ভাইয়েব ব্যাটা আমাব বাবু মোতায়েন হলেন। বছব খানেক কাজও করেছিলেন অর্থাৎ সকালবেলায় একবার এসে আবাব সাবাদিন শেয়ার বাজার ঘুবে বিকেলে আমাব চেম্বাবে দেখা দিতেন। দিনের মধ্যে তাঁব

দেখাই পেতাম না— আর পসারের দেখা আরো কম। যাই হোক ইন্দুভূষণ ভাইয়ের ব্যাটারই এইরকম দশটা ও পাঁচটায় হাজিরা দেবার কাজটা পছন্দ হল না। শেয়ার বাজারে যার আনাগোনা তার এইরকম অর্বাচীন ছোকরা ব্যারিস্টারের কাজ পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি আপনা হতেই সরে পড়লেন। তাঁর প্রথমা পত্নী একটি ছেলে প্রমোদকে রেখে মারা যান। প্রমোদ তাঁর জ্যেঠিমার কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। প্রমোদ রেলওয়েতে কাজ করেন শুনেছি। ইন্দুভূষণ ভাইয়ের ব্যাটা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছিলেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুটি ছেলে হযেছিল। একটি অন্ধ এবং বড়োটি কি একটা কাজ করছেন। অন্ধ ছেলেটি শুনেছি খুব সুন্দর গান করেন। বড়োই দুঃখ পেয়েছেন এই ভদ্রমহিলা ঐ দুটি সন্তান মানুষ করতে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে একদিন রাস্তায় বাসে চাপা পড়ে মারা গিয়ে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

পরেশরঞ্জন ছিলেন বিভুভাইয়ের ব্যাটার ছোটো ভাই। তাঁর ডাকনাম ছিল দগ্ধা। ছোটো বয়সে অসুখ করায় তাঁর নাকের মাঝখানের হাড়টা কেটে ফেলতে হযেছিল বলে তাঁর নাকে কেবল একটা ফুটোই ছিল এবং একটু নাকি-সুরে কথা কইতেন বলে ছোটোরা একটু ভয় পেত। কিন্তু খুব সৎ লোক তিনি ছিলেন। নিজের সাধ্যমত রোজগার করে তিনি সংসারের সাহায্য করতেন। বস্তুত বিভুভাইয়ের ব্যাটা মারা যাবার পর এই দগ্ধা-ভাইয়ের ব্যাটাই ছিলেন তাঁদের সংসারের অভিভাবক।

রামকমলের ছোটো ভাই দুর্গানন্দের একমাত্র ছেলে মোহিনীদাদাকে দেখে থাকলেও আমার মনে নেই। মোহিনীদাদার মা-জ্যেঠিমাকে অল্প অল্প মনে আছে। শুনেছি মধ্যের বাড়ির মেজোকর্তা দুর্গামোহনের স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে এঁর খুব সখ্য ছিল এবং সেই ভিত্তিতেই উত্তরের বাড়ির এই জ্যেঠিমার গ্রামের মধ্যে বেশ হাঁকডাক ছিল। মোহিনীদাদার স্ত্রীকে বেশ মনে আছে। মাকে তিনি শাশুড়ির মতোই শ্রদ্ধা করতেন। সেই বৌঠানটি বেশ হাসিখুসি মানুষ ছিলেন। মোহিনীদাদার একমাত্র ছেলে রতিরঞ্জন বড়ো হয়ে এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানি, যার চীফ এজেন্সী নিয়েছিলেন দুর্গামোহন দাস, সেই কোম্পানিতে বরাবর সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে অবসর নিয়ে কলকাতাতেই বসবাস করছেন।

২

এবাব বলি তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীর সেই-সব শাখার মানুষদের কথা যাঁরা গ্রামেব পূর্বপ্রান্তে বসতি কবেছিলেন। যদুনন্দনেব তৃতীয় পুত্র হরিহবের পৌত্র রাজাবামেব ছিল তিন পুত্র— বামমোহন, জগমোহন ও ব্রজমোহন। ব্রজমোহন অপুত্রক মাবা যান। বড়ো ছেলে বামমোহনেব প্রপৌত্র তাবিণীচবণ হলেন পুবের বাড়িব এক ভিটাব কর্তা। জ্ঞাতিসম্পর্কে তিনি ছিলেন আমাব দাদামশায়। এঁকে আমি দেখেছি। বেশ ফবসা ছিল এঁব গায়েব রঙ এবং বড়োদেব কাছে শুনেছি যে বয়সেব সময় নাকি তিনি খুব সৌখীনই ছিলেন। শুনেছি তিনি তাঁব জুতায় দুধেব সব মাখিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে পালিশ কবাতেন। কালীমোহন ও দুর্গামোহনেব বিমাতাব বিধবা বিয়ে যখন হয় তখন এই তাবিণী দাদামশায়ই নাকি সেই ছড়াটা যা আগেই উদ্‌ধৃত কবেছি সেটা বানিয়েছিলেন। তাঁব বড়ো ছেলে ছিলেন মনোমোহন। মনোমোহন জ্যাঠামশায় কলকাতাব ছোটো আদালতে সেবেস্তাদাবী কাজ কবতেন। মাঝে মাঝে জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনেব সঙ্গে দেখা কবতে কালীমোহন আলয়ে আসতেন। এই জ্যাঠামশায়েব সহধর্মিণীব সঙ্গে আমাব মায়েব বেশ সৌহার্দ্য ছিল। বেশ ফবসা ছিল সেই জ্যেঠিমাব গায়েব বঙ। তাঁবই আগ্রহে তাঁব আপন খুড়তুতো ভাই উপেন্দ্রমোহনেব সঙ্গে আমাব বোন সুমতি— যাব ডাকনাম খুকী— তাব বিয়ে হয়েছে। একবাব পুবেব বাড়িব এই জ্যেঠিমাই পদ্মা থেকে সদ্যধবা ইলিশ মাছ কড়াইতে তেল দিয়ে না ভেজে আগুনের উপব চিমটা দিয়ে ধবে ঝলসিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। অপূর্ব লেগেছিল। তখন থেকেই বোধ হয় খেতে ভালো লাগবাব একটা বিশেষ গুণ আমাব হয়েছিল। মনোমোহন জ্যাঠামশায়েব বড়ো ছেলে যতীন্দ্রমোহন কলকাতা ছোটো আদালতেই ওকালতি কবতেন। একটু মুখচোবা মানুষ তিনি ছিলেন এবং উত্তেজিত হলে একটু তোতলামি এসে যেত। এই কাবণে যতুদাদাব পসাব যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। মনোমোহন জ্যাঠামশায়েব দ্বিতীয় ছেলে বীবেন্দ্রমোহন কি একটা আফিসে কাজ কবতেন মফস্বলে। ছোটো ছেলে হীবেন্দ্রমোহনেব ডাকনাম ছিল ছোট্‌কা। ছোট্‌কাদাদা আমাব চেয়ে বছব দুয়েব বড়ো ছিলেন। একটু ফ্যাকাশে ধরণেব ছিল তাঁব গাযেব বঙ এবং গড়নে তিনি ছোট্টখাট্ট মানুষটি ছিলেন। আমরা একসঙ্গে খেলতাম যখন গ্রামে ছিলাম কিছুদিন ছেলে বয়সে। তিনি পড়া-

শুনায় খুব ভালো ছিলেন। তিনি বোধ হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার শেষ দল। এম. এ ভালোভাবে পাস করে তিনি লাহোরে 'সনাতনধর্ম' কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হয়েছিলেন। যখন পাঞ্জাব দুই ভাগ হল তখন তিনি লাহোরে ইংরেজির সিনিয়র প্রফেসার। সে-সময় পশ্চিম-পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসে তিনি বোধ হয় আম্বালায় একটা কলেজে অধ্যাপক হন। খুব সুখ্যাতি তাঁর ছিল ছাত্রমহলে ভালো পড়ান বলে। এখন তিনি অবসর নিয়ে কলকাতায় আছেন। ছোট্কাদাদা বিয়ে করেন নি। এই সেদিন কলকাতায় তাঁকে দেখে এলাম— ভালো লাগল।

তারিণী দাদামশায়ের ছোটো ছেলের নাম ছিল হরেন্দ্রমোহন। আমরা ডাকতাম হারাণকাকা। তিনি মুন্সীগঞ্জে মোক্তারি করে বেশ স্বচ্ছন্দেই সংসার চালাতেন। হারাণকাকা ছিলেন ছিপছিপে লম্বা, ফরসা মানুষ এবং একটু বেশিরকম তার্কিক। বোধ হয় সেটা তাঁর পেশার অনুরোধে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তিনি জন্মাবার সময়ে যে ধাত্রী ছিলেন তাকেও আমি দেখেছি। তাঁর কথা না বললে আমার স্মৃতিকথায় বাদ থেকে যাবে। কালো কুচকুচে ছিল তাঁর রঙ। আমি যখন দেখেছি তখন বয়েস হয়েছে ঢের। বসে বসে থেলো হুঁকায় তামাক খেতেন ও বাড়ির বৌঝিদের নানারকম নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন। সে-বাড়ির জ্যেঠিমা ও আমার মা সবাই তাঁকে 'ধাই ঠাইন' বলতেন। শুনলাম তাঁর নাম 'গুলকী ধাই'— নামটা 'গোলকী'র অপভ্রংশ কি না তা অনুসন্ধান করি নি। একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বৌয়েরা তাঁকে ভয় ও সমীহ করে চলত। তিনিও খুব স্নেহ করতেন তাদের এবং বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের। হারাণকাকা ও তাঁর ছেলেরাই বিশেষ করে ছিলেন এই ধাত্রীমাতার স্নেহের পাত্র। একবার শুনেছি হারাণকাকা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেপিলেরা তেলিরবাগ থেকে কোথায় যাবার জন্যে তারপাশা বা লোহজঙ্গ জাহাজঘাটায় নৌকা করে গিয়েছিলেন জাহাজ ধরবার জন্যে। সঙ্গে ছিলেন 'গুলকী ধাই'। সেদিন পদ্মায় ভীষণ ঝড় এবং বড়ো বড়ো ঢেউ। তাঁদের নৌকাটি জাহাজ-ঘাটার ফ্ল্যাটের সঙ্গে ধাক্কা খায় সজোরে। সেই ধাক্কায় 'গুলকী ধাই' ও তাঁর কোলে হারাণকাকার ছেলেটি উলটে পড়ল জলে। সোরগোল পড়ে গেল। যখন 'গুলকী ধাই'কে চুলে ধরে টেনে তোলা হল তখন দেখা গেল তিনি হারাণকাকার ছেলেটিকে একেবারে বুকের মধ্যে শক্ত করে আগলিয়ে

বেখেছেন। দুজনেই বেঁচে গেলেন। আশ্রিতজনেব ভালোবাসাব এইবকম নিদর্শন খুবই বিরল হয়ে গেছে জগতে আজকাল।

রাজাবামেব দ্বিতীয় পুত্র জগমোহনেব পাঁচটি ছেলের মধ্যে শিবচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ। শিবচন্দ্রেব জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশচন্দ্রেব বড়ো ছেলে ছিলেন শবৎচন্দ্র যিনি ভাবতায়দেব মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন অ্যাসিস্টান্ট ইন্সপেক্টব অফ স্কুল। এই শবৎচন্দ্রেব বড়ো ছেলে দ্বাবকানাথেব চাবটি ছেলে— প্রমথ, বিনয়, শচান ও মোহিত। দ্বাবিক জ্যাঠামশায়কে দেখেছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু তাঁর চাবটি ছেলেকেই জানি, বিশেষ কবে বিনয়, শচীন ও মোহিতকে। প্রমথ ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসাব। বিনয় অর্থনীতিবিশাবদ— লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অর্থনীতিব অধ্যাপক ছিলেন বহু বৎসব এবং শেষ সময়ে বোধ হয় অর্থনীতি বিভাগেব ডীন (অধ্যক্ষ)ও হয়েছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁব সুগভীব জ্ঞানেব জন্যে ভাবত সবকাব তাঁকে 'ট্যাবিফ কমিশন'এব সদস্য নিযুক্ত কবেছিলেন। সেই কাজে তিনি খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। পবে যখন নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল তখন বাংলাদেশেব তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তাব বিধানচন্দ্র বায়েব পবামর্শে বাজ্যপাল বিনয়কেই সেই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাচার্য পদে বহাল কবেছিলেন। তখন সে বিশ্ব-বিদ্যালয়েব বাহিক কোনো 'চহ্নই ছিল না। একেবাবে শুরু থেকে বিনয়কে তাব গোড়াপত্তন কবতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়েব স্ট্যাটুট ও বেগুলেশন তৈবি কবা, ফ্যাকালটি ও পাঠ্যপুস্তক নির্ণয়, অধ্যাপক নিয়োগ, ঘববাড়ি তৈবি কবা, রাস্তাঘাট, জলেব ব্যবস্থা— অর্থাৎ সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়েব জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত কাজই বিনয়কে এক হাতে কবতে হয়েছিল। অসাধাবণ পবিশ্রম এবং বিস্তব অধ্যবসায়েব সঙ্গে চাবটি বছব কাজ কবে শিলিগুড়িব ফাঁকা মাঠে বাজা বামমোহনপুবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়েব পত্তন কবে সেই চালু বিশ্ববিদ্যালযটি তাঁব স্থলাভিষিক্ত উপাচার্যেব হাতে তুলে দিয়ে তিনি অবসব গ্রহণ কবেছেন। নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার কাজে বিনয়েব কর্মতৎপবতাব তুলনা নেই। নিবপেক্ষ লোকেদেব কাছে তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন প্রচুব। দ্বাবকানাথেব তৃতীয় পুত্র শচীন খুবই যোগ্য ব্যক্তি। এ দেশে এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিলেত গিয়ে ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েব পি. এইচ. ডি. ও পরে ডি. এস-সি উপাধি পেয়েছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিও প্রফেসব হয়েছিলেন।

ইনি লণ্ডনে এফ. এন. আই. উপাধিও লাভ করেছেন। কিছুকাল ইনি ইউনেসকোর কৃষি-সম্বন্ধীয় পবামর্শদাতা ছিলেন। যখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল তখন শচীনই হলেন তাব প্রথম উপাচার্য। তাঁর পবিচালনায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে পডাশুনা খুব উদ্যমেব সঙ্গেই শুরু হয়েছে। তিনিও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবাবে গোডা থেকেই গড়ে তুলেছেন। তাঁব প্রথম চাব বছব কাজ শেষ হতে না হতেই বাংলা সবকাব আবো চাব বছবেব জন্যে উপাচার্য পদে তাঁকে বহাল রেখেছেন। ইনি বিয়ে-থাওয়া কবেন নি। এঁদেব ছোটো ভাই মোহিত বিলেত থেকে কৃষি-বিদ্যা শিখে দেশে ফিবে বেশ বডো সবকাবি চাকবি গ্রহণ কবেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব আদর্শবাদী পুরুষ। সবকাবি চাকবি ছেডে তিনি বিহাবে অনেক জমি নিয়ে একটি কৃষি প্রতিষ্ঠান গডে তুলেছিলেন তাঁব স্ত্রীব সহযোগিতায়। তিনি বিবাহ কবেছিলেন মধ্যেব বাডিব কালীমোহনেব একমাত্র পৌত্রী কুসুমেব একমাত্র কন্যা সবযূব একটি মেয়েকে। বিহাবেব জমিদাবী উচ্ছেদ আইন হবাব পব এঁদেব ফার্মটিকে সংকুচিত কবে ফেলতে হবে দেখে মোহিত ফার্ম বন্ধ কবে দিয়ে হুগলী জেলাব বিসডা গ্রামে বসতি কবেছিলেন। সেখানে দুর্বৃত্তেব হাতে নিশীথ বাত্রে তাঁবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিহত হন। দুটি সম্ভাব্যপূর্ণ জীবন অকালেই শেষ হয়ে গেল। দ্বাবকানাথেব দ্বিতীয় ভ্রাতা শশীভূষণের দুই ছেলে। বড়োজন বিধু বি. এ., বি. টি. পাস কবে অধ্যাপনা কবছেন এবং ছোটো ভাই ইন্দু হয়েছেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

মহেশচন্দ্রেব কনিষ্ঠ পুত্র কালীকুমাবেব কথা বাবা-মাব কাছে শুনেছি। তিনি আমাব মামাবাডিতে বিয়ে কবেছিলেন বলেই তাঁব সঙ্গে মায়ের মাধ্যমে আমাদেব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কালীকুমাবের বড়ো ছেলে উপেন্দ্রকাকা পুরুলিয়াতে ওকালতি কবতেন। তিনি গান্ধীজিব খুব ভক্ত ছিলেন এবং অনেক সমাজসেবা কবেছেন। নিষ্ঠাব সঙ্গে তিনি চবকা কাটতেন ও কংগ্রেসের কাজে ব্রতী ছিলেন। সেজন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকাবও করতে হয়েছে। উপেনকাকাব তৃতীয় ভাই ভূপেন ছিলেন পশুচিকিৎসক এবং সেই ডিপার্ট-মেন্টেব ডেপুটি ডাইবেক্টব হয়েছিলেন। এক সময়ে বেলগাছিয়ায় ভেটারনারী কলেজের প্রিন্সিপ্যালও ছিলেন।

জগমোহনের চতুর্থ পুত্র শিবচন্দ্রের ছোটো ছেলে গোকুলের ছিল দুই

ছেলে। বড়ো ছেলে রাইচবণেব মধ্যম পুত্র হবলাল ছিলেন ভাগলপুর কলেজের নামকবা প্রিন্সিপ্যাল। তাঁব ছেলে বঘুনাথও অধ্যাপক এবং অন্য ছেলেটি আই. ই. এস. পাস কবে আবগাবী ডিপার্টমেণ্টে সহাধ্যক্ষ।

জগমোহনেব কনিষ্ঠ পুত্র হবচন্দ্রেব জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসাদেব বড়ো ছেলের নাম ছিল প্রসন্নকুমাব। এই প্রসন্নকুমাবেব ছিল পাঁচটি সন্তান। বড়ো ছেলে করুণা জ্যাঠামশায় ওকালতি কবতেন। করুণা জ্যাঠামশায়েব বড়ো ছেলে বমেশ (কালুদাদা) কি একটা কলিয়াবী আফিসে কাজ কবতেন। মেজো ছেলে ভূপেশ তেলিববাগেব একজন কৃতী সন্তান। আমাব চেয়ে বছর খানেকেব বড়ো ছিলেন তিনি। এঁকে আমবা 'বটাদাদা' বলে ডাকতাম। বটাদাদা এদেশে ডাক্তাবি পাস করে বিলেতে গিয়ে এম. আব. সি. পি. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। দেশে ফিবে তিনি একসময়ে সিংহল দ্বীপেব কলম্বো শহবের হেলথ অফিসাব ছিলেন বেশ কিছুদিন। সেখানে কর্মকুশলতা ও সততাব জন্যে বটাদাদা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন কবেছিলেন। কলম্বো থেকে তিনি বম্বেতে হেলথ অফিসার হয়ে কয়েক বছব খুব যোগ্যতাব সঙ্গে কাজ কবেছেন। সেই আমলে কলম্বো বা বম্বেব হেলথ অফিসাব হওয়া সামান্য কথা ছিল না— খুবই উঁচু পর্যায়েব যোগ্যতা দবকাব হত ঐ পদ পেতে হলে। বটাদাদাব কর্মতৎপবতা, সততা ও সৌজন্যেব জন্যে বম্বে শহবে তিনি খুবই সুপবিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তেমনি সুগৃহিণী ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী তরুবালা। তরু বৌঠানেব মুখে একটি মিষ্টি হাসি ববাববই দেখেছি। বুদ্ধিব জৌলুস ছিল তাঁব চোখেমুখে। স্বামী-স্ত্রীতে এবকম অপূর্ব মনেব মিল কমই দেখা যায়। দুজনেই ছিলেন অতিথিবৎসল। বাঙালী কেউ বম্বেতে গিয়ে বটাদাদাব বাড়িতে অন্তত একবাব পাত পাড়েন নি এমন খুবই কম ছিলেন। বম্বেব রামকৃষ্ণ মিশনেব সঙ্গে বটাদাদা ও বৌঠানের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অর্থে সামর্থ্যে সেই মিশনকে এই দম্পতি খুব সাহায্য করতেন। আমাব বড়ো ছেলে সুবঞ্জনকে ওঁবা দুজনেই খুব স্নেহ কবতেন। আমাব বড়ো ছেলেটি বায়ুসেনায় টেস্ট পাইলট। একবার ঐ অঞ্চলে তিনি একটা হাওয়াই জাহাজেব দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়ে বেশ একটু আহত হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র বটাদাদা ও বৌঠান তাকে নিজেব বাড়ি এনে যে কত যত্ন ও শুশ্রূষা কবেছিলেন সে কথা আমাব ছেলে কিংবা আমি ও আমার স্ত্রী কখনো ভুলব না। ছোটো বয়সে একসঙ্গে খেলেছিলাম

বলেই হোক, কিংবা জ্ঞাতি-সম্পর্কের দরুনই হোক এই দম্পতি আমাকে ও আমাব পবিজনদেব খুব স্নেহ কবেছেন সব সময়ে। বম্বেব কাজ থেকে অবসর নিয়ে বটাদাদা দিল্লীতে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাজকুমাবী অমৃত কাউবের দপ্তবেব সচিবরূপে কিছুকাল কাজ কববাব পব বাংলাদেশেব তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তাব বিধানচন্দ্র বায়েব নির্দেশে তিনি বাংলা সবকাবেব ডিরেক্টব অব হেলথ সার্ভিসেস হয়ে কয়েক বছব অত্যন্ত সুখ্যাতিব সঙ্গে কাজ কবেছিলেন। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বটাদাদা কলকাতায় এলে বৌঠানেবও শুরু হল নূতন কবে সমাজসেবাব কাজ। মধ্যের বাড়িব দুর্গামোহনেব কন্যা লেডি অবলা বসুব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগব বাণী ভবনের কার্যভার সে-সময় পড়েছিল এই বৌঠানেবই উপরে। বটাদাদাব শবীবটা ভেঙে পড়ায় তিনি কাজ থেকে অবসব নিয়ে এই সেদিন মনোহবপুকুব বোডে আপন বাড়িতেই দেহত্যাগ কবেছেন। আমি যখন দিল্লীতে তখন বটাদাদাকে কাজেব জন্যে মাঝে মাঝে দিল্লী যেতে হত। আমি যখন বলতাম এবাব আমাব বাড়ি এস, বটাদাদা বলতেন, "জানিস ত ·· কের বাড়িতে আগে আমি উঠতাম। এখন তাব স্বাস্থ্য ভাইঙ্গা পড়ছে। যদি আমি এখন তব বাড়ি যাই তবে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হৈবেন।" এইবকম ছিল তাঁব উদার মন। আমি যখন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভাবতীব কাজ কবতাম তখন কথা তুললেই বটাদাদা বলতেন, "তব বাড়িতে আমি মৃত্যুব আগে যামুই।" সে যাওয়া আব হযে উঠল না। আমি ঋণীই বয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি যে তেলিববাগেব দাশগোষ্ঠীব সন্তান এব জন্যে তিনি খুবই গৌরব বোধ কবতেন যেমন আমবা সকলে কবি।

করুণা জ্যাঠামশাযেব তৃতীয ছেলে নৃপেশও ছিলেন এম. বি. ডাক্তার এবং বাংলা সবকাবেব ডেপুটি ডিবেক্টব অব হেলথ সার্ভিসেস হয়েছিলেন। তাঁব ডাকনাম ছিল 'টটা'। তিনি অল্প বয়সেই মাবা যান। তাঁর আরো দুই ছোটো ভাই আছেন— প্রাণেশ ও বাজেশ, কিন্তু তাঁদেব সঙ্গে আমার তেমন সংশ্রব হয় নি।

প্রসন্নকুমারেব দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ করুণা জ্যাঠামশায়েব মেজো ভাইয়েব নাম ছিল ললিতমোহন। তিনি আমাব বাবার ছোটো ছিলেন। ললিত-কাকা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। তিনি ওকালতি পাস কবেছিলেন কিন্তু ওকালতি করতেন কি না তা সঠিক আমার জানা নেই।

তবে শুনেছি যে শনিবার-শনিবার তিনি রীতিমত ঘোড়দৌড়ে হাজিরা দিতেন। সেই সূত্রে তাঁর দক্ষিণেব বাড়ির রাজু জ্যাঠামশায়ের কলকাতার কালীঘাটেব বাড়িতে টিপ সংগ্রহ কবতে যেতে হত। আমার আপন পিসতুতো ভাই বেবতী যাঁকে আমরা সোনাদাদা বলতাম তিনি ললিত-কাকাকে বলতেন 'টুপি দাশ'। বেস কোর্সে নাকি ললিতকাকার কাঁধে থাকত একটা ঝোলানো ব্যাগ ও মাথায় জকিদের মতো একটা টুপি পরে তিনি প্রাইভেট বুকীব ব্যাবসা করতেন। সোনাদাদা ছিলেন দুর্মুখ। তিনি বলতেন, 'বাজির টাকা না দিয়া কোন্‌দিন টুপি দাশ যে যাইব খাইব কে জানে।' ললিতকাকাব সব ছেলেদের নামেব পেছনেই ছিল 'ইন্দু'। এঁদেব মধ্যে বিমলেন্দুকেই দেখেছি কয়েকবাব। বিমলেন্দু এখন বোধ হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী। করুণা জ্যাঠা-মশায়েব তৃতীয় ও চতুর্থ ভাই হেমন্ত ও দেবেন্দ্রব সঙ্গে আমাব পবিচয় তেমন হয় নি। তাঁব সব চেয়ে ছোটো ভাই জিতেন্দ্রমোহনকে মনে আছে একটা বিশেষ ঘটনাব জন্যে। তিনি শিবপুবে ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজ থেকে পাস কবে বেলওয়ে ইঞ্জিনীয়াব হয়েছিলেন। তিনি বিবাহ কবেছিলেন মধ্যেব বাড়িব কালীমোহনেব পৌত্রী কুসুমকুমাবীব মেয়ে সবযূব স্বামী শশীকুমাব সেন যিনি পবে বিখ্যাত চোখেব ডাক্তাব হয়েছিলেন তাঁর এক বোনকে। জিতুকাকাব সেই স্ত্রীব সন্তান হবার সময়ে দারুণ অসুখ হয়েছিল। শেষ সময়ে শশীকুমার কলকাতা থেকে তেলিববাগে এসেছিলেন এবং প্রাণপাত কবে বোনকে বাঁচাতে চেষ্টা কবেও পাবলেন না তাঁকে রাখতে। আমি তখন মাব সঙ্গে তেলিববাগেই ছিলাম। মৃত্যুব পর দেহের ক্লান্তিব কোনো ছাপই সেই খুড়িমাব মুখে ছিল না। মুখখানি দেখাচ্ছিল প্রশান্ত, পবণে ছিল রাঙাপাড়েব কাপড। কপালে ও পায়ে লাগানো ছিল সিন্দুব। মৃত্যুতে খুড়িমাব মুখে যেন অপূর্ব শ্রী ফুটে উঠেছিল। সেই মুখশ্রী ও তাঁব স্বামী ও আত্মীয়স্বজনেব কাতব কান্না আমাব শিশুমনে এমন সুগভীব ছাপ দিযে গিয়েছিল যে আজ পর্যন্তও তা ভুলি নি। বিকেলে আমরা মধ্যেব বাড়িব পুকুবে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে এলাম।

জগমোহনেব কনিষ্ঠ পুত্র হবচন্দ্রেব কনিষ্ঠ পুত্রেব নাম ছিল হরিহর। এই হরিহবেব দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণারঞ্জন দাদামশায়কে দেখেছি। অতি সজ্জন ও চরিত্রবান পুরুষ তিনি ছিলেন। তিনি একটি স্কুলে সহ-হেডমাস্টারী করে

দিনাজপুর থেকে চলে এসেছিলেন অবসর নিয়ে। রিখিয়াতেই বেশির ভাগ থাকতেন অবসর-জীবন কাটাবার জন্যে। যখন কলকাতায় থাকতেন অনেক সময় আমাদের বাড়ি আসতেন। রাস্তা থেকে 'রাখাল, রাখাল আছ হে' ডাকে দাদামশায় নিজের আগমনী জানিয়ে দিতেন। হেঁটে আসতেন অনেক দূর থেকে। শরীর বেশ শক্ত সবল ছিল। বাবার সঙ্গে গল্প করে আবার হেঁটে চলে যেতেন উত্তর-পূর কলকাতায়। দক্ষিণা দাদামশায়ের ছয়টি ছেলে। বড়ো ছেলে প্রভারঞ্জন এম. এ., বি. এল. পাস করে ত্রিপুরায় জজিয়তি করছেন। চতুর্থ ছেলে লোকেশরঞ্জনকেই বেশি ভালো করে চিনি। লোকেশরঞ্জন সম্পর্কে আমার কাকা, কিন্তু বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোটো। তিনি আমাকে ভাইপো বলে ডাকেন কিন্তু আমি বয়সের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নাম ধরেই ডেকে থাকি। লোকেশ এম. এ., বি. এল. পাস করে প্রধানতঃ আলিপুরেই প্র্যাকটিস করছেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা নিয়ে প্রায়ই গিয়ে থাকেন। বেশ পসার জমিয়ে নিজেই বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ি করে নিয়েছেন। বেশ জ্ঞাতিবৎসল মানুষ তিনি। তাঁর দুটি ছেলেই পড়াশুনায় ভালো, বিশেষ করে ছোটোটি। এঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে আমার ছোটো বোন অন্নপূর্ণার ছেলে দেবব্রত (গৌতম)এর বিয়ে হয়েছে। দক্ষিণা দাদামশায়ের তৃতীয় পুত্র বিভূতির সঙ্গে আমার আলাপ না হলেও তাঁর বড়ো ছেলে অলোকরঞ্জনকে তাঁর খুব ছোটো বয়সেই দেখেছি। অলোক শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করতেন। তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যরসবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে তাঁদের ক্লাসের ছেলেরা একটা মাসিকপত্র বের করতেন। অলোক বেশ ভালো কবিতা লিখতেন সেই পত্রিকায়। এখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের সিনিয়র লেকচারার হয়ে অধ্যাপনা-ব্রত গ্রহণ করেছেন। অলোক বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং লেখেনও ভালো। এই হরিহরের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র দাদামশায়কে খুব কম দেখেছি। তিনি ডেপুটি প্রেসিডেন্সী পোস্টমাস্টার জেনারেল পদে কাজ করে অবসর নিয়ে কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে কামারডাঙায় বাড়ি করে বসবাস করতেন মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষানাথকাকা দাশগোষ্ঠীর বংশাবলীটি পরিবর্তিত করে একেবারে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত টেনে এনে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এঁর অন্য ভাইদের সঙ্গে তেমন আলাপ-

পরিচয়ের সুযোগ আমার হয় নি।

যদুনন্দনের মধ্যম পুত্র শিবরামের পৌত্র কৃষ্ণরামের চার পুরুষ নীচে কমলাকান্তের তিন ছেলে শ্রীনাথ, চন্দ্রকুমার ও আনন্দও পুবের বাড়ির বাসিন্দা। শ্রীনাথ জ্যাঠামশায়ের ছেলে ছিল না। চন্দ্রকুমার জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেন্দ্র করেন ওকালতি। তাঁর ছেলে সুধীর হলেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। আনন্দ জ্যাঠামশায়ের ছিল পাঁচজন ছেলে। ছোটো ছেলে প্রেমরঞ্জন এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠে কি অসুখে তেলিরবাগেই মারা গেলেন। তখন আমি সেখানে ছিলাম। মৃত্যু বালকমনে খুবই দাগ কেটে যায়— তাই মনে আছে প্রেমরঞ্জনদার মৃত্যু। আনন্দ জ্যাঠামশায়ের পাশের বাড়িতে যেখানে শ্রীনাথ দাশ থাকতেন সেখানে নাকি একবার ডাকাত পড়েছিল এবং ডাকাতরা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রামদা দিয়ে কোপ মেরেছিল শ্রীনাথ জ্যাঠামশায়ের গলা লক্ষ্য করে। ভাগ্যক্রমে খাটের বেড়াটার মধ্যে দা'টা লেগে গলায় কেবল অল্প একটু আঁচড় পড়েছিল। আনন্দ জ্যাঠা-মশায়ের বড়ো ছেলে সতীশ ওকালতি করতেন বর্মার উত্তর প্রান্তে ম্যাণ্ডালে শহরে। তাঁকে দেখি নি, নামই শুনেছি। এঁর সেজো ভাই সরলরঞ্জনকে দেখেছি বেশ কাছাকাছি থেকে। সরলদাদার গায়ের রঙ ছিল ফরসা এবং দেখতে খুব সুপুরুষই ছিলেন। আমাদের বাড়িতে এলে মায়ের সঙ্গে তাঁর গল্প জমত কি দিয়ে কি রান্না করা যায় এই নিয়ে। সরলদাদা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে নেপাল রাজবাড়িতে রাজবৈদ্য-রূপে খুব খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন। বয়স হয়ে গেলে তিনি অবসর নিয়ে বউবাজার স্ট্রীট, যার এখন নাম হয়েছে বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীট, সেই রাস্তায় 'তেলিরবাগ ভবন' নামে খুব উচ্চ প্রাসাদ তৈরি করে নিজ বাড়িতেই মারা যান। মৃত্যুর আগে সরলদাদা অনেক বই লিখে গেছেন। শেষের দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ায় মুখে মুখে বলতেন আর অন্য কেউ লিখে নিত। এঁদের তৃতীয় ভাই নলিনীরঞ্জন কি করতেন ঠিক জানি না। চতুর্থ ভাই অবনীদাদাকে ঢের বেশি দেখেছি। তিনি বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন।

যদুনন্দনের মধ্যম পুত্র শিবরামের কনিষ্ঠ পৌত্র চন্দ্রশেখরের ঘরে তিন পুরুষ নীচে ছিলেন রামকিশোর। এই রামকিশোরের ছিল দুই ছেলে কালী ও মহিম। মহিমের ছেলে ছিলেন লালবিহারী। লালবিহারী জ্যাঠামশায়

ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি উপবীতধারী ছিলেন সেই আমলেই এবং আপন বাড়ির পূজাপার্বণে তিনি নিজেই পৌরোহিত্য করতেন সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করে। শুনেছি তিনিই গিয়েছিলেন আমার বাবার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে। কবিরাজী ছিল তাঁর ব্যবসায়। কলকাতায় কালীমোহন আলয়ের নীচে একটা ঘরে তাঁকে থাকতে দেখেছি। তাঁর বড়ো ছেলে, কবীন্দ্রদাদা, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করেছিলেন। ছোটো ছেলে শিবেন্দ্র ছিলেন আমার বয়সী। ছোটকাদাদা, বটাদাদা, শিবেন ও আমি নাকি ছিলাম সেকালে হরিহরাত্মা। শিবেন পোস্ট আফিসে পোস্টমাস্টারি করে অবসর নিয়েছেন। রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র মহিমচন্দ্রের তিন ছেলেকেই দেখেছি। চন্দ্রচূড়কাকা আমার মায়ের খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। হৃষিকেশ ও মুরলীকাকারাও আমাদের বাড়ি আসতেন ও আমাদের সঙ্গে দেখা হত। এঁরা তিন ভাই-ই রাঁচিতে কর্মোপলক্ষে গিয়ে সেখানেই বাড়ি করে রয়ে গেছেন।

৩

এতক্ষণ আমাদের দাশগোষ্ঠীর বিভিন্ন বাড়ির কয়েকপুরুষ সন্তানদের কথা যতটুকু মনে আছে বললাম। আগেই বলেছি তেলিরবাগের ভুঁইঞারা নামেই জমিদার। জমিজমা তাঁদের বিশেষ কিছু ছিল না। সংসারের ভরণ-পোষণের জন্যে তাঁদের গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। বাইরে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্যে তাঁদের দস্তুরমত লেখাপড়া শিখে জীবনসংগ্রামে নামতে হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে যদুনন্দনবংশীয় দাশগোষ্ঠীর সন্তানেরা বুদ্ধিজীবী। জীবিকা উপার্জনের অনুরোধে তাঁরা অনেকে বিদেশেই বাসা বেঁধেছেন এবং জ্ঞাতিদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছেন। তার পর ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে তেলিরবাগ গ্রামটুকু কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হওয়ায় আমাদের এক গ্রামে পাশাপাশি থাকার যে বন্ধন তাও খসে গেল। এই-সব কারণে দাশগোষ্ঠীর অনেক শাখার লোকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎপরিচয় হয় নি।

দাশগোষ্ঠীর সন্তানেরা কর্মব্যপদেশে ভারতবর্ষের চতুঃসীমানায় ছড়িয়ে পড়েছেন। এক সময়ে পুবের বাড়ির হীরেন্দ্র (ছোটকাদাদা) ছিলেন পশ্চিমে লাহোরে, পুবের বাড়ির সরলদাদা ছিলেন উত্তরে নেপালে, দক্ষিণের বাড়ির

জেনুকাকা ছিলেন পূর্বে আসামের বিজনী স্টেটে ও পুবের বাড়ির সতীশদাদা ছিলেন বর্মাব ম্যাগুালে শহবে এবং মধ্যেব বাডিব জ্যোতিষদাদা ও দক্ষিণেব বাডিব রাজু জ্যাঠামশায় ছিলেন রেঙ্গুনে এবং পুবেব বাডিব বটাদাদা ছিলেন দক্ষিণে কলম্বোর হেলথ অফিসাব। আমবা দূবে দূবে ছডিয়ে গেছি কিন্তু তেলিরবাগের মোহ আমাদেব যায় নি। আমাদেব এই পবিবাব লেখাপডায় খুবই অগ্রসব হয়ে গিয়েছে। ছেলে ও মেয়ে প্রায় সবাই শিক্ষিত। আগে যে জ্ঞাতিদেব বর্ণনা দিয়েছি তাব থেকেই বোঝা যাবে যে আমাদেব দাশগোষ্ঠী থেকে তিন পুরুষেব মধ্যে কত মোক্তাব, অ্যাটর্নি, উকিল, ব্যাবিস্টাব, সব-জজ, ছোটো আদালতের ও ট্রাইবুনালেব জজ, হাইকোর্টেব জজ, অধ্যাপক, উপাচার্য, ইঞ্জিনায়াব ও বডো চাকুবে প্রসূত হয়েছে। আমাদেব বাপ-ঠাকুবদাদেব লাইন যদি বাদই দিই এবং যদি আমাদেব আদি পুরুষ পান্থ থেকে নীচে বাইশ পুরুষ বা যদুনন্দন থেকে অধঃস্তন নবম পুরুষ মাত্রই ধবি অর্থাৎ আমাব ও জ্ঞাতিভাইদের একটি লাইনই ধরি তবে দেখা যাবে যে আমাদেব এই তেলিববাগ দাশগোষ্ঠীব এই একই বাইশ পুরুষে প্রসূত হয়েছে কত শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান পুরুষবা। প্রায় এক ডজন উকিল। জন নয়-দশ ব্যাবিস্টাবদেব মধ্যে একজন (সতীশবঞ্জন) হলেন অ্যাডভোকেট জেনাবেল ও ল' মেম্বাব ও একজন (চিত্তবঞ্জন) হলেন সর্বসম্মত ব্যাবিস্টার-অগ্রণী ও দেশনেতা, বাকি ব্যাবিস্টাবদেব মধ্যে তিনজন (প্রফুল্লবঞ্জন, জ্যোতিষবঞ্জন ও সুধীবঞ্জন) হলেন হাইকোর্টের জজ এবং সেই তিনজনেব মধ্যে একজন (সুধীবঞ্জন) আবাব হলেন পাঞ্জাবেব ও পবে সর্বভাবতীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ। তিনটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েব তিনটি উপাচার্য (সুধীবঞ্জন, বিনয় ও শচীন)বেব হয়েছেন এই গোষ্ঠীব একই পুরুষ থেকে। তার পব ডিস্ট্রিক্ট জজ (আশুতোষ), সব-জজ, ছোটো আদালতেব জজ ও ট্রাইবুনালেব জজ (প্রদোষবঞ্জন), ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (সুহাসবঞ্জন) ও ক'জনা কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকও হয়েছেন একাধিক। বড়ো ডাক্তাব (সবলবঞ্জন, ভূপেশ), চীফ ইঞ্জিনীয়ার (নিশীথবঞ্জন), একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াবও (ইন্দু) বাদ যায় নি। এই একই লাইনেব মধ্যে অনেক শিক্ষিতা মেয়ে ও সমাজসেবিকাও রয়েছেন, যেমন সবলা বায়, লেডী বসু, অমলা, উর্মিলা ইত্যাদি। তেলির-বাগেব দাশগোষ্ঠীব কৃতী সন্তানদেব উদাহবণ ও সাহচর্য গডে তুলেছে আমার হৃদয়মনকে এবং তাঁদেব চরিত্র-বল আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে জীবনেব

যাত্রাপথে। দাশগোষ্ঠীর সন্তানদের যে তালিকা ও বর্ণনা দিলাম তা যে-কোনো অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষেই যে গৌরবজনক তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা (মিসেস পি. কে. রায়), আমাদের সবদিদি, সত্যই বলেছিলেন, "আমাব বাপেব বাড়ি তেলিরবাগেব দাশবংশ খুবই উচ্চ বংশ।" এই বংশে জন্মলাভ করার গৌরবও যেমন অনেক তার দায়িত্বও তেমনি বিস্তব। এই অভিজাত বংশে জন্মলাভ কববাব সৌভাগ্য আমাব হয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

তেলিরবাগের অন্যান্য বাসিন্দাদের কথা

তেলিরবাগ গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দা যাঁদের আমি দেখেছি এবং যাঁদের কথা আমার কিছুটা স্মরণ আছে তাঁদের সম্বন্ধে দু কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার জীবনকাহিনীর সঙ্গে এঁদের কোনো সম্বন্ধ নেই তা-ই বা বলব কেমন করে? এঁরা গ্রামের মধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন সেই পরিবেশই গোপনে গোপনে আমাকে পুষ্ট করেছে। তেলিরবাগের আকাশ বাতাস মাটি ও জল যেমন আমার অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবেশ করে গেছে আমার অজানিতে তেমনি করেই তেলিরবাগের এই-সব বাসিন্দারাও আমার জীবনকে গড়ে তুলেছেন অদৃশ্যে ও নীরবে।

প্রথমেই বলি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের বাসিন্দা 'উকিল-বাড়ি'র লোকদের কথা। এ বাড়ির সবাই পেশায় উকিল ছিলেন না, এঁদের পদবীই ছিল উকিল। উকিল-বাড়ির কর্তা ছিলেন স্বর্গীয় অভয়চরণ উকিল। এঁর ছিল তিন ছেলে। প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম অম্বিকাচরণ উকিল ও দ্বিতীয় পক্ষের দুই সন্তানের নাম সারদা ও বরদা উকিল। তা ছাড়া এ বাড়ির শ্যামাচরণ উকিল ছিলেন সব-জজ এবং তারকচন্দ্র উকিল এম. এ. বি. এল পাস-করা উকিল হয়ে মুন্সীগঞ্জে প্র্যাকটিস করতেন। এঁদের মধ্যে দুইজনকে আমি কখনো চক্ষেও দেখি নি, কিন্তু আমার পিতৃদেবের মুখে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শুনেছি। অন্যান্য সূত্রেও তাঁদের কার্যকলাপের কথা জেনে মোহিত হয়েছি এবং তাঁরাও যে আমার স্বগ্রামবাসী ছিলেন এইজন্যে মনে মনে গৌরবও বোধ করেছি। অভয়চরণবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে অম্বিকা উকিল ছিলেন নাম-করা ইংরাজি অধ্যাপক। তিনি ঢাকার বিখ্যাত উকিলস্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের লোকের হিতকর কাজে ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। আজকাল সমবায় নীতির ব্যাখ্যান ও স্বদেশী কারবারের উপযোগিতার অনেক কথাই আমরা শুনতে পাই। কিন্তু বছর ষাটেক আগে যখন সমবায় সমিতি ও দেশী বাণিজ্যের কথা আমাদের দেশের গণ্যমান্য নেতারা ভাবতেনই না তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সে-সব বিষয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীদের দৃষ্টি সে

দিকে আকর্ষণ কববার চেষ্টা কবে গেছেন। সেই আমলে অম্বিকা উকিলই সেইসব নীতি হাতে-কলমে কাজে লাগাবাব যে চেষ্টা করে গেছেন সেইটেই ছিল তাঁব প্রধান কীর্তি। সেই সময়ে— সন তাবিখ মনে নেই— অম্বিকাবাবু তেলিববাগেবই কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদেব নিযে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছে স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়েব মর্মব মূর্তিব পুব গা দিয়ে শ্যামাচবণ দে স্ট্রীটেব একটি নিচু একতলা ঘবে ইণ্ডিয়ান পাইওনিয়ার্স কোম্পানি লিমিটেড নামে একটা দোকান খোলেন। হিস্যা-দাবেবা শুনেছি প্রত্যেকে একশো টাকা দিয়েছিলেন। আমাব পিতৃদেব ও পিতৃব্যপুত্র চিত্তবঞ্জন, সতীশবঞ্জন ও জ্যোতিষবঞ্জনও এক-একশো টাকা দিয়ে শেয়াব নিযেছিলেন। সেখানে চাল, ডাল, তৈজসপত্র সব পাওয়া যেত এবং কিছু কিছু মনিহাবী জিনিসও থাকত। বৎসরান্তে স্টক মেলাতে গিযে শুনেছি তখনকাব দিনেব ঐসব যুবকেবা চালেব বস্তাব উপবই শুয়ে ঘুমিয়ে বাত কাবাব কবে দিতেন। এমনি ছিল তাঁদেব উৎসাহ। এখন স্কুল-কলেজেব ছেলেমেয়েদেব লেখাব খাতায় বাজাব ভবে গিয়েছে কিন্তু তখনকাব দিনে সে-সব ছিল না। এই ইণ্ডিয়ান পাইওনিযার্স কোম্পানিই প্রথম 'পাইওনিযার্স একসাবসাইজ বুক' নামে ছেলেমেযেদেব লেখাব খাতা বাজাবে চালু কবে। সেই কোম্পানিই এখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটেব ঘড়ি ঘবে উঠে গিয়ে নামকবা কাববাব চালাচ্ছে। এব পর ময়মনসিংহেব স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী জমিদাব ব্রজেন্দ্রকিশোবেব অর্থানুকূল্যে অম্বিকাবাবু হিন্দুস্থান কোঅপাবেটিভ ইনসিওবেন্স সোসাইটিব পত্তন কবেন। সে সোসাইটিব নাম বাংলাদেশে আজ কে না জানে। অর্থেব লোলুপতা অম্বিকাবাবুব একেবাবেই ছিল না। কাজই তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি যশ ও মান পেয়ে গেছেন বিস্তব, কিন্তু ধন সঞ্চয় তাঁব বিশেষ কিছুই কবা হয় নি। সে কর্মযোগী আজ মহাপ্রয়াণ কবেছেন কিন্তু শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেই বিশিষ্ট স্বগ্রামবাসীকে শ্রদ্ধা নিবেদন কবি। তাঁব একমাত্র ছেলে বামদাসদা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমেব ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পবলোকগমন কবেছেন। এই পবিবাবেব দ্বিতীয় সুসন্তান অম্বিকাবাবুব বৈমাত্রেয় ভাই সাবদা উকিল একজন খুব উঁচুদবেব আর্টিস্ট বলে খ্যাতি লাভ কবেছিলেন। তাঁর হাতে আঁকা অনেক দেয়াল-তৈলচিত্র লণ্ডনেব ইণ্ডিয়া হাউসকে আজও সুশোভিত কবে বেখেছে। তাঁব পুত্র শান্তনুও একজন

ভালো আর্টিস্ট। সারদাবাবুব ভাই বরদাবাবুকে দিল্লীতে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই চেনেন। দুই ভাই মিলে তাঁরা আর্টেব একটি বিশিষ্ট ধাবা সৃষ্টি কবে গেছেন যাকে লোকে এখনো বলে—'উকিল স্কুল অফ আর্ট'। ববদাবাবুব প্রধান কীর্তি দিল্লীব চেমসফোর্ড ক্লাবেব সামনে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস্'এব প্রতিষ্ঠা। সম্প্রতি ইনি দিল্লীতেই দেহত্যাগ করেছেন। এই বাডিব ভবানীচবণ উকিলেবও নাম শুনেছি টিনেব বাক্সে বং লাগাবাব এক নূতন কায়দা প্রবর্তনেব জন্যে।

তেলিববাগেব বাবুদেব জমিদাবীব ঠাট বজায় বাখবাব জন্যে তাঁদেব তিন হিস্যায় তিনজন দেওয়ানজী ছিলেন। বাবুদেব অবর্তমানে জমিদাবী রক্ষণাবেক্ষণেব এবং খাজনা আদায় উসুলেব দায়িত্ব থাকত এই তিন দেওয়ানজীব উপবে। কাজেই গ্রামেব মধ্যে এঁদেব বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। এঁবা বাবুদেব বিশ্বস্ত কর্মচাবী, পবামর্শদাতা এবং বাবুদেব মা, বৌঝিয়েবা যাঁবা গ্রামে থাকতেন তাঁদেব এবা একবকম অভিভাবকই ছিলেন বললেই চলে। বাডিব ছেলেমেযে বৌঝিযেবা তাঁদেব খুব সমীহ কবে চলতেন। বস্তুত এঁবা বাডিব আপন লোক বলেই গণ্য হতেন।

বাবুদেব মধ্যে 'মধ্যেব বাডি'ব আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল এবং তেলিববাগেব বাইবে ববিশাল অঞ্চলেও এঁদেব বাড়তি কিছু জমিদাবী ছিল। তাঁদেব বাডিব দেওয়ানজীব নাম ছিল হবিচবণ কব, কিন্তু তাঁকে সবাই হবি সিং বলেই ডাকত। কাবণটা খুলে বলি। মধ্যেব বাডিব কাজে যোগ দেবাব আগে ইনি ছিলেন দেওয়ানী আদালতেব পেয়াদা। সেই আমলে কোর্টেব সব পেযাদাদেবই বলা হত 'সিং'। সাধাবণ মানুষেব মনে শ্রদ্ধা ভক্তি বা ভয় সঞ্চাব কববাব জন্যে এই নামকবণ হয়েছিল কি না জানি না। যাই হোক তিনি যখন তেলিববাগেব মধ্যেব বাবুদেব দেওয়ান হয়ে এলেন এই 'সিং' পদমর্যাদাটাও তাঁব সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল। একবাব যে 'সিং' হয়েছে সে চিবকালই 'সিং' থাকবে এই নীতি-অনুসাবেই বোধ হয়। আমবা তাঁকে হবি সিং পিসা বলে ডাকতাম। জ্যাঠা না, খুডা না, পিসা কেন বলতাম তা জানি না। আমাদেব গ্রামেব কোনো মেয়েকে তিনি বিয়ে কবেছিলেন বলে তাঁকে পিসা বলা হত কি না সে খবব শুনি নি। যাই হোক, অনাত্মীয়জনকে এইবকম আত্মীযেব নামে ডেকে আপন করে নেওয়াই ছিল তখনকাব দিনেব রেওয়াজ। হবি সিং পিসা মানুষটি ছিলেন বেঁটে খাটো।

গায়ের রং ময়লা। ছাঁটাই করা খোঁচা খোঁচা গোঁফ ছিল তাঁর মুখে। চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য সর্বদাই দেখা যেত। দেখলেই মনে হত খুব বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেটা হবারই কথা। হাজার হোক কোর্টের পেয়াদা ছিলেন তো। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে দেখতে পারতেন না তাঁরা বলতেন লোকটি ধূর্ত ও প্যাঁচালো মানুষ। জমিদারী কাজকর্মে তিনি যে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। কোর্টের পেয়াদারা আইনের মার-প্যাঁচ জানবে বই-কি। যাই হোক, মোটের উপর তাঁর কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভয় ছিল এবং তেলিরবাগের অন্য দুটি দেওয়ানজীরা এঁকে 'সিনিয়ার' বলে মান্য করতেন। হরি সিং পিসার বাড়িখানা ছিল মধ্যের বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ-পূব কোণে— সিকদার বাড়ির কয়েক শো হাত পূবে। এঁর ছেলে কুমুদিনীকান্ত ওরফে ভ্যাগা আমার বয়সী ছিলেন এবং বড়ো দেওয়ানজীর ছেলের যে প্রাধান্যটুকু তিনি প্রাপ্য মনে করতেন তা দাবি করে আদায় করে নিতেন। এঁর কুমুদিনীকান্ত কর নামটাকে সংক্ষেপ করে ছোটকা দাদা বলতেন K^3।

দক্ষিণের বাড়ির দেওয়ানজী বিপিন সোম ছিলেন বিপরীত আকৃতির ও প্রকৃতির। গায়ের রঙ বাঙালিদের পক্ষে ফরসাই ছিল বলতে হয়। দৈর্ঘ্যে বেশ লম্বা, চুলে পাক ধরেছিল। গুম্ফ শ্মশ্রু সাফ কামানো। তিনি ছিলেন মিতভাষী ও অমায়িক নির্বিবাদী মানুষ। তাঁর ছেলে দিগিন্দ্র তেলিরবাগ স্কুলে কিছুদূর পড়ে কলকাতায় আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমার বাবা তাঁকে কলকাতা কর্পোরেশনে একটি বেলিফের কাজে ঢুকিয়ে দেন। দিগিন্দ্র আমার বাবাকে ডাকতেন কাকাবাবু, মাকে খুড়িমা এবং আমাকে দাদাবাবু বলে ডাকতেন। একেবারে ঘরের মানুষ তিনি হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির মাসের বাজার করে তিনি তা মুটের মাথায় দিয়ে আনতেন ভবানীপুর যদুবাবুর বাজার থেকে। তার পর মায়ের কাছে বসে হিসাব দিতেন। সে হিসাব-নিকাশ ছিল এক পর্ব। বড়োদিনের বন্ধে দেশ থেকে ফিরে আসবার সময় আমাদের জন্যে তিনি নিয়ে আসতেন কিছু তাজা কলাই (খেসারি) শাক, পাত ক্ষীর ও গোয়ালন্দের খেজুর গুড়। দিগিন্দ্র বেশ অল্প বয়সেই মারা যান। বিপিন সোম থাকতেন তেলিরবাগের মাঝখান দিয়ে যে খালটি বয়ে যেত তারই দক্ষিণ পারে। অন্য দুই বাড়ির দেওয়ানজীরা মারা যাবার পর বিপিন সোম তিন বাড়িরই দেওয়ানজীর

কাজ দেখতেন।

পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ানজীর নাম ছিল কালীমোহন মুখার্জি। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং তারই নিদর্শনস্বরূপে তাঁকে ডাকত কালী ঠাকুর বলে। নির্ঝঞ্ঝাট, মিষ্টভাষী ও নেহাত ভালোমানুষ, তিনি সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না। বেশ ফরসা সুদর্শন চেহারা ছিল তাঁর। আমার বাবামাকে ইনি খুব স্নেহ করতেন। গাঁয়ের লোকেরা সবাই এঁকে ভালোবাসত এঁর ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যের জন্যে। এঁর বড়ো ছেলে বীরেন্দ্র ওরফে বীরা ছিলেন আমার সমবয়সী বা একটু বড়ো। পড়াশুনা তাঁর বেশি এগোয় নি। বড়ো হয়ে কলকাতার ছোটো আদালতের এক উকিলের মুহুরির কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। বস্তুত জীবনটাকে হেসেখেলেই কাটিয়ে গেছেন। এঁর ছোটো ভাই অবনী—ডাকনাম হাবাইন্যা— প্রথমে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন) -এর বড়ো জামাতা সুধীর রায় ব্যারিস্টারের মুহুরি ছিলেন। রায়সাহেবের অসময়ে আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো ছেলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন তখন ইনি তাঁর কাছেই কাজে লেগেছেন। সুখের বিষয় যে সিদ্ধার্থ রায়ের পসার ও প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ছে অবনীরও আর্থিক সচ্ছলতা সেই অনুপাতেই বেড়ে চলেছে। অবনী তাঁর বাপের মিষ্ট স্বভাবটি পেয়েছেন। কালী ঠাকুর থাকতেন তেলিরবাগের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পাঠক-বাড়িতে। এঁদের বাড়িটির নাম পাঠক-বাড়ি হল কেন তার একটু ইতিহাস আছে। তেলিরবাগের ভুঁইঞারা যখন সেই গ্রামে বসতি করলেন তখন তাঁদের কাজে লাগে এমন সব লোকেদেরও সেই গ্রামে বসিয়েছিলেন— যেমন, পুরোহিত ধোপা নাপিত ভুঁইমালী গোয়ালা বাড়ুই কাওয়ালী ইত্যাদি। বাবুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে গীতা চণ্ডী রামায়ণ মহাভারত পাঠের জন্যে এসেছিলেন গোলকচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথকতা ও পাঠ করতেন বলে তাঁকে পাঠক বলা হত। এবং সেইজন্যে তাঁর বাড়িকে লোকে পাঠক-বাড়ি বলত। তাঁর এক কন্যার দুটি সন্তান, কালীমোহন ও লালমোহন, তাঁদের দাদামশায়ের বাড়িতেই থাকতেন। এই কালীমোহনই পরে পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ান কালী ঠাকুর বলে পরিচিত হয়েছিলেন। লালমোহনের ছিল এক ছেলে ভুবনমোহন যাকে আমরা ডাকতাম 'ভুবইন্যা' বলে। ওই বাড়িতে আর-

একজন থাকতেন তাঁর নাম ছিল দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তিনি গোলক চক্রবর্তীর কি হতেন জানি না। তাঁব ছেলে হরপ্রসন্নকে বেশ চিনতাম। হরপ্রসন্ন বড়ো হয়ে কলকাতাব ছোটো আদালতের বেঞ্চ ক্লার্ক হয়েছিলেন।

পুবোহিত পাড়ার কয়েকজনকে মনে আছে— কাউকে একটু আবছায়া বকমে, কাউকে-বা স্পষ্টভাবে। ঐ পাড়ায় একটি পবিবাব বাস করতেন তাঁদেব পদবী ছিল চ্যাটার্জী। তাঁরা আমাদেব পুবোহিত ছিলেন না। কি সুবাদে তাঁবা তেলিববাগে বসতি কবতেন জানি না। হতে পাবে তাঁদেব কেউ পুবোহিত-গোষ্ঠীতে বিয়ে কবে শ্বশুবালয়েই রয়ে গেছেন। এ বাড়িব কর্তা ছিলেন দুর্গাপ্রসন্ন চ্যাটার্জী। তাঁর ছিল তিনটি ছেলে— হবিপ্রসন্ন, আশুতোষ ও অবিনাশ। বড়ো দুজন ঢাকায় পডাশুনা করায় একটু যেন শহুরে হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁবা পায়ে মোজা দিয়ে জুতো পবে লেসেব ফিতে বাঁধতেন। গ্রামেব লোকদেব সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খেত না।

পশ্চিমেব বাড়িব অর্থাৎ আমাদেব বাড়িব কুলপুবোহিত ছিলেন গদাধব চক্রবর্তী। তাঁবই কাছে আমাব হাতেখড়ি হয়েছিল। সেই কথা পরে বলব। তিনি বেশ মোটাসোটা ভাবিক্কী ধবণেব মানুষ ছিলেন। এ ছাডা তাঁকে আমাব আব মনে নেই। শুনেছি পাণ্ডিত্যেব জন্যে তাঁব খুব খ্যাতি ছিল না— দাবিও যে ছিল তা-ও না। তবু সবাই তাঁকে গদাই পণ্ডিত বলেই জানত ও ডাকত। তাঁব জ্যেষ্ঠপুত্র বাজচন্দ্র চক্রবর্তীকে আমাব বেশ মনে আছে। এঁব ডাকনাম ছিল বাজু ঠাকুব। গ্রামেব পুবোহিতদের সম্মান যথেষ্টই ছিল— বিশেষ কবে মহিলা মহলে— কিন্তু যজমানদেব দেওয়া দক্ষিণায় যে তাঁদেব সংসাব চলত না তাতেও কোনোই সন্দেহ নেই। সুতবাং পবিবাব প্রতিপালনেব ধান্দায় বাজু ঠাকুবকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। কলকাতাব কি একটা ক্লাবে ইনি অবসব সময়ে ক্রিকেট খেলতেন এবং উইকেট কীপাব বলে বেশ খ্যাতিও অর্জন কবেছিলেন। সেই খ্যাতিব সংবাদ গিয়ে পৌঁছুল নাটোবেব গুণগ্রাহী স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ বায়েব কানে। আব যায় কোথায়। তখনই তলব পড়ল রাজু ঠাকুরের কলকাতায় নাটোবের বাজবাড়িতে। দিনকতক খেলাধুলায় তাঁকে পবখ কবা হয় এবং অচিবে তিনি বহাল হলেন বিখ্যাত নাটোব ক্রিকেট দলেব উইকেট কীপাব রূপে। খুবই নাম কবেছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ বড়ো খেলায় তিনি নেমেছেন মহা মহা রথীদের সঙ্গে। সবাই জানে

যে ক্রিকেট ম্যাচে দুপুরের বিবতিব সময় বেশ বড়োরকমের ভোজ হয়। রাজু ঠাকুর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাবুর্চির রান্না খানা টেবিলে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া কখনো তিনি করতেন না। তাঁদের ছোঁয়া জলস্পর্শও তিনি কবেন নি কখনো। তিনি বাইবে থেকে বডো জোব একটি ডাব কিনে খেতেন। কিন্তু খেলেই তো জীবন চলে না। এ জন্যে তাঁকে মোটব গাডি চালানো শিখতে হয়েছিল। লাইসেন্স হবাব পর তিনি দাদাবাবু চিত্তবঞ্জনেব বলিয়েট গাডি চালাতেন। মোটব ড্রাইভাবের কাজ কবলেও তাঁকে ববাববই পুবোহিতেব সম্মান দেওয়া হত মৃত্যু পর্যন্ত। এ সম্মান স্বভাবগুণেই তাঁব প্রাপ্য ছিল।

দক্ষিণেব বাডিব কুলপুবোহিত ছিলেন বামচন্দ্র চক্রবর্তী ওবফে রাম ঠাকুব। পাতলা ছিপছিপে ছোট্টখাট্ট গৌববর্ণ মানুষ। বাম ঠাকুবের আর্থিক অবস্থা একেবাবেই সচ্ছল ছিল না, কিন্তু তাব জন্য তাঁকে নিজের ভাগ্যেব উপব দোষাবোপ কবতে কখনো শোনা যেত না এবং সেই অজুহাতে তাঁব কারুব উপব কোনো দাবি-দাওয়াও ছিল না। আমার মা তাঁকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা কবতেন। গ্রামস্থ সবাইয়েব সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবব নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। সবাই তাঁকে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা কবত। তাঁব বডো ছেলে এখন মীবাটে সবকাবি কাজ কবেন ও ছোটো ছেলে বোধ হয় দক্ষিণ কলকাতায় চারুচন্দ্র কলেজেব বড়োবাবু।

আর মনে পডে লাখু ঠাকুবকে। তাঁব ভালো নাম একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু আমি তো কখনো শুনি নি। শুনে থাকলেও ভুলে গেছি। অনুমান কবি লক্ষ্মণ কিংবা ঐ ধবণেব কোনো নাম তাঁব ছিল। ইদানীং দু-একজনকে জিজ্ঞাসা কবেছি, তাঁরা যেন আমাব প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁবা তো জানেন লাখু ঠাকুব ববাববই লাখু ঠাকুব। মায়েব কাছে শুনেছি যে কিশোব বয়সে লাখু ঠাকুবেব দৌবাত্ম্যে নাকি বাগানেব ফল ফুল কিছু থাকত না। নষ্টচন্দ্র ও অন্যান্য উদ্ভট উপদ্রবে গ্রামবাসীদেব তিনি না কি ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। গ্রামেব সবাই লাখু ঠাকুবেব উপব যতই মাবমুখো হয়ে উঠত মধ্যের বাডিব মেজোগিন্নী দুর্গামোহনেব সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী নাকি ততই লাখুকে আগলিয়ে রাখতেন, মা যেমন করে দুরন্ত ছেলেকে আগলিয়ে রাখেন গুরুজনদের শাসন থেকে। লাখু ঠাকুরের ডানপিটেমিব অন্ত ছিল না কিন্তু তাঁর একটি গুণের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারত না। গানের গলা

ছিল তাঁর অসাধারণ সুমিষ্ট। ছোটো বয়সে আমি যখন লাখু ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন। তখন তিনি সংসারী এবং ছেলেপেলেও ছিল। একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের খ্যাতি তখন বেশ চালু হয়েছে। গ্রামের বৃদ্ধারা বলতেন, 'বাপের সুগুণটুকু পায়েন নাই, কুগুণটুকু পাইছেন ঠিকই।' লাখু ঠাকুরের গান আমিও শুনেছি। গভীর রাত্রে 'পুরৈত পাড়া'র দিক থেকে গম্ভীর গলায় গান ভেসে আসত দক্ষিণ বাতাসে খালের উপর দিয়ে। সে কি রামপ্রসাদী সুরের মূর্ছনা। দরাজ গলায় গানের প্রতিটি কথা স্পষ্ট শোনা যেত। শেষের দিকে লাখু ঠাকুর ঢাকার কাছাকাছি কোনো জায়গায় এক ভাঙা কালীমন্দিরের জবর দখল করে নাকি সেবাইত হয়ে বসেছিলেন। সেই মন্দিরের জমিজমা নিয়ে কি যেন মামলা হয়েছিল তারই কাগজপত্র নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন 'সতীশেরে দেখাইতে'। আমার বাবা-মাকেও দেখে গেলেন। চুলে তাঁর তখন জট বাঁধতে শুরু করেছে এবং পরনে টুকটুকে লাল রঙের ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা এবং গায়ে লাল রঙের কুর্তা ও চাদর। আমি তখন বিলেত থেকে সদ্য ফিরে হাইকোর্টে নাম লিখেয়েছি। লাখু ঠাকুর কাগজগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'সতীশেরে দেখাইছি। হ্যায় কইল বাদীপক্ষের আর্জিটা প্রলিকস্। আমার জবাবদাওটা সে-ই দেইখ্যা দিছে।' সতীশ-রঞ্জন তখন বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল। পুরানো দিনের সম্পর্কের দাবিতে লাখু ঠাকুর তখনো তাঁকে 'সতীশ' বলেই ডাকতেন। অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দিয়ে যখন জবাবদাওয়াটা পাস করিয়ে এনেছেন তখন লাখু ঠাকুর আমার মতো অর্বাচীন ব্যারিস্টারকে কাগজপত্র দেখানো দরকারই মনে করলেন না। সেই মামলার শেষ পর্যন্ত কি ফলাফল হল তা আর শুনি নি এবং লাখু ঠাকুর এখনো বেঁচে আছেন কি না-তা-ও জানি নে। এতদিন বেঁচে থাকবার কথা নয়।

'সিকদার-বাড়ি'র মহিমচন্দ্র হোড় ছিলেন আমার ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মধ্যের বাড়ির বড়ো ও মেজো-বাবু কালীমোহন ও দুর্গামোহন-এর বেয়ারার কাজ নিজে হাতে-কলমে করেছেন। দুর্গামোহন দেশে আসলে তাঁর 'মহিমভাই' ছাড়া চলতই না। এইসব মহারথীদের সঙ্গে যাঁর কারবার ছিল আমার মতো চুনোপুঁটি ভুঁইঞা যে তাঁর আমলেই পড়বে না তাতে আশ্চর্য হবার আর কি আছে। মহিমজ্যাঠা আমাদের কাছে তাঁর

পুরানো মনিবদের অনেক গল্প বলতেন। সেই গল্প থেকেই তাঁদের উপরে মহিমজ্যাঠার স্নেহ ও সম্ভ্রম স্পষ্ট অনুভব করতাম। আমি যখন দেশে যেতাম মহিমজ্যাঠা তখন অবসরপ্রাপ্ত বেয়ারা। কাজ না থাকায় বাড়ির মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে খিটিমিটি তাঁর লেগেই থাকত। সেবার তাঁদের বাড়ির মেয়েরা কি যেন ব্রতপালন করছিলেন। সেখানে গিয়ে শুনলাম মহিমজ্যাঠাও নাকি ব্রত করবেন। শুনে অবাক! পুরুষ মানুষ কে আবার করে ব্রত করে? মহিমজ্যাঠা বললেন, 'জানস না, মাইয়ারা বর্‌ত করে ভালো খাওনের লাইগ্যা। বর্‌ত করলে যদি ভালো খাওন যায় তবে আমিই বা বর্‌ত করুম না ক্যান।' বুঝলাম যে এ সওয়াল জবাব অকাট্য। মহিমজ্যাঠার বড়ো ছেলে জগদীশ ওরফে জগাদা ভাবতেন যে তিনি একটা কিছু হলেও হতে পারতেন কিন্তু কি একটা অজানা কারণে যে হলেন না তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতেই পারল না। কারণটা 'জগাদা' নিজেই জানতেন কি না জানি না, অন্তত কাউকে স্পষ্ট করে সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। বার কয়েক দেশের হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে জগাদা গ্রামেই বসে গেলেন, কেননা এত মুরুব্বীস্থানীয় মনিব থাকতেও কেউ তার জন্যে কিছু করলেন না। অবশেষে মহিমজ্যাঠার খাতিরে তাঁর প্রাক্তন মনিব দুর্গা-মোহনের কৃতী সন্তান সতীশরঞ্জন আমাদের জগাদাকে শ-পাঁচেক টাকা দিলেন ঘিয়ের ব্যাবসা করতে। মাস কতক জগাদা তেলিরবাগের ও আশেপাশের গ্রামের গোয়ালাদের কাছ থেকে খাঁটি ঘি কিনে কলকাতায় নিয়ে জানাশোনা বহু বাড়িতে বিক্রি করে বেড়ালেন। সবাই ভাবল জগাদার একটা সুরাহা হয়ে গেল। ভাগ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যায়। অজানা কি কারণে এবং কার যেন কি দোষে জগাদার সে ব্যাবসাও ফেঁসে গেল। কারণটা যে কি এবং দোষটা যে কার আজ পর্যন্ত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতারা কেউ জানতে পারে নি। জগাদা একটা অনির্দিষ্ট দুষ্টগ্রহের প্রকোপে পড়ে হাত গুটিয়ে দেশের বাড়িতেই বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দিলেন। মহিমজ্যাঠার ছোটো ছেলে মরইনার বয়স ছিল আমারই সমান। খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে তিনি ছিলেন। সুমিষ্ট ব্যবহার, মুখে তাঁর হাসি লেগে থাকত। দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের পিতা আমার জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের ফুট-ফরমাইস খাটবার জন্যে তাকে পুরুলিয়াতে পাঠান হয়েছিল। জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের মৃত্যুর পর মরইনা কলকাতায় কালীমোহন আলয়ে দাদাবাবু

চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জনের বেযারার কাজে লেগেছিলেন। খুবই কম বয়সে মরইনা মারা গেছেন। তাঁব মৃত্যুতে মনে খুব ক্লেশ পেয়েছিলাম তিনি আমাদেব খেলাধূলাব সাথী ছিলেন বলেই।

তেলিববাগেব কাওলী-বাড়ির লোকেদেব বাজনার জন্যে খুব সুনাম ছিল। বামকানাই কাওলীব ব্যাণ্ড পার্টির নাম এবং তাঁর নিজেব অপূর্ব ঢোল বাজনার খ্যাতি ঢাকার সবাই জানত। শ্যামাচবণ ও হবিচরণ কাওলীর যাত্রাব দলও ছিল সুপ্রসিদ্ধ সেই আমলে ঢাকা ও আসামে।

চাঁড়াল-বাড়িব ডেঙ্গব আমাব মায়েব খুবই অনুগত ছিলেন। তিনি গ্রামেই ছুতাব মিস্ত্রিব কাজ কবতেন। একবার ডান কি বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা বাটালি পবে গিয়ে অথবা অন্য কোনো কাবণে বুড়ো আঙুলে খোঁচা খেয়ে ঘা হয়ে সে আঙুল পেকে ওঠায় তাকে একেবাবে অস্ত্রোপচাব কবে কেটে ফেলতে হয়েছিল। সে সময় তিনি আমাদেব বাড়িতে ছিলেন এবং মা তাঁব অনেক সেবা-শুশ্রূষা কবেছিলেন। তিনি মাকে ডাকতেন 'সোনাখুড়ি' আব আমবা ভাই-বোনেরা তাঁকে ডাকতাম 'ডেঙ্গর ভাই' বলে। খুব আপনজনেব মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। আমাব মা প্রাচীন কালের বয়স্কা স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও আমাদেব 'ডেঙ্গব ভাই'দেব দুটি ছেলে দুর্গামোহন ও প্যাবীমোহনকে আমাদেব হাজবা বোডের বাড়িতে ঘবের কাজেব জন্যে বেখেছিলেন। এদেব জল অশুদ্ধ বলে কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য কবেন নি। সেই দুই ছেলে এখন কোথায় আছে, কি কবছে কিংবা আদৌ আছে কি না তাব খবব জানি নে। তাদেব সব চেয়ে ছোটো ভাই অমূল্য গ্রামে ডানপিটেমি কবে বেড়াতেন। পবে স্বদেশী আন্দোলনেব সময় ভলান্টিয়াবী কবতেন এবং এখন বলেন যে নাবায়ণগঞ্জেব এক অত্যাচাবী ইংরেজ সাহেবকে মেবে ফেলে নাকি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি ধবা পড়েন নি। এখন তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন এবং পলিটিক্যাল সাফাবাব বলে বাংলা সবকাবেব কাছ থেকে একটি বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

গ্রামেব মধ্যে দিয়ে যে খাল ছিল তাব দক্ষিণ পাড়ে পুরবতপাড়া ও দক্ষিণের বাড়িব মাঝখানে বারুই অঞ্চলের দত্ত-বাড়ির দুজনকে বেশ মনে আছে— যোগেন্দ্র ও তার ছোটো ভাই যতীন্দ্র। যোগেন্দ্র ভাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস কবে কিছুদিন তেলিরবাগ স্কুলেই মাস্টারী

করে কলকাতায় গিয়ে মধ্যের বাড়ির সতীশরঞ্জনের ব্যক্তিগত সহায়ক-রূপে কাজ করে অবশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কয়েক বছর কাজ করে ১৯৫৬ সালে অবসর নিয়েছেন। যতীন্দ্র ১৯২০ সালে বি. এ. পাস করেন কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে আর বেশি পড়তে পারেন নি। ইনিও তেলিররাগ স্কুলে মাস্টারী ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাজ করে নেপালের রাজ-কুলপুরোহিতের বাড়ির ছেলেদের গৃহশিক্ষক হয়ে দু বছর কাজ করেছিলেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের আফিসে পাঁচ বছর কাজ করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত সহায়ক হয়েছিলেন। তার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পদে কাজ করে ১৯৫৯ সালে অবসর নিয়ে এখন গোবিন্দনিবাস গ্রামে নানা জনকল্যাণ কাজে ব্যাপৃত আছেন। এই দুটি ভাই আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মধ্যের বাড়ির গৃহদেবতা কালাচাঁদ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্যে ছিলেন গোঁসাই পূজার পুরোহিত রামমণি ঠাকুর। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামবাসী, কিন্তু সপরিবারে তেলিররাগেই থাকতেন। লম্বা ছিপছিপে রোগা মানুষ— গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে গ্রামের সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তাঁর একমাত্র পুত্র চন্দ্রকুমার অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং বলতে গেলে গোবেচারী মানুষ ছিলেন। গ্রামের হাইস্কুলেই পড়তেন। বেশ কয়বার এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল ক'রে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়েছিলেন। চন্দ্রকুমার ঢাকুরিয়ার ললিত জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চাকরির অনেক চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। পসার কতদূর হয়েছিল বলতে পারি না। তাঁর বড়ো ছেলেটি— নাম ভুলে গেছি, তিনি লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছেলে হয়েছেন। যাদবপুর থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করে একটি বৃত্তি পেয়ে তিনি অক্সফোর্ডে পড়তে গেছেন। ফিরেছেন কি না খবর পাই নি।

গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষকে তেমন মনে পড়ছে না। তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ না করার মানে এই নয় যে তাঁরা স্মরণীয় নন। বার্ধক্যহেতু আমার স্মৃতিশক্তির ক্ষয়ই এই অনুল্লেখের একমাত্র কারণ। বালক বয়সে যাঁদের দেখেছি সে-সব মানুষের অধিকাংশই আজ আর ইহজগতে নেই। যাঁদের বয়স অল্প ছিল তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো

এখনো জীবিত আছেন। কিন্তু আমাদের গ্রামখানি পদ্মার কুক্ষিগত হবার ফলে তাঁবা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে নূতন আবাস তৈবি করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাব সংস্পর্শ একরকম নেই বললেই চলে। গ্রাম চলে গেছে, গ্রামের সেই মানুষবাও আজ নেই যাঁদের প্রভাব অলক্ষ্যে আমার জীবনকে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তবু তাঁদেব কথা ভাবতে এবং বলতে মনে আনন্দ ও শান্তি অনুভব কবি।

দ্বিতীয় পর্ব

জন্ম ও শৈশব

নবম অধ্যায

পিতামাতার বিবাহ

তেলিরবাগের পশ্চিমের বাড়িব বতনকৃষ্ণ দাশেব দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন আমাব পিতামহ গোপীমোহন। গোপীমোহন পদ্মাব দক্ষিণ পাবের কোনো গ্রামেব এক কন্যাকে বিয়ে কবেছিলেন। তাঁব ভালো নাম ছিল হবসুন্দবী এবং ডাকনাম ছিল ট্যাপালক্ষ্মী। গোপীমোহন বর্ধমান বাজ এস্টেটে সামান্য মুন্সিয়ানা চাকুবি কবে কোনোমতে সংসাব চালাতেন। গোপীমোহনের অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল কিন্তু সবাই দু তিন বছব বয়সেই মারা গেছেন। একটি ছেলে নগেন্দ্র সাত বছবের হয়েছিলেন কিন্তু একদিন বাত্রে তিনি পান মুখে কবে শুয়েছিলেন এবং ঘুমেব ঘোবে সেই চিবানো পান গলায় ঠেকে বিষম খেয়ে শ্বাসবোধ হয়ে নগেন্দ্র মাবা যান। আমাদেব মা বিযেব পব তেলিরবাগে এসে এই কথা শোনেন এবং আমাদেব উপব কড়া হুকুম ছিল কখনো রাত্রে পান মুখে কবে শোয়া চলবে না। গোপীমোহনেব বডো মেয়ে বেশ বয়স পেয়েছিলেন। বডো মেয়েটিব বিয়ে হয়েছিল কামাবখাডা গ্রামের প্রাণহরি সেনেব সঙ্গে যিনি পবে একসময় তেলিববাগ কে. এম. ডি. এম. স্কুলের হেডমাস্টাব হয়েছিলেন। ছেলে কেউ বাঁচে না দেখে বংশলোপের ভয়ে গোপীমোহন ও হবসুন্দবী উভয়েরই খুব মন খাবাপ ছিল। এমন সময় তাঁবা শুনলেন যে বর্ধমানেব কাছেই কোনো এক গ্রামে 'বাখাল রাজা' বলে যে এক জাগ্রত বিগ্রহ আছেন তাঁব কাছে শুদ্ধমনে নিবিষ্টচিত্তে আত্মসমর্পণ কবলে ঠাকুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবেন। পাডাপডশীব পবামর্শে হবসুন্দবী সেই বাখাল রাজা ঠাকুবেব মন্দিবে গিয়ে হত্যা দিলেন। শেষকালে ঠাকুব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে এব পর শিগ্‌গিব তাঁব এক ছেলে হবে এবং সে ছেলে দীর্ঘজীবন লাভ কববে। হৃষ্টচিত্তে হবসুন্দবী ফিবে এলেন বাড়িতে। তার পব যথাসময়ে জন্মালেন এক সুদর্শন ছেলে। বাখাল রাজা ঠাকুরের অনুকম্পায় ছেলে হয়েছিল বলে ছেলেব নাম হল রাখালচন্দ্র। এই বাখাল-চন্দ্রই হলেন আমাদেব পিতা।

উপর্যুপরি কয়েকটি ছেলে শৈশবেই হাবিয়ে আমাদেব ঠাকুমা হরসুন্দরী বাবাকে বাক্সের মধ্যে তুলো দিয়ে ঢাকা আঙুবের মতো যত্নে রাখতেন।

কিন্তু তবু তাঁর মন মানে না— কি জানি যদি এই ছেলেও চলে যায়। যদিও ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছিলেন ঠাকুমাকে যে তাঁর এই ছেলে দীর্ঘায়ু হবে তবু মায়ের মন বোঝে না। ঘরপোড়া গরু যেমন আগুন দেখলেই ভয় পায় তেমনি বাবাব এতটুকু সর্দি-কাশি হলেই ঠাকুমা ঘাবড়িয়ে যেতেন। ঠাকুমা আবার চললেন 'রাখাল রাজা' ঠাকুবের মন্দিরে— বাবার দীর্ঘায়ু কামনা করাব জন্যে, না, আব একটি ছেলেব কামনায় যাতে কবে দুজনেব একজন অন্তত বেঁচে থাকবে তা জানি নে। ঠাকুমা কি আশ্বাস পেলেন এবাব জানা গেল না, কিন্তু অল্পদিন পবেই তাঁব আব একটি সন্তান হল মেয়ে। ঠাকুবেব দয়ায় যখন মেয়ে তখন তাব নামকবণ হল 'বাখালী'। এই বাখালীই হলেন আমাদের আপন ছোটো পিসিমা।

বাখাল আব বাখালী পিঠোপিঠি দুই ভাইবোন একসঙ্গে মানুষ হতে লাগলেন। এইবকম কাছাকাছি ভাইবোন হলে যা হয়, এঁদেবও তাই হল। অর্থাৎ ভাবও যেমন ছিল ঝগড়াও হত তেমনি। আব তা ছাড়া বাবা ছেলে হওয়ায় ঠাকুমা তাঁব বাযনা বেশি শুনতেন বলে বাখালীর অদৃষ্টে ঠাকুমার মুখঝামটা তাকে প্রায়ই নাকি খেতে হত। মাব কাছে শুনেছি বাবার অসুখ হলে যখন তাঁব ভাত বন্ধ এবং সাগু খেতে হত তখন নাকি বাখালীবও সাগু খাবাব ব্যবস্থা হত। সন্দেহভঞ্জনেব জন্যে বাবা নাকি তাঁব বোনের মুখেব কাছে মুখ নিয়ে শুঁকে দেখতেন বাখালী আব-কিছু খেয়েছে কিনা। মা যখন আমাদেব এ-সব গল্প বলতেন তখন বাবা শুনে হাসতেন এবং 'ধ্যাৎ' ছাড়া আব বড়ো কিছু ওজব আপত্তি কবতেন না। এই সময় থেকেই ঠাকুমা বাবাব খাবাব যে ধবাবাঁধা ব্যবস্থা কবেছিলেন বাবা সেই ব্যবস্থামতই বরাবর খেয়েছেন আমাব বিয়ে পর্যন্ত। সিদ্ধচালেব ভাত, মুসুবিব ডাল, পাতলা মাছেব ঝোল দু এক টুকবা কচি পটল সমেত ও একবাটি দুধ-ভাত। মুসুবির ডাল ছাড়া অন্য ডাল বাবা কখনো খেতেন না, খেলেই নাকি অম্বল হয়ে গলা জ্বালা কববে। এটা তাঁব মনেব বিকাব, না সত্যি, তা জানি নে। তবে দেখেছি শেষ বয়সে আমার স্ত্রী এটা-ওটা বেঁধে দিলে খেয়ে নিতেন। অম্বল হয়েছে বলে তো শুনি নি কোনো দিন।

এই সময় দৈব দুর্বিপাক ঘটল পবিবাবেব মধ্যে। অকস্মাৎ আমাদের ঠাকুর্দা গোপীমোহন অন্ধ হয়ে গেলেন। তাঁব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নিরুপায় হয়ে স্বগ্রাম তেলিববাগে ফিবে এসে সেইখানেই বয়ে গেলেন।

অতি কষ্টে সংসার চলত। খাজনার টাকা বা ভাগ-প্রজাদের কাছ থেকে যা ধান পাওয়া যেত তাই কুটে চাল করে তাই দিয়ে খাওয়া হত। আশপাশের জমি থেকে শাকসব্জি যখন যা পাওয়া যেত তাইতেই হত ব্যঞ্জন। মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহন দাশ আমার ঠাকুমাকে খুব ভালোবাসতেন। যখনই তিনি দেশে আসতেন তখনই তাঁর সোনাখুড়ির সংসারের লোকেদের পরনের কাপড-জামা আনতেন ও নগদ কিছু টাকাও দিতেন আমাদের ঠাকুমার হাতে।

কথায় বলে বিপদ যখন আসে তখন একলা আসে না। সময়মত রাখালীর বিয়ে হল বিক্রমপুরস্থ সোনারঙ গ্রামের তারকেশ্বর সেনের সঙ্গে। ক্রমান্বয়ে আমাদের সেই ছোটো পিসিমার চারটি ছেলে হয়েছিল অপূর্ব-কুমার, রোহিণীকুমার, রেবতীমোহন ও রমণীমোহন। ছোটো ছেলে রমণী-মোহনের বয়স যখন খুবই কম তখন আমাদের ছোটো পিসেমশায় স্ত্রী ও চারটি সন্তান ফেলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ছোটো পিসিমার ছিল বাতের ব্যায়রাম। তিনি চারটি ছেলের হাত ধরে অন্ধ পিতার আশ্রয়ে তেলিররাগ গ্রামে এসে উঠলেন ঐ অনটনের সংসারে। মেয়েকে ও নাতিদের বুকে তুলে নিলেন আমাদের ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা। তাঁরা সবাই দৈন্যদশার মধ্যেই দিন কাটাতে লাগলেন। ক্রমশ ছোটো পিসিমা বাতের ব্যথায় পঙ্গু ও চলৎশক্তিরহিত হয়ে শয্যা নিলেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ছোটো ছেলে রমণীমোহন (টোনাদাদা) যখন এগারো বছর বয়সের তখন ছোটো পিসিমা মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করলেন। ছোটো পিসিমা মারা যাবার বহু বছর পরে যখন অপূর্ব (বড়ো দাদা) ও রমণী (টোনাদাদা) রেঙ্গুনে ছিলেন কর্মব্যপদেশে তখন ছোটো পিসেমশায় ফিরে এসে দেখা দেন। রেবতীর (সোনাদাদা) কলকাতায় বলরাম বোস ঘাট রোডের বাড়ির সামনের রকে বসে থেলো হুঁকায় চোখ বুজে সুখটান দিতে দেখেছি ছোটো পিসেমশায়কে পরম নিশ্চিন্তভাবে, যেন দুনিয়ায় কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনাই ঘটে নি। এর অল্পদিন পরে ছোটো পিসেমশায়ও মারা গেলেন।

আমাদের পিতা বাল্যবয়সে দেশেই পড়াশুনা করেন। শুনেছি তিনি প্রথমে রাজকুমার চন্দ ওরফে নদের চাঁদ পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায় পড়েছিলেন। এই পণ্ডিতমশায়কে গ্রামের লোকেরা গ্রাম্যভাষায় বলতো নদি পণ্ডিত। বাবা প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামেই ছাত্রবৃত্তি পড়েন। একমাত্র জীবিত ছেলেকে যতদিন নিজের কাছে চোখে

চোখে রাখা যায়— এই ছিল ঠাকুমার মনোগত ইচ্ছা। কে জানে, কখন ছেলের কি অসুখ-বিসুখ করে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বাবা ভালোভাবেই পাস করেছিলেন বলে শুনেছি। ছাত্রবৃত্তি পাস করাব পর প্রশ্ন উঠল— ভত: কিম্। ছেলেব যদি পডাশুনা কবতেই হয় তবে তাকে বাইরে না পাঠিয়ে উপায় নেই। তেলিববাগে তখনো হাইস্কুল হয় নি। ঠাকুমা আর কি করেন, ছেলেকে ঢাকায় পাঠাতে হল হাইস্কুলে পডতে। তখন বাবার খুল্লতাত কেদাবেশ্বব ঢাকায় মুনসেফ, না, সবজজ। বাবা সেখানে গিয়ে খুডা-মশায়েব বাড়িতে থেকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। গ্রামেব স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ায় বাবাব বয়স একটু বেশিই হযেছিল। বাবা তেবো-চোদ্দো বছব বয়সে ঢাকায় ইংবেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। তখন সেখানে একজন ব্রাহ্ম যুবক মাস্টাব ছিলেন যাঁব নাম ছিল বজনীকান্ত ঘোষ। বাবাব কাছে সেই ধর্মপবায়ণ, চবিত্রবান মাস্টাবেব অনেক গল্প শুনেছি। ছেলেবা ময়লা নোংবা কাপড পবলে তিনি বলতেন, 'কাপডটা ভালো করে নিজ হাতে কেচে নিতে কষ্ট নেই কিছু। আলস্য ত্যাগ কবে তাই করাই উচিত, কেননা ক্লিনলিনেস ইজ নেক্স্ট টু গডলিনেস।' এই সময়ে বাবার সঙ্গে কে কে পডতেন তা বিশেষ কিছুই শুনি নি। যখন এই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে বাবা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলেন কিংবা উঠব-উঠব কবছেন তখন তাঁর বয়স পনেবো ছাডিয়ে গিয়েছিল। তখনই তাঁর বিয়ে হল বিক্রমপুরস্থ হাসাড়া গ্রামেব পীতাম্বব সেনেব চতুর্থ পুত্র ও ঢাকার উদীয়মান উকিল কৈলাসচন্দ্র সেনেব একমাত্র কন্যা বিনোদিনীব সঙ্গে।

বিক্রমপুবস্থ হাসাড়া গ্রামটি একটি বডো এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটিব চারিপাশে বিস্তৃত বিল। শুনেছি হাসাডাব বিলটি বিখ্যাত আইবল বিলেবই একটি অংশ। শ্রদ্ধেয় হবেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়েব 'বিক্রমপুব' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একসময়ে হাসাডাব ঘব ও লোক -সংখ্যা ছিল এইবকম—

মোট বাডিব সংখ্যা	১৬০৫
লোকসংখ্যা হিন্দু পুরুষ	২৬১৪
„ স্ত্রী	৩০৬৮
মুসলমান পুরুষ	৮৯৪
মুসলমান স্ত্রী	৯৫৩
মোট জনসংখ্যা—	৭৫২৯

গ্রামে ইংরেজি স্কুল ও পোস্ট আফিস ছিল এবং এখনো আছে গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্যে। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ গিরীশ মুন্সী ছিলেন বিশেষ নামকরা লোক। ঘোষেদের বাড়ি ছিল খুব শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবার। কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য জজ সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ যিনি ঐ হাই-কোর্টের অনেকদিন অস্থায়ী মুখ্য বিচারপতি হয়েও কাজ করেছেন তিনি হাসাড়া গ্রামের ঘোষেদের বাড়ির তথা বিক্রমপুরের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁর তিন পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র, সতীশচন্দ্র এবং সুরেন্দ্রচন্দ্র। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের বড়ো উকিল ছিলেন। তা ছাড়া তিনি হিন্দু আইন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বই লিখেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি গরিব কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে লেখাপড়া করবার সুযোগ দেবার জন্যে অনেক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। সার্ চন্দ্র-মাধবের দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন উকিল যাঁর ছেলে বিমলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে বেশ বড়ো ব্যারিস্টার বলে খ্যাতি পেয়ে গেছেন। ছোটো ছেলে সুরেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন অ্যাটর্নি। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি বাবা ও দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)এর সঙ্গে পড়তেন ও একসঙ্গে বি.এ. পাস করেন। কলকাতায় ভবানীপুর হরিশ মুখার্জি রোডে সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়িতে ছিল তৎকালীন যত গণ্যমান্য লোকদের যাতায়াত। হাসাড়া ঘোষেদের বাড়ির মহেন্দ্র ঘোষ ছিলেন ঢাকার বড়ো উকিল ও হরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সোমের বাড়ির মাখন সোম ছিলেন স্কুলের মাস্টার। রায়েদের বাড়ির রমেশ রায়ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। এই রায়বাড়ির সুধীর রায়ের সঙ্গে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)এর বড়ো কন্যা অপর্ণা (মোনা) বিয়ে হয়। হাসাড়ায় আরো কয়েক ঘর বৈদ্য ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমেশ সেন যিনি কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ; তাঁর ভাই আলিপুরের উকিল গুণেশ সেন যাঁর সঙ্গে আমার বড়ো মামার ছোটো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এবং দীনেশ সেন যিনি ছিলেন মুনসেফ। এ ছাড়া আর এক ঘরে ছিলেন দুই ভাই পীতাম্বর ও নীলাম্বর সেন। তাঁদের পদবী ছিল সেন কিন্তু মুন্সী বলেই তাঁরা পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় কোনো খেতাব পেয়ে থাকবেন। পিতৃবিয়োগের পর পীতাম্বর ও নীলাম্বর পৃথক হয়ে নীলাম্বর হাসাড়াতে অন্য বাড়িতে চলে যান। নীলাম্বরের ছেলে দীনবন্ধু, তিনি পরে উকিল হয়ে বরিশালে প্রভূত

খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করে বিস্তৃত ভূসম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর বরিশালের বসতবাড়িটি, তাঁর বিলাতি ঘোড়া ও গাড়ি নাকি দেখবার মতো ছিল। তাঁর বড়ো ছেলে আমাদের যোগেন্দ্রমামা খুব ভালো শিকারী ছিলেন। পীতাম্বব সেন বা মুন্সীর ছিল পাঁচটি ছেলে কালীকিশোব, হবকিশোর, বাজকিশোর ও যমজ দুই ছেলে তাবিণী ও কৈলাস। বাজকিশোব অল্প বয়সেই মাবা যান। পীতাম্ববেব দুটি মেয়ে ছিল— অন্নদা— যাঁব বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুর বিদগাঁও গ্রামেব মহিম দাশগুপ্তেব সঙ্গে— এবং শশিমুখি। মহিম দাশগুপ্তেব একমাত্র পুত্র ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কালীকিশোবের ছেলে ছিল না— ছিল একটি মেয়ে। কালীকিশোব পৈতৃক বিষয়ে আপন হিস্যা থেকে হাসাডা গ্রামে উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয় স্থাপন কবে গিয়েছিলেন। সে স্কুলেব নাম ছিল কালীকিশোব এইচ.ই. স্কুল। হাসাডা পাকিস্তান হয়ে যাবার পব সে স্কুলেব নাম বজায় আছে কিনা আমার জানা নেই। হবকিশোবের ছিল দুই স্ত্রী কিন্তু দুজনেই নিঃসন্তান। যমজদেব মধ্যে যেটি বড়ো তাবকচন্দ্র তাঁব ছিল এক মেয়ে কুমুদিনী। তাঁব সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সোনাবং গ্রামের বিশাবদ-বাডিব দেবেন্দ্র সেনেব। কুমুদিনীব এক ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও এক মেয়ে লক্ষ্মী। তাবকচন্দ্র অপুত্রক হওযায় তিনি আপন যজমভাই কৈলাসেব ছোটো ছেলে যতীন্দ্রনাথকে পোষ্য নেন। ভগবানেব মাব কে খণ্ডাতে পাবে। যতীন্দ্রনাথ বিবাহেব অল্পকাল পবেই তাবকচন্দ্রেব জীবদ্দশায় একটি নাবালিকা পত্নী বেখে মাবা যান। কৈলাস ছিলেন প্রথমে ববিশালেব এবং পবে ঢাকাব নামকরা উকিল। কিছু দিন তিনি কলকাতায়ও এসেছিলেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই আমলে কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং বক্তৃতাও দিয়েছেন শুনেছি। এই কৈলাসেব যতীন্দ্র ছাডা আবো তিনটি ছেলে ছিল— যোগেশ, বঙ্কিম ও অতুল। যোগেশ কবতেন কবিবাজী, বঙ্কিম কবতেন ঘববাডি তৈবিব কনট্রাকটাবী কাববাব, অতুল ঢাকা আসানুল্লা স্কুলেব পাস-কবা ওভাবসিয়াব হযে আপন ভাই বঙ্কিমেব কাববাবে যোগ দেন। কৈলাসেব একমাত্র মেয়ে ছিলেন বিনোদিনী। সেই বিনোদিনীব বিয়ে হয় তেলিববাগেব পশ্চিমেব বাড়ির গোপীমোহনেব একমাত্র পুত্র বাখালচন্দ্রেব সঙ্গে। তখন কনের বয়স ছিল দশ এবং ববটিব পনেরো এবং পডতেন তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এই বাখালচন্দ্র ও বিনোদিনীই হলেন আমাদেব বাবা ও মা।

শুনেছি বাবার বিয়েব সম্বন্ধ পাকা কবতে তেলিরবাগ থেকে একজন ভারিক্কি ধরণের জ্ঞাতি পুবের বাড়িব লালবিহাবী জ্যাঠামশায় গিয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্রেব বাসভবনে। কৈলাসচন্দ্র তখন ঢাকায় ওকালতি কবেন এবং তাঁর বেশ পসার হয়েছিল এব আগেই। সেখানে কি কথাবার্তা হল তার বিবরণ সবটা জানিও না এবং বলবাবও দবকাব নেই। মোট কথা হল বিবাহের যাবতীয় সর্তাদি লিপিবদ্ধ কবে একটি সরু লম্বা কাগজে দুই পক্ষ সই কবলেন। এই 'নির্ণয় পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে'র একটি কপি নিয়ে লাল-বিহাবী জ্যাঠামশায় তেলিববাগ ফিবে গেলেন। এই 'নির্ণয়-পত্রটি' পরে মায়েব হাতে আসে এবং সেটিকে তিনি খুব সযত্নে বক্ষা কবতেন, এখনকার মেয়েবা যাঁদেব বেজিস্ট্রাবেব কাছে বিয়ে হয় তাঁবা যেমন যত্ন কবে বাখেন বেজিস্ট্রাব ও বিয়েব সাক্ষীদেব সই-কবা ও সীলমোহব-লাগানো তাঁদের বিবাহেব নিদর্শন-পত্রটি। ওই নির্ণয়-পত্রটি আমি দেখেছিলাম এবং পড়েও ছিলাম। সেই নির্ণয়-পত্র থেকে জানা যায় সেকালেব লোকেবা কেমন আট-ঘাট বেঁধে বিয়েব সম্বন্ধ করতেন। খুবই দুঃখেব বিষয় যে সেই নির্ণয়-পত্রটি অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিসেব সঙ্গে বাড়ি বদলেব হিড়িকে কোথায় হাবিয়ে গেছে। মোদ্দা কথা এই মনে আছে যে কন্যাব পিতা বিবাহেব পব জামাতার পড়াশুনাব সকল ব্যয় বহন কবরেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গহনা কত ভরিব হবে তাবও উল্লেখ ছিল, কিন্তু বিস্তাবিত ফর্দেব কথা আমাব মনে নেই। তা ছাড়া ছিল একটা শর্ত যে ববকে যথোপযুক্ত সম্মানেব সঙ্গে চলন করে নিয়ে যেতে হবে এবং বরযাত্রীদেব বাহা-খবচা কন্যাব পিতাই দেবেন।

সন তাবিখ যা শুনেছিলাম মায়েব কাছে তা ভুলে গেছি— আমাদের বাবা-মায়েব বিয়ে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। শুনেছি বব নিয়ে যাবার জন্যে আমাব দাদামশায় একটা হাতী ও ঢাকা থেকে গড়ের বাজনাও পাঠিয়েছিলেন। বড়ো হয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা কবেছি, 'দিদিমাগো, তোমাব কর্তা তো বড়ো লোক আছিলেন। তোমবা কি দেইখ্যা পনেরো বছবের বয়স থার্ড ক্লাসেব পড়ুয়া পোলা যাব বাপ অন্ধ তাব লগে তোমাগো একমাত্র মাইয়াব বিয়া দিছিলা।' দিদিমা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আরে সেই আমলে মাইনূসে মাইয়া বিয়া দিত বংশ দেইখ্যা। তেলিববাগের যদু-নন্দন বংশের দাশগুষ্টির খুব নামডাক আছিল। ফলটা তো কিছু খারাপ হয় নাই। কি কস্' ? বলেই আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

দশম অধ্যায

পশ্চিম-বাড়ির নূতন সোনা বৌ

আমাব ঠাকুমা যখন অল্প বয়সেব বৌ ছিলেন তখন তাঁর শ্বশুব-শাশুড়িরা তাঁকে ডাকতেন সোনা বৌ বলে। সে সূত্রে ভাসুব ও দেওর পুত্রেবা তাঁকে ডাকতেন সোনাখুড়ি বা সোনাজ্যেঠি। তাব পর আস্তে আস্তে তিনি যখন বার্ধক্যের দিকে এগুলেন এবং তাঁকে বৌ বলে ডাকবার লোকেরা একে একে চলে গেলেন অর্থাৎ তিনি বৌ পর্যায় থেকে শাশুড়ি পর্যায়ে এলেন তখন আমাব ঠাকুমা সোনা বৌ পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে হয়ে দাঁড়ালেন সোনাঠাইন। বাড়িব দেওয়ানজীবা ও প্রজাবা ঐ সোনাঠাইন বলেই তাঁকে জানতেন এবং ডাকতেন। আমাদের মা যখন বিয়েব পব শ্বশুববাড়ি এলেন তখন তিনি হলেন 'পশ্চিমেব বাড়িব সোনা বৌ'।

মা যখন শ্বশুববাড়িতে এলেন তখন তাঁব বয়স ছিল বোধ হয় দশেরই কোঠায়। মায়েব গায়েব রঙ ময়লাই ছিল। তবে মুখশ্রী বেশ কমনীয়ই ছিল। মায়েব নাকটি ছিল বেশ খাড়া তবে গোড়াব দিকটা ছিল একটু চাপা। দেখতে অনেকটা টিয়েপাখিব ঠোঁটেব মতো, ইংবেজিতে যাকে বলে অ্যাকুলাইন। মার চোখ দুটি ছিল বেশ বড়ো বড়ো। চোখেব তাবা দুটিব চারপাশে খুব ক্ষীণ একটি সাদা বেখা নজব কবলে দেখা যেত। ওই রেখার জন্যে মাব চোখ দুটিকে যেন করুণায় ভরা মনে হত। মায়ের চুলেব গোছা ছিল খুব ঠাসা এবং কোঁকড়ান। মাকে কখনো প্রসাধনেব চেষ্টা করতে দেখি নি। চুলে প্রায ঢিলে খোঁপাই কবতেন। চুল বাঁধতে দেখি নি কোনো দিন। শুনেছি ছোটো বয়সে মা বেশ গোলগাল প্রকৃতিরই ছিলেন। বড়োদের কাছে শুনেছি মাব কণ্ঠাব হাড়ই নাকি দেখা যেত না। বাবা বর্ণনা দিতেন 'নিম্বৈণ্ঠা মাইয়া' বলে।

বড়লোকেব একমাত্র মেয়ে— যিনি জীবনে কখনো বাড়ির বাইবে যান নি— তিনি দশ বছব বয়সে এলেন শ্বশুববাড়িতে এক দাসী সঙ্গে নিয়ে। দাসীটির নাম ভুলে গেছি তবে বেশ পুবানো দাসী। সেই সময়ে মেয়ে প্রথম শ্বশুবঘরে গেলে সঙ্গে দাসী যাবাব বেওয়াজ ছিল। এই দাসী দ্বিরাগমন পর্যন্ত মেয়েব সঙ্গে তাব নতুন শ্বশুবঘবে থাকত। দ্বিরাগমনেব সময় দাসীও মেয়ের

সঙ্গে তার বাপের বাড়ি চলে যেত এবং পরে যখন মেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ী যেত তখন আর দাসী যেত না। এই দাসীর কর্তব্য ছিল মেয়েকে তার শ্বশুর-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শেখান এবং কায়দামতন চলাফেরা করতে মদত দেওয়া। এই দাসীর পরামর্শে এবং নির্দেশে মেয়ের নতুন পরিবেশে সুবিধে হবে এবং বাপের বাড়ির একজন লোক সঙ্গে থাকলে বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না—এই ছিল সেকালের লোকদের ধারণা এবং সেইজন্যেই হয়েছিল পুরানো দাসী মেয়ের সঙ্গে পাঠাবার প্রথা। তবে অনেক সময় দেখা যেত যে এই দাসী একসময়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বৌ-ঝিয়েদের কাছে খানিকটা চাল দেবার চেষ্টা করত, বিশেষ করে যদি সে বড়োলোকের বাড়ির দাসী হত। আগেই বলেছি আমার ঠাকুর্দা গোপী-মোহন অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে কাজকর্ম ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে অনেক অসচ্ছলতার মধ্যে সংসার চালাতে হত। মা যেদিন শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন তার পরের দিন সকালেই মায়ের সঙ্গে যে দাসীটি এসেছিল সে খবরটা যাতে সব বৌ-ঝিয়েরা ও বিশেষ করে শাশুড়ি-স্থানীয়া মহিলারা শুনতে পান এইরকম গলায় অতি নির্বিকারভাবে প্রচার করল যে— 'আগো দ্যাখেন, আমাগো মাইয়ার সকালে ঘি দিয়া ভাতে ভাত খাওনের অভ্যাস'— মর্মার্থটা হচ্ছে যে সেইরকম ব্যবস্থাই যেন হয় এ বাড়িতেও। যে বাড়িতে কষ্টেসৃষ্টে হাঁড়ি চড়ে সে বাড়িতে এই ধরণের কথা যে খুব সুশ্রাব্য হল না তা দশ বছরের মেয়ে আমার মা-ও বেশ অনুভব করে ফিস্ ফিস্ নীচু গলায় ঘোমটার মধ্যে থেকে দাসীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তুই থাম্।' তার পর দুপুরের খাবার পর অন্যান্য বউদের সঙ্গে মা যখন এঁটো বাসনের খানিকটা তাড়া দু হাতে ধরে পেছনের খিড়কি ডোবার দিকে চললেন মেজে আনবার জন্যে দাসীটি ফস্ করে মার হাত থেকে সেই বাসনগুলি কেড়ে নিয়ে চলল ডোবার দিকে। বাসনগুলি দাসী নিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল না কিন্তু যাবার আগে সে যে মন্তব্য করল— 'আমাগো মাইয়া পারে নেকি এই কাম করতে'— তাইতে মায়ের যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। পরে তাকে আড়ালে ডেকে মা ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই কথা কইছ না।' কে কার কথা শোনে। বড়োলোকের বাড়ির দাসীর কর্তব্যই যেন ছিল গরিব কুটুমবাড়ির খুঁত ধরা। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি যে সে-সময় মা কেবল ভগবানকে ডাকতেন যে দ্বিরা-গমনের দিন যেন শিগগির শিগগির আসে, কেননা বাপের বাড়ি গিয়ে

দাসীর সব কীর্তি তাঁর মাকে বলে দেবেন। তা ছাড়া দ্বিরাগমনের পর যখন আবার শ্বশুববাড়ি আসবেন তখন সঙ্গে ঐ দাসীটা আসবে না এই রক্ষে। মা খুব হাসতেন যখন ঐ দাসীটির চালিয়াতী কথার পুনবাবৃত্তি কবতেন আমাদের কাছে।

দশ বছরের ছোটো মেয়ে প্রথম শ্বশুববাড়ি এসে কি দেখলেন? দেখলেন যে বৃদ্ধ শ্বশুব অন্ধ, কোনো বোজগাব তাঁব নেই। ঘবে আছেন এক শাশুড়ি আব একটি রুগ্ন ভগ্ন ননদ— বাখালী ও তাব চারটি ছেলে। ছোটো ভাগ্নেটিব বয়স তখন হবে বছব দুই অর্থাৎ মায়েব থেকে মাত্র আট বছরেব ছোটো। মায়েব কর্তব্য হল তাঁব শ্বশুবেব, ঠাকুবঝি ও তার ছেলেদেব, বিশেষ কবে ছোটোটি (বমণী)ব হেপাজত কবা। মা লেখাপডা শেখেন নি। তখনকাব দিনে মেয়েদেব লেখাপড়াব তেমন বেওয়াজ ছিল না। মা কোনোমতে বাংলা ছাপা বই একটু একটু পডতে পাবতেন এবং খুব সামান্যই বাংলা লিখতে পাবতেন নানাবকম বানান ভুল করে। কিন্তু সেকালের মেয়েদেব মনের মধ্যে শ্বশুববাডিব মানুষদের আপন কবে নেওয়া এবং তাদেব সুখী কবা যে মেয়েদের একটা অবশ্যকর্তব্য এই বোধটি তাঁদেব মা জ্যেঠি খুডিব ব্যবহাব দেখে এবং নানা ব্রতাদিব কথা শুনে তাঁদেব মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকত। অনেক লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষাটুকুব দাম ছিল ঢেব বেশি। সেকালের মেয়েবা শ্বশুববাডি গিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুব ও অন্যান্যদের সেবা কবাটাকে তাঁদের কর্তব্য বলে জেনেই বেশ হাসিমুখেই তা কবতেন এবং তাঁদেব সেবাশুশ্রূষা কবে মনে একটা প্রসন্নতাও লাভ করতেন। এইবকমভাবে চললে যে স্বামীও খুশি হবেন সে কথাও যে মেয়েদেব মনে থাকত না তা-ও নয়।

আমাদেব মা প্রথম থেকেই একান্ত মনে শ্বশুবের সেবায় লেগেছিলেন। ঠাকুমাব সঙ্গে সঙ্গে মাকেও রান্নাঘবেব যাবতীয় কাজ কবতে হত। ঠাকুমার যখন বয়েস হল তখন একা মাকেই বান্নাও কবতে হত। আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়িব আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। চাল কিনে খাবার সংস্থানও ছিল না। ক্ষেতের থেকে যা ধান পাওয়া যেত তাকে সিদ্ধ করে ঢেঁকিতে ছেঁটে চাল করে নিতে হত। শ্বশুর শাশুডি ঠাকুরঝি ও তার ছেলেদের এবং ছোটো শ্বশুর বৈকুণ্ঠেশ্বরকে খাইয়ে তার পর মাকে খেতে হত। অনেক সময় শাক-ব্যঞ্জনও অপর্যাপ্ত অবশিষ্ট থাকত না। নুন ও কাঁচা লঙ্কা

দিয়েই অনেক সময় কাজ চালিয়ে নিতে হত। সুস্থ সবল শরীরটাকে পুষ্ট রাখবার জন্যে এবং পেটটা ভবাবার জন্যে ভাতের পরিমাণ মা একটু বেশিই খেতেন। তার পব উঠেই বাসন মেজে শুরু হত ধান ভানবাব পালা। মাকেই দিতে হত ঢেঁকিতে পাড়। গ্রামেব কোনো সম্পর্কীয়া দয়া কবে এসে ধানগুলি বসে বসে উলটিয়ে দিতেন। অল্প বয়স থেকেই এইবকম অনেকগুলি ভাত কাঁচা লঙ্কা কিংবা তেঁতুল দিয়ে খেয়েই ঢেঁকিব পাড দিতে দিতে ঘটি ঘটি জল খাওয়ায় মাব ছোটো বয়েস থেকেই অজীর্ণ বোগ দেখা দিয়েছিল। সে বোগ মাকে আমবণ কষ্ট দিয়েছে। তা ছাড়া ধান সিদ্ধ করা ছিল এক ব্যাপাব। তখন চাইলেই পাথব কয়লা পাওয়া যেত না এবং যাও-বা পাওয়া যেত তা কেনবাব পয়সাও আমাদের পরিবাবেব ছিল না। এজন্যে মাকে বাডিব সংলগ্ন বাগান থেকে শুকনো পাতা ও ছোটো ছোটো শুকনো ডাল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হত। সেই আধ-শুকনো পাতায় ও ডালে আগুন ধরিয়ে বাঁশেব চোঙায় ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বাখা ছিল এক কষ্টসাধ্য কাজ। ধোঁয়ায় মাব চোখে জল বেয়ে পডত— চোখে অন্ধকার দেখতেন। এর উপব যখন আমাদেব ছোটো পিসিমা অচল হয়ে অনেক মাস বিছানায় কাটিয়ে শেষে মৃত্যুতে নিষ্কৃতি পেলেন তখন এই ভাগ্নে চাবটিব বক্ষণাবেক্ষণেব ভাব পডল আমাদেব মায়েবই উপব। টোনাদাদাকে মা ছেলেব মতো কবেই বড়ো করে তুলেছিলেন। এইবকম কষ্ট কবে এবং নিজের শবীবটাকে তিলে তিলে ক্ষয় কবে আমাদেব মা আমাদেব সংসাবেব সেবা কবে গেছেন তাঁব দশ বছব বয়েস থেকেই।

আব একটা ব্যাপাব যা হত তাব কথা বলতে গেলেই মা হেসে ফেলতেন। মাকে তাঁব বাপের বাডি থেকে তৈজসপত্র কাপড়চোপড বিছানা পাটি বেশ ভালো বকমই দেওয়া হয়েছিল। তা ছাডা পরে সাবা বছবেব চাল ডাল তেল নুন ঘি ও বছবেব পরনের কাপড, বিছানার চাদর, গামছা ইত্যাদি আমাদেব দাদামশায় নিয়মিতভাবে প্রতি বছর পূজার সময় নৌকা বোঝাই কবে তেলিরবাগে পাঠাতেন। চাল ডাল ইত্যাদি জিনিসগুলি সংসাবেব কাজে লেগে যেত এবং তৈবি চাল আসার জন্যে আমাব মায়েব ধান ভানাব কষ্টটার লাঘব নিশ্চয়ই হত। কিন্তু কাপড়-চোপড়, চাদব, গামছা থাকত আমার ঠাকুমাব জিম্মায়। মার কপালে নাকি চাদর-পাতা বিছানায়, ওয়াড-দেওয়া বালিশে মাথা রেখে শোবার সৌভাগ্য

জুটত খালি যখন বাবা ছুটিছাটাতে বাড়ি আসতেন। সে-সময় ঠাকুমা বিছানাব সাফ চাদর ও বালিশের খোল বের কবে দিতেন এবং মাকে নির্দেশ দিতেন— 'বাখালেব লেইগ্যা পাইত্যা দিও।' অন্য সময়ে মা শুতেন তেল-চুকচুকে বালিশটাব উপব গামছাটা পেতে আব পুরোনো ছেঁড়া পবনের শাড়ি একখানা ময়লা ছেঁডা তোষকেব উপর বিছিয়ে। বছরের পব বছব নাকি এই ব্যবস্থাই ছিল। একবার হয়েছে কি, বাবা এসেছেন দেশে ছুটিতে। ঠাকুমা ভুলেই গেলেন সাফ চাদব ও বালিশেব খোল বেব কবে দিতে। মা-ও ঠাকুমাকে মনে কবিয়ে দেন নি হয়তো ইচ্ছে কবেই, বাবাকে জানিয়ে দিতে যে মার বিছানাব অবস্থাটা সচবাচব কেমন থাকে। শহব-ফেবতা ছেলে বাত্রে শুতে এসে বিছানাব অবস্থা দেখে তো অবাক। মা হেসে খুন। সেদিন বাত্রে কতই না-জানি হাসাহাসি হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীতে। যাই হোক, পরদিন ঠাকুমাব খেয়াল হল এবং দিন থাকতেই পবিষ্কাব চাদর ও বালিশেব ওয়াড বেব কবে দিলেন। ঠাকুমা বোধ হয় আগেব বাত্রেব ঘটনাটাব ইঙ্গিত বুঝেছিলেন। মা হাসতে হাসতে বলতেন, এব পব তাঁকে আব বালিশে গামছা পেতে ও ছেঁডা শাড়ি বিছানায় বিছিয়ে শুতে হয় নি।

ও দিকে বাবা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলেব দ্বিতীয়শ্রেণী থেকে প্রথমশ্রেণীতে উঠলেন। আব কলকাতায় দাদাবাবু (চিত্তবঞ্জন) ডবল প্রমোশন পেয়ে বাবাকে প্রায ধবে ফেললেন। বাবা তখন দাদাবাবুব চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়েন। ঢাকায় পডাব এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা বলা প্রয়োজন। দাদামশায়, আগেই বলেছি, মায়েদ বিয়েব সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাবাব পড়াশুনাব যাবতীয় খবচ তিনি বহন করবেন। বাবা যখন ঢাকায় তাঁব খুল্লতাত কেদাবেশ্বরেব বাডি থেকে কলেজিয়েট স্কুলে পডেন দাদামশায় তখন ঢাকাতেই প্র্যাকটিস বেশ জমিয়ে বসেছেন। বাবা দাদামশায়েব বাডি নেমন্তন্ন না হলে যেতেনই না। এটা দাদামশায়েব পছন্দ হত না। তিনি চাইতেন যে একমাত্র জামাইটি তাঁব ছেলেবই মতো তাঁর বাডিতে আসবে যাবে খাবে এবং মাস গেলে পডা-খবচেব টাকাটা নিয়ে যাবে। বাবা কিন্তু চেয়ে হাত পেতে টাকাটা নিতে সংকোচ ও লজ্জা বোধ করতেন। বাবাব মনের ভাব ছিল— ইনি যখন খরচের টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওঁবই কর্তব্য টাকাটা পৌঁছে দেওয়া। দুজনেরই কেমন যেন একটা জিদ লেগে গেল। দিদিমার কাছে শুনেছি তিনি দাদামশায়কে

অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু কোনো ফল হয় নি। শেষে দাদামশায় করলেন কি, প্রত্যেক বছব পূজার সময় নৌকা বোঝাই করে আমাদের সংসারে সকলের কুলায় এমন বছরের চাল ডাল তেল নুন ঘি পরনের কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি তেলিরবাগে পাঠিয়ে দিতেন যাব দাম নগদ পড়া-খরচেরও বেশি। দুই দিকের গোঁ-ই বজায় বইল শেষ পর্যন্ত। মা যখন এসব গল্প আমাদের বলতেন তখন বাবা হাসতেন আব বলতেন, 'আমি ছোটো বয়সে অভাবেব জন্যে একটু বেশি অভিমানী হয়ে গিয়ে শ্বশুরমশায়েব কাছে অপরাধই কবেছি। এখন নিজের জামাই হওয়ায় তাঁব মনের ভাবটা বুঝতে পাবি।'

বাবা এন্‌ট্রান্স পবীক্ষায় পাস কবে হুগলীতে গেলেন এফ. এ. পডতে। খুল্লতাত কেদাবেশ্বব তখন সেখানে বদলী হয়েছেন। হুগলী কলেজে এফ এ. পরীক্ষায় প্রথমবাব ফেল হয়েছিলেন বলে চাদব মুডি দিয়ে বাবাব কান্নাব কথা মা বলতেন হাসতে হাসতে। তাব পবের বছব যখন পাস হলেন, দাদাবাবুও সেবাব প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করে বাবাকে ধবে ফেললেন। এব পব বাবা কলকাতায় বি. এ. পডতে এলেন আমাদেব জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনেব বাড়িতে থেকে। জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠিমার যে হৃদয়টা কত স্নেহপ্রবণ ছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়। জ্যাঠামশায় তো পশ্চিমেব বাডি এসেছিলেন দত্তকপুত্ররূপে। তাঁব বক্তের টান এমন আব কিই-বা ছিল। তাঁব সঙ্গে আমাদের বাবাব যে সম্পর্ক ছিল আজকের দিনে অনেকে তা ধর্তব্যেব মধ্যেই আনেন না। এবকম অবস্থায় আজকালকার লোকেবা হয়তো 'গণ্ডস্যোপবি বিস্ফোটকম' বলে মুখ ফিবিয়ে নেবেন এবং এরকম অনাহূতদেব দায় ঘাডে নেবেন না। কিন্তু জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠিমা অন্য ধাতুতে তৈবি ছিলেন। জ্যাঠামশায় তাঁব সোনাখুডিকে ও জ্যেঠিমা তাঁর সোনাঠাইনকে আপন জনেরই মতো জ্ঞান কবতেন ও ভালোবাসতেন। বাবা যখন কলকাতায় এলেন বি. এ. পডতে এবং রইলেন জ্যাঠামশায়ের বাড়ি তখন তাঁর বয়েস হবে প্রায় কুডি বছব। মা বইলেন দেশেব বাডিতেই অন্ধ শ্বশুর, বৃদ্ধা শাশুডি ও মা-হাবা ভাগ্নে ক'টিকে নিয়ে। তখন মার বয়স সবে পনেবো ছাড়িয়ে ষোলোয় পড়েছে।

আমাদের মা আমাদের সংসারে এসে শারীরিক অনেক কষ্টই পেয়েছেন। শরীর তাঁর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গিয়ে তিনি বিষম অম্বলের অসুখে পড়লেন।

সে অসুখ মার আমরণ ছিল। কিন্তু এত দৈহিক কষ্ট সত্ত্বেও মা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আপন কর্তব্যকে যে মহিমান্বিত করে যেতে পেরেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর দুই শ্বশুর গোপীমোহন ও বৈকুণ্ঠেশ্বরের আন্তরিক আদরে ও আপ্যায়নে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গৃহদীপটি জ্বালিয়ে মা বসতেন তাঁর শ্বশুরের পায়ের কাছে। অনেক সময়ই তাঁর গা হাত পা -টাতে হাত বুলিয়ে আরামও করিয়ে দিতেন। মার তখন বয়স হয়েছে ষোলো বছর কিন্তু তখনো মার ছেলেপেলে হয় নি। বর্ধমানের কাছাকাছি থাকলে ঠাকুমা যে মাকে সেই জাগ্রত 'রাখাল রাজা' ঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে যেতেন হত্যা দেবার জন্যে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। দূরত্বের ও খরচের বাহুল্যের জন্যে যখন সে চেষ্টা সম্ভব হল না তখন বৃদ্ধা তাঁর পিতলের মালার ডোঙাটা থেকে জপের মালাটা হাতে নিয়ে মোজার মতো চেহারার একটা থলের মধ্যে হাত গুঁজে মালা-জপ করতেন ঠাকুর্দার ঘরের দাওয়ায় বসে— বুঝি-বা একটি নাতির আগমনেরই প্রত্যাশায়। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন তখন দৃষ্টিহীন। তিনি হাত বাড়িয়ে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতেন—'তর হইব, দেখিস্ তর হইব— আমি কইয়া গেলাম তর হইব। ক্যাবল আমিই দেইখ্যা যাইতে পারুম না।' মারও বোধ হয় তখন 'ছেলে হয় নি, ছেলে হয় নি' এই অনুযোগ শুনে শুনে মনের মধ্যে মাতৃত্বের পিপাসা জেগেছিল। তাই অন্ধ শ্বশুরের এই আশীর্বাণীতে মায়ের চোখে জল এসে যেত। মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'আমার শ্বশুরঠাকুরের সেই আশীর্বাদই আসছে তবে লইয়া।'

আমার ছোটো ঠাকুর্দা বৈকুণ্ঠেশ্বর ছিলেন অপুত্রক। তাঁকে আমি দেখি নি। কিন্তু ছোটো ঠাকুমাকে দেখেছি। ছোটোখাটো গৌরবর্ণ মানুষটি সন্তান না হওয়ায় বোধ হয় একটু খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছোটো ঠাকুর্দা মনে হয়তো ভয় করতেন— ভয়টা নেহাৎ ভিত্তিহীনও ছিল না— যে আমার মায়ের বোধ হয় খেতে কষ্ট হয়। আহা, বড়োলোকের কচি মেয়ে, ওকে দেখবার-শোনবার কে-ই বা আছে— এই ধরণের ছিল তাঁর ভাবনা। তিনি এক কাণ্ড করতেন রোজ। খাবার পর তিনি এক বাটি ঘন দুধে ভাত মেখে খেতেন। গ্রীষ্মকালে তার মধ্যে বাড়ির গাছের আম কি কাঁঠাল গুলে নিতেন। তিনি যতটা পারতেন তার চেয়েও খানিকটা বেশি করেই মাখতেন। খানিকটা খেয়ে বাকীটা তিনি রেখে দিয়ে বলতেন—

'সোনা বৌ তুই খাইচ্।' ছোটো পিসিমাও মাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি যে অশক্ত হয়ে কোনো কাজে মাকে সাহায্য করতে পারতেন না, তাঁর সেবায় মাকে যে আরো খাটতে হত এবং এই অনটনের সংসারে চারটি শিশু-সন্তান নিয়ে এসে তিনি যে তাঁর বাপ-মাকে বিব্রত কবে ফেলেছেন এই বোধ ছোটো পিসিমাব মনকে নিত্য নিয়ত পীড়া দিত। বাবা ছিলেন তাঁর পিঠাপিঠি দাদা। খুব ভালোবাসতেন সেই একমাত্র দাদাকে। সেই দাদার বৌকেও পিসিমা ভালোবাসতেন মায়েব স্বভাবেব গুণে এবং আপন প্রাণেব টানে। আমাব ঠাকুমাও মাকে খুবই স্নেহ কবতেন। অনটনের সংসাবে মায়েব যে কষ্ট হত ঠাকুমা তো তাব জন্যে দায়ী ছিলেন না। মায়েব তখন পর্যন্ত ছেলে না হওযায় ঠাকুমাব ভয় ছিল বংশটা বুঝি লোপই পায়। সেইটুকু খুঁতেব জন্যে তিনি বোধ হয় মায়েব উপর একটু বিরূপ ছিলেন সেই সময়টাতে। কে জানে।

একই কর্মসূচী অনুসাবে অনটনেব মধ্যেই চলল মায়েব একঘেয়ে জীবন-যাত্রা। একমাত্র বৈচিত্র্য ছিল বাবাব বাড়ি আসা, ছুটিব দিনে। দেহমনের সব ক্লান্তি ঐ কটা দিনে কোথায় যে চলে যেত কে জানে। আব ছিল গ্রামেব সমবয়সী আব দু'টি বৌয়েব সমবেদনা ও স্নেহ। তাঁবা ছিলেন পুবেব বাড়িব মনোমোহন জ্যাঠামশায়েব স্ত্রী আমাদেব ছোট্‌কাদাদাব মা ও সেই বাড়িব করুণা জ্যাঠামশায়েব স্ত্রী আমাদেব বটাদাদাব মা। তেলির-বাগেব এই তিনটি বৌযেব মধ্যে যে প্রগাঢ় সখ্য ছিল তা বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল ছোট্ট গ্রামে একসঙ্গে বাস কববাব দরুনই। তা ছাড়া বিভু-ভাইয়েব বেটাব বউ— যিনি সম্পর্কে মাব নাতবৌ— ও মোহিনীদাদাব বৌ খুব আসতেন মায়ের কাছে। এইবকমেই কেটে গেল আবো বছব তিন চাবেক। তাব পব ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেব আগে-পিছে আমাব দুই ঠাকুর্দা গোপীমোহন ও বৈকুণ্ঠেশ্বব দুইজনেই স্বগ্রাম তেলিববাগেই দেহবক্ষা কবলেন। ছোটো ঠাকুমা কাশীবাসী হলেন। আমাব আপন ঠাকুমা— তেলিববাগেব সোনাঠাইন— তাঁব মেয়ের ঘবের মা-মবা চাবটি নাতি ও পুত্রবধূ সোনা বৌকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায় তাঁর ভাসুব-পুত্র ভুবনমোহনেব আশ্রয়ে। মার বয়েস তখন হবে উনিশ-কুড়ি। টোনাদাদার বয়স তখন এগাবো কি বারো।

একাদশ অধ্যায়

বাবা-মায়ের কলকাতায় আগমন

হুগলী কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করে বাবা এলেন কলকাতায় বি. এ. পড়তে। তখনকার দিনে কলেজে জায়গা পাওয়াব বোধ হয় তেমন অসুবিধা ছিল না। দাদাবাবু ও বাবা দুজনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকলেন বি.এ. ক্লাসে। কয়েকজন সহপাঠীদেব নাম যা বাবাব মুখে শুনেছি তা আগেই বলেছি। কলেজে পডাব সময় দাদাবাবু কি বাবার মধ্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব পবিলক্ষিত হয় নি। বাবাব মুখে শুনেছি যে দাদাবাবুব সেই সময় থেকেই সাহিত্যেব দিকে ঝোঁক ছিল। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ও বঙ্গদর্শনে যে-সব কবিতা প্রবন্ধ বেব হত সেগুলি দাদাবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে পডতেন। কলেজেব বিতর্ক সভায় বক্তৃতাও দিতেন ভালো। স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনেব সেক্রেটাবীও দাদাবাবু হয়েছিলেন এবং সবাইকে একত্রে জুটিয়ে কাজ কববাব ক্ষমতা তখন থেকেই তাঁর দেখা গিয়েছিল। খুডা ভাইপোতে সদ্ভাব ছিল বিস্তব এবং সেই প্রীতিব সম্পর্ক তাঁদেব বজায় ছিল আমবণকাল। একটা জিনিস বডো হয়ে লক্ষ্য কবেছি। বাবা ও দাদাবাবু প্লেন বি.এ পাস-কবা ছাত্র হলেও ইংরেজিটি লিখতেন খুব চমৎকাব প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুব ভাষায়। বাবা পুবানো ইংবেজ কবিদের, বিশেষ কবে মিলটনের, কাব্যগ্রন্থ থেকে অনায়াসে বডো বডো পদগুলি মুখস্থ বলে যেতে পাবতেন অনর্গল। আমরা হাল-ফ্যাসানেব ছাত্র—পুবানোদেব বলি তাবা কেবল মুখেব বুলিই শিখেছে পাখি পডাব মতো—তাদেব কিছু বোধোদয় হয় নি। কিন্তু কলকাতা কর্পোবেশনের এক-ঘেয়ে চাকবি কবেও বাবা যে ইংবেজি লিখতে পাবতেন ও সাহিত্যরস সম্ভোগ কবতে পাবতেন আমবা তাব সিকির ভাগও পাবি নে।

বাড়িতে জ্যেঠিমা (নিস্তাবিণী) বাবাকে স্নেহ কবতেন আপন ছেলের মতো। খাওয়া-দাওয়ায় কোনো প্রভেদই তিনি করতেন না বাবার ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে। বাবা বলতেন, 'বৌঠাইন অনেক সময় চিত্ত কি মাইয়াদেব না দিয়া আমাকে দিতেন ভালো খাবার জিনিস থাকলে।' বোধ হয় আশ্রিতজনের মনে কষ্ট হবে এই ভেবেই জ্যেঠিমা এইরকম

করতেন। এই-সব ছোটোখাটো ব্যাপার থেকেই জ্যেঠিমা ও জ্যাঠামশায়ের হৃদয়ের প্রসার কিছুটা অনুমান করা যায়। বাবার মুখে শুনেছি একবার নাকি বাড়িতে কি ভালো আম এসেছিল। জ্যেঠিমা সেগুলি ছাড়িয়ে কাটছিলেন সবাইকে ভাগ করে দেবার জন্যে। বাবাও বসে গেলেন আর একটা বঁটি পেতে। আম কাটছেন আর খেয়েই চলেছেন। দোষের মধ্যে জ্যেঠিমা বাবার কাণ্ড দেখে বললেন, 'আরে রাখাল, সকলেই খাইব ত?' আর যায় কোথায়। অমনি বাবা বঁটি দা ফেলে রাগ করে ছলছল চক্ষে দৌড়ে বের হয়ে গেলেন। তার পর জ্যেঠিমার সে কত সাধ্য-সাধনা দেওরের রাগ উপশম করবার জন্যে। বাবা বলতেন 'বৌঠানের কাছে আমার আবদার বায়নার অন্ত ছিল না। এখন মনে করলে লজ্জায় মরে যাই। কিন্তু বৌঠান সব সহ্য করতেন। এমন বৌঠান আর হয় না।' আমি বড়ো হয়ে যখন এসব শুনে চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর উল্লেখ করে বলতাম, 'আমার বৌঠান ছাড়া অবিশ্যি।' বাবা তখন সোজা হয়ে বসে জবাব দিতেন, 'রাখ্ তর বৌঠাইন। আমার বৌঠাইনের কইড়া আঙ্গুলের সমান না। আমার বৌঠাইনের তুলনা নাই।' বুঝতাম বাবার মনেপ্রাণে তাঁর বৌঠানের জন্যে কি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল।

জ্যেঠিমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ন'দিদি (প্রমীলা)র সঙ্গে বাবার খুব বেশিরকম ভাব ছিল। ভাব যেমন ছিল ঝগড়াও তেমনি হত হামেশা। ঝগড়া হলে দিন কতক প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ তাঁদের হত না। কথাবার্তা চলত পরোক্ষভাবে দেয়ালের মারফত। যেমন— 'দেয়াল, ওকে বল না অমুক কাজ করতে।' তুরন্ত জবাব যেত— 'দেয়াল, বলে দিও যে আমার বয়েই গেছে ও কাজ করতে।' এইরকম। আমার বাবার খাওয়া-দাওয়ায় খুব বাছবিচার ছিল আগেই বলেছি। ঠাকুমার নির্দেশে সাদাসিধে খাওয়াটাই বাবার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। বাবা তেল-আলা পেটির মাছের তেল কখনোই খেতেন না, খেয়ে পাছে বুক জ্বালা করে এই ভয়ে। পাতে ওইরকম মাছ পড়লে সেটা অন্য কারো ভোগে আসত। ন'দিদি আবার তেল-আলা পেটির মাছ পছন্দ করতেন এবং বাবার থালা থেকে তিনিই সেটা পেতেন। একবার হয়েছে কি— দুজনে ভীষণ ঝগড়া হয়েছে কি নিয়ে। প্রত্যক্ষ কথা বন্ধ। খাবার সময় দেখা গেল বেশ তেল-আলা পেটির মাছটা বাবারই পাতে পড়েছে। বার্তা গেল দেয়াল-দূতের মারফত— 'দেয়াল, ও যদি

পেটির মাছের তেল না খায় তবে আমাকে দিলেই তো পারে।' সেবার আড়িটা হয়েছিল একটু বেশিবকম জোর। বাবা জবাবই দিলেন না। মাছের তেল-আলা অংশটুকু কেটে মাটিতে ফেলে বাটি দিয়ে সেটা ঘষে দিলেন। অমনি ন'দিদিব উঠল কান্না। নালিশ গেল জ্যেঠিমার কাছে। জ্যেঠিমা বললেন, 'ঝগড়াও কববি আবাব মাছও চাইবি।' বাবাবই হয়ে গেল জয় সেবাব। আব একবাব যে কাণ্ড হয়েছিল সেটা শুনতে আজগুবী গল্পের মতো। ন'দিদির একটা মোটা কাঁচের বোতলে অনেকগুলি পোষা লাল মাছ ছিল। সে মাছগুলি ছিল ন'দিদিব খুব পেটোয়া। জল বদলানো মাছগুলিকে রোজ খাওয়ানো এসব ন'দিদি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই কবতেন। সেই কাঁচেব বোতলে কাবও হাত দেবার যো ছিল না। একদিন হয়েছে কি — বাবাব সঙ্গে ন'দিদিব কি নিয়ে হল তুমুল ঝগডা। বাবাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ন'দিদিকে শাসালেন— 'তব ওই লাল মাছগুলাইনবে আমি হিংগাইয়া হিংগাইয়া মাক্কম।' সবাই শুনল যে বাবা ঐ কথা বলেছেন। আব হবি তো হ, পবদিন সকালে দেখা গেল যে সত্যি সত্যি সব মাছগুলি মরে ভেসে উঠেছে। আব যাবে কোথায়। ন'দিদিব খুব ধাবণা হল তাঁর কাকাবই এই অপকর্ম। বাবা অনেক অনুনয় বিনয় কবে বললেন বাববার যে তিনি যথার্থই মাছগুলিকে মাবেন নি— এমন-কি বোতলটি ছোঁনই নি। কে শোনে কাব কথা। বিষম কোন্দল বেধে গেল। বাড়িময় সোবগোল। ন'দিদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কাকাই মাবছে। ও কইছিল মারুম।' জ্যেঠিমা (নিস্তাবিণী) অনেক বোঝালেন ন'দিদিকে যে মাছগুলি নিজেবাও স্বাভাবিক ভাবেই মবতেও পারে। বাবাকেও ধমকালেন— 'ক্যান তুই ঐ বকম কইলি।' বাবা জবাব দেন— 'কইছি দেইখ্যাই মাবছি নাকি?' শেষ পর্যন্ত যখন ঝগডা কিছুতেই মিটল না তখন জ্যেঠিমা হয়বান হয়ে বেগে বললেন, 'তরা যদি এমন কইবাই ঝগডা কববি তবে তবা কথা বলিস ক্যান? কথা না কইলে তো আব কথা কাটাকাটি হয় না।' দুই পক্ষই এই উপদেশ শিরোধার্য কবে নিয়ে কথা বন্ধ কবলেন। আশ্চর্য, কিন্তু সত্যি কথা— সেই দিন থেকে ন'দিদি আব বাবাব মধ্যে কথাবার্তা একেবাবে বন্ধ, কি প্রত্যক্ষে, কি পবোক্ষে। দুজনেবই সমান জিদ— কেউ-ই হার মানবে না। বাবার কাছে শুনেছি এই আড়ি চলেছিল তাঁদের মধ্যে বিশ বছবেরও উপরে। ন'দিদির বিয়ে হয়ে গেল —তিনি আলাদা বাড়ি গেলেন। বাবাও

পরে আলাদা বাড়ি গেলেন। তবু কথা বন্ধ। বহু বছর পরে ন'দিদি যখন মরণাপন্ন অসুখে পড়ে কালীমোহন আলয়ে এলেন সেবাশুশ্রূষার জন্যে এবং সে বাড়ির পেছনের গাড়ি-বারান্দার উপরের ঘরে মৃত্যুশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন, বাবা আস্তে আস্তে একদিন সন্ধ্যার সময় সে ঘরে গিয়ে ন'দিদির খাটের পাশে বসলেন। ধীরে ধীরে বাবা বললেন, 'পিরমিলা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর— আমি সত্যি সত্যিই তোমার মাছ মারি নাই।' ন'দিদি বাবার হাতখানা ধরে শান্তস্বরে বললেন, 'কাকা, আমি তোমায় ভুল বুঝে কষ্ট দিয়েছি, নিজেও দুঃখ পেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।' দুজনেরই চোখে অঝোর ধারায় নেমে এল প্রায় বিশ বছরের পুঞ্জীভূত অভিমানের তুষার-গলা চোখের জল। সেই স্রোতে ভেসে গেল ভুল বোঝাবুঝির গ্লানি ও কালিমা। স্বস্তি পেলেন দুজনেই। বাবার মুখে শুনেছি মৃত্যুর আগে যে ন'দিদির মনে বিশ্বাস এল যে বাবা তাঁর মাছগুলি মারেন নি এর জন্যে বাবার মন থেকে যেন জগদ্দল একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। এর কয়দিন পরেই ন'দিদির পুণ্যাত্মা দেহ মুক্ত হয়ে অমরধামে চলে গেল।

যথাকালে দাদাবাবু ও বাবা দুজনেই বি. এ পরীক্ষা দিলেন এবং দুজনেই পাস হলেন। দাদাবাবুকে তখন বিলেতে পাঠান হল আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্যে। বাবা জ্যাঠামশায়ের কাছে আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক হয়ে অ্যাটর্নিশিপ পড়া শুরু করলেন এবং জ্যাঠামশায়ের আফিসে নিয়মিত বের হতে লাগলেন। এ কথা বাবা কখনো ভাবতেই পারতেন না যে তাঁকেও জ্যাঠামশায় বিলেত পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে আনবেন। সেটা তিনি আশাও করেন নি। কিন্তু একই সঙ্গে ছেলে ও দেওর বি. এ. পাস করে শুধু ছেলেই বিলেত গেল আর দেওরের যাওয়া হল না— এই ভাবনাটা জ্যেঠিমার মনে বোধ হয় নিরন্তর খচখচ করত। সে সময়েই জ্যাঠামশায়ের সংসারে টানাটানি দেখা দিতে শুরু করেছিল। তা না হলে জ্যেঠিমা খুব সম্ভব বাবাকেও বিলেত পাঠাতেন। সেরকম দরাজ মন জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠিমা দুজনেরই ছিল। আমার জন্মের পর জ্যেঠিমা অনেক সময় দুঃখ করে বাবা-মাকে বলতেন— 'আমি পারলাম না রাখালেরে চিত্তর সঙ্গে বিলাত পাঠাইয়া পড়াইয়া আনতে। তবে চিত্তর যদি রোজগার হয় তবে চিত্ত তোর ছেইলারে বিলাতে পড়াইয়া মানুষ কইরা দিবই।' এ কথাটা মায়ের মুখে আমি অনেকবার

শুনেছিলাম মা যখন জ্যেঠিমার গুণের কথা বলতেন আর চোখ মুছতেন।

দাদাবাবু যখন বিলেত যান তার পরই জ্যাঠামশায়ের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। বাড়িতে ছেলেমেয়ে ছাড়াও অনেক আত্মীয় আশ্রিত ছিল। বাবাও এসেছিলেন জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করতে। তখন জ্যাঠামশায় তাঁর বড়ো ভাই কালীমোহনের বাড়ির সংলগ্ন উত্তরের জমিটুকুতে যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গোয়েঙ্কা ব্লক হয়েছে সেখানে বাড়ি করে কাঁসারিপাড়া থেকে উঠে এসে বাস করছিলেন। অনাত্মীয় দেশের লোকেরাও প্রায়ই আসত যেত এবং কেউ কেউ থাকতও। এই সংকটের দিনেও জ্যাঠামশায় তাঁদের কাউকে বলতে পারলেন না নিজের পথ দেখতে। তার উপর আমার ঠাকুমাও এলেন বিধবা হবার পর তাঁর চারটি দৌহিত্র ও পুত্রবধূ আমার মাকে নিয়ে। জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠিমা 'না' বলতে পারলেন না। জ্যাঠামশায়ের সেই অনটনের দিনে যখন ঠাকুর চাকর কমাতে হয়েছে তখন মা আসায় জেঠিমার সংসারের দিক থেকে বেশ খানিকটা সুবিধেও হয়েছিল। বৃহৎ সংসারের রান্নাঘরের কাজে মা শরীর দিয়ে খেটে জ্যেঠিমার কিছুটা কষ্ট লাঘব যে করতেন তাতে সন্দেহ নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে। তাদের খাইয়ে তৈরি করিয়ে সঙ্গে টিফিন দিয়ে স্কুলে পাঠানো, ভোলা (বসন্ত) ছেলেমানুষ, তাকে খাইয়ে দেওয়া এই-সব কাজে মা জ্যেঠিমার সাহায্য করতেন। এসব কাজ— রান্না, ছোটো ছেলের হেপাজত ইত্যাদি মায়ের অভ্যাসই ছিল। তেলিরবাগের কঠিন অভিজ্ঞতা মার এখানে বেশ কাজে লেগে গিয়েছিল। বাবা প্রায় ম্যানেজিং ক্লার্কেরই মতো জ্যাঠামশায়ের আফিসের ও বাইরের মোটা কাজগুলি দেখতেন এবং জ্যাঠা-মশায়কে সেই সবের ধকল থেকে বাঁচাতেন। বাড়িতে মা রান্নাঘরের কাজে জ্যেঠিমার দক্ষিণ হস্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ তামিল করতেন শরীর দিয়ে যতটা সম্ভব হত। আর এই সময়ে প্যারীবাবু ও দিদিমণি (তরলা) তাঁর বাপের বাড়ির জন্যে যে অর্থে-সামর্থ্যে অনেক সাহায্য করতেন তা আগেই বলেছি। কথায় বলে 'দশপুত্রসম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে'। দিদিমণি এই প্রবাদবাক্য সার্থক করেছিলেন। তিনি সৎপাত্রেই পড়েছিলেন। মেয়ে জামাই উভয়ে সেই সংকটের দিনে জ্যাঠামশায়ের পরিবারের জন্যে অকুণ্ঠভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন। এই সময়ে আর-একটি ঘটনা ঘটেছিল যা দিদিমণি ও অন্যান্য দিদিদের মুখে একাধিকবার শুনেছি। একদিন এমন হল যে জ্যাঠা-

মশায়ের ক'টা মোটা হ্যাণ্ডনোটের দেনা মেটাবাব দিন প্রায় সমাগত। দিতে না পারলে পাওনাদারদের কাছে শিবচ্ছেদ হবে এবং তারা আদালতের আশ্রয় নেবে। জ্যাঠামশায়েব মন ভাবনায় চিন্তায় ব্যাকুল এবং সেই অশান্তির জন্যে তাঁর মুখে কালিমা পড়ে গেল। অথচ টাকাব সংস্থান করা যাচ্ছে না। বাবা এদিক-ওদিক ঘুবে টাকা যোগাড় কববাব বৃথা চেষ্টা কবছিলেন। এমন সময় সন্ধ্যার পর মা তাঁব গহনাব বাক্স এবং গায়ে যা-কিছু গহনা ছিল সব একত্র কবে জ্যাঠামশায় যেখানে বসেছিলেন সেখানে তাঁব পায়েব কাছে বেখে দিলেন। মাব হাতে তখন শাঁখা ও লোহা ছাডা গলায় গায়ে আব কোনো গহনাই বইল না। মাব বয়স তখন হবে বছব কুডি। সেই বয়সেব যুবতী মেয়েব পক্ষে গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে দেওয়া যে সহজ ব্যাপাব ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। জ্যাঠামশায় ছলছল চোখে মায়েব মুখেব দিকে খানিকটা চেয়ে বইলেন। সে চাহনিব মধ্যে যে অনির্বচনীয় কোমলতা ফুটে উঠেছিল তাইতেই মায়েব সব ত্যাগ সার্থক হয়ে উঠল। তাঁব ভাসুবঠাকুবেব যে এতটুকু উপকাবও মায়েব দ্বাবা হল সে কথা ভেবেই মা মনে শান্তি ও আনন্দ পেলেন। ছেলেব বয়সী ছোটো ভাইয়েব স্ত্রীব গায়েব গহনা নিয়ে যে জ্যাঠামশায়েব পাওনাদাবদেব ঠেকাতে হল এব থেকেই বোঝা যাবে যে টাকাটাব কতখানি জরুবী দবকাব তখন জ্যাঠা-মশায়েব হয়েছিল। নেহাত অপাবগ না হলে জ্যাঠামশায় কখনই মায়েব এই গহনা নিতেন না। দাদাবাবু তাঁব দিদিব আব খুড়িমাব এই স্নেহের দান আমবণ শোধ দিয়ে গেছেন। টাকাব হিসেব কবলে তিনি পেয়েছিলেন যত দিয়েছেন তাব চতুর্গুণ। কিন্তু দুঃখেব দিনে যা পাওয়া যায় তাব তো মূল্য নেই। সে ঋণ শোধবোধেব প্রশ্নই দাদাবাবুব মনে ওঠে নি। সাবাজীবন ধবে দাদাবাবু আমাদেব পবিবাবেব সকল বোঝা বহন কবে গেছেন সন্তুষ্টচিত্তে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। মায়েব এই কৃতজ্ঞতাপ্রসূত ত্যাগ লক্ষ্য কবেছিলেন আব একজন মহীয়সী মহিলা—আমাদেব দিদিমণি। তাঁব ছেলে সুধাংশু যখন বিলেত থেকে ফিবে প্র্যাকটিস কবতে শুরু কবলেন এবং কিছু কিছু বোজগাবও কবতে লাগলেন তখন দিদিমণি মায়েব জন্যে ভাবি ওজনেব ছয় গাছা কবে সোনাব চুডি এবং গলাব হাব তৈবি কবিয়ে মাকে পবিয়ে দিয়ে যেন মনে অপার আনন্দলাভ কবলেন। মাব বয়স তখন প্রৌঢত্ব পাব হবাব মত। তিনি সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ভাসুবঝি, এই বয়সে গয়না পবতে

লজ্জা করে।' দিদিমণি বললেন, 'না খুড়িমা, এ তোমার পরতেই হবে। আমার ভালো লাগবে।' সেই চুড়ি ও হার মা নিত্য ব্যবহার করে গেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। এ ছাড়া মায়েব আর কোনো গহনাই ছিল না। দিদিমণির এই স্নেহের প্রতিদানও অমূল্য সম্পদ ছিল মায়ের কাছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমার জন্ম

জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের বৃহৎ সংসার দেনার কর্দমাক্ত পথে একঘেয়ে চালে চলতে লাগল যেমন করে চলে অত্যধিক বোঝাই-করা গরুর গাড়ি গ্রামের কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। আমাদের বাপ-মায়েরও দিনগুলি কাটতে লাগল যেন শরশয্যায়। দেখতে পাচ্ছিলেন যে জ্যাঠামশায়ের ও জ্যেঠিমার কষ্ট হচ্ছিল সংসার চালাতে কিন্তু টাকা রোজগার করে এনে তাঁদের সাহায্য করবার ক্ষমতা আমাদের বাবার ছিল না। অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষা পাস করে রোজগার শুরু করতে অনেক বছর লাগে। সুতরাং গতর খাটিয়ে দাদাকে সাহায্য করা ছাড়া বাবার আর গত্যন্তর ছিল না। মায়ের দশাও তা-ই।

এদিকে আমার ঠাকুমারও বৃদ্ধবয়সে নাতি না হওয়ায় মন খারাপ যে তাঁর কর্তার বংশটা বুঝি লোপই পায়। মায়েরও তখন বয়স বিশে পৌঁছে গেছে। ঠাকুমা বিড়বিড় করে ভাগ্যদেবতার উপর দোষারোপ করতেন যে সোনা বৌয়ের আর সন্তান হবে না। মাঝে মাঝে দিদিদের কাছে বাবার আর একটা বিয়ে দেবার ইঙ্গিতও নাকি দিয়েছেন। কথাটা মায়ের কানে না এসে যায় না। মনে মনে যে মা প্রমাদ গণতেন 'না তা-ই বা কে বলবে। সমস্ত সংসারের সারাদিনের খাটুনির পর শরীর যখন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ত তখনও এই দুর্ভাবনা যে মায়ের নিশীথ শয়নকে বিনিদ্রায় ভরে তুলত তা সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া দুঃসংবাদ গোপন থাকে না। এইরকমের ঘটনার সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমাদের মামাবাড়িতেও পৌঁছল। দাদামশায় কৈলাসচন্দ্র তখন বেঁচে। আমাদের বাড়ির কর্তারা খবর পেলেন এইরকম একটা কিছু অঘটন ঘটলে তাঁরা, আমার মামাবাড়ির কর্তারাও, পালটে জবাব দেবেন। অর্থাৎ আজকালকার রাজনৈতিক ভাষায় বলা চলে যে এঁরা এঁদের ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে যদি তাঁদের মেয়ের অমঙ্গল করেন তবে তাঁরাও প্রতিশোধ (রিপ্রাইজেল) হিসেবে তাঁদের ছেলেকে আবার বিয়ে দিয়ে এদের মেয়েকেও ফ্যাসাদে ফেলবেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

আগেই বলেছি, মধ্যের বাড়ির কালীমোহন ও দুর্গামোহনের বিমাতার গর্ভে কাশীশ্বরের একটি কন্যা হয় যার নাম রাখা হয়েছিল শ্যামাসুন্দরী। তার পরই কাশীশ্বর মারা গেলে সেই বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ হয় দুর্গামোহনের নির্বন্ধাতিশয্যে। সেই শ্যামাসুন্দরীর বিবাহ হয়ে তাঁর গর্ভে অনেক সন্তান-সন্ততি হয়— যেমন ছেলে ললিত, যতীন ও টুকু এবং কন্যা প্রমদা, টেপী এবং মনু। এই কটি ছেলেমেয়ের মামাবাড়ি বলতে ছিল জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনেরই বাড়ি। এঁরা খুব আসা-যাওয়া করতেন জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে একেবারে আপন ভাগ্নে-ভাগ্নীর মতোই। ললিতদাদা কাজে খুব উন্নতিলাভ করে আবগারী একসাইজ কমিশনার হয়েছিলেন। টেপী-দিদির বিয়ে হয়েছিল উকিল প্রমথ সেনের সঙ্গে এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে অমিয় (পাঁচু) কলকাতা হাইকোর্টে বেশ নাম-করা অ্যাটর্নি হতে হতেই মারা গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা ছিল। প্রমদাদিদির বিয়ে হয়েছিল বিদ্গাঁয়ের মহিম দাশগুপ্তের একমাত্র ছেলে যোগেন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার তেমন জানাশুনা হয় নি। এখন হয়েছে কি—ঐ যোগেন্দ্র দাশের মা ছিলেন আমাদের মাতামহ কৈলাসচন্দ্রের আপন বড়ো বোন অন্নদা। অর্থাৎ আমাদের মায়ের সাক্ষাৎ পিসির একমাত্র ছেলে হলেন যোগেন্দ্র দাশ। এই যোগেন্দ্রমামাকে অনেক দেখেছি। অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র ছেলে যোগেন্দ্রমামা দেখতে বেশ সুপুরুষই ছিলেন। রঙ গৌরবর্ণ এবং সেকালের ফ্যাসান মতে দাড়ি-গোঁফ তাঁর ছিল। তখনো মোটরগাড়ির আমদানি তেমন হয় নি এবং তার চলও ছিল কম। কলকাতায় ঠিকে গাড়ি পাওয়া যেত মেলা— বন্ধগাড়ি এবং ফিটনগাড়ি। যোগেন্দ্রমামার শখ ছিল খোলা গাড়িতে বসে শহরময় এবং বিশেষ করে গঙ্গার ধারে বেড়ানো। যোগেন্দ্র-মামা কলকাতায় আসলেই আমাদের গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং আমাদেরও তাতে খুব ভালো লাগত। এই প্রমদাদিদির সঙ্গে যোগেন্দ্রমামার বিয়ে হওয়ায় তিনি সম্পর্কে আমাদের মামী হলেন। কিন্তু আমরা বরাবরই তাঁকে প্রমদাদিদি বলেই ডাকতাম। তিনি দিদি ডাকটাই পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে ঐ ডাকে তাঁর মামাবাড়ির স্পর্শটুকু তিনি পান। এখন হয়েছে কি, ঐ প্রমদাদিদিরও কোনো ছেলেপেলে হয় নি। আমাদের মামাবাড়ির সবাই জানতেন যে প্রমদাদিদিকে আমাদের

বাড়ির সবাই খুব ভালোবাসতেন আপন ভাগ্নীরই মতো। সুতরাং তাঁদের খুব সুবিধে হল। দাবা বোড়ে খেলায় যেমন 'চেক' দেয় তেমনি যোগেন্দ্রমামাকে দিয়ে আমাদের বাড়ির চাল বাবার আর একটা বিয়ে পণ্ড করে বাজিমাত কববে। এই কাবণেই হোক, কি, যে-কোনো কারণেই হোক খেলাটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল। কোনো পক্ষই নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন না।

ওদিকে দাদাবাবু বিলেতে সিভিল সার্ভিস পবীক্ষাব জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি ও তাঁব সতীর্থ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত উভয়েই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় বসলেন। কয়েকটি বিষয়ে পবীক্ষা দেবাব পব দাদাবাবু সেবার অন্যান্য বিষয়ে পবীক্ষা দিতে বসলেনই না— কেননা তিনি মনে কবলেন যে তেমন যুতসই উত্তব দিতে পাবেন নি। পবীক্ষাগুলি দিয়ে ফেললে হয়তো পাসই হয়ে যেতেন এবং তাঁব জীবনেব গতি তা হলে অন্যপথেই ধাবিত হত। জ্ঞান গুপ্ত একাধিক বাব তাঁকে পবীক্ষাগুলি শেষ কবতে পবামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দাদাবাবু তৎসত্ত্বেও সেবাব আব পবীক্ষায় বসলেন না। জ্ঞান গুপ্ত সাহেব পুবা পবীক্ষা দিয়ে পাস হলেন অর্থাৎ আই সি.এস চাকবিতে ঢুকে গেলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদাবাবু দ্বিতীয়বার পবীক্ষা দেন। তাঁব ধাবণা হয়েছিল যে পবীক্ষাটা ভালোই দিয়েছেন এবং পাসও হবেন। এইখানে সিভিল সার্ভিস পবীক্ষায় পাস ফেল কাকে বলে একটু বুঝিয়ে বলা দবকাব। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এমন নিয়ম ছিল না যে অত নম্বব পেলে পাস এবং তাব কম পেলে ফেল। পরীক্ষাটা খুবই শক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক ছিল। প্রথমে প্রতিযোগীদেব নাম তাদেব পাওযা নম্বর অনুসাবে সাজিয়ে একটি তালিকা কবা হত। সে বছব সবকাবেব যে কটি লোক চাকবিতে নেওয়া দবকাব সেই তালিকাব উপব হতে নীচে সেই কয়টিকেই নেওয়া হত। যে কয়টিকে নেওয়া হত বলা হত যে তাবা সেবাব পবীক্ষায় পাস কবেছে। অন্য সকলে যাবা চাকবি পেল না তাবা সেবাব ফেল হল এই ধবে নেওয়া হত। এমন প্রাযই হত যে এ বছব যত নম্বব পেয়েও একজন চাকরি পেল না অতএব ফেল হল, তাব পবেব বছব তার চেয়ে কম নম্বর পেয়েও লোকে চাকরি পেল বলে সে পাস হয়েছে বলা হল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে সেই তালিকায় দাদাবাবুর ঠিক উপর পর্যন্ত

যে কটি ছেলের নাম ছিল সরকারের ঠিক তত কটি লোকই নেবার প্রয়োজন হল। এতে মনে হতেই পারে যে চিত্তরঞ্জনকে বাদ দেবার জন্যেই তাঁর উপরের যে কয়জন ছিল তাঁদের নেওয়া হল। ধর, যেন দাদাবাবুর উপরে পঞ্চাশজন ছিল এবং সেই পঞ্চাশজনকেই নেওয়া হল। সেই পঞ্চাশজন পাস হল এবং দাদাবাবু থেকে আরম্ভ করে বাকি যাঁরা নীচে ছিলেন সবাই ফেল করলেন সেবার। দাদাবাবুর মনে সরকারের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের কারণ হল যখন তিনি দেখলেন যে সেই প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে একজন মেডিকেল পরীক্ষায় পাস হলেন না এবং একজন স্বেচ্ছায় চাকরি পেয়েও নিলেন না। প্রথমেই সরকার স্বীকার করেছেন যে তাঁদের সে বছর পঞ্চাশজন লোক নেওয়া প্রয়োজন। অতএব সেই প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে থেকে দু'জন যখন কেটে গেল তখন সেই তালিকার বাকি ছেলেদের থেকে উপর থেকে দুজন নেওয়া উচিত ছিল নিয়মানুসারে। কিন্তু তা করতে গেলেই দাদাবাবুকে নিতে হয়। সেটা বোঝাই গেল, সরকারের মতলব ছিল না। সুতরাং তাঁদের বলতেই হল যে আটচল্লিশ-জন নূতন লোকেই তাদের কাজ চলবে। সুতরাং দাদাবাবুর ধারণাটা যে ভিত্তিহীন তা কেমন করে বলব? দাঁড়ালো এই যে সেবারের পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে দাদাবাবুই সেরা অর্থাৎ প্রথম। তিনি বাড়িতে তার পাঠালেন— 'ফেইলড ওয়ান প্লেস আউট জবাবী'। আসল কারণটা ছিল এই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিলেতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে ইণ্ডিয়ান হোম রুলের সম্বন্ধে অনেক বাগ্-বিতণ্ডা হয়। বিলেতের প্রগতিশীল লিবারেল দল ভারতের হোম রুলের সপক্ষে এবং স্থিতিশীল কনসারভেটিভ দল ছিল তার বিপক্ষে। দুই দলই মিটিং করে নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ প্রমাণ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেল। দাদাবাবু সেই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন এবং যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের তাগিদে দাবি সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এবং চড়া গলায় অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন লিবারেল দলের পক্ষ হয়ে। এটা রাজশক্তির কাছে যে বেয়াড়া ঠেকবে তা সহজেই অনুমেয়। ফল হল যে লিবারেল পার্টি সেবার ভোটে জিতল বটে কিন্তু আই. সি. এস. পরীক্ষায় দাদাবাবু ফেল হলেন, কেননা সরকারী খাতায় তাঁর নামে ঢ্যাড়া পড়ে গিয়েছিল রাজদ্রোহী বলে। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যর্ রিচার্ড গার্থ সাহেব কালী-

মোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনকে ভালো রকমেই জানতেন। তিনি ভুবনমোহনকে লিখলেন— 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু তোমার ছেলের ওলড্‌হ্যামের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সব ভেস্তে গেল। আমি ইণ্ডিয়া আফিসকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না।'

বাড়িতে সবাইয়ের মন যে খুবই খারাপ হয়েছিল তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সেবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দাদাবাবু পাস করলে দেশ একটি উঁচুদরের জনহিতকর জেলাশাসক এবং যদি তিনি চাকরি বজায় রাখতে পারতেন তবে এমন-কি একজন ন্যায়নিষ্ঠ কমিশনারও পেত। কিন্তু দেশ একটি উন্মুখচিত্ত, উৎসর্গিত-প্রাণ 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' হারাত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দাদাবাবু ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার জন্যে ভর্তি হলেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায়। তার পর সেই বছর ১৬ই আশ্বিন ১৩০১ বঙ্গাব্দে ইংরেজী ১লা অক্টোবর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরেই ১৪৭ নং রসা রোড সাউথ ভবনে যেখানে জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে বাবা মা তখন ছিলেন সেই বাড়ির দোতলায় একটি সরু ফালি ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম চোখ মেলেছিলাম এই পৃথিবীতে। মায়ের কাছে শুনেছি যে সেই দিনই নাকি দাদাবাবু প্রথম টাকা পান কি একটা মফস্বলে ফৌজদারী মামলায় এবং সবটাই তিনি দিয়েছিলেন জ্যেঠিমার হাতে। জ্যেঠিমা তারই থেকে কিছু টাকায় আমার জন্যে কোমরে না গলায় কি একটা গহনা, যা সেকালে সদ্যজাত শিশুরা পরত, তাই গড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের আশীর্বাদের নিদর্শন স্বরূপে।

এইখানে একটা ঘটনার কথা যা মনে পড়ছে তা বলে রাখি। বহুবছর পরে আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছিলাম। আমার সহধর্মিণীর এক মাসতুতো বোনের কন্যা সুজাতা (ডাকনাম আপু) এ দের সঙ্গে আপন ছোটো বোনেরই মতো মানুষ হয়েছিলেন এঁদের মায়ের কাছে এবং তিনি এঁদের দিদি বলেই জানতেন এবং ডাকতেন। সেই আপুর প্রথম সন্তান হবার সময়ে যখন কঠিন বেদনা হয় তখন রাতদুপুরে ডাক্তার ডাকতে যেতে হয়েছিল আমাকে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের বড়ো ডাক্তার তখন ছিলেন খ্যাতনামা সুবোধ মিত্র মশায়। তখনো ১৪৭নং রসা রোডের বাড়ি ভেঙে গোয়েঙ্কা ব্লক হয় নি। সুবোধ মিত্র মশায় ১৪৭নং রসা রোডের

দোতলায় পরিবার নিয়ে বাস করতেন। সেই রাতদুপুরে দরজায় আঘাত করলে একজন ভৃত্য আমাকে উপরে নিয়ে রোগীদের অপেক্ষা করবার ঘরে বসিয়ে খবর দিতে গেল ডাক্তার সাহেবকে। ডাক্তার সাহেব খবর পেয়ে উঁচুগলায় বললেন, 'দাস সাহেব, একটু বসুন, আমি এলাম বলে।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমি বসে অপেক্ষা করতে গিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছি। হঠাৎ যেন চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। একি? এই তো সে ঘর যেখানে আমি প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলাম। কিরকম একটা আবেশ যেন পেয়ে বসল আমার মনটাকে। এমন সময় ডাক্তার বন্ধুটি ঘরে ঢোকায় আমার ধ্যানভঙ্গ হল। তাঁকে ব্যাপারটা না বলে পারলাম না। তিনিও যেন কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'তাই নাকি? সত্যি? কি আশ্চর্য!' ডাক্তার নিয়ে গেলাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে আমার শ্বশুরালয়ের নূতন প্রসূতি-ঘরে। কিন্তু বহুক্ষণ ফুটে রইল আমার মানসপটে বহুদিন আগেকার প্রায়-ভুলে-যাওয়া সেই আরেকটি প্রসূতিঘরের ছবি এবং আমার সমস্ত হৃদয়-মন ভরে উঠল আমার মুখের পানে চাওয়া আমার মায়ের চোখদুটির আনন্দোচ্ছল করুণার বিগলিত ধারায়।

আমার জন্মের দিন থেকেই ঘুচে গেল আমার ঠাকুমার বংশলোপের আশঙ্কা এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর পারলৌকিক পরিত্রাণের আশা। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কর্তাই আইছেন।' ঠাকুর্দা গোপীমোহন মারা গিয়েছিলেন বছর দেড়েক আগে। তাঁর আশীর্বাণী সফল হল মায়ের জীবনে— 'তর হইব, দেখিস তর হইব— আমি কইয়া গেলাম তর হইব।' আমাকে দেখতে পাবেন না বলে ঠাকুর্দার মনে কষ্ট হয়েছিল। আমি আমার অন্ধ ঠাকুর্দাকে দেখতে যে পাই নি জীবনে— এই আক্ষেপ আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে পীড়া দিয়েই চলেছে।

আমার জন্মের পর থেকেই আমার দেহটাকে সহনশীল ও পোক্ত করবার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন আমার ঠাকুমা। প্রথম ব্যবস্থাটাই হল রোদে খুব ঘষে ঘষে সরষের তেল গায়ে মাখিয়ে মাথাটা টিপে টিপে গোলাকৃতি করবার নিত্য চেষ্টার পর একটা বেশ বড়ো কাঠের পিঁড়ির উপর সূর্যের দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রোদে ফেলে রাখা। কবিবর ডি. এল. রায় যে মজার গান বেঁধেছিলেন—'করে দিল কালো ছেলে রোদে ফেলে মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল'— সেটা আমার ঠাকুমার কৃপায় খেটে গেল আমারি

বেলায়। তবে সুফল যে হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। আমার মাথার সুডোল গডনটির জন্যে আমার মা সর্বদাই তাঁর শাশুড়ির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। গায়ের রঙটা পাকা কালো হয়ে গেল বটে কিন্তু দেহটাও যে খুবই পোক্ত হয়ে উঠল তাতেও ভুল নেই। আমি আজ যে বয়েস পেয়েছি তাইতেই ঠাকুমাব ব্যবস্থাব উৎকর্ষেব প্রমাণ হয়ে যায়। আমাব সহধর্মিণীর এই ব্যবস্থাটাব উপবে যে প্রগাঢ আস্থা হয়ে গেছে তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদেব মেয়ে কাজল ও আমাদের ছোটো ছেলে সুহৃদ (মানিক) এব দুই মেয়েব উপব তাব প্রয়োগে। একদিন মানিকেব ছোটো মেয়েকে ঐবকম শক্ত কাঠেব পিঁডিব উপর কাঁথা চাপা দিয়ে বোদে শোয়ান দেখে একজন বিচক্ষণ ডাক্তাব বললেন, 'এ ব্যবস্থা কে কবেছে?' আমাব স্ত্রী আমাব ঠাকুমাব দোহাই দিয়ে বললেন যে তাঁবই ব্যবস্থামত এ কাজ কবা হয়েছে। ডাক্তারটি বললেন, 'এটা সত্যি সত্যি খুব ভালো— শক্ত কাঠেব উপব সদ্যোজাত শিশুদেব শোযালে তাদেব শিবদাঁডাটা শক্ত হয় এবং শবীবটাও সহনশীল হয়।' বাগে পেয়ে আমার স্ত্রী তক্ষুনি বললেন, 'ব্যবস্থাটা যদি ভালোই হয় এবং আপনাবা যদি তা ভালোই মনে কবেন তবে আপনাবা এই ব্যবস্থা দেন না কেন?' ডাক্তাবটি অপ্রস্তুত হযে বললেন, 'দেখুন, আজকালকাব শৌখিন মায়েবা এবকম একটা স্পারটান ব্যবস্থা পছন্দ কবেন না, প্র্যাকটিসটা তো খোয়াতে পাবি নে।' বেশ হাসাহাসিব মধ্যেই আলোচনাটা শেষ হয়ে গেল।

আমাকে তেল মাখিয়ে বোদে ফেলে আমাব ঠাকুমা নাকি হাপুস চোখে চেয়ে থাকতেন আমাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গডন সৌকুমার্যেব দিকে। ঠিক সেই সময়ে মধ্যেব বাডিব কালীমোহনেব নাতনী মনোবঞ্জনদাদার একমাত্র কন্যা কুসুমকুমাবীবও একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছিল ১৪৮নং বসা বোডের বাড়িতে। ছেলেটি তাব বাপ সত্যেন বায়েব উজ্জ্বল বঙটি পেয়েছিল। সেই ছেলেটি আব আমি হয়েছিলাম দিন সাতেক আগে-পিছে। বছব বাবো-চোদ্দোব মধ্যেই সে মাবা যায়। তখন ১৪৮নং এবং ১৪৭নং বাড়িতে অনায়াসেই আসা-যাওয়া যেত খোলা ছাদেব উপর দিয়ে। ছুটকিদিদি (ঊর্মিলা)র মুখে শুনেছি যে আমাব ঠাকুমাকে টালাবাব জন্যে তাঁবা বলতেন, 'দেইখ্যা আইলাম ঐ বাড়িতে কুসুমেব পোলাবে— কি সুন্দব টুকটুইক্যা গায়েব রঙ'। বলেই একটু থামতেন এবং যখন বুঝতেন যে কথাগুলি আমার ঠাকুমার

মনে থিতিয়ে বসেছে তখন যেন আচমকা আবার বলতেন, 'সোনাদিদিমা গো— তোমার নাতি কিন্তু বড়ো কালা'। কথা দু'টাই নিছক সত্য এবং অস্বীকাব কববার যো নেই। কিন্তু আমাব ঠাকুমা নাকি যেন কিছুই আক্ষেপেব কারণ নেই এমনি গলায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন— 'সোনাব আঙ্গুট কি ব্যাঁকা আছে'। কথাটাব মধ্যে ঠাকুমাব মনেব অনেকখানি নিহিতার্থ হয়তো ছিল। তাঁব নাতিটি যে খাঁটি সোনা এবং সোনার আংটি বেঁকে গেলেও যে সোনার দাম এক বতিও কমে না— এই সহজ কথাটা বেশ সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। আমি যখন একেবাবে ছোটো বড়দিদি (অমলা) আমাকে নাকি তাঁর বুকেব উপর ফেলে থাবড়িয়ে থাবডিয়ে গান কবে ঘুম পাড়াতেন এ কথা মায়ের কাছে অনেকবাব শুনেছি। বডদিদিও পবে তাঁব জীবনের শেষ দিকে আমাকে খুব কাছে ডেকে নিয়ে আমাব ছোটো বয়সের কথা বলতেন।

আমাদের মেয়ে কাজলের বিয়েব সময়ে ছুটকিদিদি আমাদেব রাসবিহারী অ্যাভিন্যুয়েব বাড়িতে আসতেন ও বেশ কিছুক্ষণ থাকতেন এবং কাজেব ফাঁকে ফাঁকে পুরানো দিনেব কত গল্পই না করতেন। বলতেন, 'জানিস তোরা, খুড়িমা তখন আমাদেব বাড়ি থাকতেন। খোকা হয় নি। সোনাদিদিমা তো কাকাকে আর একটা বিয়ে দেবাব জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। খুড়িমা একেবারে মাথা গুঁজে কাজ কবে যেতেন। মুখে নাই বা— সবার মন জুগিয়ে চলাই তখন খুড়িমাব সাধনা। তাব পব যখন খোকা হল, আব খুড়িমাকে পায় কে। একেবাবে সিংহ অবতার।' আমবা ভাইবোনেবা হেসে ফেলতাম। আমাদেব ছেলেপেলেরা তো হেসে কুটিপাটি তাদেব ঠাকুমার এই হঠাৎ পরিবর্তনেব কথা শুনে।

দেখতে দেখতে বছব ঘুবে গেল। মা আমাকে কোলে নিয়ে গেলেন বাপেব বাড়ি হাসাড়ায়। ছোটো বয়সের বন্ধু-বান্ধবদেব এবং গুরুজনস্থানীয় লোকেদের ছেলে দেখাবাব আকাঙ্ক্ষাটা যে একটুকুও ছিল না তা না-ও হতে পারে। তখন আমাব দাদামশায় কৈলাসচন্দ্র জীবিত ছিলেন। তার অল্পকাল পবেই তিনি মারা যান। সেবার দাদামশায় হাসাডায় ছিলেন কি না জানি না। কিন্তু দাদামশায়কে আমার একেবারেই স্মবণ নেই। সেবার যখন হাসাডায় ছিলাম তখনকার কোনো ঘটনাই আমার মনে নেই। তবে শুনেছি সেই সময়ে সেখানে তিনটি ঘটনা ঘটেছিল।

প্রথমটি আমার সোনামামা (অতুল) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোলে করে নাচাতে নাচাতে হঠাৎ হাত থেকে আমাকে ফেলে দিয়েছিলেন। পড়ে যাবার কাবণটা খুব সম্ভবত আমারই চাঞ্চল্য। যাই হোক, পড়েছিলাম নাকি একটা চৌকাঠেব উপব। রক্তপাত এবং আমাব কান্নায় সোনামামা বেচারী তো অপ্রস্তুত। সেই ক্ষতচিহ্নটি আমার বাঁ-চোখের বাইরের কোনাব নীচে এখনো বেশ স্পষ্ট হয়েই আছে। পরে সোনামামা ঐ দাগটা দেখিয়ে হেসে বলতেন, 'কি অপ্রস্তুতই না আমাবে কবছিলি তুই।' দ্বিতীয় ঘটনাটা হল এই যে আমাব ঠাকুরমামা (যোগেশ) এর ছোটো মেয়ে ছুটকি আমার বয়সী। আমরা দুজনেই তখন হামাগুডি তো দিই-ই, একটু একটু হাঁটতেও শিখেছি। ছুটকিব কি কি সব খেলনা ছিল। আমি দাদামশায়ের মেয়ের ঘরের প্রথম নাতি। সুতবাং আমার উপরে তখন সবাই সদয়। তাঁরা আমাকে ঐ খেলনার থেকে কি একটা খেলনা দিয়েছিলেন। আমি একাগ্র মনে সেটি নিয়ে খেলছি। এমন সময় দেখি ছুটকি আমার দিকে সজোরে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। বুঝলাম খেলনাটা কেড়ে নেবার মতলব। আমিও খেলনাটা হাতে করে হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে শুরু করলাম। এই নিয়ে পরে ছুটকিব সঙ্গে কত হাসাহাসিই না হয়েছে। তৃতীয় ঘটনা আমাব বোন খুকীর জন্ম। খুকী আমাব চেয়ে এক বছর আট মাসের ছোটো। খুকী জন্মাবার কিছুদিন আগেই আমাদেব ঠাকুমা কলকাতায় মাবা গেলেন। মরবার সময় বৃদ্ধা তাঁব দেবতার কাছে চাওয়া নাতিকে না দেখে হয়তো কত-না কষ্টই পেয়েছিলেন।

আমবা কলকাতায় ফিবে এলাম। তখন দাদাবাবু প্রাণপাত করে টাকা রোজগাব করবার চেষ্টা কবছেন। তাব উপব তাঁব ঘাড়ে এসে পড়ল জ্যাঠামশায়ের বহু ঋণেব দায়িত্ব। তাঁকে নূতন হ্যাণ্ডনোটে সই করতে হল। কিন্তু দেবার সময় টাকার যোগাড় নেই। অবশেষে পিতাপুত্রেব দেউলিয়া আদালতেব শরণ নিতে হল ১৬ই জুন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। সবে কাজ করতে শুরু কবে জুনিয়ার ব্যাবিস্টাবেব দেউলিয়া নাম যে কিবকম মারাত্মক প্র্যাকটিসের পক্ষে তা হয়তো সবাই বুঝবেন না। সেই-সব দুঃখ কাটিয়ে কি কবে দাদাবাবু যে মাথা উঁচু কবে উঠলেন সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ভগবানের দয়া না থাকলে এমনটি হয় না। সেই-সব দিনের কথা আগেই বলেছি এবং পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর দাঁড়াল এই যে

জ্যাঠামশায়ের অ্যাটর্নি আফিস বন্ধ করতে হল। জ্যেঠিমাকে ও দিদিমণি— যিনি তখন বিধবা হয়েছেন, তাঁকে—ও তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে জ্যাঠামশায় তখন পুরুলিয়ার 'রিট্রিট' বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়ির 'রিট্রিট' নাম সার্থক হল।

বাবার আর্টিকেলড ক্লার্কশিপেব মেয়াদ তখন পূর্ণ হয়েছে। পবীক্ষাগুলি দিয়ে পাস কবলেই জ্যাঠামশায়েব মক্কেলদেব নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসতে পাবতেন। কিন্তু বাবার মন এমন ভেঙে গিয়েছিল যে হাইকোর্ট পাড়ায় যেতে তাঁব মন আব কিছুতেই সায় দিল না। তিনি অ্যাটর্নিশিপ পবীক্ষাগুলি না দিয়ে কলকাতা কর্পোবেশনেব ঠিকে গাডিব ডিপার্টমেন্টে একশ পঁচিশ টাকাব ইন্‌সপেকটবেব চাকবিতে ঢুকলেন। মুখে বলেন যে তাতেই ছোটো সংসাব চলে যাবে। তখনকাব দিনে একশ পঁচিশ টাকার দাম একশ পঁচিশই ছিল অর্থাৎ টাকায় চাব আনা হয় নি। ছোটোখাটো সংসার সত্যিই বেশ চলে যেত। চাকবি পেয়েই বাবা একটা ছোটো ভাডাটে বাড়িতে উঠে গিয়ে আলাদা সংসাব পাতলেন মাকে, আমাকে আব খুকীকে নিয়ে। মায়েব কাছে শুনেছি যে সেই সস্তাগণ্ডাব দিনে বাবা আফিসে যাতায়াতেব জন্যে একটা ছোটো টমটম গাডি ও একটা টাট্টু ঘোডাও কিনে ফেলেছিলেন। সন্ধ্যাব সময় যখন বাবা আফিস থেকে টমটম হাঁকিয়ে বাডিতে এসে নামতেন মা তখন আমাকে আব খুকীকে কাপড পবিয়ে তৈবি বাখতেন যাতে কবে সহিস যখন ঘোড়াটাকে ঠাণ্ডা কববাব জন্যে খানিকটা হাঁটিয়ে ঘুবিয়ে আনবে তখন আমবা দুই ভাইবোনে একটু গাডি চডে বেডিয়ে আসতে পাবি। এটা আমাব মনে নেই কিন্তু বড়ো হয়ে যখন মা'ব কাছে এই টমটম-চডাব গল্প শুনতাম তখন মনে খুব সাধ হত যে বড়ো হয়ে আমিও একটা মস্ত ঘোডা ও টমটম গাডি কিনে নিজে চালিয়ে আফিসে যাব। আমি বড়ো হয়ে আফিসে যাবাব যোগ্য যখন হলাম তখন কলকাতা ভরে গেছে মোটবগাডিতে। তা ছাড়া শুনলাম যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব সময় নাকি দেখা গিয়েছিল যে ঘোডার দানা অত্যন্ত দুর্মূল্য এবং এমনকি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অনেক বনেদী বাবুদেবও ঘোডা উত্তব ভাবতে বেচতে হয়েছিল। সুতবাং মনেব ইচ্ছে মনেই বয়ে গেল— টমটম চালানো আমাব ভাগ্যে আর ঘটে উঠল না।

অল্প কিছুদিন পবে বাবাকে এই ভাডাটে বাডি থেকে উঠে গিয়ে কালী-

মোহনের বাসগৃহ ১৪৮নং বসা রোডের একটা অংশে যেতে হল। সেই সময়ে কালীমোহনেব নাতনী, মনোরঞ্জনদাদাব মেয়ে কুসুমের সঙ্গে ভোলা-দাদাব মামলা চলেছে ভোলাদাদাব কালীমোহনেব দত্তকপুত্র বলে দাবিব বৈধতা নিয়ে। ভোলাদাদাব তবফ থেকে কালীমোহনের ঐ বসতবাডিব দখল বাখা নাকি আইনগতভাবে প্রয়োজন ছিল। বাবা সপবিবাবে গিয়ে সেই প্রকাণ্ড বাডিব উত্তব দিকেব বডো হলঘবটাতে গিয়ে উঠলেন। তখন সে বাডিব সদর গাড়ি-বাবান্দা ছিল পশ্চিম দিকে রসা বোডেব উপর এবং দোতলায় উঠবাব সিঁডিটা ছিল উত্তব-পশ্চিম কোনায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে উপবে উঠলেই ছিল একটি প্রকাণ্ড বাবান্দা। সেই বাবান্দাব সামনে খানিকটা এগিযে গিয়ে পৌঁছলেই বাঁ দিকে ছিল একটি ফালি বাবান্দা যেটা গিয়ে পডত ঐ হলঘবেব দবজায়। বাডিটি ছিল সেকালেব বেওয়াজমত চকমেলান। হলঘবটি এককালে শুনেছি কলকাতাব বহু গণ্যমান্য লোকেব সমাগমে মুখবিত হয়ে উঠত। বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক নাকি সেখানে পায়ের ধুলা দিয়ে গেছেন। ঘবখানা ছিল বেশ লম্বা— উত্তবে ও দক্ষিণে তিনটি কবে বেশ বডো বডো জানালা ছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে ভেতবেব বাঁধানো উঠানটি এবং উঠানেব দক্ষিণ দিকের বাবান্দাটা দেখা যেত। এই হলঘবটায় তখনো পুবানো আমলেব দু-একটা আসবাবপত্র ছিল। একটা ছিল মস্তবডো পাথবেব সরু টেবিল পুবেব দেওয়ালের গাযে। সেই টেবিলেব উপব ছিল প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু পেল্লায় একটা সোনাব জলেব চওডা ফ্রেমে বাঁধানো আয়না। এই আয়নাটা আমাব বেশ মনে পডে, কেননা এব সামনে দাঁডিযে নাচানাচি, মুখ ভেংচি অনেক কবেছি। আব-একটা আসবাবেব কথা বেশ মনে আছে সেটার মজাব চেহারাব জন্যে। সেটা বাবা মায়েব জন্যে মিস্ত্রি দিয়ে তৈবি কবিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা একটা কাঠেব মস্ত ঘব বললেই হয়। চাবটে মোটা পায়েব উপরে উঁচু কাঠের দেওয়াল, ছাদ ও পাটাতন দেওয়া একটা বাক্স। আমবা ঐ মস্ত হলঘবে এবং তৎসংলগ্ন ছোটো দু-একটা ঘবে বাস করতাম। মায়েব ভাঁডার বাখবাব জন্যে এই প্রকাণ্ড বাক্স তৈরি হয়েছিল। সেটার মধ্যে উঠে মা বেশ দাঁডাতেও পাবতেন। শেষ পর্যন্ত সেটাব কি গতি হল মনে নেই।

১৪৮নং বাড়ির দক্ষিণের অংশে থাকতেন কালীমোহনেব বিধবা পুত্রবধূ, আমাদের বডো বৌঠান দুর্গাসুন্দবী। তাঁব মেয়ে কুসুমও মাঝে মাঝে

থাকতেন। নীচের তলায় থাকতেন কালীমোহনের বৃদ্ধ মুহুরী যাঁর নাম ভুলে গেছি। তাঁর দুই ছেলে অতুল ও অনিলকে বেশ মনে আছে। অনিল খুব অল্প বয়সেই মারা যান। তেলিববাগেব লালবিহারী জ্যাঠামশায়, যিনি কবিবাজী করতেন, তিনি থাকতেন একতলায় সামনের একটা ঘরে। আর ছিলেন হেমচন্দ্র সেন, যাঁকে আমবা ডাকতাম ভ্যাগাদাদা বলে, তাঁর বাবা যিনি হাইকোর্টে কি একটা কাজ করতেন এবং তাঁর মা যাঁকে মা ডাকতেন 'পিস্যাসঠাইন' অর্থাৎ পিসিশাশুড়ি। এই 'পিস্যাসঠাইন' তখন খুবই বৃদ্ধা কিন্তু খুব উজ্জ্বল ছিল তাঁব গায়ের বঙ। তিনি জ্যাঠামশায়দেব পিসি ছিলেন এবং বিধবা হয়ে ছেলে নিয়ে তিনি কালীমোহনের আশ্রয়ে এসেছিলেন।

বড়ো বৌঠান দুর্গাসুন্দরী যে বাবা-মায়ের ঐ বাড়িতে আসাটা পছন্দ কবেন নি তাব ইঙ্গিত আমবা ছোটো ভাইবোনেবাও বুঝতে পাবতাম। মা সাবাক্ষণ আমাদেব বাবণ কবতেন দক্ষিণেব বাবান্দায় কি তৎসংলগ্ন কোনো ঘবে যেতে। তা ছাডা কে ভালোবাসে, কে বাসে না তা আমরা কেমন যেন মনের ইঙ্গিতেই টেব পেতাম। বড়ো বৌঠানেব কডা মেজাজকে আমরা ভয় কবেই চলতাম। দুটো জিনিস ছাডা বাগানের কোনো ফল-মূলেতে আমরা হাত দিতাম না। একটা হচ্ছে আমাদেব হলঘরের উত্তর দিকেব একটা রসে টুবুটুবু জামরুলেব গাছ। উত্তব দিকেব জানালা খুলে ছাতির বাঁট কিংবা আঁকশি দিয়ে টেনে জামরুল সংগ্রহ করা যেত অতি অনায়াসে। এতে কোনো গণ্ডগোল হত না, কেউ জানতেই পাবত না। গোল বাধত ঐ সামনেব গাডি-বারান্দাটাব সামনে রসা বোডেব দিকে যে একটা পেয়াবা গাছ ছিল তার পেয়াবা নিয়ে। সে পেয়াবাগুলোর আকৃতি ছিল ঠিক ছোটো কলসীর মতো অর্থাৎ ফলটার তলাব গোলটাকে গাছের বোঁটার সঙ্গে সংযুক্ত বাখবাব জন্যে ছিল একটা গলার মতো অংশ। সেই গলাটার মধ্যে কোনো বিচিই থাকত না। এক কামড়েই সেই অংশটুকু কেটে নেওয়া যেত এবং ফলটা ডাঁসা অবস্থায় থাকলে সেই গলাটা যে কি সুস্বাদু তা সে পেয়ারা যে না খেয়েছে সে বুঝবেই না। খুবই সন্তর্পণে এই পেয়ারা আহরণ কবতে হত।

সামনের রসা রোড দিয়ে যেত ট্রামগাডি। লাইন পাতা ছিল। তার উপর দিয়ে চলত ট্রামগাড়ি। সে গাড়ি টানত মোটা মোটা প্রকাণ্ড দুটো পাটকিলে বাদামী বা সাদা বঙের বিলেতী ঘোডা। মাঝে মাঝে ঘোড়া ক্ষেপে

গিয়ে গাড়িটাকে লাইন থেকে তুলে টেনে নিয়ে যেত রাস্তার অন্য দিকে। তখন তাদের শান্ত করে গাড়িটাকে টেনে আবার লাইনে বসানো হত। ঘোড়ার কোচোয়ানের হাতে থাকত মস্ত বড়ো চাবুক আর মুখে থাকত হুইসিল যা দিয়ে সে পথযাত্রীদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বলত। হুইসিলের দরকার হত না, কেননা ঘোড়ার খুবের ও গাড়িব লোহাব চাকাব আওয়াজ, এই দুই মিলিত আওয়াজ আগেই পৌঁছে যেত পদচাবীদের কানে। আমাব সেই বয়সে তখনো ইলেকট্রিক ট্রাম চলা শুরু হয় নি।

এই বাড়িতে বাসেব স্মৃতি আমার মনে খুবই আবছায়াব মতো আছে। তিনটি জিনিস বেশ মনে আছে। ঐ বাড়িতে একটি দাসী ছিল, খুবই বৃদ্ধা। তাঁর নিজেব কি নাম ছিল তা কখনো শুনি নি। সবাই ডাকত 'ইন্দুবেব মা' বলে। সেই 'ইন্দুব'-এব ভালো নাম ছিল হবিচবণ ঘোষ। তিনি ছিলেন বাবাব চেয়ে বযসে কিছু ছোটো এবং দাদাবাবুর প্রায় সমান সমান। পরে তিনিও বোধ হয় বি.এ. পবীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু পাস কবতে না পেবে বোম্বাই চলে যান এবং সেখানে কাগজেব ব্যাবসা করে বিস্তব অর্থ উপার্জন কবেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এলে বাবা, দাদাবাবুদের সঙ্গে দেখা কবতেন এবং ঐ বাড়িতে থাকতেনও। তিনি বিয়ে কবেন নি। তাঁব টাকাগুলিব কি হবে? আমবা বড়ো হয়েও শুনতাম যে তিনি তাঁর সব টাকা সুধাংশুকে (দিদিমণিব ছেলে), ভোম্বলকে (দাদাবাবুব ছেলে) এবং আমাকে তুল্যাংশে ভাগ কবে দেবেন। তিনি বোম্বাইয়ে হঠাৎ মাবা যান। কেউ কেউ বলে তাঁকে দুর্বৃত্তবা হত্যাই কবেছে। যাই হোক, তাঁব উইলেব কোনো খবব জানা গেল না এবং টাকাগুলো বাবোভূতেই মেরে নিল। যাকগে সে কথা। আমবা যখন কালীমোহনেব ১৪৮নং বাড়িতে ছিলাম তখন এই ইন্দুবের মাও ছিলেন সেখানে। খুব যখন দারুণ গবম তখন বৃদ্ধা একদিন খুব ঝাল লঙ্কা টিপে কাঁচা আমেব টক-ডাল খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হলেন। মাকেই তাঁর সেবা করতে হয়েছিল। এবকম নিষ্ঠাব সঙ্গে সেবা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। বৃদ্ধার ময়লা পরিষ্কাব করা, কাপড কাচা ইত্যাদি সবই মায়ের করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বাঁচলেন না শেষ পর্যন্ত। খবর পেয়ে ইন্দুর বোম্বাই থেকে ছুটে এসেছিলেন। এবং একটু একটু মনে পড়ে তাঁর পরনের থান কাপড় ও গলায় চাবি-বাঁধা উত্তবীয়। মৃত্যুর জন্যেই বোধ হয়

বৃদ্ধার কথা ও তাঁর ছেলের তখনকার পরিধানেব কাপড়ের কথা মনে আছে।

খুকী আব আমি পিঠোপিঠি ভাইবোন। ভালোবাসা যে ছিল না তা না, কিন্তু ঝগড়াও হত হামেশাই। খুকী ঐ বয়স থেকেই শুরু করেছিল আমার নামে বাবার কাছে নালিশ কবা। আমি যখন অতুল অনিলের সঙ্গে ডাংগুলি বা মাববেল কিংবা অন্য কোনো খেলা খেলতাম খুকী চাইত সে-ও খেলবে। আমবা তাতে আপত্তি কবতাম। খুকী তখনো ভালো কবে কথা বলতে পারে না। বাবা আফিস থেকে ফিবলেই সে নালিশ দায়েব কবত—'বাবা, দাদা খেলিস না, খেলিস না কয়।' বকুনি খেতাম খুব— প্রহাবটা তখনো বোধ হয় শুরু হয় নি। সেটা বেশ প্রচণ্ডভাবেই হত পরে খুকীব নালিশেব ঠেলায়। সেই সময়ে খুকীকে একটা পাগলা কুকুবে কামডায়— বাঁ-হাতেব উপবেব দিকে যেখানে টিকে দেয। খুকী সেই কুকুবটাকে 'যাঃ যাঃ' করে বকছে কিন্তু কুকুবটা তাব হাতেব কামডটা ছাডছেই না। আমবা দৌডে গিয়ে চেঁচামেচি কবাতে কুকুবটা পালালো। ভাগ্যিস আমাদেবও কামড়ায় নি। তাব পব পডে গেল হৈ হৈ। কি হবে মেয়েব? আজকাল পাগলা কুকুবেব কামড়েব যে সহজ চিকিৎসা হয়েছে তখনকাব দিনে তাব কিছুই ছিল না। কসৌলী তখন বোধ হয় স্থাপিতই হয় নি। গোন্দলপাডা বলে একটা জায়গায় খুকীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা কবানো হল। ভগবানেব দয়ায় খুকী ভালো হযে উঠল। খুকীব বাঁ-হাতেব ডানাটায এখনো সেই দাগটা চক চক করছে দেখা যায়।

তৃতীয় ঘটনা যা একটু একটু মনে আছে তা হচ্ছে আমাব দ্বিতীয় ভগিনী সুনীতি (গুগু)ব জন্ম ঐ ১৪৮নং বাড়িতে। সে-সময় জ্যেঠিমা চলে গেছেন পুরুলিয়াতে। মাকে দেখবে কে? ছুটে আসতেন মধ্যেব বাডিব দুর্গা-মোহনের দ্বিতীয়া পত্নী আমাদেব ধন-জ্যেঠিমা হেমন্তশশী। এই জ্যেঠিমাকে তখন দেখেছি। খুবই স্নেহশীলা মহিলা তিনি ছিলেন। গুগুব জন্মেব কিছুদিন পবেই যখন সে একটু শক্ত হয়ে উঠল তখন মা খুকী, গুগু ও আমাকে নিয়ে তেলিববাগে গেলেন। তখন একটানা বেশ কিছুদিন মায়েব সঙ্গে আমবা ভাইবোনেবা স্বগ্রাম তেলিববাগে ছিলাম।

তৃতীয় পর্ব

পড়াশুনা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শৈশবে গ্রামের স্কুলে

১

বাবা মাকে ও আমাদেব তিন ভাইবোনকে তেলিরবাগে রেখে আসবেন এই স্থির হল। এব আগে যখন কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়েছিলাম তখন আমাব বয়েস বড়ো জোব দেড বছব এবং খুকী তখনো জন্মায়ই নি। সুতরাং কোন্ বাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় গিয়েছিলাম তা আমার একটুও মনে ছিল না। তাই এবারে আবার দেশে যাওয়া হবে শুনে আমবা এবং বিশেষ কবে আমি খুব খুশি হয়ে যাবাব দিন গুনতে লাগলাম। তখনো কলকাতা কর্পোরেশনে চেয়াবেব হাতলে চাদর বেঁধে গা ঢাকা দিয়ে সবে পড়ার বেওয়াজ আসে নি। সুতবাং বাবাকে অপেক্ষা কবতে হল কবে দিনকতক ছুটি একসঙ্গে পাওয়া যায়। অবশেষে বডোদিনেব ছুটি এসে পডলে বাবা মাকে ও আমাদের তিন ভাইবোনেদের নিয়ে বওনা হলেন। বিছানাপত্তব বেঁধে একটা ঠিকে গাড়ির মাথায় বোঝাই কবে বাবাব সঙ্গে আমরা গেলাম বেলস্টেশনে। শুনেছিলাম যে স্টেশনেব নাম শিয়ালদহ। স্টেশনে গাড়ি থামতেই কুলিবা এসে গেল মালপত্তর নিয়ে গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে। সাবাটা স্টেশনে সে কি মানুষের ভিড়, ঠেলাঠেলি এবং উজ্জ্বল আলো। আমরা গিয়ে যে ট্রেনে উঠলাম শুনলাম তাব নাম গোয়ালন্দ মেল। আমরা যে কামবায় উঠলাম সেটা নাকি ইণ্টার ক্লাস— দেডা ভাড়া। জিনিস-পত্র বেঞ্চের তলায়, মাথাব উপবে বাখা হল। আমাব কেবলই মনে হতে লাগল গাডি কেন ছাডছে না— দেশে পৌছতে দেবি হয়ে যাবে যে।

অবশেষে একটা বাঁশির আওয়াজ হতেই গাডির দরজা দিয়ে মুখ বাডিয়ে দেখি দূরে একটা সবুজ বাতি। বাবাকে জিজ্ঞাসা কবে জানলাম যে ওটা নাকি সিগন্যাল— গাড়ি ছাডবার ইঙ্গিত। ওটা না জললে নাকি গাডি ছাড়ে না। আস্তে আস্তে গাড়ি এগুতে লাগল এবং তাব গতিবেগও বেডেই চলল। যতদূর মনে আছে বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছিলাম। মা বললেন, 'খোকা, শুবি আয়।' আমাব ইচ্ছে জানালা দিয়ে মুখ বাডিয়ে থাকি। কিন্তু অন্ধকার রাত, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গাডি না থেমেই দু-একটা

স্টেশন পেরিয়ে গেল। ক্রমে দেহ মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশ কনকনে হাওয়ায় শীত-শীত বোধ হল। মায়ের বসবার জায়গার পাশেই কোনো-রকমে কুকুবকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পডলাম। খুকী গুগুব তখন অর্ধেক রাত। কতক্ষণ ঘুমোলাম জানি নে। হঠাৎ বাবা ঠেলে বললেন, 'খোকা, ওঠ।' গা মোডামুডি দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে দেখি ভোব হয়েছে আবছায়ারকমে অর্থাৎ বোদ ওঠে নি কিন্তু আকাশেব রঙ পাতলা হয়ে এসেছে। পাতলা সাদা ধোঁয়াব মতো মেঘ যেন ছডিয়ে বয়েছে। শুনলাম আমবা গোয়ালন্দে এসে গেছি। এখানে বেল থেকে নেমে স্টীমাবে চাপতে হবে। স্টীমাবের কথা শুনেই মনটা লাফিয়ে উঠল এবং তাডাতাডি কাপডচোপড পবে নিলাম। দূবে পদ্মা নদী দেখা যাচ্ছিল।

গাড়ি থামলে আবাব লোকেব ভিড—কুলিব ঠেলাঠেলি। গাডি দাঁডিয়েছে এমন একটা জায়গায় যেখানে প্লাটফবম ছিল না। নদীব পাবে বালির উপবে ট্রেন এসে থেমেছে। গাডি থেকে মাটি বেশ খানিকটা নীচে নামতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল যাত্রীদেব। যাই হোক, যাত্রীবা দেখলাম তা গ্রাহ্যই কবছিল না। নেমেই পাঁই পাঁই কবে ছুটছিল জাহাজঘাটেব দিকে। তাডাতাডি গিয়ে জায়গা দখল কববার জন্যে। আমবাও যথাসম্ভব তাডা-হুডো করে চললাম ভিড়েব পেছন পেছন। বাবা মাল-মাথায় কুলিদেব সামলাচ্ছিলেন। জাহাজেব কাছে এসে দেখি কতকগুলি চওডা চওডা তক্তা ফেলে শক্ত কবে বেঁধে পাড থেকে জাহাজের গা পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাবই উপব দিয়ে যাত্রী, কুলি ঠেলাঠেলি কবে জাহাজে উঠছে। মার কোলে গুগু, আব খুকী ধবেছে বাবাব হাত। মা আমাব বাঁ-হাতটা তাঁর ডানহাতে শক্ত কবে ধবে তক্তাব উপর দিয়ে প্রায় টেনেই নিয়ে এলেন জাহাজের উপবে। এখন কেমন বলতে পাবি না, তখনকাব দিনে জাহাজেব একতলায় যাত্রীদেব বসবাব জায়গা থাকত না। যাত্রীদেব সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নিজ নিজ ক্লাসে যেতে হত। জাহাজেব দোতলায় সামনে খানিকটা খোলা ছাদ এবং তাব পেছনেই দুই লাইন ঘব, মাঝখানে পথ। শুনলাম ওগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেব থাকবাব কামবা। মাঝখানেব সরু পথ দিয়ে খানা-কামবায় আসা যেত। জাহাজেব পেছনে আব-একটা সিঁডি ছিল। সেইখান দিয়ে উঠে মস্তবডো ডেকটায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেব জায়গা এবং দু'একটা খাবাবের স্টলও ছিল। আমরা এসে দেখি তৃতীয়

শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অনেকে তারই মধ্যে তাদের পছন্দমত জায়গায় সতরঞ্চি বিছিয়ে মাথায় একটি বালিশ বা পোঁটলা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। ইনটার ক্লাসের যাত্রীদের জায়গা ছিল একেবারে জাহাজের দোতলার পেছনের দিকে। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে দিয়ে পাশ কাটাতে কাটাতে গিয়ে সেই পেছনের ইনটার ক্লাসের বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। রেলিংটা ধরে তাকিয়ে দেখি যাত্রীরা তখনো আসছে এবং অনেক কুলি মাল নামিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় জাহাজের গোটা দুই ভেঁপু বেশ জোর আওয়াজে বেজে উঠল। অল্পক্ষণ পরেই জাহাজে ওঠবার সিঁড়ির তক্তাগুলি একে একে তোলা হতে লাগল। যখন একখানা মাত্র তক্তা বাকি তখনো দু-একটি যাত্রী তারই উপর দিয়ে ছুটে উঠে এল জাহাজে। তার পর শুনলাম তিড়িং তিড়িং কিসের ঘণ্টা। বাবা বললেন 'জাহাজ এইবার ছাড়ব'। জাহাজের দুইপাশে জল গুলিয়ে উঠল এবং জাহাজখানি আস্তে আস্তে পার থেকে সরে যেতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পরেই মোড় ঘুরে সামনের দিকে চলল। আবার বাজল ভেঁপু মোটা গলায় এবং তার পরই আবার তিড়িং তিড়িং ঘণ্টা। ক্রমশ জাহাজের গতিবেগ বাড়তে লাগল এবং জাহাজের দুপাশে যেখানে চাকা ঘুরছিল সেখানে জল ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠল। আমরা চললাম আমাদের গ্রামের দিকে।

জাহাজ থেকে দূরে দূরে কত ছোটো ছোটো নৌকো সাদা সাদা পাল তুলে চলেছে। বাবা বলে দিলেন সেগুলি 'জাউল্যা ডিঙি, মাঝিরা মাছ ধইর‍্যা বেড়ায় নদীতে'। জাহাজ কখনো যায় নদীর মাঝখান দিয়ে, কখনো যায় বালির চরের ধার দিয়ে। আবার কখনো ঢেউ তুলে চলে একেবারে উঁচু পাড়ের পাশ দিয়ে। শুনলাম যেখানে নদীর পাড় ভাঙে— সেখানে নাকি খুব গভীর জল থাকে। উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কোলে উঠে অথবা মায়ের হাত ধরে আমাদের জাহাজটাকে দেখছিল। কেউ-বা তার আঙুলটি দিয়েছে তার মুখে, কেউ-বা হাতছানি দিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করছিল। বাবা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন একতলায় জাহাজের মাঝখানের খোড়লটার মধ্যে যেখানে এঞ্জিন সবেগে ঘুরে চলেছে তা দেখাতে। খুকী সঙ্গ নিয়েছিল কি না মনে নেই। ভীষণ গরম ছিল সে ঘরটা। শীতের দিনে বেশ লাগছিল আরাম। জানালা বলে কিছু ছিল না। মস্তবড়ো তিনটে কি চারটে

ঘোড়ার মাথার মতো ভারী লোহা উঠছিল আবার ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল এবং সেই ওঠা-পড়াব সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা জাহাজের মাঝখান দিয়ে গিয়ে জাহাজেব দু'পাশে যে দুটো প্রকাণ্ড নাগরদোলার মতো চাকা ছিল তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। বাবা বুঝিয়ে দিলেন কি করে জাহাজ চলে। এমন সময় আবাব বেজে উঠল তিডিং তিডিং। চমকে উঠলাম। বাবা হাত দিয়ে দেখালেন এঞ্জিনেব উপবে ঝুলছে দুটো গোল দেওয়াল-ঘড়ি চকচকে পিতলেব বাক্সে। তাতে কি কি সব লেখা ছিল। আব ছিল একটা না দুটো কাঁটা। যেই তিডিং তিড়িং ঘণ্টা বাজে অমনি কাঁটাটা এক জায়গা থেকে ঘড়িব আর-এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। খালাসীবা আবার ঘড়িব তলায় একটা কি ঘুরিয়ে দেয়। বাবা বলে দিলেন যে জাহাজেব উপব থেকে সারেঙ নাকি ওই ঘণ্টা বাজিয়ে নীচের খালাসীদেব নির্দেশ দেন এঞ্জিন জোরে বা আস্তে চালাতে হবে কিংবা আগে বা পিছনে চালাতে হবে এবং সেই সংকেত পেয়ে খালাসীরা একটা কাঁটা ঘুবিয়ে দিয়ে সাবেঙকে জানিয়ে দেয় যে তারা সাবেঙ-এর নির্দেশ বুঝতে পেবেছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এঞ্জিনেব ঘোডাগুলির ওঠাপডা দেখছিলাম। অল্পক্ষণ পবেই সেই গরম ঘবটা থেকে বেবিয়ে হাওয়ায় এলাম সিঁডি দিয়ে উপরে উঠবাব জন্যে। এমন সময় দেখি একটা খালাসী মোটা একটা দডিব আগায় একটা ভাবী ধবণেব কি জিনিস বেঁধে সেটা সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে এবং জাহাজ এগোনোব সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে তুলে ফেলে 'বাঁও' না কি যেন বলেই আবাব সামনের দিকে ছুঁডে ফেলছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা কবলাম যে লোকটা কি মাছ ধবছে না কি? বাবা হেসে বললে, 'না, জল মাপতে আছে— দেখতে আছে জাহাজ যাওনেব যথেষ্ট জল আছে কি না।' এই খালাসীব জল মাপাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় দুপুর নাগাদ জাহাজটা আস্তে আস্তে ভিড়ল একটা ফ্ল্যাটেব পাশে। শক্ত কবে বডো কাছি দিয়ে জাহাজটা বাঁধা হল ফ্ল্যাটের বড়ো বডো বেঁটে থামের সঙ্গে। তার পর আবার চওড়া তক্তাগুলি জাহাজ থেকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে বেঁধে সিঁড়ি করা হল। আমরা তার-পাশা বা লৌহজঙ্গে পৌঁছলাম। কত ফিরিওয়ালা পাতক্ষীর, গোল গোল ক্ষীরা ও গুড় নিয়ে উঠল জাহাজে বিক্রি করতে। আমরা সেবার গোয়ালন্দের জাহাজের বিখ্যাত মুবগির কারি আর ভাত খাই নি— তখন তার খবরও

আমি জানতাম না। ফ্ল্যাট থেকে একটা নৌকোয় নেমে সবাই বসলাম। জাহাজটা আবার ভেঁপু বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল। আমাদের নৌকোও ছাড়ল। নৌকোয় এর আগে যে চড়েছিলাম তা মায়ের কোলে বসে। এবার বড়ো হয়ে এই প্রথম নৌকোয় চড়লাম। ভয় যে করছিল না তা বলতে পারি নে। তবে চলন্ত নৌকোয় বসে জলে হাত দিতে ভারি স্ফূর্তি হয়— শীতকালের নদীর জল যতই ঠাণ্ডা হোক। এসে পড়লাম বহরের পাশে প্রবাহিত মস্ত চওড়া খালে— নদী বললেই চলে। বহর বন্দরের বাজারে নেমে আমরা গেলাম হেঁটে বাবার সঙ্গে, আর মা বোধ হয় গেলেন ডুলিতে গুগুকে কোলে করে। আমাদের তেলিরবাগ পৌঁছতে প্রায় বেজে গেল গোটা তিনেক কি চারেক বেলা।

২

আমরা যখন সেবার তেলিরবাগ যাই তখন আমার বয়েস ছিল বছর পাঁচেক। সেই সময়ে ভবানীপুরে কোনো স্কুলে পড়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। বহুদিন আগের কথা। যদি কোনো পাঠশালায় বা স্কুলে গিয়েও থাকি তা বোধ হয় নেহাত ছেলেখেলার মতোই হয়েছিল। সে আমলে এখনকার মতো নার্সারী স্কুল কি মণ্টেসরী স্কুল ছিল না। হাই স্কুলে ঢোকবার আগে পর্যন্ত টুকিটাকি পড়াশুনা বাড়িতে বসেই হত কোনো পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। 'কিন্তু কোনো পণ্ডিতমশায়ের কথা আমার তো স্মরণে আসছে না। যাই হোক, যখন বাবা মাকে ও আমাদের তেলিরবাগ গ্রামে রেখে এলেন তখন আমরা মধ্যের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলাম। যে সময় ঐ বাড়িটা খালি থাকত পশ্চিমের বাড়ির লোকেরা ঐ দোতলা বাড়িতেই উঠতেন। আমরাও সেই মধ্যের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলাম। সেই বাড়ির সামনের বড়ো উঠানের উপরই ছিল তেলিরবাগের কে. এম. ডি. এম. এইচ. ই. স্কুল— অর্থাৎ তেলিরবাগের কালীমোহন দুর্গামোহন হাই ইংলিশ স্কুল, বাবা যার ছিলেন সম্পাদক। বয়েস হয়েছিল আমার স্কুলে যাবার। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। সুতরাং মায়ের চোখের উপরেই থাকব এবং টিফিনের সময় দোতলায় এসে একবাটি দুধ খেয়ে যাব— এই-সব ভেবে আমার

স্কুলে যাবাব ব্যবস্থা হল।

কিন্তু মাব কিরকম একটা ধাবণা হল যে শাস্ত্রমতে ছেলের একটা হাতেখড়ি দিয়ে তার পর স্কুলে যাওয়াই বিধেয়। এতেই মনে হয় আমি আগে স্কুলে পড়ি নি। যাই হোক, মা ডেকে পাঠালেন আমাদের পশ্চিমেব বাড়ির দেওয়ানজী কালী-ঠাকুবকে। দেওয়ানজী সব কথা শুনে মায়েব সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, খুবই সঙ্গত কথা। তিনি সব ব্যবস্থাই কবে দেবেন। মা যেন কিছু না চিন্তা করেন। কালী-ঠাকুর সোজা গেলেন পুবোহিতমশায়েব বাড়িতে। আচমকা এবকম একটা সুখবর পেয়ে গদাধব চক্রবর্তী মশায় খুবই খুশি হলেন। আমাব মায়েব এইবকম ধর্মবুদ্ধি দেখে খুশি হবাবই কথা। দক্ষিণাব আশাটাও যে তাঁর মনেব মধ্যে ছিল না তা-ই বা কে বলবে। পুবোহিত-ঠাকুব অবিলম্বে মাব কাছে এলেন। মা ভূমিষ্ঠ হয়ে পুবোহিত-ঠাকুবেব চটি জুতা থেকে বেব-কবা পায়েব দুটি বুড়া আঙুলেব ধূলা মাথায নিয়ে চিবায়ুষ্মতী হবাব আশীর্বাদ পেলেন। কি কি জিনিস হাতেখড়িব জন্যে দরকাব হবে পুবোহিত-ঠাকুব একটা ফর্দ করে দিলেন মাকে। অচিরে গ্রামেব মধ্যে প্রচাব হয়ে গেল যে 'পশ্চিমেব বাড়িব সোনা বৌয়েব পোলাব হাতেখড়ি হৈব'। খববটা মধ্যেব বাড়িব দেওয়ানজী হবি সিং-এব কানে পৌঁছতে দেরি হল না। সর্বসম্মতিক্রমে তিনজন দেওয়ানজীব মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং আমাব মায়েব তাঁব সঙ্গেই পরামর্শ কবে কাজটা কবা উচিত ছিল। মনে এই ভাবটা থাকলেও হবি সিং পিসা মায়েব সঙ্গে দেখা করে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'সোনা বৌঠাইন যদি খোকাব হাতেখড়ি দিবেনই তবে সে কথা আমাবে কইলেই তো ঢাকা থনে আমি ভালো পণ্ডিতই আনাইয়া দিতাম। ঠাকুবদারে দিয়া হাতেখড়ি দেওয়াইলে কেমন হৈব কে জানে।' স্পষ্টই ইঙ্গিত কবলেন যে 'ঠাকুবদা' অর্থাৎ গদাধর চক্রবর্তীব লেখাপড়াব জন্যে নামডাক নেই এবং তিনি, হবি সিং, থাকতে সোনা বৌঠাইন এই ভুলটা কেমন কবে কবলেন। যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। মা যখন পুবোহিত-ঠাকুবকে বলেই ফেলেছেন তখন গত্যন্তব নেই। হবি সিং পিসাও বললেন যে সোনা বৌঠাইন যেন কিছু চিন্তা না কবেন— তিনিই (হরি সিং পিসা) সব বন্দোবস্ত কবে দেবেন। কথায় না হলেও তিনি ভাবে বেশ স্পষ্টই জানালেন যে খোকাব লেখাপড়া— সেটা ঈশ্ববেব ইচ্ছা।

মুখে মুখে হবি সিং-এর এই অপপ্রচার গিয়ে পৌঁছল পুবোহিত গদাধর চক্রবর্তীর কানে। পৌঁছে দেবাব লোকেব অভাব গ্রামে ছিল না, কেননা হবি সিং পিসা খুব লোকপ্রিয় ছিলেন না। পুবোহিত-ঠাকুব তো শুনেই অগ্নিশর্মা। ছুটে এলেন মায়েব কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'হাবামজাদা হবি সিংএব সাহস ছাখ্‌ছ সোনা বৌমা। তোমাব মুখেব উপর কথা কয়। আমি গদাধর শর্মা— আমি খোকাবে হাতেখড়ি দিমু অর কি আস্পর্ধা সে কথা কইতে আসে? তুমি দেইখ্যা রাইখো সোনা বৌমা এই আমি আউজ্ঞকা কইয়া থুইলাম— আমাব কাছে হাতেখড়ি পাইয়া তোমাব পোলা কতদূব যায।' ভাগ্যে সেখানে হবি সিং পিসা ছিলেন না। গালাগালিটা তাই একতবফাই হয়ে গিয়ে শান্তি হল। বেশ ঘটা কবেই নাকি আমাব হাতেখড়ি হয়েছিল। পবে আমি যখন বিলেতে বেশ ভালো কবে পাস কবে ফিবে কলকাতায আইন প্র্যাকটিস কবতে নেমে ক্রমশঃ উন্নতিব ধাপে উঠছিলাম মা প্রায়ই হেসে হেসে এই ঘটনাব কথাটা আমাদেব শুনিয়ে শেষে বলতেন, 'পুবোইত-ঠাকুবমশায়েব কথা কি মিথ্যা হৈতে পাবে?' বলেই আমাব মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি যখন কলকাতা হাইকোর্টেব জজ হলাম তখন গদাধব চক্রবর্তীমশায় এবং হবি সিং পিসা দুজনে কেউই আব ইহজগতে ছিলেন না। যদি পুবোহিত-ঠাকুব বেঁচে থাকতেন তবে তিনি হবি সিং পিসাকে যে একহাত শোধ নিতেন তাতে সন্দেহেব কোনো অবকাশই নেই। হাতেখড়িব পব আমি গ্রামের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম।

তখন তেলিববাগ স্কুলেব হেডমাস্টারমশায় ছিলেন শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্তমশায়। তিনি বহবেব চৌধুবী-বাড়িব এক শবিক সুধন্যকুমাব বসু বায়চৌধুবীব ভাগ্নীকে বিবাহ কবেছিলেন। তাঁব স্ত্রীকে দেখেছি মায়েব কাছে অনেকবাব। আমবা তাঁকে মাসীমা বলে ডাকতাম। তাঁদেব ছেলেদের মধ্যে দুজনকে জানতাম— জ্যোতিষ আব বিনয়। বিনয় আমার সঙ্গে পড়তেন দেশেব স্কুলে। পবে তিনি বেশ ভালোভাবে পাস-টাস করে মাস্টাবি কি ওকালতি করতেন তা ঠিক বলতে পাবি নে। জ্যোতিষদাকে দেখেছি কলকাতা হাইকোর্টেব দোতলাব বাবান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে। কোনো উকিলেব মুহুবী ছিলেন বোধ হয়। হেডমাস্টাব বলতে যে-রকম জাঁদরেল কড়া লোকেব ছবি মনে জাগে কামিনীবাবু সে-বকম হেডমাস্টার-

মশায় ছিলেন না। তিনি খুব বিদ্বান মিষ্টভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াতেন। কামিনীবাবুর পরে যে-সব হেডমাস্টারমশায়রা এসেছিলেন তাঁদের কাছে আমি পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে শুনেছি তাঁবা খুব নামকরা হেডমাস্টাব ছিলেন। তাঁদেব নাম ছিল ভুবনমোহন মুখার্জি, যদুলাল চক্রবর্তী ও আমাদেবই বড়ো পিসামশায় প্রাণহবি সেন।

সেসময় স্কুলেব সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মহিম মাস্টারমশায়। মহিম-বাবু প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট পবে স্কুলে আসতেন। তিনি ছিলেন বহবের চৌধুবীবাডিব একজন নামী সন্তান। কেউ তাঁকে পদবী ধবে ডাকত না। 'মহিম মাস্টার' বলেই তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি পডাতেন ইংবেজি। তিনি খুব দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। শুনেছি মৃত্যুর সময় তিনি একশো বছবের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন।

আব একজন ছিলেন তেলিববাগ ও বহবেব বিখ্যাত পণ্ডিতমশায়। কেউ বলে তাঁর নাম ছিল বাজকুমাব চন্দ, আবাব কেউ বলে নদেব চাঁদ চন্দ। লোকে সংক্ষেপে তাঁকে ডাকত 'নদি পণ্ডিত' বলে। তিনি পডাতেন বাংলা। মৃত্যুকালে তিনি একশো বছব পাব হয়ে গিয়েছিলেন। তেলির-বাগে হাই স্কুল হবাব আগে পণ্ডিতমশায় একটি পাঠশালা চালাতেন। বাবা যখন গ্রামে প্রাইমারী ও ছাত্রবৃত্তি পডতেন তখন তিনি এই নদি পণ্ডিতের কাছেই পডতেন। আমি পণ্ডিতমশায়েব ছাত্রদেব দ্বিতীয় পুরুষেব একজন। সেইজন্যে তিনি আমাকে খুব স্নেহ কবতেন। বড়ো হয়ে যখন আমাব বড়ো ছেলে খোকন (সুবঞ্জন) হল তখনো পণ্ডিতমশায় বেঁচে ছিলেন এবং পড়াতেনও। খুব ইচ্ছে ছিল যে খোকনকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশাইযেব কাছে ক'দিন পডিয়ে আনব। কিন্তু গডিমসি করে সে ইচ্ছা অপূর্ণই বয়ে গেল। পুরোহিত-পাডার কৌশিকবাবু অঙ্ক কষাতেন। তখনকার দিনের আর কোনো মাস্টারমশায়দেব কথা মনে পড়ে না এখন।

সে-সময় যে-সব ছেলেরা গ্রামেব স্কুলে পডত তাঁদেব কথা কিছু কিছু আগেই বলেছি। পুবেব বাড়ির মনোমোহন জ্যাঠামশায়েব ছোটো ছেলে ছোটকাদাদা ও করুণা জ্যাঠামশায়েব মেজো ছেলে বটাদাদা বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছর মাত্র বড়ো ছিলেন। কিন্তু দুজনেই যতদুব মনে পড়ে পড়তেন আমাব দুই ক্লাস উপবে। পরে দুজনেই বোধ হয় এনট্রানস্ পরীক্ষার্থীদের শেষদলের মধ্যে ছিলেন। হেডমাস্টার কামিনীবাবুর ছোটো

ছেলে বিনয় ও পুবের বাড়িব লালবিহারী জ্যাঠামশায়ের ছোটো ছেলে শিবেন্দ্র পড়তেন আমার সঙ্গে। আমাদেব পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ানজী কালী-ঠাকুবের বড়ো ছেলে বীরু ও হবি সিং পিসাব ছেলে কুমুদিনীকান্ত বোধ হয় আমাব উপবেব ক্লাসে পডতেন। উত্তবেব বাড়িব মোহিনীদাদার ছেলে রতিবঞ্জন পডতেন আমাদেব নীচেব ক্লাসে। কুমুদিনীকান্তব পুবা নাম ছিল কুমুদিনীকান্ত কব— একেবাবে অনুপ্রাসের অট্টহাস্য। ছোটকাদার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। ছোটকাদা তাঁকে অনেক সময় ঠাট্টা কবে ডাকতেন K[8] বলে। সিকদাব-বাড়িব মহিমজ্যাঠাব বড়ো ছেলে জগদীশ হোড অর্থাৎ আমাদেব জগাদা ও গোঁসাই পূজাবীব বামমণি-ঠাকুবেব একমাত্র সন্তান চন্দ্রকুমাবদা তখনই বেশ উঁচু ক্লাসে পৌঁছে প্রায় স্থিতিলাভ করেছিলেন। আব মনে আছে পুবেব বাড়িব সরলদাদাব ছোটো ভাই প্রেমরঞ্জনদাকে। তিনি বেশ উঁচু শ্রেণীতে উঠবাব পব হঠাৎ কি অসুখ কবে ক'দিনের মধ্যেই মারা যান। প্রেমবঞ্জনদা খুব লোকপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁব অকালমৃত্যুতে গ্রামবাসী ছেলে বুড়ো সবাই খুব আঘাত পেয়েছিলেন মনে। এবই অল্প আগে কি পিছে মাবা যান পুবেব বাড়িব জিতুকাকাব স্ত্রী যাঁর কথা আগেই বলেছি। আমাব শৈশবে স্বগ্রামে বাসকালে এই দুটি মৃত্যু আমাব মনের উপর গভীব রেখাপাত কবেছিল।

তেলিববাগ গ্রামে বসবাস আমাব খুব ভালো লেগেছিল। পডাশুনাও ছিল, আবাব সেই সঙ্গে নানাবকমেব আনন্দও ছিল। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে এবাড়ি ওবাড়ি ঘোবা, মেয়েদের নানা ব্রতেব গল্প, সুন্দব সুন্দব কথা মুগ্ধ হয়ে শোনা, সাঁতাব না জানাব জন্যে ভয়ে ভয়ে পুকুবে স্নান ও ঠাঁই জলে দাঁড়িয়ে অন্যদেব গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া, শীতেব বেলায় নাকে হাত দিয়ে হঠাৎ একটা ডুব দিয়ে গা-টা গবম কবে নেওয়া ইত্যাদি কাজে সময় যেন হু হু করে কেটে গিয়েছিল।

৩

গ্রামে বাস কবলে ছয় ঋতুর সৌন্দর্য-সমারোহ যেমন উপভোগ করা যায় শহবে তা সম্ভবই হয় না। এই তো আমবা এলাম শীতকালে বড়োদিনের সময়। সকালবেলায় পুকুবেব উপবে উঠতে দেখলাম ধোঁয়া। হাঁ করে নিশ্বাস ফেললে বেব হয় ধোঁয়া। মাঠ শুকিয়ে গেছে। পশ্চিমের বাড়ির

পশ্চিমে যে খাল ছিল সেই খালটা ও তার ওপারে খেলার মাঠ খটখটে শুকনো। সেখানে ফুটবল, ধাপসি ইত্যাদি খেলা চলত সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত। সেই খেলাব মাঠেব পাশ দিয়েই চলে গেছে পায়ে-হাঁটা পথ বহরের বাজাবের দিকে। সন্ধেবেলা থেকে গ্রামেব 'ঠাবাইনবা' বসতেন তাঁদের গায়ে জডানো মোটা চাদবটাব নীচে বড়ো মালসায় তুষেব আগুন জ্বেলে। চমৎকাব লাগে শীতকালে তাঁদেব চাদবেব ভিতবে হাত দিয়ে আগুন পোয়াতে। তার পবে শীতেব প্রকোপটা যে কমতে লেগেছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। বাত্রে আব তেমন লেপ লাগে না। পুকুবেব জল চিনচিনে ঠাণ্ডা নেই— ধোঁযাও যেন কমে গেছে। ও দিকে প্রত্যেক বাড়িব উঠানে ও আশপাশে যে আম-কাঁঠালেব গাছ ছিল সেই আমগাছে মুকুল দেখা দিল। দেখতে দেখতে 'আম্রমুকুল সৌগন্ধে' গ্রাম ভবে গেল। গাছে গুটি বাঁধল। আমবা কাঁচা আম খাবাব প্রত্যাশায় ভবিষ্যতেব দিকে উন্মুখ হয়ে বইলাম। কাঁঠাল গাছে ধবল কাঁঠালেব অজস্র কষি। সেই কষিগুলি দিন দিন বড়ো হযে উঠতে লাগল। 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'— প্রবাদবাক্যটা তখনো শিখি নি।

তাব উপব হতে লাগল শ্রীপঞ্চমী পূজাব আয়োজন। মধ্যেব বাড়ির দক্ষিণে বড়ো উঠানটাতেই আমাদেব স্কুল। তাবই উত্তব দিকে পূজামণ্ডপ। কুমাবেবা লেগে গেল সবস্বতী প্রতিমা গড়তে। আমি জন্মেছিলাম জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনেব বাডিতে। দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনবা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁদেব বাডিতে প্রতিমা পূজা দেখি নি। কিন্তু গ্রামেব এই পৈতৃক ভিটায় তাঁরা এই-সব পূজা-পার্বণ বন্ধ কবেন নি। গ্রামেব গরিব লোকেবা তাই পূজা-পার্বণে আনন্দ কবতে পাবতেন। তা ছাডা স্কুলে সবস্বতী পূজা না হলে গ্রামেব ও আশপাশেব এতগুলি ছেলে কোথায় অঞ্জলি দেবে? আমি মন্ত্রমুগ্ধেব মতো প্রতিমা গডা দেখতাম। দেখতে দেখতে বাঁশেব কাঠামোয় পাঁক-মাটিতে গডা প্রতিমাব দেহসৌষ্ঠব বেব হতে লাগল। তখনো কুমারেবা দেবীব মাথাটি বসায় নি। আগে দেবীব হাতপা ও গা'টা গডা হয়ে গেলে কুমারেবা মাথাটা গলাব উপব বসিয়ে দিল। তার পব এল বঙেব ঘটা। দেখতে দেখতে প্রতিমাব চোখ মুখ কান ফুটে বের হতে লাগল। কি টানা-টানা চোখ, গায়ে নির্মল শ্বেতববণী বঙ। তাব পর এল ঘন কালো চুল,মাথায় উঠল মুকুট, গলায় হাব, হাতে কঙ্কণ, কানে কুণ্ডল। ঝলমল

করে উঠল প্রতিমাখানি। শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে বেজে উঠল ঢোল আর কাঁসি ও সানাই। মা আমাকে বেশ সকাল-সকাল স্নান করিয়ে ফরসা জামা পরিয়ে দিলেন। ধুতিখানা বোধ হয় বাসন্তী রঙে ছোপানোই ছিল। সেজে-গুজে মধ্যের বাড়ির দোতলা থেকে নেমে গেলাম পূজামণ্ডপে। আমার মতো আরো অনেকগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো ছেলেরা তার আগেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে জমা হয়েছিল। পুরোহিত-ঠাকুরমশায় ছেলেদের আলাদা আলাদা দল করে দাঁড় করালেন। তার পর এক একদল ছেলেদের প্রতিমার সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি কি দুটি গাঁদা ফুল দিয়ে বললেন, 'আমার লগে লগে মন্তর পড়বি।' অর্থাৎ তিনি যেমন যেমন কথাগুলো বলবেন আমাদেরও তা-ই বলতে হবে। তিনি আস্তে আস্তে টেনে টেনে কেটে কেটে মন্ত্র বলতে লাগলেন আর আমরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি করে যা বললাম তা একটানা লিখলে খানিকটা এইরকম দাঁড়িয়েছিল বলে স্মরণ হয়—

"ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্মল বর্ণে,
রতন বিভূষিত কুণ্ডল কর্ণে,
শিরে জটা গজমোতি হার,
দে দে কণ্ঠে বিদ্যার ভার।"

মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলি দিয়ে আমরা ভক্তিভরে বীণাপাণি দেবীকে প্রণাম করে ঠাকুরমশায়ের পায়ের কাছে যে যা পারে একটি দুটি কি চারটি পয়সা রেখে সরে দাঁড়ালাম। তার পর শুরু হল আর একদলের অঞ্জলি দেওয়া। এইরকম ক্রমান্বয়ে সব ছেলেরা পালা করে অঞ্জলি দিল। গ্রামের ছোটো মেয়েরা আমাদের স্কুলে অঞ্জলি দিতে এসেছিল বলে মনে পড়ে না। তখনকার দিনে ছেলে-স্কুলে মেয়েরা আসত না এবং মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন তাগিদও হয় নি। তবে নদি পণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে তাঁর শিক্ষিতা কন্যা ছোটো মেয়েদের জন্যে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। তেলিরবাগের মেয়েরা হয়তো সেখানে গিয়েই অঞ্জলি দিয়েছিল। যাই হোক, অঞ্জলি দিক বা নাই দিক সে-সব মেয়েরা যে সকাল-সকাল স্নান সেরে এলোচুলে বাসন্তী রঙের শাড়ির বাহার দিয়েছিল তা একটু একটু এখনো মনে আছে। বাসন্তী রঙের কাপড়ে সেজে ছেলেমেয়েরা বসন্তকালকে আহ্বান করে নিয়ে এল।

চৈত্রমাস শেষ হয়ে এল প্রায়। আমরা তখন তেলিরবাগে পুরানো হয়ে

গেছি। এপ্রিলের মাঝামাঝি পুকুর-ধারে একদিন হঠাৎ জগঝম্প-তালে ভীষণ জোরে বেজে উঠল জয়ঢাক। সে কি আওয়াজ! কি ব্যাপার, কি ব্যাপাব? ছুটে চললাম পুকুব-পাড়ে। গিয়ে দেখি বেশ কজন লোক সমাগম হয়েছে। দু-তিনজন লোক পুকুবে নেমে ডুব দিচ্ছে আব কি যেন খুঁজছে। কেউ জলে ডুবে গেল না কি? আমি তো ভয়ে কাঠ। শিগগিবই দেখি সেই ডুবুবিবা ভেসে উঠল এবং মস্ত লম্বা ও বেশ মোটা একটা কাঠ, গ্রাম্য-ভাষায় যাকে আমবা বলতাম খাম বা থাম, তাই টেনে পাড়েব কাছে এনে ফেলল। নূতন উদ্যমে জয়ঢাক আবাব বেজে উঠল। জিজ্ঞাসা কবে জানলাম যে ওই জিনিসটা গাজনেব গাছ। ঠিক বুঝলাম না ব্যাপাবটা তখন। তার পর সেই গাজনেব গাছকে উপবে তুলে এনে খোলা জায়গায় একটা গর্ত করে পোঁতা হল এবং তাব উপবেব দিকটায় একটা কাঠেব দু-তিন ধাপ সিঁড়িব মতো একটা জিনিস যাব দুপাশেব কাঠেব মধ্যে ফুটো ছিল সেইটে বসিয়ে দিয়ে সেই ফুটোগুলিব মধ্যে গোটা কয়েক বাঁশ একসঙ্গে শক্ত কবে বেঁধে বাঁশেব দু দিকেব আগায় মোটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। শুনলাম যে ঐ দড়িতে বেঁধে গাজনেব সন্ন্যাসীদেব ঘোবানো হবে। প্রাচীন দু-একজন যাঁবা উপস্থিত ছিলেন তাঁবা বললেন যে তাঁদের আমলে ঐ দড়ি দুটোর শেষে দুটো প্রকাণ্ড বঁড়শিব কাঁটার মতো জিনিস থাকত এবং সেই কাঁটা দুটো সন্ন্যাসীদেব পিঠেব চামড়াব মধ্যে ফুটিয়ে সন্ন্যাসীদেব ঘোবানো হত। আমার সে কথা শুনে ভয়ে গা শিউরে উঠল দেখে বৃদ্ধেবা বললেন, 'আইজকাউলকাব মানুষের সে ধর্মজ্ঞান নেই, সবই তাবা সহজ কইবা লইছে। তাই বঁড়শি না বিঁধাইয়া ছোকবাবা প্যাটে ঐ দড়ি বাইন্ধা ঘুবপাক খায়, ছ্যাঃ!' বৃদ্ধদেব মানসিক অসন্তোষপ্রসূত ঐ ছ্যাঃ ধ্বনি সত্ত্বেও আমি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

তাব পর থেকেই আবম্ভ হল সন্ন্যাসীদেব আনাগোনা ও মাঝে মাঝে 'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম' চিৎকাব। ভালো কবে চেয়ে দেখি সন্ন্যাসীবা গ্রামের ও আশেপাশেব চেনা ছেলেবাই। তাবা চুলে তেল না দিয়ে, রঙিন কাপড় পবে এমন ভোল বদলিয়েছে যে প্রথমটা তাদেব চিনতেই পারি নি। মেলা বসে গেল গাজনতলায় চড়ক বা নীল পূজার দুদিন আগে থেকেই। কতবকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস বেচা-কেনা হচ্ছে। পাঁপড়ভাজা ও মিঠাই-মণ্ডা কত কি খাবার জিনিস। বাড়ি বাড়ি ঘুবে বেড়াতে লাগল একদল লোক পট নাচিয়ে। সে এক মজার ব্যাপার। প্রত্যেক বছর চড়কের সময়

এরা নানারকম পট চিত্রিত করে এবং সেই ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে গান বানায়। একজন একটা লম্বা উঁচু সরু বাঁশের আগায় একটা পট ঝুলিয়ে ধরে থাকে আর-একজন হাতে একটা সরু লাঠি দিয়ে সেই পটের ছবির দিকে দর্শকদের নজর আকর্ষণ করে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান করে। প্রত্যেক বছর নূতন পট আঁকা হয় ও নূতন গান রচনা করা হয়। এই ছড়ার গান রচনায় বেশ কৃতিত্ব লাগে। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এই-সব ছড়া খুবই সময়োপযোগী হয় এবং তা শুনতে খুবই মজা লাগে। এতে অনেকের সম্বন্ধে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ প্রচ্ছন্নভাবে করা হয়। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে পট নাচিয়ে পয়সা সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীদের খরচ চলে। তাদেরও তো সংসার চলা চাই।

তার পর এল চড়কের দিন। সন্ধ্যা হতে না হতেই চড়ক ঘুরতে লাগল। দুজন করে সন্ন্যাসী সেই বাঁশের আগায় বাঁধা দড়িটা আপন আপন পেটে বেঁধে ঝুলতে থাকে হাত-পা সোজা ছড়িয়ে দিয়ে। নীচ থেকে সেই সিঁড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়িটাকে ধরে কয়েকজন লোক থামটার চারি দিকে ঘুরতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে বাঁশের আগায় দড়িতে ঝোলানো সন্ন্যাসী দুজনও ঘুরতে লাগল। ক্রমশ ঘোরার গতিবেগ বেড়েই চলল এবং সন্ন্যাসী দুজন আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে কতরকম কায়দা দেখাতে লাগল। নীচে যে-সব সন্ন্যাসী ছিল তারা সমস্বরে বলতে লাগল— 'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম'। সেই 'মহাদেব মহাদেব' রবে গাজনতলা মুখরিত হয়ে উঠল। এই চলল রাত-দুপুর পর্যন্ত। বাড়ি থেকে ঘন ঘন মায়ের তাড়ায় আমার এই-সব লোমহর্ষক কার্যাবলীর শেষ না দেখেই বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরতে হল। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম— কিন্তু মনের মধ্যে রাত-দুপুর পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে লাগল সেই গাজন-গাছে ঘূর্ণায়মান সন্ন্যাসী দুটির চেহারা— ভয় হতে লাগল পাছে ছিটকিয়ে পড়ে। আর কানে বাজতে লাগল সেই 'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম' ধ্বনি। তখন বুঝি নি যে এই চড়কের ঘূর্ণি আরো একটা মস্ত-বড়ো ঘূর্ণির প্রতীক মাত্র— যে বড়ো ঘূর্ণির টানে ঘুরে চলেছে দিন, মাস, বছরগুলি অবিরাম গতিতে। এবং যার আবর্তে পরে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে চলেছে আমাদের এই পৃথিবীটাকে সজীব সুন্দর করে রাখতে।

চড়কের পর এল গ্রীষ্মকাল। রোদটা হয়ে উঠল চনচনে কড়া। কিন্তু তেলিরবাগে তেমন গরম লাগত বলে মনে পড়ে না। গ্রামের দক্ষিণে অদূরেই ছিল বিরাট চওড়া পদ্মানদী। তার উপর দিয়ে খালি মাঠগুলি

পেরিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে আসত দখিন হাওয়া সন্ধ্যা হতে না হতেই। সারা দিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যেত সেই মন্দমধুর মলয় বাতাসে। গ্রামের ডোবাগুলি এবং উত্তর-পুব কোণের মস্তবড়ো কচু খোলাটা গেল প্রায় শুকিয়ে। সেই-সব নিচু জমিগুলিতে পাঁকের মধ্যে জন্মালো কতরকম লতা, গুল্ম। খালের কাদা মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল এবং বড়ো বড়ো ফাটলের দাগ বেরল, যেন খালের বুক চিরে। খালের ওপারের ক্ষেতগুলিতেও বের হতে লাগল চিড়-খাওয়া ফাটলের কত রকমারী নকশা। ক্ষেতের মাটিটা যেন জলের তৃষ্ণায় হা হা করে ধুঁকছে। এদিকে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় কচি আমগুলি বেশ পুষ্ট হয়ে উঠল। শুরু হয়ে গেল আমাদের আম কুড়াবার ধুম। কত রকমেরই না ছিল আমগুলি, আর কত বিচিত্রই না ছিল তাদের নাম। কাঁচামিঠা, চিনিটুকুইরা, হাতির লাদা এবং আরো কত কি? শেষোক্ত আমের নামকরণের ইতিহাসটুকুর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। বাবার বিয়ের সময় তাঁকে নেবার জন্যে যে একটা হাতি এসেছিল সেটাকে নাকি ঐ আমগাছটার সঙ্গে বেঁধেছিল। হাতি যদি বাঁধাই হয়ে থাকে তবে তার জন্যে আমটার ঐ রকম একটা বিশ্রী নাম দেবার কি অর্থ বা কারণ ছিল তা বড়ো বয়স পর্যন্তও জানতে পারি নি।

মাঝে মাঝে আসত ঝড়, মারা যাকে বলতেন কালবৈশাখী। ঝড়গুলি কিন্তু হত বেশির ভাগ সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রের দিকে। সে যে কী ঝড় তা কিছুতেই শহুরে লোকেরা বুঝবে না। হাওয়া ছুটে আসছে উদ্দাম গতিতে। বিদ্যুৎ আকাশের বুক চিরে আলোয় সব উজ্জ্বল করে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে ঘনায়িত হয়ে যেত। নিকষঘন অন্ধকারে পৃথিবী যেন আচ্ছন্ন হয়ে যেত। মধ্যের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখেছি ঘন কালো মেঘে আকাশ ঠাসা এবং আকাশের ঐ মেঘ আর পদ্মার নীল জল যেন মিশে এক হয়ে গেছে। নদীবক্ষে একটিও নৌকা নেই। আর সে কি ঝড়ের দমকা হাওয়া। গাছগুলির আগাগুলি আথালী-পাথালী আছাড় খেয়ে পড়ছে। কোনো কোনো পুকুরের কোনায় কোনায় যে শাপলা লতা ছিল তার বড়ো বড়ো পাতাগুলি জলের ঢেউয়ে উলটে-পালটে যাচ্ছে আর শাপলাফুলগুলি মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে জলে ডুব দিয়ে উঠছে। অপূর্ব এই কালবৈশাখীর সমারোহ তেলিরবাগ গ্রামে যা দেখেছি তা কলকাতায় কখনো দেখি নি। পরে অবিশ্যি দেখেছি শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে।

বিকেলে ঝড় উঠলে আমরা ছুটতাম আম কুড়াবার জন্যে। কিন্তু আম পাবার যো নেই। 'ঠাবাইন'রা তার আগেই 'আগইল' অর্থাৎ ধামা নিয়ে আমগাছের তলায় হাজির। রাত্রে ঝড় উঠলে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাব আম কুড়াতে। কি মজাই না হবে। ও হরি, গিয়ে দেখি 'ঠাবাইন'রা তারও আগে গিয়ে রণক্ষেত্র দখল করে আছেন। সব সময়ে যদি এইরকম করে 'ঠাবাইন'রা আমাদের বঞ্চিত করেন তবে আমরা করি কি? দিন-রাত তাঁদের বকুনি—'কিব্যাদ্‌দ্‌প্‌ পোলাপান রে'— শুনে শুনে আমরা ঝালাপালা বিরক্ত হয়ে যেতাম। গাছের থেকে খসে-পড়া আম যদি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করা না যায় তবে দায়ে পড়ে অভদ্র আচরণের কথা যদি ছেলেদের মনে জন্মায় তবে তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত বলেই মনে করতাম। যা কুড়িয়ে পাওয়া গেল না তা ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে পেড়েই নিতে হয়— ন্যায়শাস্ত্রের এই সহজ সিদ্ধান্তটাই আমরা গ্রহণ করলাম। অগোচরে, পরের গাছে চড়ে আম পেড়ে নিলে সে কাজটাকে যদি চুরি বলে অপপ্রচার করা হয় তবে সে চৌর্যবৃত্তির মূলেই রয়েছে ঐ সব 'ঠাবাইন'দের ছেলেদের প্রতি নির্মম নির্যাতন। তা ছাড়া পরের জিনিস নিলে চুরি হয় শুনেছি, কিন্তু নিজেদের বাড়ির গাছেরও আম পাড়া যেত না আমাদের নিজ নিজ মা, জ্যেঠি, খুড়িদের তাড়নায়। অতএব নিতান্তই নিরুপায় হয়েই আমাদের নানা ফন্দিফিকির করতে হত।

আমাদের প্রত্যেকের জামার পকেটে কিংবা কোঁচরে থাকত কাগজে মোড়া নুনের পোটলা। আম সংগ্রহ হলে তার চোকলা ছাড়াব কিসে? ছুরি পাব কোথায়? ছুরি কেনবার পয়সা চাইলেই সব জানাজানি হয়ে বকুনির অন্ত থাকবে না। একটা সনাতন প্রথা ছিল তা শিখে নিলাম। গ্রামের পুকুরে ঝিনুকের অন্ত নেই। নাকটিপে এক ডুব দিয়ে পাঁক-মাটিতে হাতড়ালেই ঝিনুক পাওয়া যেত যার যত ইচ্ছা। একটিতেই যথেষ্ট। সেই ঝিনুকটি পরিষ্কার করে ঘাটের শানের উপর খানিকক্ষণ জোর করে ঘন ঘন ঘষলেই সেই ঝিনুকের মধ্যিখানটায় একটা ফুটো হয়ে যেত। সেই ফুটোটার চারি পাশটা হয়ে যেত ভীষণ পাতলা আর অসম্ভব তীক্ষ্ণ। কাঁচা আমের গায়ে ঝিনুকের সেই ফুটোটা বুলালে আমের উপরের সবুজ চোকলাটা বেমালুম উঠে আসত। ছুরি দিয়ে কাটলে চোকলা ছাড়া আমের শাঁসও খানিকটা চলে যায় যত মিহি করেই কাট না কেন। কিন্তু এই ফুটো-করা

ঝিনুক দিয়ে কাঁচা আমের চোকলা ছাড়ালে এতটুকুও অপচয় হয় না। সুতরাং আমরা ছেলেরা নুনের পোটলা ও ফুটো ঝিনুক নিয়ে বের হতাম আম সংগ্রহ করার জন্যে অর্থাৎ পরের কি নিজের গাছে চড়ে সঙ্গোপনে আম পেড়ে আনবার জন্যে।

কিন্তু গাছ থেকে আম পেড়ে আনাটা বলা যত সহজ কাজে ততটা সোজা ছিল না। ঐ ভাবে আম যোগাড় কবতে গিয়ে অনেক সময় দৈব দুর্যোগ বা অনর্থ ঘটে যেত। গ্রামেব কতকগুলি পাডাব 'ঠাবাইন'বা থাকতেন সদা-জাগ্রত। গাছে উঠলেই সেই ঠাকু'মাব ঝুলিব বাক্ষসীব মতো তাঁদের টনক নডত এবং তক্ষুনি 'কেবে কেবে' কবে হুঙ্কাব দিলেই গাছ থেকে লম্ফ দিয়ে মাটিতে পডেই দে ছুট ছাড়া গত্যন্তব থাকত না। ধবা পড়লে যা দুর্গতি হত তা লোক ডেকে ডেকে বলবাব মতো হত না। একটা ঘটনা মনে পডছে— বলেই ফেলি।

একদিন দুপুবে মা গেছেন উত্তবেব বাড়িতে পাডা বেডাতে। মধ্যেব বাড়িব উত্তব-পশ্চিম কোণে যে একটা পাকা পায়খানা ছিল তাবই কাছাকাছি বেশ বডো ঝাঁকডা একটা জামগাছ ছিল— যাব ফল ছিল অতীব সুস্বাদু ও বসাল। বাড়িব কর্ত্রীব অনুপস্থিতিব সুবর্ণ সুযোগে হবি সিং পিসাব ছেলে ভ্যাগা উঠলেন গাছে। আমি আব কে কে তলায দাঁড়িয়ে বইলাম আম কুড়োবাব জন্যে। এমন সময হয়েছে কি মধ্যেব বাড়ি ও উত্তবেব বাড়িব মাঝে যে দেয়ালটা ছিল সেটা ভেঙে পডে যে একটা পথ হয়ে গিয়েছিল মধ্যের বাড়ি থেকে উত্তবেব বাড়িব যাতায়াতেব জন্যে, সেই পথ ধরে এলেন আমাবই মা। বোধ হয় উত্তবেব বাড়িব মেয়েবা সেদিন বাড়ি না থাকায় মা মধ্যেব বাড়ি ফিবে আসছিলেন। যেই-না মাকে দেখা আমবা যাবা নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম দিলাম তো দে ছুট— একেবাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তাব অখিলবাবুব কোয়ার্টাবেব কোনায় দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ভ্যাগাব কি দশাটা হয়। ওদিকে মাকে দেয়ালেব এপিঠে আসতে দেখেই ভ্যাগা একটা উঁচু ডাল থেকে মাবলে লাফ। পডেই নিজের ডান দিকেব গালটাকে হাত দিয়ে চেপে ধবে চেঁচিয়ে উঠল—'বাবা বে গেছি বে'। ভ্যাগাকে ডুকবে কেঁদে উঠতে দেখে মা ভাবলেন যে ছেলেটা হয়তো ইঁটেব উপব পডে খোঁচা খেয়ে আঘাত পেয়েছে। হাজার হোক মায়েব প্রাণ। তিনি শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কাটছি নেকি?'

ভ্যাগা ভাবল মায়ের মনটা ভিজেছে—সেইজন্যে সেই ভেজা মনটাকে একেবারে গলিয়ে দেবার জন্যে একটু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'এপিট ওপিট ফোকা হৈয়া গেছে'। হয়ে গেল হিতে বিপবীত। 'কি সর্বনাশ, চল্ শিগগিব ডাক্তারবাবুর কাছে' বলেই মা যেই ভ্যাগাব ডান হাতটা ধবতে গেছেন ভ্যাগা তখন পালিয়ে পাব। তাব গালে একটু আঁচডও লাগে নি। মা বুঝলেন যে গালটা এপিঠ ওপিঠ ফুটো হবার কথাটা মাকে ভোলাবাব জন্যে ভ্যাগাব ধাপ্পা মাত্র এবং তখন—'যত ব্যাদদপ পোলাপান' বলতে বলতে তিনি মধ্যেব বাডিব দোতলায় উঠে গেলেন। সেদিন আম নুন খাওয়াটা তেমন জমল না।

বর্ষা যদি উপভোগ কবতে হয তবে যেতে হয পদ্মানদীব পাবে অবস্থিত কোনো গ্রামে— যেমন ছিল আমাদেব তেলিববাগ। আকাশ ঘন-কালো জলভবা মেঘে অন্ধকাব হয়ে গেল সূর্যদেবেব মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে। তৃষ্ণার্ত ধবিত্রীব বুকে নেমে এল বর্ষাব অবিশ্রাম বাবিধাবা। যে-সব বাড়িতে ছিল টিনেব চাল সেগুলি মুখবিত হয়ে উঠল মোটা মোটা বাবিবিন্দুপাতে। কৃষকেবা হবষিত হয়ে উঠল অনেক দিনেব আকাশ-চাওয়া বর্ষাব সমাগমে। মাঠে বেবল তাবা তাদেব লাঙল ও নানা বঙের বলদগুলি নিয়ে। কেউ সাদা, কেউ বাদামী, কেউ-বা পাটকিলে বঙেব। জমিব ফাটলগুলি অচিবে বুজে গিয়েছিল প্রথম পশলা-দুই বৃষ্টিব জলে। লাঙল দেওয়া হল। মই দিয়ে ঢেলা ভাঙা হল। ও দিকে দেখতে দেখতে নদী-নালা খাল-বিল ফুলে উঠল জলেব তোডে। পাব ডিঙিয়ে সে স্রোত চলে এল মাঠেব উপব দিয়ে। বীজধানগুলি ও পাটেব বীজ বপন কবা হল। মাঠে জল যেমন বাডতে লাগল ধানেব ও পাটেব চাবাগাছগুলিও সেই অনুপাতে বেড়ে উঠতে লাগল। তেলিববাগেব ছোটো খাল জলে ভবে গেল এবং স্রোতও বইতে লাগল এবং তাতে নৌকা চলাচল শুরু হযে গেল। মাঠ ক্ষেত জলে জলময় হয়ে গেল। ছেলে বুড়ো এমন-কি বৃদ্ধবমণীবাও ছিপ দিয়ে গ্রামের খালে পুঁটি মাছ, ট্যাংবা মাছ ধবতে লাগলেন। যাঁবা বেশি উৎসাহী তাঁবা স্রোতেব মুখে স্থানে স্থানে চাঁই পাতলেন কই মাগুব মাছ ধববাব আশায়। চাবি দিক জলে থৈ থৈ। তাবি মধ্যে আমাদেব তেলিরবাগ গ্রামেব বসতি অঞ্চলটুকু যেন গলা বাডিয়ে মাথা উঁচু কবে ভেসে বইল ছোটো একটি স্বপ্ন-দেশের দ্বীপের মতো। গাছে গাছে কদম্ব ফুল একটা মাদক গন্ধ ছডিয়ে

দিতে লাগল পাড়াময়।

এইবকম এক ভরা বর্ষায়— সাল তাবিখ মনে নেই— আমাদের মামাবাড়ি থেকে খবব এল যে আমাদেব সেখানে নিযে যাবাব জন্যে লোক পাঠানো হচ্ছে। বোধ হয় দিদিমা গুগুকে দেখবাব জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। আমাব তো আব তব সয় না। লোক আসছে না কেন? মা ধমকালেন— 'আইব খন'। শেষ পর্যন্ত লোক এল নৌকা নিয়ে। সেকালে রেওয়াজ ছিল মেয়ের বাপেব বাড়িব লোকেদেব মেয়েকে শ্বশুববাড়ি থেকে আনা ও ফিবিয়ে পাঠানো— অর্থাৎ মেয়েব বাপেব বাড়িব ঘাডেই পডত যাবতীয খবচাটা। সেই বেওয়াজ অনুসাবেই দিদিমা— দাদামশায তখন বেঁচে ছিলেন না— লোক দিযে নৌকা পাঠিযেছিলেন মাকে ও আমাদেব নিযে যেতে। যে লোকটি এলেন মা তাঁব পবিচয় কবিয়ে দিলেন— 'কৈলাস সিং মাউসা'। শুনলাম তিনি মামাবাড়িব খুবই অনুগত প্রজা এবং তাঁব স্ত্রীব সঙ্গে মায়েব ছিল বোনেবই মতো সম্প্রীতি। সুতবাং তিনি যে আমাদেব 'মাউসা' হবেন তাতে কোনো ভুল নেই। সেই দিনটা কৈলাস সিং মাউসা বিশ্রাম কবলেন। মা সব জিনিস গুছিয়ে তৈবি হলেন। পবদিন ভোবে আমরা সবাই নৌকা কবে বওনা হলাম কৈলাস সিং মাউসাব জিম্মায় মামাবাড়ি হাসাড়াব উদ্দেশে।

বাবা যখন কাছে থাকতেন না তখন খুকীবও নালিশেব বালাই থাকত না। বোধ হয় আমাব বিরুদ্ধে মাব কাছে বেশি প্রশ্রয়ও পেত না। কাজেই তখন আমাব সঙ্গে খুকীব বেশ সদ্ভাবই থাকত। নৌকা আমাদেব অপবিসব খাল বেয়ে কত বেতঝাড়েব পাশ দিয়ে শেষে গিয়ে পড়ল বহবেব বডো খালটাব মধ্যে— যেটাকে বোধ হয় সবকাবী মহলে তালতলাব খাল বলত। খাল না যেন নদী। বর্ষায় সেই খাল টুবুটুবু ভর্তি এবং পদ্মা থেকে জলস্রোত ঠেলে এসে পড়েছে এই খালটার মধ্যে। বডো খালে পডা মাত্র খুকী— 'দাদা ছাখ, ঐ যে' বলে হাত বাড়িয়ে কত ফুলে ভবা মন্দাব ও কদম্ব গাছ এবং এটা ওটা কত কি দেখিয়ে নিজেই উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগল। কত খাল নদী নালা বেয়ে এবং এক একবার সময় ও পথেব দৈর্ঘ্য বাঁচাবার অছিলায় মাঝিরা চুপি চুপি পরেব ধানক্ষেতের উপব দিয়েই চলল নৌকা চালিয়ে। জল আব জল। ধানক্ষেতেব উপর দিয়ে যে না গেছে নৌকায় চড়ে সে বুঝবেই না যে সে কি

অপরূপ দৃশ্য এবং সে নৌকাবিহারে কি অপূর্ব আনন্দ। নৌকা যেমন এগুচ্ছে ধানগাছগুলি তাদের ফলন্ত শিষ সমেত মাথাগুলি আস্তে আস্তে নুইয়ে নুইয়ে জলের মধ্যে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পর নৌকাখানা তাদের উপর দিয়ে চলে যাবার পরই সেই ধানগাছগুলি সোনার ধানের মঞ্জরি মাথায় করে যেন এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং টপ টপ করে ঝরে পড়তে থাকে রোদে ঝলমল জলবিন্দুগুলি। অপূর্ব শোভন সে দৃশ্য আমার বালক-মনে যে রেখাপাত করে গেছে আজও তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতিতে। যতই ভেসে চলেছি জলের উপর দিয়ে, চোখ আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ ধানক্ষেতের দিগন্ত-বিস্তার দেখে দেখে। আনন্দের হিল্লোল উঠেছিল আমার শিশু-হৃদয়ে সেই প্রাণপ্রাচুর্যের স্রোতধারার বেগে। ধানক্ষেত পেরিয়ে নৌকা যখন পড়ল আর-একটি খালে তখন বুড়া মাঝির কোলে বসে তার হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৈঠা দিয়ে জল টানা যে কি উল্লাসকর ব্যাপার সে কি করে বুঝবে যে না টেনেছে বর্ষার জলে স্ফীত খালের মধ্যিখানে ছই-তোলা নৌকার দাঁড়।

দেখতে দেখতে এসে গেল শরৎকাল। নদী তখনো ভরা এবং খরস্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু আকাশের রং কেমন যেন একটু বদলে গিয়ে ফিকে হয়ে এল। বাতাসে যেন কিসের স্পর্শ পাওয়া গেল যা অনুভব করতে পারে ছোটোরাও যদিচ সেটা বোঝাতে পারে না তারা ভাষায়। মাঠের জল খুব একটু একটু করে নামতে শুরু হল। মাথার উপর মেঘে যেন ফাটল ধরতে লাগল এবং মাঝে মাঝে ঘন নীল আকাশ চকিতের মতো দেখা যেতে লাগল। ক্রমশঃ এই মেঘের ফাটলগুলি বাড়তে লাগল এবং পুঞ্জীভূত মেঘগুলি ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো পাল-তোলা ডিঙিনৌকার মতো আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণ কিরণ এসে পড়তে লাগল উঁচু গাছের ডগায় এবং তার পর আমাদের মুখে বুকে পিঠে। শুরু হয়ে গেল ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। বাতাসের স্পর্শ যেন স্নিগ্ধ শীতল হয়ে উঠল। ধানের শিষে নোলকের মতো ঝুলতে শুরু হল শরতের শিশিরবিন্দুগুলি। সবুজ ধানক্ষেতগুলি যেন শরতকালের সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে সোনালী হয়ে উঠল। অন্ন প্রাচুর্যের আসন্ন প্রত্যাশায় ঘরে ঘরে আশা ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হল। বর্ষার দিনে ধানক্ষেতের সবুজ আঁচল বিছিয়ে আলস্যে মেঘের অবগুণ্ঠন মুখ থেকে সরিয়ে

ফেলে অপূর্ব জ্যোতির্ময়স্বরূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়ালেন শারদলক্ষ্মী। আমার বালকচিত্তের মধ্যেও কেমন যেন একটা আনন্দের ছোঁয়া লেগে গেল আমার অজানিতে নিভৃতে, নীরবে। আকাশে বাতাসে একটা আগমনীর সুর উঠল— প্রথমে খুব মৃদুভাবে। ক্রমে সেই সুর মূর্ত হয়ে উঠে 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি'। এই শোভন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বেজে উঠল শারদোৎসবের বাজনা। এই 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি' যে কি অদ্ভুত, অনির্বচনীয়, আশ্চর্য ব্যাপার তা যে গ্রামে বসে সে বাজনা শোনে নি সে কি করে বুঝবে।

আমাদের দেশে যাবার পর যে প্রথম দুর্গাপূজা হয়েছিল সেটা আমার বেশ মনে আছে। কলকাতায় থাকতে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের গাড়ি চেপে গঙ্গার ধারে দুর্গাপূজার ভাসান দেখেছিলাম বটে কিন্তু এত কাছাকাছি দুর্গাপূজা আগে কখনো দেখি নি। আমাদের গ্রামে তিনটি বড়ো পূজা হত— দক্ষিণের বাড়িতে, মধ্যের বাড়িতে, আর আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে। মধ্যের বাড়ির প্রতিমাটি হত সব চেয়ে বড়ো এবং জমকালো। মাঝারি সাইজের প্রতিমা হত দক্ষিণের বাড়িতে এবং আমাদের বাড়ির দেবীপ্রতিমাটি হত ঐ দুইটির চেয়ে কিছু ছোটো। পূজার বেশ কিছুদিন আগে থেকে কুমারেরা যখন প্রতিমার কাঠামোটা বানিয়ে খড় ও মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ত আমরা ছেলেরা দল বেঁধে তিন বাড়িতেই ঘুরে আসতাম স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর। প্রতিদিন একটু একটু করে দুর্গাঠাকুরানী ও তাঁর পুত্রকন্যাদের ও দেবীর বাহন সিংহটির ও মহিষাসুরের দেহের চেহারাগুলি যেমন যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকত আমরা অবাক হয়ে তা অনেকক্ষণ বসে দেখতাম। সরস্বতী প্রতিমা গড়ার সময় যা দেখেছি এ ক্ষেত্রেও তাই দেখলাম। রোজ নূতন মাটির প্রলেপ পড়ত প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। যখন সেগুলি কুমার কারিগরের পছন্দসই হল তখন প্রত্যেকের গর্দানের উপর তাদের মাথা বসানো হল। তার পর এল প্রতিমার গায়ে রং লাগাবার ধুম। সরস্বতীর মাথায় ঘন কালো চুল ও গায়ে সাদা নির্মল এবং লক্ষ্মীর মাথায় কোঁকড়ানো চুল ও গায়ে একটু হলদে রং। গণেশের গায়ে লাল এবং কার্তিকের কালো চুল ও গোঁফ ও গায়ে ঈষৎ হলদে রং। দুর্গাঠাকুরানীর মুখে রক্তিম আভা ও কালো গুচ্ছ চুল। কুমারদের কাজ আমরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। এর পর হত চালচিত্রেও কত রং-বেরঙের ছবি এবং কতরকমের সোলা ও রাংতার পাতে

ঝালর এবং ঠাকুরদের গায়ে জমকালো গহনা। তা ছাড়া দেবীর দশ হাতে দশ রকমের প্রহবণ। বর্শাটা গিয়ে মহিষাসুরের বুকে যেখানে গিয়ে বিঁধেছে সেখানে রক্ত যেন ছিটকিয়ে বের হয়েছে। দেখে দেখে আমাদের চোখ আর ফেবে না। গ্রামেব সবাই বললেন যে 'পশ্চিমেব বাডিব প্রতিমা ছোটো হৈলে কি হইব দ্যাখতে সকলেব থনে ভাল।' এই তিন বাডিব ভূঁঞাদের মধ্যে পশ্চিমেব বাডিব আমি একলা সেবাবে গ্রামে উপস্থিত ছিলাম বলেই পশ্চিমেব বাডিব প্রতিমাব প্রশংসা হল কিনা জানি না।

তাব পব মহালয়াব পবে বাবা এলেন কলকাতা থেকে। সে কি আনন্দ আমাদের ভাইবোনেদেব। সবাই পেলাম নূতন জামা ও জুতা এবং আমি একটা বেশি পেলাম ছেলে বলে— লেজ-আলা জবি দিয়ে বাঁধা পাগডি বা টুপী। মেয়েবা তো পাগডি পবে না তাই তাবা পাগডি পেল না। সেদিন রাত্রে যে নূতন জামা জুতা ও পাগডি মাথাব বালিশেব কাছে বেখে শুয়েছিলাম তা এখনো মনে আছে। তাব পর ষষ্ঠীপুজোর দিন সানাই, ঢোল ও কাঁসব বেজে উঠল। আমাদেব কাওলী বাডিব বামকানাই ভাইয়েব ঢোল বাজানো একটা শোনবাব মতো জিনিস ছিল। সে কি বাজনা— সে কি আস্ফালন। ঢোলেব বোলগুলি যেন কথা বলে উঠছিল। আমি তন্ময় হয়ে শুনলাম সে বাজনা আব হাপুস নয়নে দেখলাম দেবী প্রতিমার দিকে। আমাব শিশুমন অচিবে ভবে উঠল কানায় কানায় শাবদোৎসবেব আনন্দ-হিল্লোলে। পূজামণ্ডপের সামনেটা ভুঁইমালীবা আগেই চমৎকাব কবে লেপে দিয়েছিল। তাতে কত বর্ণেব আলপনা দিলেন মেয়েবা। নৈবেদ্য সাজানো হল। প্রতিমাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল এবং চাবি দিন ব্যাপী দুর্গাপূজা শুরু হল।

বোজ সন্ধ্যায় আবতি ও সন্ধ্যাপূজার ভিড জমে যেত। মস্তবড়ো পঞ্চপ্রদীপ বাতি জ্বেলে পুবোহিতঠাকুব সেটিকে ডান হাতে ধবে ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে এবং বাম হাতে পিতলেব ঘণ্টাটা বাজিয়ে আরতি আরম্ভ কবলেই কাওয়ালী বাডিব ঢুলীবা ঢোল বাজনা শুরু কবে দিত। সে কি অপূর্ব ঢোল বাজানো। পূজামণ্ডপেব সামনে লোক গিজগিজ কবত। গ্রামের হিন্দুমুসলমান নবনাবীবা আসলেন পূজা দেখতে। চাঁডাল জোলা কেউই বাদ গেল না। দক্ষিণেব ও পশ্চিমেব বাডিতে প্রত্যহ ছাগ-বলি হল। কিন্তু মধ্যেব বাড়িতে জীব-বলি কালীমোহন বন্ধ কবে দেওয়ায় সেখানে আখ চালকুমড়া ইত্যাদি বলি হল। মহাষ্টমীব দিন সকালে শুনলাম

নরবলি হবে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! অথচ দেখবারও কৌতূহল। আমাদের বাড়ির পূজামণ্ডপের একটা জায়গায় দেখলাম পর্দা দিয়ে ঘেরা— কি যেন কাজ হচ্ছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি যখন নামল এবং বাতি জ্বলল তখন ভীষণ ভাবে ঢোল ও কাঁসর বেজে উঠল। লোকে বলল যে নরবলি হচ্ছে। অচিরে পর্দার বেড়াটা সরিয়ে নেওয়া হল এবং দেখলাম সেখানে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের ছিন্ন মাথাটা একখানা বড়ো মানকচু পাতার উপর— চারি দিকে সে কি রক্ত। অদূরে উপুড় হয়ে আছে সেই লোকটার ধড়টা— তার গলা দিয়ে সে কি রক্ত বেয়ে পড়েছে আর একটা মানকচুর পাতার উপর। ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম এবং মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তখন বুঝি নি। পরে শুনলাম এই নরবলির অভিনয় একটা মামুলী ব্যাপার। একটা বড়ো গর্তের মধ্যে একজন লোক বসে থাকে— তার মাথাটা মাটির উপরে থাকে। তার গলার চারি দিকে কচুপাতা পেতে গর্তের মুখটা ঢেকে দেওয়া হয় এবং সেই লোকটির গলার উপর ময়দা না পিঠালীর প্রলেপ দিয়ে এবং লাল আলতা ছিটিয়ে দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যেন দূর থেকে মনে হয় সত্যি সত্যি একটা মাথা ধড় থেকে কচুপাতার উপর রেখে ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে: আর একজন লোক উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটা একটা গর্তের মধ্যে নিচু করে রাখে এবং তার গর্দানের উপর ময়দা না পিঠালী দিয়ে আর একটা গলা তৈরি করে কচুপাতার উপর রেখে তাতে আলতা ছিটিয়ে দেয়। তখন কিন্তু তা বুঝি নি। মনে হয়েছিল সত্যিই বুঝি একটা মানুষকে বলি দিয়ে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে বিজয়া দশমী এসে পড়ল। দিনগুলি যে কোথা দিয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। যাই হোক, সন্ধ্যার সময় তিন বাড়ির প্রতিমা নিজ নিজ বাড়ির পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হল। তার পর শান্তিকলস ভরে নিয়ে তিন বাড়ির লোকেরা বাজনা বাজিয়ে নিজ নিজ পূজামণ্ডপে ফিরে গেলে সেই শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়া হল সবাইয়ের মাথায়। তার পর শুরু হল কোলাকুলির পালা। এই-সব সেরে নতুন কাপড় পরে বাবার সঙ্গে চললাম বহরের পশ্চিমের খাল পার দিয়ে পদ্মা নদীর দিকে। কত লোক কত প্রতিমা জোড়া নৌকায় তুলে আস্তে আস্তে ভেসে চলছে পদ্মার স্রোতে। বহরের চৌধুরীদের লাঠিয়ালদের সে কি সড়কির আস্ফালন। অ্যাসিটিলিন

গ্যাসের আলোয় তা ঝক ঝক করে উঠছিল। মারামারি কিন্তু কিছু হল না সেবার। তার পর অনেকবার ঘুরে ফিরে নৌকা জোড়াটা দু দিকে বেয়ে নিয়ে যাওয়ায় মাঝখানে একটা বড়ো ফাঁক হয়ে প্রতিমা পদ্মার অতল জলে তলিয়ে গেল। আমরা খুব হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের দিন স্নানের সময় দেখলাম মধ্যের বাড়ির পুকুরঘাটে বহু ছেলে-মেয়ের ভিড়। দেখলাম আগের দিন যেখানে প্রতিমা-বিসর্জন দিয়েছিল সেখানে গোটা দুই তিন লম্বা বাঁশ জলের উপর উঠে রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম যে প্রতিমা যাতে ভেসে না ওঠে সেজন্য প্রতিমার কাঠামোর মাঝখান দিয়ে বাঁশ মাটিতে শক্ত করে পুঁতে দিয়েছে এবং পোঁতা বাঁশেরই মাথাগুলো জলের উপর উঠে রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সব মধ্যের বাড়ির পুকুরের বাঁধানো ঘাট থেকে একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে দূরে পুকুরের মধ্যেখানের সেই বাঁশ ছুঁয়ে যে প্রথম আবার ঘাটে ফিরবে তারই জিত— এই হচ্ছে খেলা। আমি শহুরে ছেলে। যদিচ ১৪৮ নং বাড়িতে দুটা প্রমাণ সাইজ পুকুর ছিল, আমি তখনো সাঁতার শিখি নি। সঙ্গীরা ডাকতে লাগল 'খোকা আয়'। যেতে পারছি না বলে লজ্জাও লাগছে অথচ যেতেও করছে ভয়। তখন দুজনে দু দিক থেকে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে ফেলল জলে এবং আমাকে বলল, 'জল কাটা'। ওরা আমাকে একটু তুলে ধরেছিল। আমি ওদের মতোই হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। কয়েকবার খাবিও খেলাম, কিছু জলও ঢুকল পেটে কিন্তু গিয়ে পৌঁছলাম সেই বাঁশের কাছে। বাঁশ ধরে দম নিয়ে আবার ছেলেদের সঙ্গে ফিরে এলাম ঘাটে। দেখলাম যে সে এক মজার ব্যাপার। তার পর ভয় কেটে গিয়ে আমার নিজেরই উল্লাস হল ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে আমি শিখে গেলাম সাঁতার কাটা। একটা কাজের কাজ হয়ে গেল।

৪

তার পর ছোটো ছোটো পূজা হয়েই চলল। লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি। লক্ষ্মীপূজায় কোনো বাড়িতে ছাগ-বলি হয় না। কিন্তু হয় আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে। মা বললেন, 'ওরা শাক্ত কিনা তাই।' বুঝলাম না কিছু। লক্ষ্মীপূজার পর বাবা ফিরলেন কলকাতায়। তার পর আবার আমাদের স্কুল খুলল। পড়াশুনা শুরু হল। হঠাৎ খবর এল

যে সরকাবী স্কুল ইন্সপেক্টর আসবেন আমাদের স্কুল দেখতে। সাজ-সাজ রব উঠল। ইন্সপেক্টব আসা তখনকার দিনে ছিল একটা মহা ব্যাপার। তাঁর রিপোর্টেব উপরে নির্ভব করবে স্কুলেব ভবিষ্যৎ। রিপোর্ট খারাপ হলে বিশ্ববিদ্যালয়েব তালিকা থেকে নামও কাটা যেতে পাবে এবং যদি সরকাবী সাহায্য ববাদ্দ থাকে তবে সে বরাদ্দ বাতিলও হয়ে যেতে পাবে। আমাদের দস্তুরমত বিহার্সেল শুরু হল। বলা হল সেদিন ভালো কাপড পবে স্কুলে আসতে হবে। ইনস্পেক্টব সাহেবকে নম্রভাবে কেমন কবে নমস্কাব কবতে হবে, কি ধবণেব প্রশ্ন হতে পাবে এবং তাব কি জবাব দিতে হবে তা সবই শিক্ষকবা শিখিয়ে দিলেন। তার পর সেই ভয়াবহ দিনটি এসে পডল। সব বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে। তেলিববাগেব মাঝখান দিয়ে যে খাল গেছে পুবেব দিকে সেই খালেব পাবেই মধ্যেব বাডিব বড়ো ফটক। সেই ফটক থেকে দোতলা বাডিব নীচে বাবান্দা পর্যন্ত চেঁছে-ছুলে সাফ কবে লাল শালু পাতা হয়েছে। দুধারে বাঁশ কেটে মাটিতে পুঁতে দুই দিকেব বাঁশেব মাথায় যে গর্ত ছিল তাব মধ্যে বাখাবি ঢুকিয়ে খিলান বা আর্চ কবাও হযে গেছে। বাঁশে ও আর্চে সবুজ পাতা জডানো। আমবা ছেলেবা দুইধাবে লাইন কবে দাঁডালাম যখন ইনস্পেক্টব সাহেব এলেন। আমবা জোড হাতে তাঁকে নমস্কাব কবলাম। লাল শালুব উপব দিয়ে তিনি চলে যাবাব পব কে একটি ছেলে একটা বাঁশেব খুঁটির গায়ে যেই-না দিয়েছে হেলান অমনি বাঁশেব মাথাব গর্ত থেকে বাখাবিটা ছিটকিয়ে গিয়ে লাগবি তো লাগ আমাবই কপালে। ডান চোখেব ভুরুর ঠিক উপবে এসে লাগল। রক্তাক্ত হয়ে দোতলায় দৌড়ে গিয়ে মায়েব কাছে হাজির। বাডিতেই ছিলেন দাতব্য চিকিৎসালয়েব ডাক্তার অখিলবাবু। তিনি কি মলম দিয়ে যেন বেঁধে দিলেন। ফিরে গেলাম ক্লাসে। শেষ পর্যন্ত, হায়, ইনস্পেক্টব সাহেব আমাদের ক্লাসেই এলেন না। ওপরের দুটা ক্লাসে গিয়ে হেডমাস্টাবমশায় ও সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট মহিম মাস্টাব-মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে গেলেন জলযোগ সেবে। রিপোর্টটা শুনেছি ভালোই হয়েছিল। যাক, তাইতেই আমাদেব সব আয়োজন সার্থক হয়ে গেল এবং অবসান হয়ে গেল হেডমাস্টাব ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহিম মাস্টাবমশায়দের সকল দুশ্চিন্তাব। যাকে কথায় বলে সব ভালো যার শেষ ভালো।

ইনস্পেক্টব সাহেব আসাব কিছু পরেই হল আমাদের বাৎসরিক

পরীক্ষা। আমি এর আগে কখনো পরীক্ষাই দিই নি। মনে মনে ভয় যে করছিল না তা বলতে পারি নে। আশ্বাস দিলেন নদি পণ্ডিতমশায়— 'কোন ভয় নাই বে— তুই তইব্যা যাবি।' পবীক্ষা না দিয়েও উপায় নেই। কি কবা যায়। দিলাম পবীক্ষা নেহাৎ অনিচ্ছাব সঙ্গে ও ভয়ে ভয়ে। পণ্ডিতমশায়েব বাক্য কি মিথ্যে হয়? আমি সত্যি সত্যিই তবে গেলাম। সেই বাবই গুজব উঠেছিল যে মোহিনীদাদাব ছেলে রতিরঞ্জন বুঝি-বা আটকে যায়। মোহিনী-দাদাব মা আমাদেব জ্যেঠিমা হুঙ্কাব দিয়ে উঠলেন। আমাদেব বাবা ছিলেন স্কুলেব সেক্রেটাবী। তিনি যখন বড়োদিনেব বন্ধে তেলিববাগ এলেন তখন জ্যেঠিমা কালক্ষেপ না কবে বাবা আসামাত্র নালিশ রুজু কবলেন— 'সতীশেব্ ইস্কুলে আমাব বইত্যা পবমোশন পাইব না— এত বড়ো কথা কয় হ্যাড মাস্টাব। তুমি এব একটা বিহিত না কবলে ভাল হৈব না কইয়া থুইলাম।' অর্থাৎ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে সেক্রেটাবীব সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনবোধে সেক্রেটাবীব সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধেও আপিল যেতে পাবে আবো উপবওয়ালাদেব কাছে। বাবা খালি বললেন— 'আইচ্ছা, দেখুম অনে'। দেখা গেল যে গুজবটা সত্য নয়, তবে ব্যাপাবটা বতিবঞ্জনেব কানেব কাছ ঘেঁষেই গেছে। সব ভালো যাব শেষ ভালো। বতিবঞ্জন যথাবীতি প্রমোশন পেলেন এবং সে যাত্রায় বেঁচে গেল বেচাবী হেডমাস্টাবমশায়েব চাকবিটা। সেক্রেটাবীব বিরুদ্ধে কাজেই আপিলেব আব প্রয়োজন হল না। যতদূব মনে আছে সিকদাব বাডিব মহিমজ্যাঠাব বড়ো ছেলে আমাদেব জগাদা ও গোঁসাইপূজাব রামমণি ঠাকুবেব একমাত্র পুত্র চন্দ্রকুমাবদা সেবাব যে ক্লাসে ছিলেন সেইখানেই রয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনেব কাবোরই ঠাকুমা তখন বেঁচে নেই, এতবড়ো দুর্ভাগ্যেব কথা স্মবণ করে হয়তো তাঁবা নিজ নিজ অদৃষ্টকেই যথেষ্ট ধিক্কাব দিয়েছিলেন।

৫

আব একবার ভবা বর্ষায় মা আমাদেব তিন ভাইবোনদেব নিয়ে কৈলাস সিং মাউসাব তত্ত্বাবধানে নৌকাযোগে হাসাডায় নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। তেলিববাগ থেকে নৌকা ছাডবাব পব আমবাও হাপুস চোখে কেবল দৃশ্যবৈচিত্র্য দেখেই বিহ্বল হয়ে পডছিলাম। কোথা দিয়ে যে সময় গেল তা কে জানে। তার পর দেখতে দেখতে বিদগাঁও গ্রামে পৌঁছানো গেল।

সেখানে মায়ের আপন বড়োপিসি অন্নদার বাড়ি। মায়ের এই পিসির ছেলে যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত—আমাদের যোগেন্দ্রমামা—বিয়ে করেছিলেন আমাদের মধ্যের বাড়িব শ্যামাসুন্দরী পিসির বড়ো মেয়ে প্রমদাদিদিকে, যাঁর কথা আগেই বলেছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার আমরা নৌকা ভাসালাম মামাবাড়িব পথে। আবার সেই সবুজ ধানক্ষেত। তার পর কত নদী খাল পেরিয়ে চলল নৌকাখানা সাদা পাল তুলে দুলতে দুলতে। বিকেলের দিকে শবীব এলিয়ে এল। ঘুমিয়ে পডলাম ছইয়ের ভেতরে মায়ের কোলের কাছে। কোন্ ঘাটে যে নৌকা ভিডল, কখন যে পৌঁছলাম হাসাড়ার মামাবাডিতে তা এখন আব মনে নেই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হল জলযোগ। সে প্রায় পেট ভরেই ভাত খাওয়া। জাউয়েব গলা ভাত, বিশুদ্ধ ঘি দিয়ে ও আলু পাকা কুমড়া ও ডাল সিদ্ধ দিয়ে যে কী মুখবোচক হয়েছিল তা এখনো যেন মনে পডে। তার পব মা নিয়ে গেলেন আমাদেব তিন ভাইবোনেদেব বাডিব দক্ষিণের দালানে তাঁর ছোটো জ্যাঠামশায় তাবক সেনেব কাছে। ঢিপ কবে পদধূলি নিয়ে দাঁডিয়ে একবাব তাঁকে ভালো কবে দেখে নিলাম। বেশ সুদর্শনই বলে মনে হল। বঙ ফবসা, গোঁফে একটু পাক ধবেছে। মাঝ-বয়েস পেরিয়ে গেছে। ইনি আমার দাদামশায় কৈলাস সেনেব যমজ ভাই। এঁরই কন্যা হলেন কুমুদিনী মাসীমা, যাঁব কথা আগেই বলেছি। মায়েব নির্দেশে এঁকে ধন-দাদামশায় বলেই জানলাম। তাব পব মায়েব সঙ্গে তাঁব জ্যাঠা-মশায়েব কথাবার্তা শুরু হল। আমি নিঃশব্দে সরে পডে চলে গেলাম আমাদেব ঠাকুবমামা যোগেশের বডো ছেলে শ্যামাদাদাব কাছে। শ্যামা-দাদা আমাবই মতো ময়লা, দেখতে বেশ প্রমাণ সাইজ লম্বা। শ্যামাদাদার হাতে ছিল একটা গুলতি। তিনি আমাকে 'খোকা আয়' বলে ডেকে নিয়ে চললেন বাডিটা ঘুবিয়ে দেখিয়ে আনতে। বাডিব বাইবে ছিল মস্ত বডো চারচালা ঘর যেটা ছিল তাঁদের বৈঠকখানা ঘব, পাশেই মস্ত বড়ো পুকুব। সদরবাডি থেকে অন্দরমহলে ঢুকতে হত একটা প্রকাণ্ড দেউডি পেবিয়ে। এককালে নাকি এই দেউডিতে থাকত দরওয়ান। আমরা যখন গেলাম মামাবাড়িতে তখন দরওযান বলে কাউকে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। দেয়াল দিয়ে ঘেরা অন্দরমহলটা ছিল খুব প্রশস্ত। অন্দবমহলে যতদূর মনে পডে তিনটি দালান ছিল। প্রথমে বেশ উঁচু ভিতের উপর একতলা দক্ষিণের দালান।

তার পর একটা উঠান পেরিয়ে মধ্যের দালান— এটি ছিল দোতলা। আর একটা উঠান পেরিয়ে ছিল আর একটি একতলা দালান যাকে বলা হত উত্তরের দালান। প্রত্যেক দালানেব আলাদা রান্নাঘব। মধ্যের দালানের উত্তব-পশ্চিম কোণে ছিল একটা ঢেঁকিঘব। পরে দেখেছি এই ঢেঁকিঘবে ঢেঁকিব পাড় আবম্ভ হলেই কোথা থেকে একটি হাবা ছেলে ছুটে আসত প্রায় উলঙ্গ বেশে এবং ঢেঁকিব তালে তালে নিজেব বাঁ হাতেব তেলোটাব উপবে ডান হাত মুঠি কবে একমনে বসে বসে তাল দিত। ঢেঁকিব পাডেব আওয়াজ পেলে নাকি সে থাকতে পাবত না— ছুটে যেত যেখানে সে আওয়াজ হচ্ছে। তাব পবই ছিল একটা খিডকি পুকুব যেখানে বৌঝিবা যেত বাসন মাজতে। দেয়ালেব বাইবে ছিল 'ছিটাল' অর্থাৎ যেখানে তিন দালানের আবর্জনা ফেলা হত।

দক্ষিণেব দালানে থাকতেন ধন-দাদামশায় তাবকচন্দ্র সেন। ভাইয়েদেব মধ্যে তখন তিনিই বেঁচে ছিলেন। তাঁব বাড়িব দক্ষিণে ছিল অনেক ফলেব গাছ। তাব মধ্যে একটা যে কামবাঙা গাছ ছিল সেটা খুব মনে আছে, কেননা সে গাছে উঠে একটা অঘটন আমাব ঘটেছিল। একদিন দুপুবে ধন-দাদামশায় যখন ঘুমিয়েছিলেন আমি গুড়ি-গুড়ি সেই কামবাঙা গাছে উঠে বেশ বঙ ধবেছে এমন কটা ফল পেড়ে যেই-না কোঁচবে ভবেছি অমনি কোথা থেকে গোটা দুই লাল পিঁপডে আমার পেটে ও উরুতে এমন কামড়ে দিল যে আমি হাত ছুঁডে কেঁদে উঠেই পডলাম গাছ থেকে। 'কে বে' বলে জেগে গেলেন ধন-দাদামশায়, আমি ততক্ষণে পালিয়ে পাব। কিন্তু ফল হল যে সেই বাত্রে পিঁপডেব কামডেব ব্যথায় আমাব এসে গেল দারুণ জ্বব ও যন্ত্রণা। ঐ দালানে আব থাকতেন 'ছোটো বউ' অর্থাৎ আমাব মাযেবই ছোটো ভাই যতীনেব বিধবা স্ত্রী। ধন-দাদামশায়েব নিজেব তখন ছেলে ছিল না বলে তিনি তাঁব যমজ ভাই, আমার দাদামশায কৈলাসচন্দ্রেব ছোটো ছেলে যতীনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ কবেন। ভগবানেব বিধানে সেই পোষ্য-পুত্রটি অতি অকালে মাবা গেলেন একটি দুঃখিনী বাল-বিধবাকে বেখে। এই ছোটো বউই তখন দেখতেন তাঁব শ্বশুব আমাদেব ধন-দাদামশায়কে।

মধ্যেব দালানটি ছিল দোতলা। তার একতলাব প্রবেশদ্বারের কাছে প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো হত একটি পিতলেব পিলসুজে। আসনের সামনে দেওয়া হত একটি পিতলের রেকাবিতে বেশ কয়েকখানা বাতাসা ও

কয়েকটা সাজা পান ও এক গ্লাস জল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে হাত দেবার যো ছিল না। শেষে বউবা যখন মনে করতেন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তখন সেই বাতাসাগুলি ছড়িযে দেওয়া হত হরিব লুটের মতো আর আমবা ছোটোবা তা কাড়াকাড়ি কবে কুড়িয়ে নিয়ে খেতাম। এই মধ্যের দালানেব একতলাব দক্ষিণ-পশ্চিমেব একটা ঘবে থাকতেন মায়ের ঠাকমা অর্থাৎ বাড়িব কর্তা পীতাম্বব সেনেব বিধবা পত্নী। অনেক তাঁর বয়েস হয়েছিল এবং তাঁব ডান দিকটা পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি ডান হাত নাডতেই পাবতেন না। তাঁর বড়ো ছেলে কালীকিশোবেব দ্বিতীয়া পত্নী— যাঁকে আমবা 'মা-দিদি' বলে ডাকতাম, তিনি খুব হাসিখুসী মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁব শ্বাশুড়িব সব কাজই কবতেন। তাঁকে স্নান কবিয়ে কাপড পবিয়ে দেওয়া, তাঁব ময়লা মালসা ফেলা, তাঁব জন্যে বান্না কবা— সব কাজই কবতেন 'মা-দিদি'। এইখানে একটা কথা মনে পড়ছে। এই বৃদ্ধা শাশুড়িব জন্যে 'মা-দিদি' মাটিব হাঁড়িতে কাঠেব লাঠি দিয়ে নেড়ে নেড়ে দুধ খুব ঘন কবে জাল দিতেন। বৃদ্ধা বাঁ হাতে খেতেন এবং খাওয়াব পরে খানিকটা ঘন দুধ নিতেন। আমবা ছোটোবা বসে থাকতাম বাকি দুধটুকু ও হাঁড়িব গায়ে লাগা চাচিব লোভে। তখন কিন্তু ঘেন্না কবত না বৃদ্ধা বাঁ হাতে খেতেন বলে। যাক্, যা বলছিলাম। 'মা-দিদি' তাঁব শাশুড়িব সেবা করেছেন অক্লান্ত ভাবে ও অতি নিষ্ঠাব সঙ্গে যতদিন পর্যন্ত সেই বৃদ্ধা বেঁচে ছিলেন। মা-দিদির এক ভাই ললিত দাদামশায়ও এই বাড়িতেই থাকতেন ও হাসাড়া স্কুলে পড়াতেন। আব মধ্যেব দালানে থাকতেন আমাব দিদিমা ও তাঁর সন্তান-সন্ততিবা।

আব একটা উঠান পেবিয়ে উত্তবের দালানে থাকতেন দুই সতীন, সেজদাদামশায় হবকিশোবের দুই বিধবা পত্নী। বড়োটিকে ডাকতাম সোনা-দিদিমা আব ছোটোটিকে বলতাম নয়াদিদিমা। বড়ো হয়ে গল্পের বইয়ে পড়েছি যে পতিব্রতা স্ত্রী নিজেব ছেলে না হওয়ায় স্বামীব বংশলোপের আশঙ্কায় নিজের স্বামীকেই আবার বিয়ে দিয়েছে। শুনলাম যে আমাদের সোনাদিদিমাও সেই গল্পের আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রীর মতো আপন স্বামীকে নয়াদিদিমাব সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কথাটার মধ্যে মর্মার্থ নিহিত আছে কিনা খোঁজ পাই নি। কিন্তু নয়াদিদিমাবও সন্তান হয় নি এবং হরকিশোরের বংশলোপই পেয়ে গেল। মাঝখান দিয়ে সোনাদিদিমাব কপালে জুটল

আমরণ সঙ্গী একটি সতীন। তবে এটা বলবই যে দুই সতীনে বেশ সদ্ভাবই ছিল— সমব্যথী বলেই বোধ হয়। এঁরা দুজনে দেখতে একেবারে বিপরীত ধরণের। সোনাদিদিমা ছিলেন ময়লা দেখতে কিন্তু অত্যন্ত স্নেহশীলা মহিলা। নয়াদিদিমা ছিলেন বাঙালী মেয়ের পক্ষে খুবই ফরসা এবং একটু খুঁত খুঁতে। তবে মোটের উপরে বেশ হাসিখুসী। এই দুই সতীনই আমাকে খুব স্নেহ করতেন মায়ের খাতিরে।

আমাদের দিদিমা তখন হাসাডাতেই ছিলেন। তাঁর গায়ের রং একরকম শ্যামবর্ণই বলতে হয়। আয়তনে তিনি ছিলেন না-মোটা, না-রোগা। মানানসই উঁচু ও ছিপছিপে। তাঁর নাকটি ছিল বেশ চোখা। সেই খাড়া নাকের উপর ছিল একটি সরু সবুজ উলকির টানা দাগ এবং কপালে ছিল একটি সবুজ উলকির ছোটো টিপ। চোখ দুটির কালো তারার চারি পাশে ছিল সরু একটি বৃত্তাকার রেখা যা পেয়েছিলেন তাঁর সবকটি ছেলে ও মেয়ে। দাঁত মাজতেন দিশী তামাকপাতা পোড়ানো ছাই দিয়ে, যার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর একটি দাঁতও পড়ে নি। তাঁর ছিল চার ছেলে ও একমাত্র মেয়ে, আমাদের মা। ছোটো ছেলে যতীনকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন দাদা-মশায়ের যমজ অগ্রজ আমাদের ধন-দাদামশায়। বাকি তিনজনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যোগেশ, যাঁকে আমরা ডাকতাম ঠাকুরমামা বলে। তিনি ছিলেন বেশ গোলগাল ধরণের মানুষ। পড়াশুনা বিশেষ এগোয় নি তবে কবিরাজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। ঠাকুরমামা (যোগেশ) থাকতেন কলকাতায় হ্যারিসন (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী) রোড থেকে যে ছোট্ট গলি ট্যামার্স লেন বেরিয়েছিল তারই সাত নম্বর ভাড়াটে বাড়িতে দাদামশায়ের প্রাক্তন মুহুরী হালদার-মশায়ের সঙ্গে। ঠাকুরমামা কলকাতায় কবিরাজী করতেন। সেই সঙ্গে তিনি মেয়েদের মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল তৈরি করে মাঝারি সাইজের চ্যাপ্টা শিশিতে ভরে চমৎকার কার্ডবোর্ডের খোলে ঢুকিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। কাটতি মন্দ ছিল না। কিছু বেশি মূলধন ঢাললে একটা ভালো ব্যবসা হলেও হতে পারত। সেই তেলের নাম ছিল 'চন্দন কুসুম তৈল'। বোতলের গায়ে এবং কার্ডবোর্ডের বাক্সটায় উপরের চুলখোলা একটি সুন্দরী রমণীর চেহারা থাকত। কেন জানি না, আমার বরাবর ধারণা ছিল যে ওটা আমাদের বড়ো মামীরই প্রতিকৃতি। বস্তুতঃ আমাদের 'ঠাইনমামী' সুন্দরীই ছিলেন। খুব ফরসা রঙ, সুন্দর কালো

চুল এবং ছিপছিপে লম্বা স্ত্রীলোক তিনি ছিলেন। শুনেছি মেজাজটা তাঁর একটু রুক্ষই ছিল। সেটাব জন্যে কে দায়ী কে জানে।

ঠাকুরমামার ছিল চার ছেলে— যথাক্রমে শ্যামদাদা, বাশু (অনন্ত), বোচা (বিজয়) ও গোপাল। শ্যামাদাদা ও বোচা এখন বেঁচে নেই। বাশু আছেন আসামেব তিনসুকিয়ায় এবং গোপাল ডাক্তারি করছেন দ্বারভাঙায়। ঠাকুবমামাব দুটি মেয়ে— বড়োখুকী (সুবালা) ও ছোটোখুকী। বড়কি-দিদির বিয়ে হয়েছিল বানবি গ্রামেব উপেন্দ্র সেনগুপ্তেব সঙ্গে, যাঁকে আমবা বলতাম 'স্যানঠাকুব'। এবকম চমৎকার লোক খুব কম দেখা যায়। একবাব যখন হিন্দু মুসলমানেব দাঙ্গা চলেছে হঠাৎ তখন স্যানঠাকুবেব সঙ্গে দেখা হলে যেমন বলতে হয় তাই বললাম— 'স্যানঠাকুব কেমন আছেন?' তিনি সহাস্যমুখে বললেন— 'মোটেব উপর ভালোই।' পবে জানলাম যে মুসলমানেবা তাঁব দেশেব বাড়ি কদিন আগেই জ্বালিযে দিয়েছে এবং তাবই কদিন আগে তাঁব বড়ো ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় গেছে। পবে জানা গেল যে ছেলেটি গিয়েছিল ঢাকায় মুসলমানদেব সঙ্গে মারামাবি কবতে, সেই ছেলেটি পবে বড়ো হয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস কবে ফৌজে ঢুকেছিল কমিশন পেয়ে। সে তাব সেনাদলেব সঙ্গে মিশবে যায়। সেখানে জার্মান জেনাবেল বমেলেব বাহিনীর হাতে উত্তর-আফ্রিকাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কবেছিল। তার বাপ, মা ও বালিকা বধূটিকে দুঃখ সাগবে ভাসিয়ে কোথায় সে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেল। বড়কিদিদি ও স্যানঠাকুবেব দৃঢ় ধাবণা ছিল যে তাদেব ছেলেব খোঁজ একদিন আসবেই। আহা, বৌটিও হয়তো তাই ভেবেই মনকে শান্ত কবেছেন। বধূমাতাব সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও মনমবা হয়ে বড়কিদিদি ও স্যানঠাকুর ইহলোক হতে চলে গেছেন। ছটকি ছিলেন আমাব চেয়ে কয়মাসেব ছোটো। তাঁব বিয়ে হয়েছিল হাসাড়া গ্রামেই। কলকাতা হাইকোর্টের নামকবা উকিল রমেশ সেনেব ভাই গুণেশের সঙ্গে তাঁব বিয়ে হয়। গুণেশ আলিপুবে ওকালতি করে বেশ পসার কবেছিলেন।

মেজোমামা (বঙ্কিম) ও সোনামামা (অতুল) তখন হাসাড়ায় ছিলেন না। তাঁরা সপবিবারে বোধ হয় তখন ঢাকাতেই ছিলেন। মেজোমামা ছিলেন বেশ ফরসা। তিনি তাঁর বাবাব রঙ পেয়েছিলেন। দোহারা চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো, দেখতে সুদর্শন। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না।

বোধ হয় এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। সোনামামা অতুল ছিলেন কালো কিন্তু তাঁর চোখমুখ বেশ সুন্দব ছিল। চোখ দুটি যেন জল-জল করত। তিনি এন্‌ট্রান্‌স্ পাস কবে ঢাকাতে আসানুল্লা ইনজিনিয়াবিং স্কুল থেকে ওভার-সিয়াবী পাস কবেছিলেন। পবে তিনি ও মেজোমামা দুজনে মিলে কন্‌ট্রাকটারী কাববাব কবে ঢাকার বমনায় বড়ো বড়ো বাড়ি তৈবি কবান। সোনা-মামাব প্রথম পক্ষেব স্ত্রীব গর্ভে ছিল একটি ছেলে (প্রতুল) ও একটি মেয়ে যার ডাকনাম ছিল বুচুনী। ভালো নাম ভুলে গেছি। প্রথম স্ত্রী মাবা যাবাব পব সোনামামা আবাব বিয়ে কবেছিলেন এবং সেই বিয়েতে সন্তান হয়েছিল বেশ কটি। অরুণ, অমল, কমল ওবফে দুর্গাশংকব ও বিভু। মেয়ে ছিল—ছোটো বুচুনী, কাবজী, লিলি ও যূঁই। এদেব সঙ্গে আমাদেব বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মায়েব জন্যে। প্রথম পক্ষেব মেয়ে বুচুনীব বিয়ে হয় আমাদেবই হাজবা বোডেব বাড়িতে মায়েব আনুকূল্যে। কমলেব সঙ্গে আমাদেব যাওয়া আসা এখনো আছে। খুব স্নেহপ্রবণ ছেলে কমল। এখনো সর্বদা আমাদের খোঁজ-খবব নেন। কমল বেশ হাসিখুসী ছেলে। তাব বাপেব অনেক গুণ দেখি সে পেয়েছে। আমাদেব সোনামামাকে মা খুব স্নেহ কবতেন। সোনামামাও আমাদেব খুব ভালোবাসতেন। সোনামামাব গানেব গলা ছিল বেশ ভালো। তিনি আমাদেব অনেক কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি কবতে শিখিয়েছিলেন। একটা ছড়া ছিল আকাব ইকার ও যুক্ত অক্ষব বিহীন। তাঁব দুটো লাইন এখনো মনে আছে— 'খবতব বব শর হত দশ বদন খগচব নগধব ফণধব শয়ন।' সোনামামাবও মায়েব মতন অম্বলেব ব্যারাম ছিল।

হাসাড়ায় পৌঁছবাব প্রথম দিনই পবিচয় হল আব দুটি লোকেব সঙ্গে। প্রথম জনেব নাম নিশিকান্ত চক্রবর্তী। তিনি মামাবাড়িব পুবোহিত-বংশেব সন্তান এবং মামাবাড়ির দেওয়ানজীও ছিলেন। বেশ মোটাসোটা চেহাবা, গলায় ছোটো ছোটো রুদ্রাক্ষেব বেশ লম্বা মালা। পবিষ্কাব যজ্ঞোপবীত বাম কাঁধ থেকে বুকেব উপব দিয়ে ডান হাতেব তলা দিয়ে সমস্ত দেহটাকে বেঁধে বেখেছে। আমাকে দেখেই হেসে বললেন—'কি, যদু, আইছ?' মাব মুখের দিকে তাকাতেই মা বুঝিয়ে দিলেন যে তেলিরবাগেব দাশেরা যদুনন্দনের সন্তান কি-না তাই সেই ডাক। নিশিমামা আমাকে বরাবরই আদব করে ডাকতেন 'যদু'। অপর জন ছিলেন

মতিলাল চক্রবর্তী। অতি মৃদুভাষী সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শ্যামাদাদার গৃহশিক্ষক। তিনি তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের মামাবাড়িতেই থাকতেন ও স্বপাক খেতেন। তিনি হাসাড়া স্কুলেও মাস্টারি করতেন। হাসাড়া গ্রামের হাইস্কুলটি স্থাপন করেছিলেন আমাদের বড়ো দাদামশায় কালীকিশোর। তাঁর নিজ অর্থ ব্যয়েই স্কুলটি চলত। সেই দাদামশায়ের নামেই স্কুলের নামকরণ হয়েছিল। বেশ উঁচু ডাঙা জমির উপরে বড়ো বড়ো কলা-গাছ-ঘেরা পুকুরের এক দিকের পারে বেশ সুন্দর স্কুলঘরগুলি এখনো মনে আছে। তখন হেডমাস্টারমশায় ছিলেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী। আমার মায়ের অনুরোধে আমরা যে সময়টা হাসাড়ায় থাকব সেই সময়টার জন্যে হেড-মাস্টারমশায় আমাকে হাসাড়ার কালীকিশোর হাই স্কুলে ভর্তি করে নিলেন। বাড়িতে শ্যামাদাদার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মতিবাবুর কাছে পড়ার ব্যবস্থা হল। সেই স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার সময় আমি নাকি ভালোই পাস হয়ে-ছিলাম। শোনা কথা মাত্র।

সেইবারেই শ্যামাদাদার সঙ্গে আমার যে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হল সেই আলাপই আমাদের বজায় ছিল শ্যামাদাদার মৃত্যু পর্যন্ত। মামাবাড়িতে গোসাপের যে প্রাচুর্য দেখেছি সেবার তা আর কোথাও কখনো দেখি নি। আমাদের তেলিরবাগ গ্রামে বড়ো-একটা গোসাপ দেখি নি। গোসাপ দেখতে ঠিক একটা প্রমাণ সাইজ মেছো কুমিরের মতো। খালি জিভটা তার সাপের জিভের মতো দুই ভাগে চেরা। শুনেছি এখন নাকি গোসাপ তেমন আর নেই, কেননা সেগুলির চামড়ার দাম বেশি হওয়ায় সেগুলিকে মেরে মেরে একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে চামড়ার ব্যবসায়ীরা। শ্যামাদাদা অব্যর্থ লক্ষ্যে গোসাপের গায়ে ঢিল ছুঁড়তে পারতেন। দুজনে একসঙ্গে বসতাম বৈঠকখানা ঘরে মতিবাবুর তক্তপোষে পড়া শেখবার জন্যে। কিন্তু সে নাম-মাত্র পড়া। মতিবাবু শ্যামাদাদাকে তেমন শাসন করতে পারতেন না। পারলে তা যে শ্যামাদাদার পক্ষে কল্যাণেরই কারণ হত তা পরে বুঝেছি। বড়োলোকের বড়ো নাতি বলে শ্যামাদাদা একটু আদুরেই ছিলেন এবং তাঁর ভাগ্যে বকাবকিটা বোধ হয় যথেষ্ট হয় নি। ফল হল শ্যামাদাদা এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। তিনি পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় মামাদের বাসায় থেকে মোজা-গেঞ্জির কারখানায় কলে মোজা-গেঞ্জি তৈরি করতে শিখেছিলেন। তার পর কলকাতায় ঘড়ির দোকানে ঘড়ি

মেবামতেব কাজও কিছুদিন শিক্ষা কবেছিলেন। তাঁব হাত খুব ঘামত। সেই-জন্যে হাতেব কাজ কববাব অসুবিধে হত বলে মোজা গেঞ্জি তৈরির ও ঘড়ি মেরামতেব কাজ বেশিদিন করলেন না। আসল কথা হল এই যে, শ্যামাদাদা কোনো কাজে লেগে পড়ে থাকতে পাবতেন না। অধ্যবসায়েব বেশ অভাবই ছিল। মাঝে মেজোমামাদেব কন্‌ট্রাকটারী কাজে মিস্ত্রিদেব কাজেব তত্ত্বাবধানও কবেছেন কিছুদিন। শ্যামাদাদাব কৃতিত্ব ছিল বহুমুখী। শ্যামাদাদা ছিলেন গুলাইল ছুঁড়তে অদ্বিতীয়। ঝোপে ঝাড়ে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া গোসাপগুলিব দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঢিল ছুঁড়তে শ্যামাদাদাব মতো কাউকে দেখি নি। বাঁশি বাজাতে পাবতেন চমৎকাব। তাব পব কলে মোজা গেঞ্জি তৈবি কবা এবং এক চোখে একটা চোঙা দিযে ঘড়ি মেবামতেব কাজ— একাধাবে এত গুণেব সমাবেশ বড়ো একটা সহজ ব্যাপাব নয়। সেই শিশুবয়স থেকেই আমি শ্যামাদাদাব যে ছায়াব মতন হয়ে গেলাম, সে মোহ আমাব চলেছিল বহুকাল। শ্যামাদাদাও হাতেব কাছে একটা ভক্ত চেলা পেয়ে বেশ প্রসন্ন হয়ে পড়লেন আমাব উপব। আমাব প্রতি এই স্নেহাসক্তি শ্যামাদাদাব ছিল মৃত্যু পর্যন্ত।

এইখানে একটা ঘটনা বলে বাখি যদিও তা ঘটেছিল অনেক পবে। শ্যামা-দাদাব বিয়ে স্পষ্ট মনে আছে। আমি যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় মিত্র ইন্সটিটিউসনে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি সেই সময় একই সঙ্গে সোনামামা ও শ্যামাদাদার বিয়ে হয় ঢাকায়। মামাবা তখন ঢাকায় থাকতেন। চওড়া নবাব-পুবেব বড়ো বাস্তাটা যেখানে বেল-লাইন পেরিয়ে পলটনেব মাঠেব পাশ দিয়ে বমনায় চলে গেছে সেই বেল-লাইনেব লেভেল ক্রসিংয়ে পৌঁছবাব খানিকটা আগে নবাবপুব থেকে ডাইনে একটা গলি বেবিয়েছিল সেই গলির একটা বাড়িতে। বাস্তাটাব নাম মনে নেই। শ্যামাদাদাব সঙ্গে যাঁব বিয়ে হল সে মেয়েটি আমাবই বয়সী কিংবা হয়তো একটু ছোটোও হতে পাবেন। নামটি তাঁব মনোবমা। সার্থক বাখা হয়েছিল সে নাম, কেননা আমাদের সে বৌঠানটি সত্যিই মনোবমা ছিলেন এবং আজও আছেন। চমৎকার ফরসা তাঁব গায়েব বঙ, পাতলা ছিপছিপে তাঁব গড়ন। চোখ-দুটিতে কেমন কোমল একটি চাহনি ছিল যা মনকে স্নিগ্ধ কবে দিত। আমাব বেশ মনে আছে এবং এখন ভাবলেও হাসি পায় যে শ্যামাদাদার বিয়েব সময় আমি এই বৌঠানটিকে উপহার দিযেছিলাম, একখানা 'ঠাক'মার ঝুলি'। ঐটুকু মেয়েকে আর কি

বই-ই বা দেওয়া যায়। সেই যে বছর বারো বয়সে হাসাড়ার সেন-পরিবারে এই কন্যাটি এলেন সেই থেকে তিনি তাঁর শ্বশুবকুলের সেবা কবেই চলেছেন মুখ গুঁজে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। কষ্টও পেয়েছেন ঢেব। বড়ো ছেলেটি অকালে চলে গেল। টানাটানির সংসাবের সকল কর্তব্য পালন কবে চলেছেন এই নম্র-মধুব-স্বভাবা সাধ্বী বমণী, আমাদেব বৌঠান মনোবমা।

সেবাব যখন মামাবাড়ি গিয়েছিলাম মায়েব সঙ্গে এবং বেশ কিছুদিন ছিলাম তখনকাব দুটি পূজাব কথা আমাব মনে আছে। একদিন শ্যামাদাদা বললেন, 'খোকা, চল'। আমি তো এক পায়ে খাড়া। গেলাম দাদাব সঙ্গে অনেক দূবে গ্রামেব বসতি অঞ্চলের বাইবে বনেব ধারে। বেশ চমৎকাব জ্যোৎস্না রাত। দূব থেকে আলো দেখতে পেয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'ঐখানে কি হৈতেছে।' শ্যামাদাদা বললে, 'দেখবি অখন'। কাছে গিয়ে দেখি একটা বড়ো ধবণেব পূজামণ্ডপ। দাদা ফিসফিস কবে বললেন, 'বন-দুর্গাপূজা'। প্রতিমাখানা প্রকাণ্ড। দুর্গা প্রতিমাবই ধবণেব। কিন্তু যেমন বীভৎস চেহাবা বনদুর্গাব তেমনই বিশ্রি চেহাবা তাঁব চাবটি ছেলেমেয়েব। তাদেব নাম শুনেই আঁৎকে উঠতে হয়। একটি ছেলেব নাম গাবুবদলন। অর্থাৎ তিনি জলে কাদায় হামা দিয়ে বেড়ান। লাল চোখ, যেন কাউকে ধরতে পারলে তাব আব বক্ষা নেই। অন্য ছেলেটিব নাম মোছড়াসিং। মেয়ে দুটিব চেহাবা এমন হিংস্র যে দেখলেই ভয় কবে। একটি মেয়েব নাম দানো চ্যাঁচানি অর্থাৎ সবস্বতীব counter part। অন্যটির নাম ভুলে গেছি। বাজনাও বাজছিল ভীষণ জোরে। অর্থাৎ যেমন বীভৎস দেবতা তেমনি ভয়াবহ সমস্ত পবিবেশটি। আমি সেদিন বাড়ি ফিবে এসে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। প্রতিমা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। এবই কিছু কাল পরে শ্যামাদাদা বললেন, 'খোকা, আয়।' ঘুটঘুটে অন্ধকাব রাত্রি অনেকটা পথ চলে নির্জন পোড়ো একটা জায়গায় দেখলাম লোকসমাগম হয়েছে। শ্যামাদাদা বললেন, 'শ্মশানকালী'। এতবড়ো উঁচু প্রতিমা আমি জীবনে কখনো এ পর্যন্ত দেখি নি। কালীমূর্তিব মাথাব মুকুট যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। জিভ লকলক, সংহাব মূর্তি। এর মধ্যে ভাব যাই থাক ভয়ে আমার গা শিউরে উঠেছিল। এর পবে আব কখনো বনদুর্গা-পূজা কিংবা শ্মশানকালীর পূজা দেখি নি।

এবই কিছুদিন পরে শোনা গেল আমাদের ধন-দাদামশায়ের বিয়ে। ধন-

দাদামহাশয়ের প্রথমা পত্নীকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর মেয়ে কুমুদিনী মাসীমা মায়েব চেয়ে একটু বড়োই হবেন। তবে ধন-দাদামশায়ের আবার বিয়ে কেন? শ্যামাদাদা বিষয়টা জলের মতন বুঝিয়ে দিলেন। ধন-দাদামশায়েব ছেলে নেই। ছেলে না থাকলে মবলে কে জল দেবে? সেজন্যে তিনি আমাদের ছোটোমামা যতীনকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। সেই ছেলের বিয়েও হয়েছিল। সবাই ভাবল যে ধন-দাদামশায়ের বংশটা বক্ষা পেল। ভগবান আড়ালে বোধ হয় হেসেছিলেন। সেই পোষ্যপুত্র একটি বাল-বিধবা পত্নী বেখে অপুত্রক অবস্থায় মাবা গেলেন। আমাদের সেই ছোটো মামীর সাবাটা জীবন অন্ধকাব হয়ে গেল। ধন-দাদামশায়কে গ্রামেব মাতব্বরেরা পবামর্শ দিলেন আবাব দার পবিগ্রহ করে সংসাবী হতে। সেই পবামর্শমতে পুন্নামকনবক থেকে পবিত্রাণেব আশায় ধন-দাদামশায় আবাব বিয়ে করতে বাজি হলেন। মেয়ে দেখা হল এবং দিনক্ষণও ধার্য হল। ধন-দাদামশায়ের বয়স অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে বব সেজে শ্বশুববাড়ি গিয়ে বিয়ে কবাটাতে বোধ হয় একটু কিন্তু-কিন্তু লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে মেয়েটিকে তাঁব বাপেব বাড়ি থেকে আনিয়ে হাসাড়াব বাড়িতেই তার বিয়ে হবে। আমবা ছোটোবা বাড়িতে বিয়েব আয়োজন দেখে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। দিন গুণতে লাগলাম। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় ডুলিতে কবে কন্যাকে নিয়ে আসা হল। পবেব দিন অর্থাৎ বাংলা ১৩০৭ সালেব ফাল্গুন মাসেব এক পূত লগ্নে ধন-দাদামশায়েব বিয়ে হল সুধাংশু-বালাব সঙ্গে। ধন-দাদামশায়েঁব বোধ হয় বয়স হয়েছে পঞ্চাশোর্ধ্বে এবং তাঁব নববধূব বয়স বিশেব কোঠায় পৌঁছয় নি। আমাব বয়স তখন পুবা ছয় বছব পাঁচ মাস, খুকীব প্রায় পাঁচ এবং গুগুব হবে বছব খানেক। আমাব মনে নেই, তবে শুনেছি যে আমাকে নাকি ধন-দাদামশায়েব পাশে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল নিতবরের মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে। একটা জিনিস একটু একটু মনে আছে। বিয়েব রীতি-অনুসারে বিবাহেব সভায় রুপার যে থালাখানায় চন্দন ধান দূর্বা ইত্যাদি বাখা হয় সে থালাখানা সভায় উপস্থিত যিনি কুলীন-শ্রেষ্ঠ তিনিই পেয়ে থাকেন। কে যেন মনে নেই, আমাকে শিখিয়ে দিল ঐ থালাটা আমাবই প্রাপ্য। আমি খপ কবে গিয়ে সেটা দখল করে বসলাম। কাবণটা আমি তখন কিছুই বুঝি নি। সমস্বরে সভাস্থ সবাই বলে উঠলেন, 'হ তাই ত? খোকাই ত এখানে বড় কুলীন।' মৌদগোল্য গোত্রের উপরে

কোনো কুলীন নাকি সেখানে সেদিন ছিলেন না। যাই হোক, কুলীন বিদায় সংগ্রহ করে মায়ের কাছে জমা দিলাম রুপার রেকাবিটি। আমাদের যিনি ধন-দিদিমা হয়ে এলেন তাঁর রঙ আমারই মতন ময়লা। বেশ পাতলা চেহারা। চোখে-মুখে বুদ্ধির একটা প্রাণবন্ত ছাপ। এই ধন-দিদিমার সঙ্গে পরে আমার খুব রসালাপ হত। এই ধন-দিদিমার একটি ছেলে হয়েছিল। নাম তার রাখা হয়েছিল অমূল্য। বংশটা রক্ষা পেল এই আশ্বাস বুকে নিয়ে ধন-দাদামশায় কয়েক বছর পরেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন। নেপথ্যে ভগবান বোধ হয় আবার হাসলেন। ধন-দাদামশায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই সে ছেলেটি ঢাকায় কুমুদিনী মাসীমার ছেলে দ্বিজেনদাদার বাড়িতে দেয়ালে ঠেস দেওয়া প্রকাণ্ড এবং ভারি লোহার ফটকের উপরে চড়ে খেলতে খেলতে সেই ফটকটি নিয়ে সজোরে পড়ে সেই ফটকের চাপেই মারা গেলেন। ধন-দাদামশায়ের বংশ শেষ পর্যন্ত লোপই পেয়ে গেল। ভগবানের মার কে খণ্ডাতে পারে। আমাদের ধন-দিদিমার এখন বয়স হয়েছে বেশ। দেশের জমিজমা সব গেছে পাকিস্তানের হিড়িকে। দেশছাড়া, বাস্তুহারা হয়ে আমাদের স্নেহ-শীলা ধন-দিদিমা দিন গুনছেন জীবনভর দুঃখের অবসানে পরলোকে যাবার দিনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখনো সেই হাসিটুকু লেগেই আছে তাঁর মুখে। সেইটেই তাঁর নাতি-নাতনী আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ধন-দাদামশায়ের বিয়ের পরেই আমরা ফিরে গেলাম তেলিরবাগে।

৬

আবার শুরু হল তেলিরবাগের স্কুলে পড়া। নদি পণ্ডিতমশায়ের কাছে বাংলা আর কৌশিকবাবুর কাছে অঙ্ক। ছুটির দিনে চলল মধ্যের বাড়ির পুকুরে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে স্নান ও সাঁতারের হুল্লোড়। সুবিধে পেলেই গ্রামের খালে লগি ঠেলে নৌকায় বিহার এবং বেথইন ফল সংগ্রহ করে নুন দিয়ে ছড়া বলতে বলতে ঝাঁকিয়ে পাকিয়ে সকলে মিলে খাওয়া। আবার এল দুর্গাপূজা এবং বাবা এলেন নতুন পোশাক নিয়ে আমাদের ভাইবোনেদের জন্যে। আবার চলল তন্ময়চিত্তে তিন বাড়ির প্রতিমা গড়া পর্যবেক্ষণ করা। পূজার কটা দিন কেটে গেল একটা অনির্বচনীয় আনন্দ আবেশের মধ্যে। বাবা কলকাতায় ফিরে গেলেন আপন কাজে। বড়োদিনের সময় আবার এসেছিলেন কিনা মনে নেই। আবার এল বাৎসরিক পরীক্ষার দুশ্চিন্তা।

সেবারেও তরে যাওয়া গেল। তাব পর এল গ্রীষ্মেব ছুটি। খুকী আর আমি আবার গেলাম মামাবাড়ি হাসাড়ায়। ছুটির খানিকটা অংশ কাটতে না কাটতেই খবর এল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেব শ্রাবণ মাসে আগের দিন দুপুর রাত্রে আমাদেব একটি ভাই হয়েছে। আমাব আব তব সয় না। খুকীব গোছানো যেন শেষই হয় না। প্রায় তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হল। আবাব আমরা কৈলাস সিং মাউসাব সঙ্গে বিদ্গাঁও হয়ে তেলিববাগে ফিবে এলাম। গভীব বাত্রি হয়েছিল বলে সে ভাইয়েব নাম হয়েছিল নিশীথবঞ্জন, ডাকনাম নসু। আমবা যখন তেলিববাগে পৌঁছলাম নসু তখন তিনদিনেব ছেলে। আমাদের ভাইবোনেদেব মধ্যে এক নসুই জন্মেছে তেলিরবাগ গ্রামে। যথাবীতি তাব আটকৌড়ে হল। আমবা মুড়ি, চিনিব ও গুড়েব বাতাসা, মঠ ও কদমা খেলাম হুল্লোড় কবে।

ইংবেজী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেব মাঝামাঝি নসু একটু শক্ত হয়ে উঠলে বাবা আমাদেব সবাইকে কলকাতায় ফিবিয়ে নিযে গেলেন। কলকাতায় ভবানীপুবে আমাকে সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি কবে দেওয়া হল। সেখানে আমি পড়েছিলাম বছব খানেক কি তাবও একটু বেশি। আস্তে আস্তে নূতন পবিবেশে এবং শহবেব উত্তেজনাময় আবহাওয়ায় আমাব মনটা খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠল, অন্তত সাময়িক ভাবে।

সেই শিশুবযসে আমাব গ্রামীণ জীবনযাত্রা খুব সহজ, সবল ও সুন্দব ছিল। জ্ঞাতি সম্পর্কে ও পাতানো সম্পর্কে জ্যেঠিমা কি খুড়িমাদেব কাছে চিঁড়েব মোয়াটা, বাতাসা ও কদমাটাও পাওয়া যেত। ক্লাস যখন ছুটি তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গ্রামেব অলিতে-গলিতে অবাধে ঘুবে বেড়ানো যে কী অপূর্ব আনন্দময় পবিবেশ সৃষ্টি কবে তা বর্ণনা কবা সহজ নয়। তার পব দুপুবে পুকুবে হুড়ো-হুড়ি কবে সাঁতাব দেওয়া, চিৎ হয়ে অথবা জলের ভিতব ডুবে। আগেই বলেছি আমাদেব পশ্চিমেব বাড়িব পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে যে খালটি আমাদেব গ্রামটিকে বেষ্টন কবে বয়ে গেছে তাবই এ পাবে দুটা প্রকাণ্ড তালগাছ ছিল। খালেব ওপাবে ছিল খেলার মাঠ। শীতকালে সেই খাল যেত শুকিয়ে। খেলার মাঠে যেতে হত ঐ দুটো তালগাছেব পাশ ববাবব। এক দৌড়ে শুকনো খালটাব বুকের উপব দিয়ে ওপাবে ঠেলে ওঠাব আনন্দ এখনো স্মরণে আছে। সেই তালগাছ দুটা আমাব মনেব মধ্যে এমন একটা মায়া সৃষ্টি করেছিল যা আজ পর্যন্ত গেল না। জানি না ছোটোবয়সে শিশুপাঠ্য ছড়াব বইখানা আমি

প্রথম তেলিরবাগে বসে পড়েছিলাম কিনা। কিন্তু ঐ দুটো তালগাছের সঙ্গে একজোড়া একানড়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা কেমন করে যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আমার মনে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার ছোটো ছোটো নাতি-নাতনীরা যখন দুলে দুলে সুর করে পড়ে, 'এক যে ছিল একানড়ে সে থাকে তালগাছে চড়ে'— আমার মানসনেত্রে ফুটে ওঠে আমাদের তেলিববাগ গ্রামে পশ্চিমের বাড়ির পশ্চিম দিকের খালপারে সেই দুটো তালগাছ যার মাথায় চড়ে বসে আছে আমার শিশুমনের কল্পনার একানড়ে দম্পতি।

এই ছোট্ট তেলিববাগ গ্রামই ছিল আমার পিতৃ-পিতামহের ভদ্রাসন বাড়ি। তারই সঙ্গে সংলগ্ন ছিল একটি পুকুর ও কয় বিঘা মাত্র জমি। পশ্চিমের খালপারে ছিল দুটি উঁচু তালগাছ। এই গ্রামের শান্ত পরিবেশে কেটেছে আমার শৈশবের কটা বছর আত্মীয় ও অনাত্মীয় গ্রামবাসীদের আদরে সোহাগে। কিন্তু হায়, আমার শৈশবের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, লতাগুল্ম সুশোভিত নয়নাভিরাম, ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় সেই ছোট্ট গ্রামখানি আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সর্বগ্রাসী কীর্তিনাশা পদ্মার অতল জলে। জীবনের এই অন্তিম সময়ে মনে পড়ে সেই ছোট্ট তেলিববাগ গ্রামখানি ও তার পশ্চিমপ্রান্তে আমার সেই পৈতৃক ভদ্রাসন পশ্চিমের বাড়ির চারিটি ভিটা ও তৎ-সংলগ্ন বিঘা কতক জমি এবং পশ্চিমের খালপারের অতন্দ্র প্রহরীর মতো উঁচু তালগাছ দুটি। গ্রামের আকাশ বাতাস আলো মাটি ও জল শৈশবে আমার দেহকে পুষ্ট করেছে এবং আমার মনকে বিকশিত করেছে। আমার শৈশবের লীলাভূমি সেই প্রাণাধিক গ্রামটিকে আজও পারলাম না ভুলতে।

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি।
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।

০ ০ ০

সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়োবার ধুম;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!

—রবীন্দ্রনাথ

চতুর্দশ অধ্যায়

কৈশোরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে

আঠারো শো সাতান্ন সালের সিপাহীযুদ্ধের শেষে বেশ কয়েক বছর নির্জীব হয়ে থাকার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই ব্রিটিশ রাজত্বের উপর ভারতবাসীদের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ আবার মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুবিখ্যাত ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভারতীয়দের যে স্তোকবাক্য শুনিয়েছিলেন তার উপরে বহুসংখ্যক দেশবাসীর আস্থা একেবারেই চলে গিয়েছিল। তরুণের দল ক্রমশই বুঝছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে কাগজে কলমে প্রস্তাব পাস করে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। তাঁদের মনে এতটুকুও সংশয় রইল না যে উদ্ধত রাজপুরুষদের হাত থেকে ভিক্ষা চেয়ে স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল—স্বাবলম্বী হয়ে নিজের জোরে স্বাধীনতা কেড়ে ছিনিয়ে নিতে হবে। এই ভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বহু লোক জীবন পণ করে দেশ উদ্ধারের কাজে লেগে গিয়েছিলেন। কত জায়গায় কত গুপ্ত সমিতির গঠন হতে লাগল। পুণাতে ঠাকুরসাহেবের নেতৃত্বে আঠারো শো সাতানব্বই সালের কিছু আগে যে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাতে অরবিন্দ ঘোষ যোগ দিয়েছিলেন ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে। তার পূর্বেই তিনি বাংলাদেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কাজ শুরু করেছিলেন। অন্য কয়েকটি গুপ্ত সমিতিও ছিল। বহু দেশভক্ত বাঙালী যুবক সেই-সব সমিতি-ভুক্ত হলেন জীবন-মরণ পণ করে। ভিতরে ভিতরে যখন এই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তখন অন্য একদল লোক অনুভব করলেন যে দেশকে রক্ষা করতে হলে এবং সত্যিকারের প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার। সবচেয়ে আগে প্রয়োজন দেশবাসীদের সুশিক্ষা দেওয়া। তার পর কর্তব্য নিজেদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা এবং দেশবাসীর জীবিকার্জনের পথ খুলে দেওয়া। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও উৎকর্ষের দিকে দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করতে হবে। অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে স্বাদেশিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এঁরা রাজা রামমোহন রায় -প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন -অবলম্বিত পন্থা অনুসরণে

মনোনিয়োগ করলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি হল এঁদের মিলনস্থল। হিন্দুমেলা খোলা হল এবং আরো কত কী সভাসমিতির প্রকাশ্য বৈঠক চলতে লাগল। দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত লোকদের বহুজনার সমাগম হত এইসব অনুষ্ঠানে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাই, কলকাতার কলকোলাহলের বাইরে বোলপুর রেল-স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুই রাঙামাটির পথ পেরিয়ে ভুবনডাঙার ছোটো গ্রামটি ছাড়িয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন উনিশ শো এক সালের ডিসেম্বরে (৭ই পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে)। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত আলো-হাওয়া দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের শ্যামল শোভা এবং নিত্যপরিবর্তনশীল ঋতুসকলের নব নব বৈচিত্র্য শিশুমনের উপর প্রতিফলিত হয়ে উঠে তাদের কোমল হৃদয়গুলিকে প্রস্তুত করবে সার্থক বিদ্যা গ্রহণের জন্যে এবং সেই-সব শিশুদের অন্তরক্ষেত্রকে অভিসিঞ্চিত করে দেবে মহর্ষিদেবের ধ্যান দিয়ে গড়া ধর্মজীবনের অনাবিল মন্দাকিনীধারা ও আত্মনিবেদিত ভক্তজীবনের মহান আদর্শের প্রভাবে বেড়ে উঠে শিশুরা জীবনে মাধুর্য ও চরিত্রে বল লাভ করবে— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

ইংরেজ শাসনকর্তাদের মনে কিন্তু খটকা লাগল। কলকাতায় এত জায়গা থাকতে ঠাকুরবাড়ির স্বদেশীদলের অন্যতম নেতা হঠাৎ কেন বোলপুরের নির্জন মাঠের মধ্যে গিয়ে স্কুল খুলে বসলেন? ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামের অন্তরালে ইনি স্বদেশী দল তৈরি করছেন নাকি? তাঁদের চোখে ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক মনে হল। তার পর যখন উনিশ শো পাঁচ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গ হল এবং দেখতে দেখতে ধোঁওয়া থেকে দেশে আগুনও জ্বলে উঠল তখন সরকারের সেই সন্দেহদৃষ্টি স্বভাবতই রোষরক্তিম হয়ে উঠল। এর ফল এই হল যে, কোনো সরকারী কর্মচারী, কিংবা অন্য কোনো লোক যিনি সরকারের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না কিংবা চাইলেও ভয়ে পাঠাতেন না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করেছিলেন যে, বারো বছরের বেশি বয়সের ছেলেদের তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে না, কেননা বেশি বয়সের ছেলেদের মন গঠিত হয়ে যায়, তাতে তখন অন্য কোনো ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই দুই

কারণে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন ছাত্রসংখ্যা নিতান্তই কম ছিল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁরই কাছে কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়—
এসো চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং এই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষচন্দ্র—এঁদের দুজনকে এবং আর তিনটি ছেলে নিয়েই সূচনা হয়েছিল আশ্রম-বিদ্যালয়ের। এরা দুজনেই একসঙ্গে পরে আমেরিকা গিয়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা অর্জন করে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সন্তোষদা পরে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের ভার নিয়েছিলেন এবং তা বহন করেছিলেন তাঁর অকাল মৃত্যু পর্যন্ত। রথীদা শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হয়ে বহু বৎসর আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে আইন দ্বারা ঘোষিত হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য-পদে বৃত হয়েছিলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছু পরে শান্তিনিকেতনে বিদ্যার্থী-সমাগম হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের দৌহিত্র এবং স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র নয়নমোহন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কিছুকাল অধ্যয়ন করেছিলেন। ইনি পরে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যবহারজীবীর কাজ করে অল্পবয়সেই মারা যান। সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ও সমাজসংস্কারক আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দও শান্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে জর্মানিতেও শিক্ষালাভ

করেছিলেন এবং সেই থেকে বিদেশেই রয়ে গেছেন। সম্প্রতি তিনি গুরুদেবের কবিতার ইংরেজী অনুবাদের কাজে বিশেষভাবে ব্রতী আছেন। আসামের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূর্বকুমার চন্দও এক সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে অক্সফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং কালক্রমে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরে বাংলা সরকারের শিক্ষাধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। স্বনামখ্যাত জে. এন. রায়ের এক ভাইপো হিমাংশু রায় এবং এক ভাগিনেয় প্রমোদ রায় বোধ হয় এই সময়েই এসেছিলেন। হিমাংশুর ডাকনাম ছিল শুনেছি গোলাপ। তিনি পরে বোম্বাই শহরে 'বম্বে টকিজ' প্রতিষ্ঠা করে যশস্বী হয়েছিলেন। প্রমোদদাও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নাম করেছিলেন। আর কারা এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তা সঠিক স্মরণ নেই।

আমাদের পরিবারে ও ঠাকুর-পরিবারে আলাপ-পরিচয় ও আসা-যাওয়ার সম্পর্ক ছিল। আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্যবহারজীবী হলেও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সময়ে তাঁর কিছু হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। দেশবন্ধুর দ্বিতীয়া ভগিনী ছিলেন অমলা যাঁকে আমরা বড়দিদি বলে ডাকতাম। তিনি খুব উঁচু দরের গায়িকা ছিলেন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। বড়দিদি প্রথমে আমার পিতাকে বলেন যে আমাকে শান্তিনিকেতনে 'রবিকাকার স্কুলে' পাঠালে আমার দেহ মন দুয়েরই উপকার হবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি বাবা আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু প্রথমে ইতস্তত: করছিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়ম মেনে চলে আমার স্বাস্থ্য টিঁকবে কি না এই ভয়ে। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী আজীবন আমাকে স্নেহ করে আসছেন। যখন বড়দিদির প্রস্তাবে আমার বৌঠানও সম্মতি দিলেন তখন বাবার আর কোনো আপত্তি রইল না।

বড়দিদির কোনো কাজে গাফিলতি দেখি নি; যেটা ধরেছেন সেটা সম্পন্ন না করে নিশ্চিন্ত হন নি। সুতরাং অচিরেই চিঠি গেল 'রবিকাকা'র কাছে আমাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। সত্বরই রবীন্দ্রনাথের জবাব এল সন্তোষ জানিয়ে। কেননা শান্তিনিকেতনের সেকালে একটা জ্যান্ত ছেলে পাওয়া পরম পরিতোষেরই বিষয় ছিল। সেইসঙ্গে এল এক কপি ছাপা নিয়মাবলী— নিরামিষ আহার, খালি পায়ে বিহার ইত্যাদি

ইত্যাদি। নিয়মাবলীর একটা কথা খুবই মনে লেগেছিল। সেটা হচ্ছে আমাকে কী কী জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে তার একটি ফর্দ। যতদূর মনে আছে তালিকাটা ছিল এই ধরনের— কাপড় পাঁচখানা, সুতোর গেঞ্জি তিনটি, গরম গেঞ্জি একটি, পাঞ্জাবি কি শার্ট তিনটি, গামছা দুখানা, শতরঞ্চি একটি, তোষক একটি, মশারি একটি, মাথার বালিশ একটি, বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়াড় দুটি করে, লেপ কি কম্বল একটি এবং একটি পট্টবস্ত্রের জোড়। বাসনের মধ্যে— গাড়ু একটি, থালা বাটি ও গেলাস একটি করে, আর চাই কাপড় জামা রাখবার জন্যে একটা ছোটো টিনের বাক্স। এ ছাড়া একটি কাঠের বাক্সে ছুতোরের হাতিয়ার, যথা— করাত, হাতুড়ি, বাটালি, র‍্যাঁদা ও তুরপুণ। এই শেষ জিনিসগুলিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল— ভাবলাম কী মজাই না হবে।

অচিরে সব জিনিসপত্র কেনা হল এবং ঠিক হল দেশবন্ধুর ছোটো ভাই বসন্তকুমার, যাঁকে আমরা 'ভোলাদাদা' বলতাম, তিনি আমাকে সঙ্গে করে রবীন্দ্রনাথের কাছে জিম্মা করে দিয়ে আসবেন বড়োদিনের ঠিক পরে। দিন আর কাটে না। আমি যখন আমার হাতিয়ারের বাক্সটা খুলে জিনিসগুলিতে হাত বুলিয়ে খুশি হতাম তখন আমার সোনাদাদা (এক পিসতুতো ভাই) প্রায়ই আমাকে ভয় দেখাতেন, বলতেন, 'যাও-না, দেখবে কেমন মজা। কলকাতার কটন ইস্কুলের নাম শুনেছ তো? সেখানে মেরে ছেলেদের তুলোধুনো করে দেয়। সেখানেও তোমায় সামলাবে না বলে তোমাকে রবি ঠাকুরের ইস্কুলে পাঠানো হচ্ছে— রবি ঠাকুর ঠেঙিয়ে তোমাকে তক্তা বানিয়ে দেবেন। যাও-না, দেখেই এসো-না' ইত্যাদি। শান্তশিষ্ট ছেলে বলে আমার খ্যাতি কোনো দিনই ছিল না; বরঞ্চ বেপরোয়া দুর্দান্ত ছেলে বলেই অনেকে আমাকে অভিহিত করতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোনাদাদার ভয়াবহ কথা-গুলিতে মনটা যে একটুও দমে যায় নি তা বলতে পারি নে।

অবশেষে যাবার দিন এল। বাবা-মাকে প্রণাম করলাম। মা শিরে আঘ্রাণ করে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ভোলাদাদার সঙ্গে রওনা হয়ে হাওড়া স্টেশনে সকালের ডাকগাড়িতে উঠে পড়লাম। এর আগেও দু-একবার গিয়েছি রেলগাড়িতে, এমন-কি স্টীমারে চড়েও; কিন্তু মা তখন ছিলেন সঙ্গে, আর গিয়েছিলাম নিজেদের গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু এবার তো মা সঙ্গে যাচ্ছেন না এবং চলেছি কোন্ অজানা জায়গায়।

ভোলাদাদাও তো আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে যাবেন কলকাতায় ; সঙ্গে তখন তো কেউই চেনা থাকবে না। আব সোনাদাদা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়? কী হবে? এই-সব বিভীষিকাব কথা যখন মনের মধ্যে তোলপাড কবছে ঠিক সেই সময়েই হুইসিল দিয়ে বেলগাডি চলতে শুরু কবল। জানালা দিয়ে বাইবে চেয়ে বইলাম। প্রথম-প্রথম স্টেশনগুলি আসতে লাগল ঘন ঘন— লিলুয়া, বালি, বেলুড়, উত্তবপাড়া— নাম পড়তে না পডতেই স্টেশন ছাডিয়ে চলল বেলগাডি কত অজানা গ্রাম পিছনে ফেলে, আম কাঁঠাল ও কলা গাছের আডাল দিয়ে, কত ঘাট-বাঁধানো পুকুর এবং আবো কত পানায়-ঢাকা ডোবাব পাশ দিয়ে। ক্রমশ বেল-লাইন এসে পডল ফাঁকা মাঠেব মধ্যে। গাডিব গতিবেগও বেডে চলল। কত স্টেশনের নামই পডতে পাবলাম না। এখন দুই ধাবে প্রায়ই আসছে ভাঁডবাঁধা খেজুর গাছ এবং বুনো কী সব গাছ— মাঝে মাঝে দু-একটা তাল গাছ। টেলিগ্রাফ পোস্টগুলিতে যে মাইলেব সংখ্যা লেখা আছে তা-ই গুনতে লেগে গেলাম। গাডি এসে দাঁডাল 'ব্যাণ্ডেল' বলে একটা স্টেশনে। মিনিট কয়েক পবেই আবাব গাডি ছাডল। কত যে মাইল-পোস্ট গুনলাম তাব ইয়ত্তাই নেই। গাডিবও চলাব বিবাম নেই। লাইনেব দুই পাশেব গাছগুলি যেন উলটো দিকে ছুটে চলেছে আমাদেব পিছন-পানে। ও দিকে দূবে মাঠেব শেষে যে-সব গাছ দেখা যাচ্ছিল তাবা যেন আমাদেব বেলগাডিব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামনে বেস্ খেলা জুডে দিয়েছে। মনটা যেন কেমন অবশ বোধ হল, চোখের পাতা বুজে এল— কখন যে ঘুমিয়ে পডলাম টেবই পাই নি।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লাগতেই চোখ খুলে দেখি বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে গেছি। কত বকমেব লোক গিজ্‌গিজ্ করছে— কত হাঁকডাক কত ফিরিওয়ালাব। ভোলাদাদা একটা উর্দিপবা লোককে কী বললেন। সে একটু পবেই কিছু খাবাব দিয়ে গেল। জলযোগ সেবে একটু প্রাতস্থ বোধ করলাম। আবাব ছুটল বেলগাড়ি। তালিত স্টেশন পেবিয়ে খানা জংশনে একটু দাঁডিয়ে বেলগাডি ডাইনে মোড নিয়ে লুপ লাইনে ঢুকে পডল। তার পব দু-এক মিনিট কবে বনপাস, গুসকবা আব ভেদিয়ায় থামতে থামতে গাড়ি এসে দাঁডাল বোলপুব স্টেশনে। ভোলাদাদা আগেই বলেছিলেন যে গাড়ি খুব কম সময়েবই জন্যে বোলপুবে দাঁডায়। তাই ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে পড়লাম। একজন কুলি আমার ছোটো বাক্স আর শতরঞ্চি-মোড়া বিছানাটি নামাতে

না নামাতেই রেলগাড়ি ছেড়ে গেল। আমরাও কোনোমতে নেমে পড়লাম।

ভোলাদাদা এদিক ওদিক চাইছিলেন—বুঝলাম কাউকে খুঁজছেন। এমন সময় শুনলাম কে একজন 'ভোলা' 'ভোলা' বলে হাঁক দিচ্ছে। আমরা ভোলাদাদাকে ডরাই, আর কে এই লোকটা যে 'ভোলা' 'ভোলা' বলে ডাকছে? লোকটার সাহস তো কম নয়। এইরকম ভাবছি এমন সময় দেখি কৃষ্ণকায় বেঁটেখাটো কিন্তু ভীষণ জোরালো চেহারার একটি লোক আবার 'ভোলা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভোলাদাদা তাকে ইশারা করতেই সে এসে থামল এবং একগাল হেসে বলল, 'কলকাতা থেকে যে ভোলাবাবু আসছেন তাঁকে নেবার জন্যেই বাবুমশায় আমাকে পাঠিয়েছেন।' ভোলাদাদা যখন বললেন তিনিই ভোলা এবং কলকাতা থেকেই আসছেন, তখন সেই লোকটি তাঁর দিকে বেশ একবার চেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আসুন তবে।' কুলির মাথায় মাল তুলে ভোলাদাদার হাত ধরে সেই লোকটির অনুসরণ করলাম। টিকিট-বাবুর কাছে টিকিট দিয়ে আমরা স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পরে জানলাম সেই লোকটির নাম কোদো।

তখনকার দিনে বোলপুর রেল-স্টেশনটি ছিল নেহাত ছোটো। একহারা কয়েকখানা কামরাওয়ালা ছোটো একতলা পাকা বাড়ি—তার সামনে খিলেন-করা লম্বা বারান্দার পরেই আপ-গাড়ির প্ল্যাটফর্ম। কাঠের ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পেরিয়ে নামলেই ডাউন গাড়ির প্ল্যাটফর্ম এবং সেখানে সামনেটা খোলা একটা ছোটো ঘর ছিল এবং এখনো আছে, রোদ বৃষ্টি থেকে যাত্রীদের আশ্রয়স্থল। বাইরে রাস্তার উলটো দিকে ছিল একটা টিনের গুদাম। এ ছাড়া যতদূর মনে পড়ে স্টেশনে আর কিছু ছিল না। এখন যে বড়ো বিশ্রাম-কামরা এবং খাবার ঘর দেখি সেগুলি নেহাত হালে তৈরি হয়েছে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি গোটা-কয়েক গোরুর গাড়ি—কোনোটা খোলা, কোনোটা ছইওয়ালা। সেকালে না ছিল রিক্‌শা, না ছিল মোটরকার, কি বাস্। ভাবলাম ওই একটা গোরুর গাড়িতেই যেতে হবে। মনটা বেশ খুশি হল, কেননা গোরুর গাড়িতে আগে কখনো চড়ি নি। দেশে যেতে গিয়ে কেবল নৌকা চড়েছি। এমন সময় কোদো বললে যে, আমাদের নিতে সে দ্বিপুবাবুমশায়ের বয়েল গাড়ি এনেছে এবং আমাদের তাইতেই যেতে হবে। অতি অপরূপ ছিল সেই যান। দেখতে সেটি আজকালকার ছোটো এক বাসের মতো। আকারে ছোটো কিন্তু মজবুত কাঠে তৈরি—দুই দিকে

দুটি করে জানালাও রয়েছে। জানালার খড়খড়ি ওঠানো নামানো যায়। পাদানের উপর ছিল একটি পাটাতন। পাদানের উপরে এবং পাটাতনের নীচে ছোটোখাটো জিনিসপত্র রাখাও চলে। আবার পাটাতনের মাঝখানের তক্তাটা ছিল এক দিকে মজবুত কব্জা দিয়ে আটকানো। সেই পাটাতনটি তুলে ভাঁজ করে উলটো দিকে শুইয়ে দিলেই গাড়ির মাঝখানটা ফাঁক হয়ে দুদিকে দুটো বেঞ্চি হয়ে যেত এবং তাতে পা ঝুলিয়ে ঠেসাঠেসি করে জন-ছয় আরোহী বেশ যেতে পারত। আমরা সেই ভাবেই বসলাম— ভোলাদাদা আর আমি একটা বেঞ্চে এবং কোদো অন্য বেঞ্চটায়। আমার বাক্স আর বিছানা রইল পাদানের উপর বেঞ্চের নীচে। গাড়ির চালকটি ছিল একজন মুসলমান— অনুসন্ধানে জানা গেল তার নাম আফতাবুদ্দিন, লোকে তাকে 'ন' বাদ দিয়ে আফতাবুদ্দি মিঞা বলেই ডাকে। দোহারা চেহারা, হাসিখুশি, মাঝবয়সী মানুষ— গোঁফদাড়িতে একটু পাক ধরেছে মনে হল। পরনে ছিল তার একটি লুঙ্গি, গায়ে একটা জামা এবং মাথায় সাদা কাপড়ের তিনকোনা টুপি। আর তার যে দুটি বলদ তারা ছিল দেখবার মতো। এমন নিটোল সুগোল ধবধবে সাদা রঙের বলদ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাদের শিং-জোড়াও ছিল একই ধাঁচের এবং কুঁজের গড়নটিও ছিল একই রকমের। দেখলেই মনে হত যেন দুটি যমজ ভাই। যাই হোক, নতুন ধরনের বয়েল গাড়ি চেপে কোদোর তত্ত্বাবধানে আমরা রওনা দিলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে।

২

স্টেশন এলাকার বাইরে এসেই দেখি একটা রাস্তা গেছে বাঁ দিকে— শুনলাম সেটা গেছে অজয় নদীর পাড়ে ইলেমবাজার গ্রামের দিকে। পরে অনেকবার আমরা গেছি সেখানে চড়ুইভাতি করতে। আমরা চললাম সিধে উত্তর দিকে। দু ধারে মনিহারী দোকান, মুদির দোকান, পানের ও কাপড়ের দোকান। মাঝে মাঝে দু-একটা তামাকের দোকান থেকে মিষ্টি-গুড়ের সঙ্গে তামাকপাতার গন্ধ। এখনো যখনই শান্তিনিকেতনে যাই সেই মিষ্টি গন্ধ পাই— সে দোকানগুলিই আছে— সেখান থেকেই সে গন্ধ আসে, না, আমার নাকেই লেগে রয়েছে আর সেই রাস্তায় চললেই পাই সে গন্ধ— কে জানে। কোনো দোকানের সামনে ঝুলছে ডিট্‌জ্‌ লণ্ঠন, কোথাও-

বা দেখলাম কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্প। খানিকটা চলেই এলাম একটা যেন চৌমাথার কাছে। শুনলাম ডান দিকে রাস্তা গিয়েছে হাট পেরিয়ে রেল লাইনের উপরের ব্রিজ দিয়ে সিয়ানডাঙার দিকে এবং বাঁ দিকের রাস্তা গেছে সুরুলের কুঠিবাড়ির দিকে আর সোজা রাস্তাটা চলে গেছে সিউড়ি শহরের পানে। সামনেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দাতব্য-চিকিৎসালয়। কোদো বললে যে সেখানে বসেন হরিচরণ ডাক্তারবাবু; তিনিই প্রত্যহ একবার করে শান্তিনিকেতনে এসে ছেলেদের ও আশ্রমবাসীদের দেখে যান এবং দরকারমত ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। পরে দেখেছি দ্বিপুবাবুমশায় তাঁর একজন নিত্যকার রোগী ছিলেন, অর্থাৎ অসুখ হোক আর না-ই হোক একবার করে ডাক্তারবাবুকে প্রত্যহই দ্বিপুবাবুর কুশল-সংবাদ নিতে হত।

আমরা চললাম সিধে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাল মাটির রাস্তা ধরে। অল্প একটু এগিয়েই ডান দিকে পড়ল একটি ছোট্ট গির্জা। সে গির্জা এখনো রয়েছে কিন্তু এখন রাস্তার উপরে বহু বাড়ি ঘরদুয়ার হয়ে প্রায় দেখাই যায় না। বাঁ দিকে ছিল একসারি খোলার ঘর। এগুলি পেরিয়ে এসে পড়লাম একটা প্রকাণ্ড খালি মাঠের মধ্যে। ডাইনে বাঁয়ে কোনো লোকালয় নেই। ধানকলের ধূমায়িত চিম্‌নি তখনো মাথা তুলে ওঠে নি। ডান দিকে যতদূর চোখ যায় মাঠ চলে গেছে রেল লাইনের উপরকার উঁচু পাড় পর্যন্ত। বোলপুর শহর ছাড়িয়ে গেলেই ছিল একটা উঁচু ডাঙা জমি। সেই ডাঙা জমিটা ডিনামাইট ফাটিয়ে দু ভাগ করে নীচের জমিটা সমতল করে তবে লাইন বসানো হয়েছিল। লাইনের দু ধারে বেশ উঁচু পাড় হয়ে উঠল স্তূপাকার আলগা মাটি দিয়ে। সেই শিশুবয়সে এই ঢিবিগুলিকে দূর থেকে বেশ পাহাড়ের মতোই আমার মনে হয়েছিল। সেই ঢিবির উপরে একটু অন্তর অন্তর ছিল এক-একটা তাল গাছ। বাঁ দিকে মাঠ ধু ধু করছিল।

এখন যেখানে ডাকবাংলা দেখতে পাওয়া যায় তখন সেখানে কিছুই ছিল না। সেই বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়ে চলেছে লাল রাস্তা এবং তারই উপরে বেশ জোরেই চলেছে আফতাবুদ্দি মিঞার বয়েল গাড়ি। বোলপুর শহর ছাড়িয়ে প্রথম লোকালয় হল ভুবনডাঙার গ্রাম। কয়েকটি খড়ের চালা— একটি মুদির দোকান যেখানে কয়লা এবং কাঠও থাকত মজুত। এই দোকানটি এখনো আছে। গ্রামখানি ছাড়িয়েই ডান দিকে দেখলাম

একটি গোবস্থান। কয়েকটি শানবাঁধানো ইঁটের স্তূপ না-জানি কোন্ অতীতেব অজানা কোন্ নবনাবীর দেহাবশেষ সযত্নে আগলে ঐখনো দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে দেখলাম মস্ত বড়ো বাঁধ, যাব উঁচু পশ্চিম পাড়ে একসার বড়ো তালগাছ নিস্তব্ধ প্রহরীব মতো দাঁড়িয়ে বয়েছে সাবাবাত্রি-দিনমান। বাঁধেব এক পাশে বড়ো বড়ো কাশেব গাছ— তখনো ফুল বের হয় নি।

আবো একটু এগিয়ে বাঁ দিকে দেখলাম গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোটো একটি একতলা বাংলা। কোদো বললে, ওটাকে বলা হয় 'নিচুবাংলা' এবং ওটাতে থাকেন 'বড়োবাবুমশায়', অর্থাৎ ববীন্দ্রনাথেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ। পবে শুনেছি নিচুবাংলা তৈরি হয়েছিল মহর্ষিব থাকবাব জন্যে, যত দিন শান্তিনিকেতনেব দোতলা বাড়িটি না তৈবি হয়। বড়ো দোতলা বাড়িটি বাসযোগ্য হলে মহর্ষি সেখানে যান, পবে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিচুবাংলায় গিয়ে বসতি কবেন।

ডান দিকে আবাব ধূ ধূ মাঠ গেছে পূবেব দিকে বেল-লাইনেব ঢিবিব দিকে এবং উত্তব দিকে চলে গেছে তালতোড় গ্রাম পর্যন্ত। নিচুবাংলা এবং শান্তিনিকেতনেব সীমানা কোদো যা দেখাল আঙুল দিয়ে তাব মাঝখানে ছিল একটা বেশ বড়ো মাঠ— সে মাঠে কোনো গাছপালা কি বাড়িঘব ছিল না সেকালে। নিচুবাংলা থেকে শান্তিনিকেতন একটু কমবেশি সিকি মাইল হবে। সেই পথটুকু অতিক্রম কবে বাঁ দিকে দেখলাম একটি পাকা দোতলা ছোট্ট বাড়ি— পবে জানলাম তাব নাম 'দেহলি'। আবো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে দেখলাম তিনটি খুব উঁচু ঢিবি। কোদো বললে যে 'কর্তামশায়', অর্থাৎ মহর্ষিদেব, যে একটি পুকুব খুঁড়বাব চেষ্টা করেছিলেন, তাবই মাটিগুলি জমা হয়ে তিনটে ছোটো পাহাড় হয়ে গেছে। সেগুলি পেবিয়েই আমাদের বয়েল গাড়ি বাঁ দিকে মোড় ঘুবল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেব লাল বাস্তা সোজা চলে গেল গোয়ালপাড়া গ্রাম পেবিয়ে সিউড়ি শহবেব দিকে।

বাঁয়ে মোড় ফিবতেই দেখলাম আগাগোড়া লোহাব ফ্রেমে কাচবসানো একটি মন্দিব। তাবই গায়ে পুব দিকে লোহাব একটি উঁচু চূড়া। মন্দিরের ছাদ দেখলাম লাল টালিব। পবে শুনেছি এককালে নাকি ছাদটাও ছিল পুরু কাচেব। একবার ঝড়ে সে চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ; পবে টালি বসানো হয়। মন্দিরেব উত্তর দিকে মস্ত বড়ো এক ফটক। এই ফটকটা হল

শান্তিনিকেতনের উত্তরের প্রবেশদ্বার। তার দুই স্তম্ভের উপর প্রস্তরফলকে কি সব লেখা। পরে দেখেছি যে যেখানে মহর্ষিদেবের ট্রাস্ট ডীডের প্রধান শর্তগুলি খোদাই করা রয়েছে। ফটকের উপর লোহার একটা ফ্রেমে টিনের পাতে লেখা রয়েছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। বয়েল গাড়ি সেই ফটকের মধ্যে ঢুকল। রাস্তার দু ধারে একসার করে আমলকীর গাছ। সামনেই শান্তিনিকেতনের বড়ো দোতলা বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি সামনের উত্তরমুখো বারান্দায় মস্তবড়ো একটা আরামকেদারায় বসে আছেন সোনার চশমা নাকে একজন গৌরবর্ণ ভদ্রলোক। তিনি চশমার উপর দিয়ে আমাদের দিকে একবার তাকালেন। কোদো ফিসফিস করে বললে,'দ্বিপুবাবু-মশায়'। কোদোর নির্দেশ অনুসরণ করে তার পিছন পিছন আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গেলাম। সেখানে মাঝের বড়ো হল্ কামরাটা পেরিয়ে দক্ষিণের গাড়িবারান্দার উপরকার খোলা ছাতটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কোদো খুব সসম্ভ্রমে আস্তে আস্তে বললে—'বাবুমশায'। বুঝলাম ঐখানে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। ভোলাদাদা গলা-খাঁকারি দিয়ে বারান্দায় গেলেন, আমিও গেলাম তার পিছু পিছু। ভোলাদাদা গিয়েই তাঁকে প্রণাম করলেন, দেখাদেখি আমিও প্রণাম করে ফেললাম। 'আরে এসো, এসো' বলে হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি আমাদের পাশের দুটো চেয়ারে বসতে বললেন।

এইবার তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম। বুঝলাম ইনিই রবীন্দ্রনাথ এবং এঁরই ইস্কুলে আমি পড়তে এসেছি। দেখলাম বেশ লম্বা চেহারা, মাঝবয়সী লোক, ধবধবে রঙ। পরনে সাদা থানের ধুতি এবং তার উপরে সাধারণ লংক্লথের পাঞ্জাবি। ঢোলা হাতাদুটোর মধ্যে বলিষ্ঠ বাহুদুটির খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। পরে শুনেছি যে যখন তিনি পদ্মাবক্ষে নৌকাতে থাকতেন তখন দাঁড় বেয়ে বেয়ে তাঁর হাত খুব চওড়া ও জোরালো হয়েছিল। পায়ে ঠন্‌ঠনের বিদ্যাসাগরী লাল চটি। বেশ সুন্দর দাড়িগোঁফের মধ্যে একটু একটু যেন পাক ধরেছে। দাড়ি তখন শেষ বয়সের দাড়ির মতো অত লম্বা হয় নি। নাকে গোল স্প্রিং-দেওয়া চশমা, গলায় জড়ানো কালো ফিতের সঙ্গে বাঁধা। সোনাদাদা যে ঠ্যাঙাড়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে একেবারেই মিলল না' প্রশান্ত মুখের চেহারা দেখে এবং গলার আওয়াজ শুনে কেমন যেন ভালো লাগল। শ্রদ্ধা ভক্তি সম্ভ্রমে মনটা ভরে গেল। তখন ঠিক বুঝি

নি, বড়ো হয়ে যে গান শুনেছি ‘হেরিলে হবে জ্ঞানমন প্রাণ পড়ে পদতলে’— সেইরকম একটা ভাব অস্পষ্টরকমে এসেছিল মনে। নানা কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসার পর বোধ হয় কিছু জলযোগও হয়েছিল। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ডাকলেন— ‘উমাচরণ।’ একটি ছোটোখাটো লোক এসে দাঁড়ালে তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, ‘নীচে আপিসঘরে রাজেন্দ্রবাবুর কাছে এই দাদাবাবুকে নিয়ে যাও।’ আমার রবীন্দ্র-পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ করে সেই লোকটির সঙ্গে আমি নীচে চললাম। ভোলাদাদা বোধ হয় সেইদিন রাত্রেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন।

দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একতলার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা মাঝারি আকারের ঘরে গেলাম। দেখলাম মাটিতে ফরাশের উপর একটি ডেস্কের সামনে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বুঝলাম ইনিই রাজেন্দ্রবাবু। রঙ বেশ ফরসা, মুখে ঘন কালো গোঁফদাড়ি। তিনি উমাচরণের কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে পড়ে আমার দিকে একবার তাকালেন এবং ডেস্কের ডালাটি তুলে একখানা বাঁধানো বই বের করে কী সব লিখলেন। বুঝলাম যে আমাকে তিনি ভর্তি করে নিলেন। পরে অন্য একজন কাকে বললেন, ‘একে ভূপেনবাবুর কাছে দিয়ে এসো।’ পরে জানলাম ছেলেদের বাড়ি থেকে যে টাকাপয়সা আসত সব রাজেনবাবুর কাছেই জমা হত। প্রতি বুধবার তাঁর কাছে গিয়ে খাতা পেনসিল কালী কলম নিব সাবান ও বাড়িতে চিঠি লিখবার পোস্টকার্ড চেয়ে আনতে হত। তিনি প্রত্যেকের হিসেবে খরচ লিখে সে-সব জিনিস সরবরাহ করতেন।* সব সময়ে চাইলেই জিনিস পাওয়া যেত না। ‘গেল সপ্তাহে যে কালী দিলুম, তা কী করে ফুরোল’, ‘পেনসিল কেন হারাল’— সেই-সবের কৈফিয়ত দিতে হত। মাস্টারমশায়কে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তিনি ছিলেন সেকালের কোষাধ্যক্ষ— একালের ছোটোখাটো অর্থসচিব আর-কি।

আমার বাক্স আর বিছানা তুলে নিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে খড়ের চালওয়ালা একটা ঘরের পাশ দিয়ে মস্ত একটা ইঁদারার গা ঘেঁষে সেই লোকটি আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল লাল টালির দোচালা এক ঘরের সামনে। ওইটে শুনলাম ছেলেদের থাকবার এবং শোবার ঘর। ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন একটু বেঁটে কিন্তু বেশ গোলগাল উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একজন ভদ্রলোক খালি গায়ে গলায় যজ্ঞোপবীত ঝুলিয়ে। বুঝলাম ইনিই

ভূপেনবাবু। ইনিই ছেলেদের তত্ত্বাবধান করতেন। ছেলেদের ইনি কত যে স্নেহ কবতেন তা পরে দেখেছি। আমিও সে স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তিনি আমাকে 'এসো বাবা' বলে হাত ধবে নিয়ে গেলেন। দেখলাম দক্ষিণেব দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি পাতা রয়েছে কয়েকটা তক্তপোশ। তখনো সব ছেলেবা ফেবেন নি, সেইজন্যে কয়েকটা তক্তপোশ খালিই ছিল। তাবই একটা দেখিয়ে বললেন, 'এইটে তোমাব, বিছানাটা খুলে ফেলে পেতে নাও। বাক্সটা তক্তপোশেব নীচেই বাখো।' তাব পব যে-সব ছেলেরা বিদ্যালয় খোলাব দু-একদিন আগেই এসে পডেছিলেন তাঁদেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিলেন। তাঁবা খুব উৎসুক হয়ে, আমি কোথা থেকে আসছি, কাদের বাডিব ছেলে ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। তাঁদের খববও আমাব কতকটা জানা হয়ে গেল। সন্ধ্যাটা ছেলেদেব সঙ্গে গল্পগুজব কবে কাটালাম। ছেলেবা সবাই ববীন্দ্রনাথেব কথা বলতে হলে তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন। আমিও সেইদিন থেকেই তাঁকে গুরুদেব বলে আসছি। বাত্তিবে ছেলেদের সঙ্গে খেয়ে এসে শুয়ে পডলাম। ট্রেনে আসাব দরুন শবীরটা ক্লান্তই ছিল। তবু ঘুম আসে না। মনে পডছিল মায়েব মুখ, বাবা ও ভাইবোনদেব কথা। পবে কখন ঘুমিয়ে পডেছিলাম। মায়েব কোল ছেডে এসে পডলাম আশ্রম-জননীব কোলে। বয়স তখন আমাব নয় থেকে দশেব মধ্যে।

৩

আমি যেদিন আশ্রমে পৌঁছলাম তাব পব দিন ছিল বুধবাব, আশ্রমেব সাপ্তাহিক ছুটিব দিন। তাব পবদিনই বিদ্যালয় খুলবাব কথা। সকালবেলাব জলযোগ সেবে সাবা শান্তিনিকেতনটা ঘুবে দেখে এলাম। আশ্রমেব এলাকাটি আয়তনে চতুষ্কোণ— বিশ-বাইশ বিঘা জমি হবে। তখনকাব দিনেব শান্তিনিকেতনেব চাব দিকে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তব। আশ্রম-এলাকাব দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছিল সবুজ ধানক্ষেত এবং উত্তবে ছিল লাল কাঁকবেব খোয়াই। ভুবনডাঙাব গ্রাম-ছাড়ানো বাঙামাটিব পথ বেয়ে এলে প্রথমেই দেখা যেত নিচুবাংলা যেখানে থাকতেন গুরুদেবেব বডদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, আব একটু এগিয়ে যেতেই দেখা যেত দেহলি— এ কথা আগেই বলেছি। দেহলিতে গুরুদেব অনেকদিন ছিলেন। উত্তব-পুব কোনায় একটি পুকুব কাটা হয়েছিল কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া সেখানে জল থাকত না। মাটি স্তূপীকৃত হয়ে তিনটে

ছোটো পাহাড়েব মতো হয়ে গিয়েছিল; তারই বড়োটার উপরে পুবমুখো একটি উপাসনা-বেদী ছিল মহর্ষিদেবের প্রভাতের উপাসনার জন্যে। ওই পুকুবের পশ্চিম পাডেই ছিল কাচেব মন্দিব, যার কথাও আগে বলেছি। মন্দিরেব দক্ষিণে ছিল দোতলা বাড়ি যেখানে গুরুদেবকে প্রথম দেখি। উত্তব-পশ্চিমে গোটা দুই-তিন ছাতিম গাছ ছিল। তাবই নীচে ছিল মহর্ষিদেবের সান্ধ্য উপাসনাব বেদী। একটি পাথব দিয়ে বাঁধানো বড়ো চাতালের উপব একটু উঁচু কবা মর্মব বেদী—বেদীব পিছনে দাঁড কবানো ছিল বেদীব মাপে একটি প্রস্তবফলক। তারই উপবেব দিকটায় লেখা ছিল 'তিনি আমাব প্রাণেব আবাম, মনেব আনন্দ, আত্মাব শান্তি'। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল বেশ বড়ো টিনেব বান্নাবাড়ি। খাওয়াদাওয়া হত সেখানে। দক্ষিণমুখো ছিল ছোটো একটি একতলা বাডি। তাতে ছিল তিনটি কামবা—একটিতে লাইব্রেবি, একটিতে বিজ্ঞানাগার এবং একটি ছিল অতিথিব জন্যে। তাবই পুবের দিকে উত্তব-দক্ষিণে টানা বাবান্দাযুক্ত টালির দোচালা ঘব যেখানে আমবা থাকতাম। পবে সে ঘবে আব কেউ থাকত না, তাকে বেখে দেওয়া হয়েছিল পুবানো দিনেব নিদর্শন হিসাবে 'প্রাক্কুটিব' নাম দিযে। সম্প্রতি সেটি জীর্ণ হয়ে পড়ায় তাকে ভেঙে পাকা ছাদওয়ালা লম্বা ঘব বানানো হয়েছে। বড়ো ইঁদাবাটাব উত্তবে ছিল একটি খডেব ঘব যেখানে দু-একজন মাস্টাবমশায় থাকতেন। আব দু-একটি চালাঘব ছাডা শান্তিনিকেতনে তখন আর কোনো বাডিঘব ছিল না।

বড়ো দোতলা বাডিব দক্ষিণে শিউলি গাছেব বীথি চলে গিয়েছিল দক্ষিণের ফটক পর্যন্ত। এই ফটকেব দুই ধারেব স্তম্ভেব গাযে মার্বেল পাথবে খোদাই করে লেখা ছিল মহর্ষিদেবেব ধর্মমতের কতকগুলি সাবমর্মকথা। ফটকের উপরে ছিল বৃত্তাকারে একটি মাধবী ফুলের লতানে গাছ যাব নীচে বসত অঙ্কেব ক্লাস। তাবই পুবে ছিল আম্রকুঞ্জ যেখানে এখনো প্রতি বৎসব বসে বিশ্বভাবতীব সমাবর্তন-সভা। একসাব শালগাছ ছিল আশ্রমের দক্ষিণ সীমানা—তারই গায়ে ছিল লাল কাঁকরের বাস্তা 'দেহলি' থেকে লাইব্রেরি-বাড়ি পর্যন্ত। ঘববাডিতে তখন আশ্রমবাসীদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হত না। যে দিকেই চোখ ফেবাতাম চোখ জুডিয়ে যেত। ভোবের বেলা পুবের দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যেত সূর্যোদয়ের সোনালি শোভা মাঠের

ওপারের রেল-লাইনের উঁচু ঢিবির উপরকার তালগাছের ফাঁক দিয়ে। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পশ্চিম দিগন্তে অস্তমান রক্তিম গোলকের গায়ে গৃহাভিমুখী রাখাল ও তার গোরুগুলিব চলন্ত কালো ছায়াছবি। অপূর্ব সে-সকল দৃশ্য মানসপটে এঁকে রেখে গেছে আশ্রমজননীর ক্ষমাসুন্দর স্নেহাবনত মুখচ্ছবি।

আমি যখন প্রথম আশ্রমে আসি তখন মোহিতবাবু— মোহিতচন্দ্র সেন— ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। বেশ মোটাসোটা শ্যামবর্ণ ছিল তাঁব চেহাবা। গুরুদেবের তেবো শো দশ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' তিনিই সম্পাদন কবেছিলেন। যতদূব শুনেছি, তিনি সিটি কলেজেব বেশি মাইনেব কাজ ছেড়ে শান্তি-নিকেতনে এসেছিলেন গুরুদেবেব আদর্শের আকর্ষণে। আমার যাওয়ার কিছুদিন পূর্বেই সতীশচন্দ্র বায় মাবা যান— তাঁব কাছে পডবার সৌভাগ্য আমাব হয় নি। সতীশবাবু অতি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ কবেন, কিন্তু ওই স্বল্পপবিসব জীবনেই তিনি যে প্রতিভাব পবিচয় দিয়ে গেছেন তার কথা গুরুদেবেব মুখে অনেকবাব শুনেছি। তাঁবই সমবয়সী ছিলেন বোধ হয় অজিতবাবু— অজিতকুমাব চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুবাগী এবং বিশেষ কবে ববীন্দ্রসাহিত্যে মশগুল। বডো হযে পডেছি অজিতবাবুব লেখা। সে সময় সাময়িক পত্রে গুরুদেবকে লক্ষ্য কবে যে-সব অসংগত সমালোচনা বের হত, তাব পালটা জবাব দিতেন অজিতবাবু ক্ষুবধাব ভাষায়। সে সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গল্পলেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই আসতেন আশ্রমে এবং অজিতবাবুকে মদৎ দিতেন।

হরিবাবু এবং জগদানন্দবাবু দুজনেই ঠাকুববাবুদেব জমিদাবি সেবেস্তায় কাজ কবতেন আশ্রমে আসবাব আগে। আগেব দিনেব অভ্যাসমত এঁরা দুজনেই গুরুদেবকে বলতেন 'বাবুমশায়'। হবিবাবু ছিলেন গৌববর্ণ মার্জিতদেহ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি আমাদেব সংস্কৃত পড়াতেন। গুরুদেবের নির্দেশমত তিনি ছেলেদেব জন্যে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' লিখেছিলেন। তাঁব জীবনের প্রধান একটি কাজ ছিল বাংলা অভিধান সংকলন। আজও মনে পড়ে, দিনেব কাজ শেষ কবে সান্ধ্যাহ্নিক সেবে লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে কুয়োব ধারে খডেব চালাঘবেব পশ্চিমেব জানালার কাছে বেখে হরিবাবু তাঁর বাংলা অভিধানেব জন্যে শব্দ সংগ্রহ কবে পাণ্ডুলিপি লিখছেন। সে কাজের বিরাম ছিল না, শেষ ছিল না। মাসের পর মাস,

বছরের পর বছর কেটেছে অভিধানের কাজে। গুরুদেবের উৎসাহের উদ্দীপনায় কাজ করে গিয়েছেন হরিবাবু অক্লান্তভাবে। যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন আমার দশ বছর বয়সে, তার সম্পূর্ণ রূপ তিনি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন আমার পঞ্চাশ বছর বয়সে। সেই পরিশ্রমের এবং অধ্যবসায়ের পুরস্কার এবং সেই নিষ্ঠার মর্যাদা ও গৌরব তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই পেয়ে গিয়েছেন তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানের দেশব্যাপী প্রশংসায়।

জগদানন্দবাবু ছিলেন কৃষ্ণকায়। আশ্রমের দক্ষিণ গেটের বাইরে একটি খড়ে ঘরের তিনি থাকতেন তাঁর ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে। সন্ধ্যার দিকে তিনি একটু বেড়াতেন মাঠে মাঠে খালি গায়ে। কাপড়খানা কোঁচা না করে সেটিকে লম্বা করে গলা জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পায়ের চটি থেকে গোড়ালির সিকি অংশ বেরিয়েই থাকত এবং সেইজন্যে চটিজুতোর সামনেটা শুকিয়ে উপরের দিকে গুটিয়ে বেঁকে উঠত। মুখে থাকত কালো রঙের বর্মা চুরুট। চলনসই সুন্দর বেহালা বাজাতেন জগদানন্দবাবু— তবে সে বাজানো মামুলি প্রথা-মতে নয়। দাঁড়িয়ে বেহালাটিকে বুকের উপরে না রেখে এবং গাল দিয়ে তাকে চেপে না ধরে, তিনি বেহালা বাজাতেন বসে বসে, নিজের ভুঁড়িটির উপর বেহালাটি আলগোছে রেখে। জগদানন্দবাবুর হাসিটি ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের হাসির উল্টো ধরনের। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাসি ছিল অত্যন্ত খোলা এবং উঁচু পর্দায় বাঁধা অট্টহাসিরই মতো। নিচুবাংলায় তিনি হাসলে দেহলিতে তা শোনা যেত। জগদানন্দবাবু হাসতেন নীরবে— তাতে আওয়াজ হত না, শুধু চোখ-দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ত। জগদানন্দবাবুর স্নেহশীলতার কথা বলে শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে কয়েকটি কথা পরে বলব। রাজেন্দ্রবাবু আর ভূপেন সান্ন্যাল মশায়ের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। গুরুদেবের মধ্যম জামাতা সত্যবাবুও আশ্রমে থাকতেন। তিনি বিকেলের দিকে আমাদের শরীরতত্ত্ব পড়াতেন। খেলাধুলায় ছিল তাঁর খুব উৎসাহ। আর দিনুবাবুর কথা কী বলব। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপুবাবুর একমাত্র পুত্র। তিনি আমাদের গান শেখাতেন, মাঝে মাঝে ইংরেজিও পড়াতেন। বিশালকায় পুরুষ ছিলেন তিনি। দিনুবাবুকে প্রথম প্রথম একটু ভয় পেতাম— কিন্তু তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। গানের ক্লাসের ছেলেদের খুব ভালোবাসতেন। দিনুবাবুর কথা বলতে গেলেই তাঁর সহধর্মিণী কমল-বৌঠানকে মনে পড়ে। মিষ্টভাষিণী স্নেহময়ী রমণী

ছিলেন তিনি।

আমি শান্তিনিকেতনে যাবার কিছু পরেই এলেন শাস্ত্রীমহাশয়— বিধুশেখর ভট্টাচার্য। এসে কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় গেলেন এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে। আমরা ছোটোরা অবাক যে মাস্টারমহাশয়কেও পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার পর ফিরে তিনি হরিবাবুর সঙ্গেই প্রথমে থাকতেন। অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ— স্বপাক খেতেন। পরে তিনি পালিভাষার চর্চায় লেগেছিলেন। তিনি বড়ো ছেলেদের সংস্কৃত পড়াতেন। আরো কিছুদিন পরে এসেছিলেন নগেন আইচ মহাশয়। তিনি এসেছিলেন ড্রইং মাস্টার হয়ে। আমাদের সকলকে ড্রইং ক্লাসে যেতেই হত। ড্রইং পেনসিলটা ধরতে শিখতেই লেগে গেল হপ্তাখানেক। লেখবার পেনসিলটা যেমন গোড়ার দিকে শক্ত করে ধরা হয়, ড্রইং পেনসিলের বেলায় নাকি তা চলতেই পারবে না। ড্রইং পেনসিলটাকে ধরতে হবে মাঝামাঝি জায়গায় অতি আলগোছে এবং ছোটো ছোটো আঁচড় মেরে সোজা লাইন টানতে হবে। আমার হাতের কায়দা দেখে মাস্টার-মহাশয় বোধ হয় হপ্তা দুয়েই আমার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে নগেনবাবু আমাদের বাংলাও পড়াতেন। বেশ দুলে দুলে সুর করে দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে তিনি আমাদের নদী কবিতাটি মুখস্থ করিয়েছিলেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পড়েছি মনে আছে, তবে সেটা আশ্রমবাসের গোড়ার দিকে না শেষের দিকে মনে নেই। পরে তিনি জামসেদপুরের একটি বিদ্যালয়ে হেডমাস্টার হয়ে চলে যান। জীবনের শেষ দিকে জ্ঞানবাবু আবার আশ্রমে ফিরে এসে বাড়ি করে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করে গিয়েছেন।

আমার আশ্রমবাসের গোড়ায় আমরা একুনে পনেরো কি ষোলোটি বিদ্যার্থী সেখানে একত্রে বাস করতাম। অরবিন্দদা ও অজিতবাবুর ভাই সুজিতদা আমি যাবার অল্প পরেই এনট্রান্স পাস করে কলকাতায় পড়তে চলে যান। সুজিতদা খুব অল্প বয়সেই মারা যান। পূর্ববঙ্গের উপেনদা (ভট্টাচার্য) সুজিতদাদের সঙ্গেই পড়তেন কি না মনে নেই। উপেনদা পরে অধ্যাপক হয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরই তিনটি ভাই সত্যেন, লব ও কুশ পরপর এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সন্তোষদার মেজো ভাই ভোলা খুব নম্র স্বভাবের ছেলে ছিলেন। তিনি আর আমি বরাবরই এক ক্লাসে পড়তাম। গুরুদেবের ছোটো ছেলে শমী আমাদের সঙ্গে পড়তেন। শমী

হুবহু গুরুদেবেব মতো দেখতে ছিলেন—একই রকম বঙ, মুখের গড়ন ও চোখের চাহনি। গানও কবতেন খুব চমৎকার। ভোলাব ছোটো ভাই সর্বেশ, যাকে আমবা 'সবি' বলে ডাকতাম, তিনিও কিছু পবে আশ্রমে এসেছিলেন। ভোলাব মতো সবিও খুব অল্পবয়সে মাবা যান। তিনি ছাত্রমহলে খুব প্রিয় ছিলেন— শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'সর্বেশ কাপ' এখনো বয়েছে। অজিতবাবুব ছোটো ভাই সুশীল আমাদেরও নীচে পড়তেন। তাঁব গানের গলা ছিল খুব ভালো। সুশীলেব তর্ক কববাব যে একটা বাতিক ছিল, পবম্পবায় শুনেছি এখনো তা ঘোচেনি। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েব ছেলে অরুণচন্দ্রও ছিলেন আশ্রমে। অরুণদাব চেহাবা ছিল লম্বা বোগা। তাঁব কাপড়চোপডেব দিকে বিশেষ খেয়াল ছিল না। পডাশুনায় ভালো বলেই খ্যাতি ছিল। পবে তিনি কলকাতায় কলেজে অধ্যাপক হয়ে যথেষ্ট নাম কবেছিলেন। ববিশাল অঞ্চলেব খ্যাতনামা স্বদেশী নেতা মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতা মহাশয়েব দুটি ছেলে— যোগবঞ্জন ও প্রেমবঞ্জন পড়তেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যোগবঞ্জনদা আশ্রমেই মারা যান। সেই বোধ হয় মৃত্যুকে আমি প্রথম দেখি সামনাসামনি। ফবাসী চন্দননগবেব বাসিন্দা গৌবগোপাল ঘোষ ছিলেন খুব স্ফূর্তিবাজ খেলোয়াড়— যেমন ছিল শরীবেব গডন তেমনি ছিল তাঁর গায়েব জোব। গুরুজনেবা তাঁকে ডাকতেন 'গোবা' বলে। তাঁর নামেব সঙ্গে গাযেব বঙেব কিছুটা মিল ছিল। তাঁকে গৌবদা বলতাম আমবা ছোটোবা। গৌবদা পডাশুনা শেষ করে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কাজ করে গিয়েছেন আমরণকাল। গৌবদা মাবা যাবাব পরে লাইব্রেবিব সামনেব মাঠটাব নাম-করণ হল 'গৌবপ্রাঙ্গণ'। আমি যাবাব দিন দুই-তিন আগে এসেছিলেন একটি ছিপছিপে রোগা ধবধবে রঙেব ছেলে। নাম তাব নাবায়ণ কাশীনাথ দেবল। শুনেছিলাম তাঁব বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়, মা ছিলেন ব্রহ্মদেশীয়। চমৎকাব হাসিখুশি ছেলে ছিলেন তিনি। সিল্কেব লুঙ্গিব উপব বেঁটে কোট গায়ে দিয়ে মাথায় সিল্কেব রুমাল বাঁধলে খুব মানানসই দেখাত। বযসে আমার চেয়ে বছবখানেকেব বডো ছিলেন কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ। আমি যেদিন বিকেলে আমাদের দোচালা বাসগৃহে এলাম সেদিন দেখি দেবলদা কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছেন সামনে যে একটা ডোবা ছিল তারই মধ্যে। দেবলদা পড়তেন গৌরদার সঙ্গে আমাদের এক ক্লাস উপরে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায়

পাস করে দেবলদা কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় একবার অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে ছিলেন। পাদরী বেভারেণ্ড হোম্‌স্‌ সাহেব তখন সেই ছাত্রাবাসের কর্তা। ছেলেরা রুটিন করে পড়াশুনা করেন এটা তিনি খুব পছন্দ করতেন এবং তেমনি অপছন্দ করতেন রুটিন অমান্য করলে। অর্থাৎ রুটিনে যদি থাকে ইংরেজি তখন অঙ্ক কি অন্য কোনো বিষয় পড়তে দেখলে তিনি বিরক্ত হতেন। দেবলদার ছিল রুটিনে অরুচি—কিন্তু রুটিনের ব্যতিক্রম হয়ে গেলে হোম্‌স্‌ সাহেব বিরক্ত হবেন বলে তাঁর দিবানিদ্রাটির সময়, রুটিনে যা লেখা থাকত সেটিকে কেটে, ছোট্ট করে ইংরেজিতে এস. টি. লিখে রাখতেন। হোম্‌স্‌ সাহেবের ধরবার ছোঁবার উপায় রইল না। এস. টি. মানে হল সিরিয়াস থিংকিং অর্থাৎ ঘুম! বহু বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম পোস্টআপিস খোলা হল, দেবলদা হয়ে পড়লেন পোস্টমাস্টার। দেবলদাকে দেখে কে! 'ও দেবলদা, একটা পোস্টকার্ড দাও-না' বলে বার-তিনেক চেঁচাবার পর শুনেছি নাকি সামনের খাতাটা থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলতেন, 'গোল কোরো না, দেখছ না সরকারী কাজ হচ্ছে? এত তাড়া কিসের?'

অল্প কদিন পরেই এলেন নরেন খাঁ। মুসলমান নন—খাঁটি ব্রাহ্মণ। রঙ আমার চেয়ে কমসে কম দুই পোঁচ ঘন। অপ্রস্তুত হলেই জিভ কাটতেন। পড়তেন আমার নীচের ক্লাসে। মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে সুদক্ষ ছিলেন। বহু কালের কথা—ভুলে গেছি আর কারা ছিলেন তখন। যাঁরা ছিলেন কিন্তু নাম করতে পারলাম না তাঁরা আমার স্মৃতির ক্ষীণতাপ্রসূত অপরাধ ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি।

সেকালে আশ্রমে যারা কাজকর্ম করত তাদের মধ্যে কোদোর কথা আগেই বলেছি—অতি কালো এবং অতি বলিষ্ঠ ছিল সে। জল তোলাই ছিল তার কাজ। মুখে হাসি লেগেই ছিল।

গুরুদেবের বাহন উমাচরণের সঙ্গে প্রথম দিনেই পরিচয় হয়। কেমন মেয়েলি ধরনে সরু গলায় কথা কইত। লেখাপড়ার নামগন্ধও জানত না—জানবার বাসনাও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নি কখনো। আমরা পরে অনেক সময় বলেছি, 'ওহে উমাচরণ, তুমি এত বড়ো কবির সঙ্গে ঘর করছ, দুটো কবিতাও পড়তে শিখলে না হে?' সে বলত, 'আপনারাই তো শিখছেন দাদাবাবু, তা হলেই হল।' পরে একবার

তাকে বলেছিলাম, 'জান উমাচরণ, বিলেতে ডাক্তার জন্সনের বাহন বস্ওয়েল সাহেব তার প্রভুর কী জীবনবৃত্তান্তই না লিখেছে! আর তুমি কী করছ হে?' উমাচরণ অম্লানবদনে হেসে প্রশ্ন করল— 'সে ডাক্তারবাবুটি কে দাদাবাবু?' বুঝলাম এর আর কোনো আশাই নেই।

একটি সাঁওতাল ছেলেকে মনে পড়ে— সে রোজ সন্ধ্যায় লণ্ঠনগুলিকে ঝেড়ে মুছে ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। নামটি তার ভুলে গেছি— হাঁটত একটু থপ্‌থপ্‌ করে, বুদ্ধির বেশি প্রসার তার হয় নি। রান্নাঘরের ভাণ্ডারী বিপিন, যাকে আমরা ম্যানেজার আখ্যা দিয়েছিলাম, তাকে বেশ মনে আছে। সে ধুতিটা কোমরে না পরে পরত পেটের উপরে প্রায় বুকের কাছে। দুষ্টু ছেলেরা বলত যে, ও খেয়ে খেয়ে যে ভুঁড়ি করেছে সেইটে লুকোবার জন্যেই এইরকম করে কাপড় পরে। ওর ছিল এক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট— নাম ছিল তার তিনকড়ি। তাকে আমরা বলতাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ভুবনডাঙার যাত্রাদলের একজন ছোট অভিনেতা ছিল ঐ তিনকড়ি। খাবার ঘরে নুন জল লেবু পরিবেশন করত। স্পষ্ট মনে আছে রোগা লম্বা সতীশ ঠাকুর আর মোটা বেঁটে চণ্ডী ঠাকুরকে। রাঁধত কিন্তু ভালো। কিংবা হয়তো ক্ষিধের তাড়নায় আমাদের সবই ভালো লাগত।

প্রতি বুধবার আসত সাবু আর হোরি আব্বাস। সাবু ছিল ধোবা— মিশকালো রঙের উপরে কানের ফুটোয় সোনার রিং-এর মতো কুণ্ডল-দুটি খুবই খোলতাই হত। তার বাচ্চা গাধাটার 'পরে চড়ে নি এমন ছেলে কমই ছিল। একজন ছেলে ভেবেছিল সাবু মানেই ধোপা— কী কারণে একদিন সাবুর 'পরে বিরক্ত হওয়ায় সে ছেলেটি এক মাস্টারমহাশয়কে বলেছিল— 'মহাশয়, একজন নূতন সাবুর বন্দোবস্ত না করলেই নয়— যা কাপড় ছিঁড়ছে বলা যায় না।' নাপিত ছিল আব্বাস। তার পোশাকী একটা নাম ছিল— গুরুদাস বোধ হয়— কিন্তু সবাই তাকে আব্বাস বলেই জানত এবং ওই নামেই ডাকত। 'ওহে আব্বাস, ইংরেজি জান?' জিজ্ঞাসা করায় সে একবার হেসে বলেছিল, 'জানি বৈকি দাদাবাবু, তবে কতকাল আগের কথা।' সেই থেকে আমরা তাকে খুব ধরে বসতাম, 'ওহে আব্বাস, তোমার সেই ইংরেজি বক্তৃতাটা এনাদের একবার শুনিয়ে দাও না হে।' মনমেজাজ ভালো থাকলে আব্বাস দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে নেড়ে মাঝে মাঝে গমক দিয়ে খুব খানিকটা বিড় বিড় করে 'হোরি আব্বাস' বলে বক্তৃতাটা শেষ করে

বসে পড়ত। সেইজন্যে তার নামই হয়ে গেল হোরি আব্বাস। আজকালকার নাপিতের মতো সে বাঁ হাতের তেলোয় চট্‌পট আওয়াজ করে ক্ষুর ধার দিত না, সে ক্ষুর ধার দিত তার ডান পায়ের হাঁটুর নীচের চামড়াটার উপরে, সে কথা এখনো মনে আছে। তার ভোঁতা ক্ষুরের টানে অনেকের গালে রক্তপাত হয়েছে।

আর মনে আছে লিকৃলিকে রোগা, দন্তহীন, গালে-টোল-খাওয়া এক বৃদ্ধকে। সে খাটো ধুতির উপর চামড়ার কোমরবন্ধ পরে খালি গায়ে লাঠি হাতে বোলপুর আর শান্তিনিকেতন যাতায়াত করত দিনে দু বার করে। সে ছিল আমাদের ডাকহরকরা। তাকে আমরা ডাকতাম 'সর্দার' বলে। তার জীবনের ইতিহাস অল্পই শুনেছি তার কাছে, বেশির ভাগটাই কিংবদন্তী— লোকপরম্পরায় শোনা কাহিনী। তার উপরে রঙ চড়িয়েছে আমাদের তরুণ মনের কল্পনা। তার ইতিহাস যেটা আমরা গড়ে তুলেছিলাম সেটা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিত। ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তার কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের তখনকার বয়সে প্রমাণের দরকারই হত না। ভালো লাগলেই বিশ্বাস করতাম। ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই :

সে নাকি ছিল বীরভূমের নামকরা এক ডাকাতের দলের সর্দার। বোলপুর রেল স্টেশন থেকে সিউড়ি পর্যন্ত যে লাল রাস্তা চলে গেছে তারই আশেপাশে সে দলবল নিয়ে বিচরণ করত। ভুবনডাঙা গ্রাম ছাড়িয়ে এসেই যে উঁচু ডাঙা জমিটা যার উপরে এখন আশ্রম হয়েছে সেখানে আগে ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই ছিল না, গোটা-দুই ছাতিম গাছ ছাড়া। সেই ছাতিমগাছগুলি ছিল সিউড়ির রাস্তা থেকে পশ্চিমের দিকে খানিকটা দূরে। এই ছাতিমতলায় তারা এসে ঘুপ্‌টি মেরে বসত সন্ধ্যার পর। লাল রাস্তা দিয়ে বোলপুর থেকে লোকেরা যেত গোয়ালপাড়া পেরিয়ে সিউড়ি শহরের দিকে। সুবিধা বুঝে এরা তাদের 'শিকার' করত। অর্থাৎ লুটপাট করে যা-কিছু পেত কেড়ে নিত। আক্রমণের ঠিক আগেই জয়ধ্বনি করে উঠত তারা—'হারে রে রে রে রে'। অনেক সময় যাত্রীদের হাতেও লাঠি-সোটা থাকত—তখন হত ভীষণ লড়াই। সে কী পাঁয়তাড়া আর সে কী লাঠিচালনার কায়দা! পারবে কেন সে-সব যাত্রীর দল এই-সব পেশাদার লাঠিয়ালের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সর্দারের দলেরই জিত হত। লুঠের টাকা ও মালপত্র সর্দার সবাইকে ভাগ করে দিত, নিজেও নিত।

দলের মধ্যে ঐক্য ছিল একান্ত দরকার; তাই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে সন্দেহ হলে তাকে চবম শাস্তি দেওয়া হত— অর্থাৎ তাকে আব পরে খুঁজেও পাওয়া যেত না। একবার এইবকম সন্দেহ নাকি পডেছিল সর্দারের নিজেব জামাইয়েব উপব। সে থাকত বর্ধমানের কাছে মানকব না কী একটা গ্রামে। বোলপুব থেকে যেতে আসতে পঁচিশ ক্রোশ পথ। কর্তব্যের কাছে আত্মপর ভেদ নেই। সর্দাব নিজেই নাকি ভাব নিল দুষ্টদমনেব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইয়া মস্ত বনপা চডে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল সর্দাব জামাইয়ের বাডিব দিকে। সেখানে জামাইযেব সঙ্গে শেষ বোঝাপডা কবে বাতাবাতি ফিবে এসে দলেব লোকেদেব জানালে কী প্রতিবিধান সে কবে এসেছে। এক বাত্তিবে পঞ্চাশ মাইল বনপা কবেও যাওয়া যায় কি না আমাদেব মনে সে প্রশ্নই ওঠে নি, জিজ্ঞাসা কবে গল্পেব বসভঙ্গ কববাব চেষ্টাও কবি নি। তবে এটা শুনেছি যে সেদিনেব পব সর্দাবেব জামাইকে আব কেউ চোখে দেখে নি।

এইবকম কবে দিন যায়, মাস যায়। একদিন সন্ধ্যাব খানিকটা আগে সর্দার বেব হল তাব সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহাবে শিকাব কবতে। ছাতিমতলায় এসে দেখে একজন প্রৌঢ বয়সেব লোক হাত জোড় কবে বসে বয়েছেন গাছেব তলায় জোডাসন কেটে পশ্চিমদিক-পানে চেয়ে। ধবৃধবে ফবসা তাঁব গায়ের বঙ। মুখ-ভবা তাঁব দাডি, পবনে লম্বা জোব্বা। সর্দাব ও তাব চেলাচামুণ্ডারা ভাবলে যে আজকে একটা ভাবী শিকাব তাদেব ববাতে জুটেছে এবং দিন-কতক স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। লম্ফ দিয়ে হুঙ্কাব দিয়ে উঠল সবাই— 'হাবে বে রে বে বে'। লোকটি একবাব চোখ খুলে বললেন, 'তোমবা ক্ষণকাল অপেক্ষা করো, আমাব প্রার্থনা শেষ হয় নি— শেষ হলে যা ইচ্ছে কোবো।' শুনে সাঙ্গোপাঙ্গবা হেসে উঠল। কিন্তু অল্পক্ষণেব মধ্যেই তাবা স্তম্ভিত হয়ে পডল সর্দারেব দিকে চেয়ে। সর্দাবেব মুখচোখেব ভাবই যেন বদলে গিয়েছে। স্তিমিতনেত্র সাধকেব সৌম্য মুখচ্ছবি সর্দাবেব চোখে নাকি অনির্বচনীয় মহিমায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল— সর্দাব চেয়েই আছে। দেখে দেখে সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিজের জামাইকে গুম কবেও যার চোক্ষেব পলক পড়ে নি, সেই সর্দাবেব চোখ নাকি জলে ভবে এলো। অবশ্যমৃত্যুব সম্মুখে মুখোমুখি দাঁডিয়েও মানুষ যে সমাহিত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবতে পারে এ দৃশ্য সর্দার তো কখনো দেখে নি— এ ধাবণা তার মনেব ত্রিসীমানায় কখনো

আসে নি। সমস্ত মনপ্রাণ তার লুটিয়ে পড়ল সেই ধ্যানরত সাধু পুরুষটির পায়ে। সর্দারের ইশারায় তার দলের লোকেরা চলে গেল খানিকটা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। সর্দার বসে রইল হাত জোড় করে সেই মহাপুরুষের মুখের দিকে চেয়ে। উপাসনান্তে সাধক চাইলেন সর্দারের পানে। কী করুণাই ভরে উঠেছিল সেই ক্ষমাসুন্দর চক্ষের চাহনিতে যা সর্দারের উত্তপ্ত মনকে শীতল করে দিয়েছিল তার অজানিতে। মস্তক তাঁর অবনত হয়ে পড়ল সেই সিদ্ধপুরুষের চরণে। লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে সর্দার তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাইল। সাধক তার মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। ধ্যাননিমগ্ন সাধু পুরুষটি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি সেবার রায়পুরের সিংহবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। একদিন বিকেলে একাকী বিচরণ করতে করতে সেই ছাতিমতলায় এসে পড়েছিলেন। সেই থেকে সর্দার মহর্ষিদেবের আশ্রয়ে এল এবং মহর্ষি রায়পুরের সিংহবাবুদের কাছ থেকে ঐ ডাঙাজমিটা কিনে সেই ছাতিমতলায়ই তাঁর উপাসনাবেদী স্থাপন করলেন এবং শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

সংক্ষেপে এই হল সর্দারের জীবনের ইতিহাস। এর কতটা সত্যি এবং কতটা কাল্পনিক, কতটা প্রামাণিক এবং কতটা আমরাই জুড়ে দিয়েছিলাম সে কথা আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। মোট কথা হচ্ছে সর্দারকে ঘিরে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদের মনের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল, আর তাইতেই আমরা খুশি হয়েছিলাম। সেই ডাকাতের দলের সর্দার আমাদেরই ডাকহরকরা এ কথা ভাবতেই মন খুশি হয়ে উঠত। ছেলেদের এবং মাস্টারমহাশয়দের বাড়ির চিঠি সে সর্দার বোলপুর ডাকখানা থেকে নিয়ে আসত আর দিয়ে আসত। এখনো মনে পড়ে ছিপ্‌ছিপে, রোগা, বয়সের ভারে ঈষৎ অবনত বৃদ্ধ মানুষটি হেঁটে আসছে রাঙামাটির পথ বেয়ে— হাতে তার লম্বা লাঠি, কোমরে তার চামড়ার কোমরবন্ধ, কাঁধে তার ডাকের ঝুলি। আমরা অনেক সময় তাকে ধরে বসতাম, 'সর্দার, সেই হুঙ্কারটা একবার শুনিয়ে দাও-না।' সে হেসে এড়াবার চেষ্টা করত। খুব বেশিরকম ধরে পড়লে এবং মনমেজাজ ভালো থাকলে সর্দার দাঁড়িয়ে পড়ত— মাথায় গামছাটি বেঁধে দুই হাতে বড়ো লাঠিটা ধরে বারকতক পাঁয়তারা কষে ও লাঠিটা বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে সে আচমকা ডাক ছাড়ত— 'হারে রে রে রে রে'। শুনে আমাদের গায়ে দিত কাঁটা। কিন্তু পরক্ষণে টোলখাওয়া গালে দন্তবিহীন

মুখে একটু হেসে সে বলত, 'সে কী দিন গেছে দাদাবাবু, কী দিনই না গেছে।'

বিদ্যালয় খোলার আগের বুধবারের মধ্যে বাকি ছেলে ও মাস্টার-মহাশয়রা সব ফিরে এলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ হল। একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা শুতে গেলাম। পরের দিন অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মস্রোত আবার প্রবাহিত হল, আমিও সেই প্রবাহের মধ্যে ভেসে চললাম।

৪

আমাদের দিন শুরু হত সূর্যোদয়ের পূর্বে, অতি প্রত্যুষে— যতদূর মনে আছে গ্রীষ্মকালে সাড়ে চারটেতে এবং শীতকালে পাঁচটা বাজলে। ঘুম থেকে উঠে বিছানাটি ঝেড়ে গুটিয়ে রাখতে হত আর সেইসঙ্গেই নিচু গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতাম—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে।

এই মন্ত্রটি ভূপেনবাবু আমাদের শিখিয়েছিলেন। কেই বা লোকেশ এবং চৈতন্যময় অধিদেবতারই বা স্বরূপ কী কে তখন তা জানত। সে-সব তথ্য আমাদের শিশুমনের ধারণার বাহিরে ছিল। এখনো যে ধারণায় সেটি আয়ত্ত করতে পেরেছি এ দাবি করতে পারি নে। কিন্তু এটুকু ভূপেনবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম নিয়ে দিনের কাজে লাগতে হয়। ভগবান বলে যে কেউ একজন আছেন এবং তিনি যে প্রাতঃস্মরণীয় এটুকু বোধই তখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে ধারণাটা মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে এসে পড়ল নিত্য উচ্চারণের অভ্যাসে সেটা যে ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধা ছিল তা তখন উপলব্ধি না করলেও জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় তা অনুভব করছি এ কথা বলবই।

অন্ধকার থাকতেই আমাদের প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে হত। তার পর পালা করে নিজেদের ঘরটি পরিপাটি করে ঝাঁট দিতে হত। তার পর পড়ত স্নানের ঘণ্টা। গাবতলার বড়ো কুয়োর ধারে, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক—

ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হত। সে এক পর্ব বললেই হয়। কেরোসিন টিনের মুখে কাঠের এড়ো শক্ত করে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে তার মধ্যে দড়ি বেঁধে কোদো কুয়োর থেকে জল তুলে বাঁধানো চৌবাচ্চাগুলি ভরে দিত এবং আমরা মগে করে জল তুলে গায়ে মাথায় দিতাম। বাসি জল শীতকালে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, গায়ে দিলেই গা শিউরে ওঠে। কোদোকে একটু খোসামোদ করলে এক টিন সদ্য তোলা ঈষদুষ্ণ জল পাওয়া যেত—সে কী আরাম। কোদো সে কী বড়ো বড়ো টান দিত দড়িতে—দেখতে দেখতে উঠে আসত জলভরা টিন। পরে আমরা যখন বড়ো হলাম তখন আমরা নিজেরাও জল তুলেছি কোদোর অনুকরণে। যে-সব ছোটো ছেলে ভালো করে স্নান করতে পারত না, কিংবা আলস্যভরে, কি শীতের প্রকোপে স্নান করতে চাইত না, তাদের ধরে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন ভূপেনবাবু। কারও গায়ে খোস-পাঁচড়া থাকলে সেজন্যে ঘৃণা কি অবহেলা তাঁর ছিল না।

স্নান সেরে যে যার পট্টবস্ত্র ও চাদর পরে নিতাম। সদ্যঃস্নাত দেহে পাট-কাপড় পরলে মনে যে একটা শুচিতা-সঞ্চার হয় বালক বয়সে তা সম্যক্‌ভাবে না বুঝলেও মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠত। উপাসনার ঘণ্টা পড়লেই নিজ নিজ কম্বলাসনে পছন্দমত নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে উপাসনায় বসতে হত। উপাসনার তাৎপর্য কিছু জানা ছিল না, মনে মনে কী প্রার্থনা করতে হবে তা-ও কেউ শিখিয়ে দেন নি। এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে শুদ্ধদেহে শান্তচিত্তে ভগবানের নাম করতে হবে। প্রথম প্রথম এদিক ওদিক চাইতাম, দেখতাম অন্যরা কী করছে। মাঝে মাঝে যে দু-একটা কাঁকর কাঠবিড়ালীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারি নি তা-ও বলতে পারি নে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-সাত মিনিট চুপ করে বসবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে ভগবানকে ডাকবার ইচ্ছাও যে কখনো হয় নি তা-ই বা কী করে বলি। এই ক্ষণকাল সমাহিতচিত্তে বসবার অভ্যাসটি যে পরবর্তী জীবনে কোনো কাজেই আসে নি তা-ও বলতে পারি নে। ঘণ্টা পড়লে সবাই উঠে পড়ে আসনটি ঝেড়ে নিতাম। ঠিক তখনই দেখতাম যে দেহলির দিক থেকে গুরুদেব ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসছেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময়মত তিনি আসতেন। মানসনেত্রে এখনো দেখতে পাই প্রাক্‌কুটিরের সামনেকার শালবীথির লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে তিনি আসছেন আমাদের সঙ্গে সমবেত উপাসনায় যোগ

দিতে। আমবা সারি দিয়ে দাঁড়াতাম এবং চটি জুতাটি ছেড়ে লাইনের সামনে আমাদেব দিকে মুখ কবে দাঁড়িয়ে যুক্তকবে গুরুদেব প্রার্থনা করতেন,ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি। আমবাও তাঁব সুবের সঙ্গে সুব মিলিযে সমগ্র স্তোত্রটি উচ্চারণ কবতাম। এখনো মনে পড়ে গুরুদেবেব ধ্যাননিবিষ্ট প্রশান্ত মুখেব উজ্জ্বল ছবি। সমবেত উপাসনা শেষ হলে আমবা একে একে তাঁকে প্রণাম কবে নিতাম এবং তিনি হাত জোড় কবে প্রতিনমস্কাব জানিয়ে আশীর্বাদ করতেন আমাদেব সবাইকে। সে আশীর্বাদ আজও অক্ষয় হয়ে বয়েছে আমাদেব জীবনে। গুরুদেব আশ্রমে থাকতে একটি দিনেব তবেও এই সমবেত উপাসনায় তাঁকে অনুপস্থিত দেখি নি।

সমবেত উপাসনাব পব পট্টবস্ত্র ছেড়ে ধুতি কি পাজামা কি প্যান্ট, আব শার্ট কি পাঞ্জাবি এবং তাব উপব গেরুয়া আলখাল্লা পবে নিতাম। তাব পবই পড়ত জলখাবাবেব ঘণ্টা। সকালবেলায় কোনোদিন পেতাম ভেজানো ছোলা কিংবা ভেজানো কাঁচা মুগেব ডাল। এখো গুড় অথবা আদা নুন দিয়ে ছোলা বা কাঁচা মুগ মন্দ লাগত না খেতে। কোনোদিন বোঁদে, কোনোদিন জিবে গজা, কখনো বা মোহনভোগ। তাব পব দুই হাতা দুধ। অনেক সময দুধেব টান পড়লে টিনেব দুধও খেয়েছি। বিকেলেব জলখাবাবটা হত সকালেব সঙ্গে মানিয়ে। অর্থাৎ সকালে মোহনভোগ হলে বিকেলে বোঁদে কি গজা, আব সকালে বোঁদে কি গজা হলে বিকেলে পেতাম মোহনভোগ। বিকেলে যতদূব মনে পড়ে দুধ পাওয়া যেত না। তবে মাঝে মাঝে লুচি ও একটা কিছু ভাজি পাওয়া যেত। আমাদেব কেউ কেউ 'মোহনভোগ' কথাটা শুনলেই মুখ বিকৃত কবে বলতেন—'মোহনভোগ, না সুজিব কাঁই—না আছে ঘি, না আছে চিনি— ছ্যা।' তাব পব যেতে হত পড়াব ক্লাসে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম মামুলি স্কুল ছিল না। শহবেব বোর্ডিং স্কুলগুলিকে গুরুদেব ভয় কবতেন এবং সেগুলিকে মনে কবতেন বাবিক, পাগলাগাবদ,হাসপাতাল বা জেলেবই একগোষ্ঠীভুক্ত। তাঁব ব্রহ্মচর্যাশ্রম যাতে বিদ্যাশিক্ষাদানেব কল বা কাবখানায় পবিণত না হয় সেদিকে ছিল তাঁর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। তপোবনেব গুরুগৃহেব যে ছবি গুরুদেব মানসচক্ষে দেখেছিলেন তাবই সাদৃশ্যে মহর্ষিব সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে তিনি তাঁব ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। বদ্ধ ঘবেব দম-আটকানো সংকীর্ণতা বিদ্যার্জনেব পক্ষে অনুকূল নয় এই ছিল তাঁব ধ্রুব বিশ্বাস। সুতবাং শান্তিনিকেতনে

ক্লাসঘরের কিংবা টেবিল-চেয়ারের বালাই ছিল না। কানমলা, হাঁটুগাড়া, নিজের কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার অপমান আমাদের ভুগতে হত না। আশ্রমের এক-একটি নির্জন স্থানে পল্লবিত তরুছায়ায় মাস্টারমশায়কে ঘিরে নিজ নিজ কম্বলাসনে বটুবিদ্যার্থী আমরা বসতাম বইখাতাপত্র নিয়ে— সেই ছিল আমাদের ক্লাস। প্রভাতের নির্মল বাতাস আমাদের সদ্যঃস্নানস্নিগ্ধ দেহমনকে সজাগ সতেজ ও উৎসুক করে দিত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যার্জনের ব্রতে। ভগবৎকৃপায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গুরুদেবের কাছে পড়বার। সাহিত্য-সাধনার শত কাজের মধ্যেও সময় করে ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি পড়াবার ভারও নিতেন, ছোটোদের পাঠ্যপুস্তকও রচনা করতেন। 'ইংরেজি সোপান' বলে দু-তিন খণ্ড ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বই তিনি লিখেছিলেন। মুখে মুখে আমরা তাঁর কাছ থেকে ইংরেজি শিখতাম। তাঁর নির্দেশমত হরিবাবু লিখেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রবেশ'; সে বইয়ের এক-একটি অধ্যায়ের শেষে অমরকোষের এক-একটি শ্লোক থাকত— যেমন চন্দ্রসূর্যের কী কী নাম, কোন্ কোন্ শব্দে 'ষ' লিখতে হবে। বালকবয়সে শেখা 'হিমাংশুশ্চন্দ্রমাশ্চন্দ্র ইন্দুঃ কুমুদবান্ধবঃ' কিংবা "সূরসূর্যার্যমাদিত্য ভাস্কর" ইত্যাদি এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে আছে। 'ঈষৎ কোষ' শ্লোকটি যখন আয়ত্ত করতে পারা গেল তখন 'স' ও 'ষ' এর মধ্যে আর কোনো গোলযোগ হবার সম্ভাবনাই রইল না। গুরুদেব কখনো পড়াতেন ইংরেজি কখনো বা বাংলা।

সাড়ে-দশটা কি এগারোটার সময় সকালের ক্লাস শেষ হয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা আসত। তখনকার দিনে ছেলেদের জন্যে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের থালা বাটি গেলাস নিয়ে সার বেঁধে খাবার ঘরের দিকে রওনা দিতাম। গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। একদিন এই সারিতে, আর একদিন অন্য সারিতে যেখানে খুশি বসে পড়তেন। আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম— হায় রে, যদি আজকে আমার পাশে বসেন। গুরুদেবের পাশে বসবার একটা তো আগ্রহ ছিলই, তার উপরে আবার ছিঁটে-ফোঁটা প্রসাদও পাওয়া যেত— নরম মোটা হাতরুটির অন্তত আধখানা। সে সময়কার দুজন ঠাকুরের কথা আগেই বলেছি। সতীশ ঠাকুর ছিল ছিপছিপে রোগা এবং চণ্ডী ঠাকুর ছিল বেঁটে মোটা গাঁট্টাগোট্টা ধরণের

মানুষ। সতীশ ঠাকুব একটু মিতভাষী গম্ভীর, কিন্তু চণ্ডী ঠাকুর ছিল গপ্পী মানুষ, হাসিখুশি। কিন্তু উভয়েই আমাদেব রুচির খবব বাখত। কে খাইয়ে, কে ডাল ভালোবাসে না, কে চায় কেবল ঝোলেব পটল, এ-সব তাদেব জানা ছিল এবং পাবতপক্ষে রুচিসংগত পবিবেশনই কবত। এদেব উপবে ছিল বিপিন— আগেই বলেছি তাকে বলা হত ম্যানেজাব। সে ডাকে সে বেশ খুশিই হত। বিপিন চাবি দিকে চোখ বাখত কাব কী লাগে। আব-একজন লোক ছিল তিনকড়ি, সে পিতলেব বড়ো জাগে কবে জল দিয়ে বেড়াত। লোকটিব বোধ হয় একটু আধটু আফিম খাবাব অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে সে ঝিমোত। বিপিন তাকে মোটে পছন্দ কবত না। আমরা মাঝে মাঝে 'জল, জল' বলে হাঁক দিলে বিপিন বিবক্তিব সুবে বলত— 'জল তো ঘুমচ্ছেন'।

মধ্যাহ্নভোজনেব সময় পাওয়া যেত গবম ভাত এবং চায়েব চামচেব দু চামচ ঘি। ডাল হত বেশিব ভাগই অড়হব, মাঝে মাঝে মুসুবি এবং কদাচিৎ মুগ। তাব সঙ্গে দিত পাতলা পাতলা আলুভাজা কিংবা ঢেঁড়স-ভাজা ও কদাচিৎ পটলভাজা। বর্ষাব দিনে যখন আলু বেশি পাওয়া যেত না তখন কুচি কুচি কচু ভাজাও খেয়েছি। একটা কুমড়োব ঘ্যাট এবং শেষে বেশ কড়া কবে সাঁৎলানো আলুব ঝোল। তাতে মাঝে মাঝে পটলও পড়ত। আলুব অভাবে খামালু দিয়েও কাজ সাবা হত। অনেক লোকেব বান্না হত বলেই হোক, কি সতীশ ও চণ্ডী ঠাকুবেব কেবামতির জন্যেই হোক, সেই ঝোলটা ছিল খুব মুখবোচক। পববর্তী কালে বাড়িতে সেবকম বান্না কববাব চেষ্টা কবা হয়েছে বহুবাব, কিন্তু কিছুতেই তেমনটি হয় নি। হয়তো বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব মুখেব স্বাদই বদলে গেছে, বাড়িব বান্নায় কোনো ত্রুটি হয় নি। এইসঙ্গে বাত্রেব খাবাবেব তালিকাটা দিয়ে ফেলি। ভাত কি হাতরুটি যাব যেমন রুচি। রুটিতে একটু ঘি মাখানো থাকত। ডাল হত অড়হব কি ছোলা। তাব সঙ্গে পাওয়া যেত হয় নবম কবে আলু পেঁয়াজ ভাজা নয়তো আলু-পোস্ত। মাঝে মাঝে আলুব বদলে ছোটো ছোটো দিশি পেঁয়াজ দিয়ে পোস্ত। তাব পব সেই আলু-পটলেব ঝোল। দ্বিতীয়বাব কবে ডাল আব ঝোল পবিবেশনেব বীতি ছিল দুবেলাই। বাত্রে দুই হাতা কবে দুধ ববাদ্দ ছিল প্রত্যেকেব। আহাবান্তে নিজেদেব থালা বাটি গেলাস মেজে তুলে বাখতে হত। পবে দেখেছি, কাঁসার

থালার বদলে কাঠি দিয়ে গাঁথা শালপাতায় খাওয়া হত। দুপুরের খাওয়া শেষ হলে পালা করে অতিথিসেবায় লাগতাম। সে কাজে উৎসাহী ছিল অনেক ছেলে। খাবার পর দিবানিদ্রার রেওয়াজ ছিল না। যে যার নিজের তক্তপোষে, গুটিয়ে-তোলা বিছানায় ঠেসান দিয়ে বিকেলের পড়াটা ঝালিয়ে নিতাম।

বিকেলে আবার ঘণ্টা-দুই ক্লাস হত। এই সময়ে বেশির ভাগ হত জগদানন্দবাবুর ল্যাবরেটরি-ঘরে গিয়ে বিজ্ঞানচর্চা। ছোট্ট কটি আলমারিতে নানারকমের জিনিস থাকত। তাই দিয়ে হত আমাদের কত গবেষণা। কেমন করে মেঘ হয়, কেমন করে তা আবার গলে জল হয়ে যায়, বুঝে নিলাম পাঁচ মিনিটে। একটি মাঝারি ডিক্যানটারে কিছু জল দিয়ে তার নীচে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালালে সে জল থেকে বাষ্প উঠতে লাগল এবং সেই বাষ্প একটা সরু নল দিয়ে আর একটা ডিক্যানটারে ঢুকে পড়ল, আর সেই ডিক্যানটারের গায়ে ঠাণ্ডা জল দিতে না দিতে সে বাষ্প জল হয়ে যেতে লাগল। একটা গোল চাকতিতে ছিল রামধনুর সাতটা রঙ পাশে পাশে আঁকা। সেই চাকতিটা জোর করে ঘোরালেই সব রঙ একাকার হয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেল। বোঝা গেল চোখে যে সাদা আলো দেখি তার মধ্যে সাতটা রঙই রয়েছে গোপনে। কেমন করে ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ি চলে, কেমন করে একটা পাত্রকে একেবারে হাওয়া-শূন্য করা যায়—আরও কত কী গবেষণা ও পরীক্ষা হত। এর সঙ্গে হত পদার্থবিজ্ঞানের সামান্য একটু আমেজ-মেশানো কত খোশগল্প। সে-সব পড়া নিতান্তই ছেলেমানুষি ধরনের সন্দেহ নেই কিন্তু এতে করে আমাদের কৌতূহল সজীব ও উন্মুখ হত, আরও জানার আগ্রহ সতেজ হয়ে উঠত। গুরুদেবের মেজ জামাই সত্যবাবু পড়াতেন ফিজিওলজি। মস্ত বড়ো বড়ো ছবি ছিল মনুষ্যদেহের বিচিত্র যন্ত্রগুলিকে চেনাবার জন্যে। তারই সাহায্যে সত্যবাবু মনুষ্যদেহের কলকব্জা সব মোটামুটি বুঝিয়ে দিতেন সরস ও সহজ ভাষায়। হৃৎপিণ্ডের কাজ কী, শিরা-উপশিরাগুলির কোন্‌টার মধ্যে লাল রক্ত শরীরকে পুষ্ট করে আর কোন্‌টার মধ্যে দিয়ে দূষিত নীল রক্ত ফুসফুসে গিয়ে তাজা বাতাসে চাঙ্গা হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, সে-সব তথ্য অল্পের মধ্যে একরকম জানা হয়েছিল। হজম হয় কোন্ কোন্ রসে এবং কোথায় তারও হদিশ কিছু পেয়েছিলাম। একটি নরকঙ্কাল ছিল একটা কাঠামে ঝোলানো। তা ছাড়া

মড়ার মাথা ও হাড অনেক ছিল। ত্রিপুরার মহাবাজা একটি মস্ত বড় কাঠের দূববীক্ষণ যন্ত্র আমাদেব দিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় জগদানন্দবাবুর নির্দেশমত আমরা 'হেলিজ কমেট', গ্রহ নক্ষত্র সব দেখতাম এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ গল্প শুনতাম।

এইখানে আব-একটা কথা মনে পডছে, তাব উল্লেখ কবি। বর্ষাব দিনে কালো মেঘে অম্বব মেদুর হয়ে যখন মুষলধাবে বৃষ্টি নামত তখন আমবা পাত-তাডি গুটিয়ে মাস্টাবমশায়দেব একজনেব সঙ্গে বেব হয়ে পডতাম বৃষ্টিব ধারায় ভিজে শবীবটা জুডাতে। বৃষ্টির জল তখন মাঠেব থেকে খোয়াইয়ে গডিয়ে পডছে আব নানা ছোটো ছোটো ধাবায় এগিয়ে গিযে পবস্পব মিলে মিশে মোটা ধাবা হয়ে ছুটেছে কোপাই নদীব দিকে। আমবাও তাব অনুসবণ কবে ছুটতাম বর্ষাব গান গেয়ে গেয়ে। অচিবে কোপাই নদীব মবা গাঙে বান এসে পড়ত। আমবা ঝাঁপিয়ে পডতাম সেই নদীব জলে। বানের টানে ভেসে যেতাম কত কেয়াঝোপেব পাশ দিয়ে, কত কাশ ফুলে ঢাকা উঁচু পাডেব তলা দিয়ে। বেশ কিছুদুব গেলে দেখা যেত বেল-লাইনেব সাঁকো। সেটা বড়ো সর্বনেশে জায়গা। সাঁকোব নীচে জলের তলায় লুকিয়ে থাকত কত বড়োবডো পাথব। সেখানে কোপাইয়েব জল ফুলে ফেনিল হয়ে উঠত। তাব মধ্যে পডলে আব বক্ষা নেই— হাত-পা তো ভাঙতেই পাবে—আব যদি পা তাব ফাটলে পডে যায় তবে বিপ্লাশঙ্কা খুবই জোব। সেজন্যে দূব থেকে সাঁকো দেখতে পেলেই পাডেব দিকে কানি খেতে খেতে নদীব পাডে উঠে পডতে হত। তত-ক্ষণে বৃষ্টি হয়তো থেমে গেছে। তখন ভিজে কাপডটা নিংড়ে নিয়ে ঘবে ফেবাব পালা। ফেবা হত বেল লাইন ধরে। লাইনেব দুই পাশে বড়ো বডো তাল গাছে তালগুলিতে তখন পাক ধবতে শুরু করেছে মাত্র। কী কবে লাইনেব পাথব মেরে তাল পাডা যায় তা চক্ষে না দেখলে প্রত্যয় হওয়া কঠিন। আমাদের মধ্যে কয়েকজনেব হাতেব টিপের খ্যাতি ছিল। যদি একটা তাল পড়ত তবে তাব আঁটি নিয়ে যে টানাটানি শুরু হত তাব হিড়িক চলত প্রায় আশ্রমে পৌঁছনো পর্যন্ত। ততক্ষণে পবনেব কাপড গায়েই শুকিয়ে গেছে। আশ্রমে ফিবেই কাপড ছেডে আমাদেব খেতে হত গবম আদাব চা—একেবারে অমৃতসমান। এই জলে ভেজায় আমাদের দেহমনেব শ্রান্তি অনেক লাঘব হত। শরীব সহনশীল তো হতই, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে সহজে আনন্দ করবার শক্তি ও অভ্যাসটাও বেডে যেত। কালবৈশাখীব ঝড়ে মনটাকে উড়তে

দেওয়ায় কিংবা বর্ষাব মুষলধাবার সঙ্গে মনটাকে ভাসিয়ে দেওয়াতে মানব-মনের যে একটা অপবিসীম চরিতার্থতা আছে তা ঐ অল্প বয়সেও অনুভব কবেছি।

বিকেলে ক্লাস শেষ হলে জলযোগ সেবে ছুটতাম সকলে খেলাব মাঠে। কলকাতাব মোহনবাগান ক্লাবেব ‘ব্যাক’ খেলোয়াড গৌবদাব হাতেখডি হযেছিল শান্তিনিকেতনেব ঐ খেলাব মাঠে। কোনো কোনো ছেলে বাগান কবত। একটু একটু জমি এক-একজনকে বিলি কবা হত। কেউ-বা করত অডহব ডাল, কেউ-বা কবত চিনেবাদামেব চাষ, আবাব কেউ লাগাত ঢেঁডস। বডো কুয়োটাব কাছ থেকে নালা কেটে স্নানের জলেব ধাবা এনে ক্ষেতে জল দেওয়া হত। কেউ যদি জমি পেয়ে তাব যত্ন না কবত বা তাব জমিতে আগাছা জন্মাত তবে তাব জমি বাজেয়াপ্ত কবে যাব জমিতে খুব ভালো চাষ হত তাকে দেওয়া হত। জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াব মতো অপমান আব কিছু ছিল না। পবে একবাব একজন মাস্টাবমশাযেব খেয়াল হল ছেলেদেব চামডা-শোধনেব কাজ শেখাতে হবে। বডো বডো জালায় গোলা হল ফিটকিবি আব কী কী সব মশলা। বর্ষাব দিনে মাঠে ঘাটে বিস্তব হেলে সাপ দেখা যেত। ছেলেবা লেগে গেল হেলে সাপ মেবে তাব চামডা বোদে শুকিয়ে ঐ জালাব মধ্যে ডোবাতে। কত হেলে সাপ যে মাবা গেল তাব লেখাজোখা বইল না।

আগেই বলেছি আমাদেব প্রত্যেকেব একটি কবে কাঠের কাজেব হাতিয়াব-ভবা বাক্স ছিল। একজন জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁব কাছে আমবা ছুতোবের কাজ খানিকটা শিখেছিলাম। নিজেদেব জন্যে ডেস্ক, শেলফ ও ছোটো আলনা চলনসই বকম তৈবি কবে নিতে শিখে গেলাম। সেই জাপানী ভদ্রলোক— নাম তাব ভুলে গেছি— একবাব দুটো সত্যিকাব নৌকো তৈবি কববার আয়োজন কবে ফেললেন। তাঁর নির্দেশমত কাঠগুলি আমবা ধবে থাকতাম— তিনি সেগুলি চেঁছে-ছুলে কবাত দিয়ে প্রমাণসই কবে কেটে নৌকোতে লাগাতেন। মাঝে মাঝে আমাদেব দিতেন দু-একটা মোটা কাজ— যেমন ব্যাঁদা দিয়ে একমেটে কবে চাঁছা। পবে তিনি সেটাকে তাঁব মনেব মতো কবে মসৃণ করে চেঁছে নিতেন। যখন নৌকো-দুটি সম্পূর্ণ তৈরি হল তখন তাঁর আর আমাদেব উল্লাস দেখে কে। আমবা এমন ভাব করতে লাগলাম যেন কাজটা আমবাই হাসিল কবে ফেলেছি। একটি নৌকোর

নাম হল 'সোনার তবী', সেটি ছোটো, তাব খোলটাব আকৃতি ছিল সমুদ্রের জাহাজেব মতো। অন্যটিব নাম দেওয়া হল 'চিত্রা', সেটি ছিল আকারে বড়ো, তাব তলাটা চ্যাপটা। নৌকা দুটিব নিজ নিজ নাম, সামনেব গলুইয়ের একপাশে লিখে, তাদেব তালদিঘিতে ভাসানো হল। ছুটিছাটাব দিন নৌকা-বিহাব কববাব অনুমতি পাওয়া যেত।

এই জাপানী ভদ্রলোক আমাদেব যুযুৎসুও শেখাতেন। এ বিদ্যেয় গৌবদা দেখতে না-দেখতে পাবদর্শী হয়ে গেলেন। সে কত কায়দা, কত-না প্যাঁচ। গৌবদাকে এঁটে ওঠা যেত না কিছুতেই। কত বকম পাঁয়তাড়া, আব কী কবে মাটি নিতে হবে সে-সব গৌবদাব যেন মুখস্থ হয়ে গেল। ওস্তাদ যে পাশ থেকেই গৌবদাকে কায়দা কবে আছাড় মাবতেন তৎক্ষণাৎ মাথাটা এক পাশে কাত কবে কাঁধেব উপব ভব দিয়ে মাটিতে দড়াম কবে পড়েই চট কবে লাফিয়ে দাঁড়ানো গৌবদাব সহজেই অভ্যাস হয়ে গিয়ে-ছিল। শত্রুপক্ষেব হাতটাকে কেমন সহজে দুমড়ে পিঠেব কাছে নিয়ে তাকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চল কবে ফেলা যায় সে কায়দায় গৌরদা এত সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়লেন যে আমবা ভয়ে তাঁব সামনে হাতই বাড়াতাম না। ঐ জাপানী ভদ্রলোকটিব উৎসাহেব অন্ত ছিল না। তখন রুশ-জাপানেব ঘোব যুদ্ধ চলছে। দিনুবাবু ছড়া বাঁধলেন—'চা পান কবিয়া ছুটিল জাপান রুশিয়াব 'পবে রুষিয়া' এবং আবও কত কী ভুলে গেছি। যেদিন 'টেলি-গ্রাফ' কাগজে খবব এল যে রুশিয়াব সাবা বলটিক নৌবহবটি অ্যাডমিবাল টোগোর নৌযুদ্ধকৌশলে প্রশান্ত মহাসাগবের গভীব গর্ভে তলিয়ে গেছে, সেদিন উৎসাহেব চোটে ঐ জাপানী মানুষটি যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তাঁব নেতৃত্বে আমবা বোলপুব শহবটি প্রদক্ষিণ কবে এলাম দিনুবাবুব বচিত গান গেয়ে—'জয় জয় জয় হে জাপান।'

খেলাধুলাব পব হাত পা ধুয়ে সান্ধ্য উপাসনা সেবে আমাদেব দিনেব কাজ শেষ হত।

৫

সন্ধ্যাব পব পড়াশুনাব বেওয়াজ ছিল না। তখন শুরু হত বিনোদনপর্ব। যাঁদেব কণ্ঠে সুব ছিল তাঁরা যেতেন গানেব ক্লাসে। গান শেখানো হত তানপুরা ও এসরাজেব সঙ্গে—হারমোনিয়ামেব চল ছিল না। কোনো-

দিন গান শেখাতেন অজিতবাবু, কোনোদিন বা দিনুবাবু। দিনুবাবু ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী। দিনুবাবুর যে কী গলা ছিল আর কী দরদ দিয়ে গাইতেন তিনি—কী করে বোঝাব তাঁদের যাঁরা সে গান শোনেন নি। কথা ও সুর যেন অভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করত যখনই তিনি গান করতেন। মনে পড়ে শেলির একটি কবিতার দুই ছত্র, ছাত্রাবস্থায় যার তর্জমা করেছিলাম—

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory

ঠিক সেইভাবেই দিনুবাবুর গানের রেশ স্মৃতির বীণায় গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই বৃদ্ধ বয়সেও। 'নৈবেদ্য'র গানগুলি সকলে মিলে শিখতাম আর গাইতাম—

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো হে।

কিংবা

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

এবং আরও কত কী। গীতাঞ্জলির গানগুলি তখন ছাপা হয়ে বের হয় নি; এবং যেমন যেমন লেখা হত গুরুদেব তখন-তখনই দিনুবাবুকে শিখিয়ে দিতেন, আমরাও দিনুবাবুর কাছ থেকে টাটকা টাটকা শিখে নিতাম। সে-সব গানের তুলনা নেই। সময়ে সময়ে গুরুদেব নিজেই গানের আসর জমিয়ে বসতেন। প্রথাসিদ্ধ ওস্তাদ গাইয়েরা পরে এসেছিলেন।

আমাদের একটা খেলা হত মাঝে মাঝে, ইংরেজিতে যাকে বলে **sense training**— এটাতে গুরুদেবের খুবই উৎসাহ ছিল। সকলকে নিয়ে এক-সঙ্গে বসে হাতে একটা ফুটরুল তুলে তিনি বলতেন—'এই দেখো, এক ফুট এতটা লম্বা। আচ্ছা, এই দেখো টেবিলের এই পাশটা। বলো তো এটা লম্বায় কত ফুট কত ইঞ্চি।' আমরা সবাই খুব বিজ্ঞের মতো সেই দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে মনে মনে একটা আঁচ করে নিতাম, তার পর কেউ বলতেন 'চার ফুট দুই ইঞ্চি', কেউ বলতেন 'তিন ফুট এগারো ইঞ্চি'— এইরকম যার যা প্রাণ চায় এক-একজন এক-একটা মাপ বলতেন। তার পর টেবিলের সেই পাশটা ফুটরুল দিয়ে মেপে দেখা হত, যার আন্দাজ আসল মাপের সব-চেয়ে কাছাকাছি হল তারই হত জিত। এইভাবে, এই দেয়ালটা লম্বায় কত, এই দরজাটা কতটা উঁচু, এখান থেকে ঐ ফুলদানিটা কত দূরে,

এই-সব নিয়ে মাপামাপি চলত খাবাব ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত। আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে সজাগ কববার চেষ্টা হত সব দিক দিয়েই।

এক-একদিন এক-একজন মাস্টাবমশায় গল্প বলতেন। কত নূতন দেশের কথা, কত বিচিত্রজাতি মানুষদেব কত বকমারি জীবনযাত্রার বিবরণ এবং তাদের শৌর্যবীর্যেব কত-না কাহিনী। পালা কবে মাস্টাবমশায়বা গল্প বলতেন। অজিতবাবু, সত্যবাবু এবং জগদানন্দবাবুব গল্পেব আসর ভরতি থাকত। বস্তুত, আমবা এঁদেব গল্পেব ক্লাসেব জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতাম। জগদানন্দবাবুব গল্পেব তুলনা ছিল না— যেমন তাঁব বলাব ভঙ্গি, তেমনি চিত্তাকর্ষক তাঁর গল্পেব বিষয়বস্তু। তখন 'স্ট্র্যাণ্ড' না কী-একটা ইংরেজি সাময়িক পত্রিকায় মঙ্গলগ্রহেব দিকে অভিযানেব একটা গল্প ধাবাবাহিক বেব হচ্ছিল। জগদানন্দবাবু সেটা বাংলায় নিজেব মতো করে আমাদের বলেছিলেন। মনটা সেই গল্পে এমন বোমাঞ্চিত হয়ে উঠত যে আজও তা মনে রয়ে গেছে। সংক্ষেপে গল্পটা এই— প্রকাণ্ড একটা গোলাব মধ্যে কয় বন্ধু বহু বছবেব খাবাব, জল ও অন্যান্য রসদ নিয়ে ঢুকে পড়ল। সেই গোলাব ভিতরটা বেশ একটা ঘবেব মতো— বিছানা পাতা রয়েছে, মাঝেব টেবিলটায় খাওয়া-দাওয়া আব পড়াশুনাও চলবে। দেয়ালেব গায়ে সাজানো বয়েছে নানা বিজ্ঞানেব বই ও গ্রহনক্ষত্রেব কক্ষপথেব ছাপ। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলির মতো জানালা। আর কত বকমেব যন্ত্রপাতি, ফটোগ্রাফ তোলবার ছোটো বড়ো ক্যামেবা। হিসেব কবা হল এত বড়ো গোলাটা ঘণ্টায় কত মাইল কবে ছুটে গেলে কত দিন পবে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছবে। এইখানে আমরা সবাই শিখে নিলাম পৃথিবী থেকে মার্স গ্রহটি কত যোজন মাইল দূরে এবং কত বেগে গোলাটি ছোটা চাই। যা হোক গোলাটা একটি অতিকায় কামানের মধ্যে ঢুকিয়ে মঙ্গলগ্রহেব দিকে লক্ষ্য করে দাগা হল। ছুটে চলল গোলা কত নক্ষত্রমণ্ডলীব পাশ দিয়ে, কত গ্রহ-উপগ্রহেব গা ঘেঁষে বিরাম-বিহীন গতিতে। ঘুলঘুলি জানালা দিয়ে বন্ধুবা উঁকি মেবে দেখে নিত কোন্ কোন্ গ্রহনক্ষত্র তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে সে কী উল্কাপাত— চোখ তাদেব ঝলসে যায়। একদিন এক বন্ধু বললেন আর-এক বন্ধুকে, 'ভাই, বইটা ছুঁড়ে দাও তো।' যাকে বলা হল সে বইটি ছুঁড়ে দিল— কিন্তু বই নড়েও না পড়েও না। কী হল? বন্ধুরা বুঝলেন, তাঁরা এমন একটা জায়গায় এসেছেন যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পৌঁছোয়

না, আর সেইজন্যেই বই পড়ছে না। তখনি হিসেব হল কত লক্ষ ক্রোশ দূরে গোলাটা চলে এসেছে। আমরা জেনে নিলাম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের দৌড় কতটা। কিন্তু গা শিউরে উঠল ভাবনায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের বাইরে গিয়ে গোলাটা যদি মঙ্গলগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে না পৌঁছতে পারে তবে কী হবে? তবে কি গোলা সেই বইটার মতোই ঝুলে থাকবে? বড়োই উৎকণ্ঠায় সেদিনের গল্পে ছেদ পড়ল। পরের সপ্তাহে যখন শুনলাম যে গোলাটা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহের টানের মধ্যে এসে যাবে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এইভাবে চলতে লাগল গল্পটা। এখন শুনছি সেই গল্পই নাকি সত্যি হবে— কুকুর বাঁদর তো মহাশূন্যে বেশ খানিকটা ঘুরে এল— মানুষও নাকি শিগগিরই যাবে। যাক আর নাই যাক, গল্পের বন্ধুরা কী কী গ্রহনক্ষত্র দেখে দেখে গেল সে কথা শুনে আমরাও জেনে নিলাম তাদের সকলেরই নামধাম, ইতিহাস। পরে আমাদের সেই ছেলেবেলায় এক ধূমকেতু বেরোল — নাম তার শুনলাম হেলির কমেট— কী প্রকাণ্ড তার লেজ! সে নাকি পঁচাত্তর বছর পর একবার করে আসে। সেই সময় কোনো একজন কবি সাময়িক পত্রে একটি কবিতা লিখেছিলেন পড়েছি, যার ভাবার্থ এই, 'হে হেলির কমেট, তুমি এর আগের বার যখন এসেছিলে মা তখন জন্মায় নি মোটে, আর হামাগুড়ি দিত আমার বাবা।' ঠিক এই সময়টার কিছু পূর্বে গুরুদেবের অনুরাগী বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্যে একটা মস্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অনেকগুলি গ্রহনক্ষত্রের চার্ট দিয়েছিলেন। তন্ন তন্ন করে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হেলির ধূমকেতু, চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের কোথায় কী আছে— পাহাড়, সমুদ্র— সব দেখে নিতাম। জগদানন্দবাবু আমাদের এ-সব বিষয়ে যে-সব গল্প বলতেন সেগুলিই পরে ছেপে বের হল 'গ্রহনক্ষত্র' নাম নিয়ে। কীটপতঙ্গ-পোকামাকড়ের কত কাহিনী শুনেছি জগদানন্দবাবুর কাছে— কেমন তাদের বাসগৃহের ছাঁদ, কী তারা খায়, কী কাজ তারা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে গুরুদেব নিজেও গল্প বলতেন। তিনি খুব মনোরম করে গল্প বলতে পারতেন— তাঁর বলার ভঙ্গিতে গল্পের ভাবধারাটি যেন আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠত। একটি গল্প এখনো মনে আছে— সেটি গল্পগুচ্ছে 'গুপ্তধন' নামে বেরিয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেতে বসে গুরুদেব গল্পটি পড়ে শোনালেন। আমরা সবাই সেদিন মুগ্ধ হয়ে একমনে শুনলাম সেই কাহিনী। একটু একটু

গা ছমছম করেছিল। মনে আছে সে রাত্রিতে বহুক্ষণ মানসচক্ষে জেগে ছিল সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সুবিশাল মূর্তি, আর মনের গোপন অলিগলিতে গুন গুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই চিরকুটে লেখা রহস্যময় কথাগুলি—

পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় বাধা।
শেষে দিল রা, পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে।
ঈশান কোণে ঈশানী কহে দিলাম নিশানী॥

কখন যে তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে।

মাঝে মাঝে অভিনয় হত। খুব ছোটো বয়সে হত মুকুট। একটু বড়ো হলে করতাম আমরা হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের এক-একটা নকশা। 'রোগের চিকিৎসা', 'চিন্তাশীল', 'অন্ত্যেষ্টিসৎকার', 'বিনিপয়সার ভোজ' ইত্যাদি খুব জমত। সেগুলি যেন পুরোনো হত না। তার পর একাদিক্রমে 'শারদোৎসব', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'মালিনী' এবং 'রাজা' আমরা অভিনয় করেছিলাম। মাস্টারমশায়রা করেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। অভিনয়ের কথা যেগুলি বিশেষ করে এখনো মনে পড়ে সেগুলি পরে বলব। যতদূর মনে আছে 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী' অভিনয় হয়েছিল আমি চলে আসবার পর। গুরুদেব আমাদের জন্যে এই যে সব নাটক লিখতেন সাহিত্যের দিক থেকে তার মূল্য খুব বেশি এবং স্থান খুব উচ্চে সন্দেহ নেই; মানবজীবনের নিবিড় উপলব্ধিই তাদের উৎস সেও সুনিশ্চিত; তবু এ-ও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অভিনয়ে ও গানে, আনন্দে-উৎসাহে ছেলেদের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে মনের যাতে প্রসার হয় ও সৌন্দর্যবোধশক্তি যাতে সতেজ হয়ে ওঠে। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি কত চিন্তা করতেন তার ইয়ত্তা নেই।

দুপুরের খাবার পরে পালা করে সযত্নে পাতা কুড়িয়ে পরিষ্কার অভুক্ত খাবার গরিব অতিথিদের খাওয়ানোর কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া অভ্যাগত অতিথিদের সেবার কাজেও আমাদের লাগতে হত। পৌষ-উৎসবের সময় এক-এক দল ছেলে এক-এক ঘরের অভ্যাগতদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন পালা করে। অতিথিদের বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এখানে ওখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া—এই ছিল ছাত্রদের কর্তব্য। এ কাজে আমাদের উৎসাহ ছিল খুব। আগন্তুকেরাও আমাদের সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করতেন। এই-যে সেবার ভাব—জীবনগঠনে এর বিশেষ প্রয়োজন

বোধ করেছি।

আমাদের এক-এক ঘরে এক-এক জন ছেলে এক-এক সপ্তাহের জন্যে ক্যাপটেন বা দলপতি নির্বাচিত হতেন। তিনি যেই হোন— পড়াশুনায় সরেস কি মন্দ— তাঁর হুকুম তামিল করতেই হত। তাঁর ক্ষমতা যেমন ছিল তাঁর কর্তব্যও ছিল অল্প নয়। ঠিক সময়ে ছেলেরা ঘুম থেকে উঠলেন কি না, ভালো করে ঘর ঝাঁট পড়ল কি না, বিছানাগুলি পরিষ্কার করে গুটনো হল কি না— এ সবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। তার পর সার বেঁধে ছেলেদের নিয়ে যাওয়া খাবার ঘরে কি মন্দিরে— এও ছিল তাঁর কাজ। আর এক কাজ ছিল বুধবারে বুধবারে সাবু যখন আসত— ধোপাবাড়ির কাপড় মিলিয়ে নেওয়া, কাপড় ধুতে দেওয়া। আশ্রমের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করলে কিংবা অন্য ছেলের উপরে কোনো অন্যায় ব্যবহার করলে অভিযুক্ত আসামীকে হাজির হতে হত বিচার-সভায়। সে সভায় বিচারপতি হয়ে বসতেন ঐ ক্যাপটেন। পরে যখন আরো ছেলে বেড়ে গেল এবং আরো ঘর তৈরি হল তখন সকল ঘরের ক্যাপটেনেরা মিলে এই বিচারসভায় বসতেন। তাঁরা বিচার করে যা রায় দিতেন সেটা গ্রাহ্য করতেই হত। মারধর করে শাসন করবার রীতি একেবারেই ছিল না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অপমানটাই ছিল মোক্ষম শাস্তি। একবার একটি ছেলে গাছের পাকা পেয়ারা পেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে একা খেয়েছিল বলে তার একবেলার জলখাবার বন্ধ হয়েছিল। মাস্টারমশায়রা এর মধ্যে আসতেন না বা কোনোরকম [illegible] করতেন না। বস্তুত, বিচারসভা এমন উদ্ভট কিছু রায় কখনো দেয় নি যার জন্যে মাস্টারমশায়দের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন হতে পারত। আমাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এইরকম করে ভালো ভাবেই চলত।

যতদূর মনে আছে মাস্টারমশায়দের মধ্যেও এক-এক জন এক-এক সময়ে সর্বাধ্যক্ষ হতেন। সেখানেও বড়ো-ছোটো ছিল না। নিজেরাই একজনকে সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। ফলে মাস্টারমশায়দের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। সর্বাধ্যক্ষ-নির্বাচন বেতনের হারের উপর নির্ভর করত না। অধ্যাপক-সভা ছিল— সেখানে মাস্টারমশায়রা বসে ছেলেদের কল্যাণকর বিষয়গুলির আলোচনা করতেন। গুরুদেব অনেক সময় অধ্যাপক-সভায় নানা নূতন প্রস্তাব করে আলোচনা ধরিয়ে দিতেন এবং মাস্টারমশায়দের মতামত জেনে নিতেন।

প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হত। মন্দিরে প্রবেশের দরজার উপরকার

লোহার খিলানের মাঝখান থেকে একটি বড়ো ঘণ্টা সেকালে ঝুলত। উপাসনার মিনিট-পাঁচেক আগে থাকতে গুরুদেব সেই ঘণ্টাটিকে বাজিয়ে সকলকে উপাসনায় ডাকতেন। দু-একজন নিষ্ঠাবান লোক দূর বোলপুর শহর থেকেও আসতেন এই বুধবারের উপাসনায় যোগ দিতে। আমরা ছেলেরা সার বেঁধে এসে মন্দিরের শুভ্রশীতল শ্বেতপাথরের মেঝের উপর বসতাম জোড়াসন কেটে, যুক্তকরে। তানপুরা ও এসরাজের সঙ্গে গান গেয়ে উপাসনা আরম্ভ হত। ভিন্ন ভিন্ন বুধবারে ভিন্ন ভিন্ন গান হত। কখনো হত পুরানো গান, কখনো হত গুরুদেবের সদ্য-রচিত ব্রহ্মসংগীত। কয়েকটা গান এখনো মনে আছে। প্রায়ই হত—

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।

অনেক সময় শুনেছি—

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আভাস পাই।

আরো কত গান সে আর কত বলব। গানের পরে গুরুদেব উপাসনার প্রারম্ভে সুললিত স্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

ভগবৎ-আরাধনার পর গুরুদেব এক-এক বুধবারে উপনিষদের এক-একটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন ও শেষে উপদেশ দিতেন। মন্দিরে গুরুদেব যা বলতেন তার সারমর্ম 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থপর্যায়ে ছাপা হয়ে বের হত। উপদেশের শেষে আবার গান গেয়ে উপাসনা সাঙ্গ হত। পরবর্তীকালে গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ক্ষিতিমোহন সেন মশায় মন্দিরে উপাসনা করতেন। কবীর, নানক, দাদূ, মীরাবাঈ এবং আরো কত সাধুসজ্জনের ভক্তবাণী তিনি শোনাতেন এবং কী সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই তিনি দিতেন! আশ্রমের সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা হত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও শ্রুতিমধুর সুরে। সে-সব মন্ত্রের মানে বোঝাবার বয়স তখন আমাদের হয় নি— এখনো যে বুঝি পূর্ণভাবে তা বলতে

পারি নে। কিন্তু সেই বালক ও কিশোর বয়সে শুনে শুনে যে মন্ত্রগুলি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় এখনো তা ভুলি নি। মন্দিরের মধ্যে ফুলের সুবাস, ধূপের পবিত্র গন্ধ, বেদ-উপনিষদের মন্ত্রের বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য এবং ব্রহ্মসংগীতের আনন্দহিল্লোলিত ঝংকার একত্র মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করত। আমাদের অপরিণত মনে তা যে আমাদের অন্তরের গভীরে গোপনে নীরবে কাজ করে গেছে, ব্যর্থ হয় নি একটুও—এ কথা আজ জোর করেই বলতে পারি। ঈশ্বর-প্রীতির তাৎপর্য বুঝেছিলাম অস্পষ্ট আভাসে— অলক্ষ্য প্রভাবে সেই অস্পষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমার জীবন।

৬

অরুণ-আলোর অঞ্জলি নিঃশেষ করে দিয়ে শারদলক্ষ্মী হেমন্তের কুয়াশার অন্তরালে বিলীন হয়ে গেলেন। শিশির-ভেজা তৃণদলের ডগায় ডগায় সকালে-সন্ধ্যায় কে যেন অঞ্জলি ভরে মুক্তো ছিটিয়ে দিতে লাগল। দিনগুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে বিকেল হতে-না-হতেই সূর্যদেব পশ্চিমপাটে রক্তিম আভা ছড়িয়ে অস্ত যেতে শুরু করলেন। আমলকীরা শাখা-সার হয়ে এল পাতা ঝরিয়ে আর শীতের আমেজে আমাদের গা উঠল সির্‌সিরিয়ে। আমার আশ্রমবাসের প্রথম বৎসরের শেষ দিকে হেমন্ত ও শীতের সন্ধিক্ষণে সাতই পৌষের অগ্রদূতেরা আসতে শুরু করলেন একে একে, আশ্রমে যেন একটা জীবনচাঞ্চল্য দেখা দিল। শান্তিনিকেতনের বড়ো দোতলা বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে আশ্রিত পরিজনদের যে-সব ঘরগুলি আছে তাতে লোকসমাগম হতে লাগল। কত-রকম কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে তৈরি কত রকমের খাঁচা এদিকে ওদিকে রোদে শুকোচ্ছে দেখতে পেতাম। শুনলাম যে বড়ো বড়ো ওস্তাদ বাজি-করেরা সাতই পৌষের মেলার জন্যে কত রকম-বেরকম বাজি তৈরি করছেন। ও অঞ্চলে আমাদের যাতায়াত মাস্টারমশায়রা পছন্দ করতেন না। তাই দূরে থেকে আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মেরে যতটুকু জানা যায় তাতেই খুশি থাকতে হত। শুনলাম যে সেবার নাকি একটা মস্ত বড় মানোয়ারী জাহাজ থেকে জলন্ত গোলা বর্ষণ হবে পাড়ের বড়ো কেল্লাটার উপর। কে হারে কে জেতে তাই ভাবতে ভাবতে আমরা বিভোর হয়ে যেতাম। আনন্দে উৎসাহে দিন গুনতে লাগলাম।

সাতই পৌষ আশ্রমবাসীদের ভক্তিভরে স্মরণীয় এক পুণ্যদিন। এই দিনে মহর্ষিদেব কয়েকজন সমবিশ্বাসী ধর্মবন্ধুগণের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই দিনটিকে গুরুদেব যে কত বড়ো স্মরণীয় দিন মনে করতেন তা তাঁর সাতই পৌষের ভাষণগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। আত্মার মুক্তিই হচ্ছে সাতই পৌষের মর্মবাণী। তাই এই পুণ্যদিনে গুরুদেব তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষিদেবের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্রকৃতির কোলে ভূমার আলিঙ্গনে ভক্ত-জীবনের মঙ্গলময় প্রভাবে সুকুমারমতি বালকেরা বেড়ে উঠে মুক্তির আভাস পেয়ে ধন্য হবে। সাতই পৌষের এই মর্মকথাটি আশ্রমবাসী সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

সাতই পৌষের দিন-তিনেক আগে থাকতেই লোকসমাগম শুরু হল। কত দূর গ্রাম থেকে গোরুর গাড়িতে পসরা বোঝাই করে কত দোকানী পসারী আসতে লাগল। কত রকমের হাঁড়ি কলসী— কোনোটা বা লাল, কোনোটা বা কালো। কত দরজা-জানালাই না জড়ো হল। দুটো-তিনটে নাগরদোলা এবং একাধিক চড়কি ঘোড়দৌড়ের মঞ্চ। এক-এক পয়সায় কত পাক খাওয়া যেত সেকালে। গালার কত রকমারি জিনিস— আম আতা কলা শশা টিয়েপাখি হরিণ হাতি ও বাঁদর। তা ছাড়া নানা আকারের কাগজচাপা এবং আরো কতরকম খেলনা ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। বাঁশের ছোটো বড়ো ছড়ি, মুখোশ, তালপাতার টুপি ও হাতপাখা তো থাকতই। হরেকরকম খাবারের দোকান, মিঠাই মণ্ডা ও পাঁপড়ভাজা। বড়ো বড়ো বাক্সের মধ্যে কত রকমের ছবি দেখাত সামনের কাচ-বসানো বড়ো দুটো ফুটো দিয়ে। আর ছবির চেয়ে রসালো হত সেই বাক্সওয়ালার সুর করে বলা বর্ণনাগুলি। কত বিক্রি হত সাঁওতালি মেয়েদের রুপার গহনা— কানের ঝুমকো, গলার হার, খোঁপার ফুল এবং হাতের বাউটি। আমরা কিছু কিনতাম আমাদের বোনেদের জন্য। কত আসত তাঁতের বোনা কাপড়, বেড-কভার, গামছা। কত-না থাকত মনোহারী দোকান— সামনে ঝুলত একটা করে প্রকাণ্ড আয়না, দোকানের চেহারা যাতে খোলে। কী বিরাট জনসমাগম! সাতই পৌষের মেলা এই অঞ্চলের লোকেদের একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু— সবাই উন্মুখ হয়ে থাকত এই বাৎসরিক মেলার জন্যে। নিজেদের তৈরি শিল্প-দ্রব্য বেচে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে তারা ঘরে ফিরত

দু-তিন দিন কাটিয়ে। আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। কবির লড়াই বা যাত্রাগান শুনে শেষ রাত্রে অনেকেই সেই আসরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। দ্বিপু-বাবুমশায় যখন নিজে গিয়ে যাত্রার আসর জাঁকিতে বসতেন তখন বহু লোক ঠাকুরবাবুকে দেখে কৃতার্থ হয়ে যেত। সাঁওতাল নরনারীর নৃত্য চলত মৃদঙ্গের তালে তালে রাতদুপুর পেরিয়ে।

এই কলকোলাহলের মধ্যে মন্দিরে সন্ধ্যার সময় উপাসনা করলেন গুরুদেব নিজে। মন্দিরের সমস্ত ঝাড়গুলিতে মোমবাতি জ্বালানো হল এবং তার আলো কাচের মধ্যে তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। বাইরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে গুরুদেবের সুললিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'যো দেবোঽগ্নৌ' মন্ত্র। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন বাইরের গোলমাল আমরা শুনতেই পাই নি। একান্তমনে বিহ্বলচিত্তে শুনে নিলাম উপাসনা। আমাদের সেই বালকবয়সে গুরুদেবের উপাসনার সত্য তাৎপর্য বোঝবার শক্তি একেবারেই হয় নি। কিন্তু একটি অনির্বচনীয় আনন্দে যে মনটা ভরপুর হয়ে উঠেছিল সে কথা আজও ভুলি নি।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটো ছোটো দল বেঁধে এক-একজন মাস্টারমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা বাজি দেখতে গেল। তখনকার দিনে বাজি পোড়ান হত বর্তমান রতনকুঠির উত্তর-পূর্ব দিকে। প্রথমেই সোঁ সোঁ করে উঠল একটা হাউই, বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে দারুণ একটা আওয়াজ করল। সবাই বুঝে নিল এবার বাজি পোড়ানো আরম্ভ হবে। তার পর কত-না তুবড়ি আগুন-ফুলি ফোয়ারা ছোটালো, কত রকমের হাউই উঠতে লাগল কত রকমারি আলো জ্বালিয়ে। কোনোটা ফেটে পড়ল লাল নীল ফুলঝুরি হয়ে, আবার কোনোটা ক্ষান্ত হল একটা মস্ত বোমার আওয়াজ করে। বাজিকরেরা আগুন ধরিয়ে দিতেই সে আগুন চট্‌পট্‌ এদিক-ওদিকের ডালপালাতে ছড়িয়ে গিয়ে জ্বলে উঠল কত বিচিত্র গাছ, যার ডালে ডালে ঝুলে পড়ল রঙবেরঙের আলোর ফুল। বেশ খানিক ক্ষণ চলল এই-সব বাজি। এরকম অদ্ভুত সুন্দর বাজি আমি তো আগে কখনো দেখি নি— মনটা উল্লাসে ভরে উঠেছিল। শেষে আগুন ধরালো প্রকাণ্ড দুটো কাঠামে। প্রদীপ্ত শিখায় দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ল একটা মস্ত বড়ো জাহাজ আর কিছু দূরে পর্বতশিখরে একটা দুর্গের চূড়া। তার পর শুরু হল সশব্দে কামান দাগা। গোলাগুলি এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে চলেইছে। কে জেতে কে

হাবে কে জানে। আস্তে আস্তে নিভে গেল জাহাজের আলোগুলি, দুর্গ থেকে তখনো দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ আসছিল জাহাজটাব দিকে। বোঝা গেল জাহাজটাই ঘায়েল হয়ে নিভে গেল। অনেক বাতে প্রাক্‌কুঠিবে ফিবে এসে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পডা গেল। সাবাদিন ভলাণ্টিয়াবি করে এবং বাত্রে বাজি পোডানো দেখে শবাবটা যেন এলিয়ে পডল ঘুমে। মেলাব মাঠের কল-কোলাহল তখনো চলেছে।

৭

দেখতে দেখতে প্রায় দুই বছব আশ্রমবাস সাঙ্গ হলে আবাব গ্রীষ্মেব ছুটি এল। তখন পড়ে গেল বাড়ি যাবাব তাডা। কোনো কোনো ছেলের অভিভাবক নিজেই এলেন কিংবা লোক পাঠিযে দিলেন ছেলেকে নিয়ে যেতে। যাঁদেব নেবাব জন্মে বাড়ি থেকে কেউ এলেন না তাঁদেব ছোটো ছোটো দলে ভাগ কবে এক-একজন মাস্টাবমশায়েব জিম্মা কবে দেওয়া হল। কয়েক দল ছেলে যাবেন উত্তবে বামপুবহাটেব দিকে, বাকি সকলে যাবেন কলকাতায়— যাঁবা পূর্ববঙ্গেব তাঁবা সেখান থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ কুমিল্লা ও ত্রিপুবাব উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। এবাব আব আফতাবুদ্দি মিঞাব বয়েল গাডি পাওয়া গেল না— কী কবে কুলোবে এত ছেলে আব বাক্সপ্যাটবা ও বিছানা ঐ ছোটো বাসে। তাই এবাবে ব্যবস্থা হয়েছিল কয়েকখানা ছই-ঢাকা গোরুব গাড়িব। আমাদেব নানা আকাবেব টিনেব বাক্স এবং বিবিধ বঙেব শতরঞ্জি মোডা বিছানাগুলি গোরুব গাডিতে চাপিয়ে দিয়ে কেউ কেউ গোরুব গাডিতেই উঠে পডলেন এবং তাব মধ্যে যাঁবা বেশি হুঁশিয়াব ও উৎসাহী তাঁবা গাডোযানদেব তোয়াজ কবে বলদ হাঁকাতেও লেগে গেলেন। আমবা বেশিব ভাগ ছেলে পদব্রজেই বওনা দিলাম। সঙ্গে চলল লাঠিহাতে সেই সর্দাব। পিছন আগলিয়ে চললেন মাস্টাবমশায়বা। সেই পরিচিত রাঙা মাটিব পথ বেয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় সদ্য-শেখা গান গাইতে গাইতে যখন বোলপুব শহবে পৌঁছলাম, দোকানপসাবীবা চিনে নিলেন যে ঠাকুববাবুদের ইস্কুলেব দাদাবাবুবাই বটে— বুঝলেন যে আমবা ছুটিতে বাড়ি চলেছি।

তখনকাব দিনে বোলপুব থেকে কলকাতায় অর্থাৎ হাওডায় যেতে, স্পষ্ট মনে আছে, তৃতীয় শ্রেণীব বেলমাশুল লাগত একটাকা সোয়া পাঁচ আনা। মাস্টাবমশায় বাজেনবাবু ছুটিব সময় কলকাতাযাত্রী ছেলেদের প্রত্যেককে দুটি

কবে টাকা দিতেন। নেহাত যাঁরা ছোটো তাঁরা ছাড়া অন্য সকলে নিজেরাই টিকিট কিনতাম। বাকি থাকত হাতে যে পৌনে এগারো আনা পয়সা তার কোনো হিসেবনিকেশ দিতে হত না। সেটাব সদ্ব্যবহাব হত বর্ধমান স্টেশনে। এই সময়ে ছেলেদেব প্রকৃতিগত প্রভেদটা বোধ হয় একটু বেবিয়ে পড়ত। কেউ-বা কিনত মিহিদানা ও সীতাভোগ আব কেউ-বা চিংড়িমাছ বা মাংসের প্যাটি। সে সময় বাক্স মাথায় কবে 'গবম প্যাটি' ফিবি কবে বেড়াত ফিরিওয়ালাবা। অনির্বচনীয় সুস্বাদু ছিল সেই জলখাবাব। এখনো যখনই যাই বর্ধমান স্টেশন দিয়ে, গাড়ি থামলেই মনে পড়ে ছেলেবেলাকাব বাড়ি ফেবাব কথা। গাড়িব জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি— বুঝি প্যাটিওয়ালা আসছে। কিন্তু আজকাল আব তাদেব দেখি নে, 'গবম প্যাটি' ডাকও শুনি নে— মিহিদানা কি সীতাভোগেও সে বস আব নেই। সেটা যে কেবল মিহিদানা ও সীতাভোগেবই দোষ তা নাও হতে পাবে। ঘিয়েব বদলে দালদা চালালে খানিকটা বসবিকাব ঘটবেই— তবে অনুমান কবি যে তেবোব সঙ্গে চুয়াত্তব বছব বযসেব ব্যবধানটাও তাব অন্যতম কাবণ হতে পাবে।

কলকাতায় ফিবে দিনকতক খুব সমাদবে থাকা গেল। মা মনে করলেন ছেলেটা নিবামিষ খেয়ে খেয়ে বোগা হয়ে গেছে। বাবা একটু চাপা স্বভাবের ছিলেন। সহজে হৃদয়াবেগ প্রকাশ কবতেন না। কিন্তু একদিন মাঝবাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি তিনি আমাব কণ্ঠাব কাছে হাত বুলিয়ে দেখছেন। আমি উসখুস কবতেই হাত সবিয়ে নিলেন। ফলে খাওয়া-দাওয়াটা খুব ভালো ভাবেই চলল। এ ছাড়া আমাব খাতিব ছিল বৌঠান বাসন্তী দেবী এবং বড়-দিদি অমলা দাসেব কাছে। কী কী নতুন গান 'ববিকাকা' লিখেছেন এবং আমাদেব শিখিয়েছেন তাব মহড়া দিতে হত প্রত্যহ সন্ধ্যায়। ছুটিব দিনগুলি পবমানন্দে কাটতে লাগল। কিন্তু অল্পদিনেব মধ্যেই জ্ববে পড়লাম। সে কী কাঁপুনি দিয়ে ধুম-জ্বব— প্রায় বেহুঁশ হয়ে যেতাম। কয়েকদিন পব জ্বব ছেড়ে যেত। আবাব পূর্ণিমায় কি অমাবস্যায় কি একাদশীব দিন জ্বব আসত। এমনি চলল এক মাসেব উপব। একবাব বাবা নিয়ে গেলেন কর্নেল এন. পি. সিনহাব বাড়িতে। তিনি তখন সবকাবী কাজে অবসব নিয়ে কলকাতায় ডাক্তাবি ব্যাবসা কবছিলেন। তিনি পবীক্ষা কবে বায় দিলেন যে আমাকে ম্যালেবিয়ায় ধবেছে। তখনকাব দিনেব ম্যালেবিয়াব একমাত্র ওষুধ কুইনিন-মিক্সচার চলল সপ্তাহের পব সপ্তাহ। ও দিকে গ্রীষ্মেব ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল।

কিন্তু মা বেঁকে বসলেন যে এইবকম দুর্বল শবীবে ছেলেকে কাছ-ছাডা কবা যেতে পাবে না। ফলে সে বছব ছুটিব পব আমাব আর আশ্রমে ফেবা হল না।

কিছুদিন পর শবীবটা যখন চাঙ্গা হল তখন ঠিক হল আমাকে কলকাতাব কোনো ইস্কুলেই ভর্তি কবা হবে। সে সময শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মিত্র প্রতিষ্ঠিত মিত্র ইনস্টিট্যুশনেব খুব নামডাক। ভবানীপুর কাঁসাবিপাডায় এক ভাডাটে বাড়িতে সেই ইস্কুলেব একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে সেখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস ছিল। তাব পব যেমন যেমন ছেলেবা বার্ষিক পবীক্ষা দিয়ে পাস হতে লাগল সেইসঙ্গে এক-একটি কবে ক্লাসও বাডতে লাগল। সতীশচন্দ্র বসু মশায় ছিলেন প্রধানশিক্ষক এবং হবিদাস কব মশায় ছিলেন ইস্কুলেব পবিদর্শক। বিশ্বেশ্ববাবু প্রত্যহ একবাব কবে এসে ক্লাস পবিদর্শন কবে যেতেন। আমি ভর্তি হলাম চতুর্থ শ্রেণীতে। তাব উপবে তখন আব একটি-মাত্র ক্লাস ছিল। সে ক্লাসে যাঁবা পডতেন তাঁদেব মধ্যে ছিলেন আজকালকাব স্বনামধন্য ব্যবহাবজীবী ও দেশনেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। বছব খানেকেব একটু উপবে সেই ইস্কুলে পডেছিলাম এবং সুশীলচন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রমুখ কয়েকটি সতীর্থকে প্রীতিভাজন সুহৃদ্‌রূপে পেয়েছিলাম।

এইখানে এব আগে-পিছে ঘটেছিল যে কয়েকটা ঘটনা তাব উল্লেখ কবা সংগত হবে বলে মনে কবি। আগেই বলেছি যে মধ্যেব বাডিব কালীমোহন তাঁব উইলে তাঁব স্ত্রী চন্দ্রমণিকে দত্তকপুত্র নেবাব অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেই অনুমতিব বলে চন্দ্রমণি তাঁব দেবব ভুবনমোহনেব কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমাব আমাদেব ভোলাদাদাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ কবেন। সেই দত্তক গ্রহণকে নাকচ কববাব জন্যে কুসুমেব নাম দিয়ে তাঁব স্বামী যে মামলা করেছিলেন সেই মামলাটা কিছুকাল চলবাব পব সালিসেব মাধ্যমে আপোষে মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। আপোষেব শর্তানুসাবে কিবকম ভাগ-বাঁটোয়াবা হয়েছিল তা সঠিক আমি শুনি নি। তবে মোটামুটি শুনেছিলাম এবং চাক্ষুষ দেখেছিলাম যে জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনেব ১৪৭ নং বসা বোড বাডি যেখানে আমি জন্মেছিলাম সে বাডিটি কুসুম পেলেন এবং জ্যাঠামশায় কালীমোহনেব ১৪৮ নং বসা বোড বাডি ও তৎসংলগ্ন জমি, পুকুব, শিবমন্দিব ইত্যাদি পডল ভোলাদাদাব অংশে। জ্যাঠামশায় কালীমোহনেব বাড়িটিব আমূল সংস্কার ও বিস্তর পবিবর্ধন কবে তাব নাম দেওয়া হল

'কালীমোহন আলয়'। জ্যাঠামশায় ভুবনমোহন ও জ্যেঠিমা নিস্তারিণী ভোলাদাদা ও অন্যান্য পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে এলেন কালীমোহন আলয়ে এবং বড়ো বৌঠান দুর্গাসুন্দরী তাঁর মেয়ে কুসুম ও কুসুমের স্বামী ও কন্যা সরযুকে নিয়ে ১৪৭ নং রসা রোড বাড়িতে চলে গেলেন। জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের পরিবার কালীমোহন আলয়ে উঠে আসবার আগে আমরা ছিলাম ঐ বাড়ির বড়ো বৈঠকখানা ও তৎসংলগ্ন কটা ঘরে। বাবা সেখানে ছিলেন ভোলাদাদার হয়ে বাড়ি দখল করে। কিন্তু আপোষে মিটমাট হয়ে যাবার পর আমাদের সেখানে থাকার আর প্রয়োজন রইল না। তা ছাড়া বাড়িখানার বিস্তৃত ভাঙাচোরা ও মেরামতের কাজ হবে বলে বাবা প্রথমে ঐ বাড়ির পেছনে ২১ মাথা খেজুর গাছওয়ালা বাড়ির পাশের একতলায় ও পরে আবার ২১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের এক ভাড়া-বাড়িতে উঠে গেলেন। আমি তখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তে গেছি।

শান্তিনিকেতনে যাবার পর যে প্রথম দুর্গাপূজার ছুটি হল তখন আমি এসে উঠলাম ২১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের বাড়িতে। দেখলাম বাড়িটি ছোটো, একতলা বাড়ি এবং ঘরগুলিও ছিল বেশ অপরিসর। বাড়ির দক্ষিণে ছিল সরকারী রাস্তা কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন। রাস্তার পরেই ছিল একটা চওড়া কাঁচা দুর্গন্ধ নর্দমা। কর্পোরেশনের জমাদারের মর্জি হলে সপ্তাহে একবার সেই নর্দমাটা সে একটা লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করে যেত এবং তখন সেখান থেকে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে যে বিষম দুর্গন্ধ বের হত তা যেন এখনো নাকে লেগে আছে। বাড়ির পশ্চিম গা দিয়ে ঐ লেনেরই একটি উপশাখা সোজা উত্তরে গিয়ে পড়েছে বড়ো রাস্তা হাজরা রোডের উপরে। সেই বড়ো রাস্তার ওপারেই ছিল কর্পোরেশনের ময়লাবাহী জমাদারদের বস্তি এবং তার পরই ছিল ময়লার ডিপো অর্থাৎ যত রাজ্যের খাটা পায়খানার ময়লা সেখানে ফেলে পাম্প করে মাটির নীচের নর্দমাতে চালিয়ে দেওয়া হত। বাড়ির পশ্চিমে যে ছোটো গলি ছিল সেখানে ছিল একটি খিড়কি দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেই পাওয়া যেত একটা ছোট্ট উঠান ও তারই একপাশে ছিল রান্নাঘর। ছাতে উঠবার কোনো সিঁড়ি ছিল না। সেটা ভালোই হয়েছিল, কেননা তাতে কোনো রেলিং দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

২১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে বাসের কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। পাশের বাড়িতে ছিলেন বঙ্কিম বলে আমার বয়সী একজন ছেলে। তাঁদের পবিবাব ছিল কালীঘাটেব বিখ্যাত পীঠস্থানে অবস্থিত কালীমন্দিরের এক ঘব সেবায়েত। তাঁদের বাড়িব পবেব বাড়িতে থাকতেন একটি পবিবাব যাঁদেব সঙ্গে আমাদেব বেশ ভাব হয়েছিল। তাঁদের বাড়ির একটি ছেলেব নাম ছিল ক্ষিতীশ বায়। বঙ্কিম ও ক্ষিতীশ আমাদেব বাড়ি প্রায়ই আসতেন এবং আমিও যেতাম তাদেব বাড়িতে। আমাদেব ছোটো পিসিমা বাখালীব চাবজন ছেলেই তখন আমাদেব সঙ্গে এই বাড়িতে ছিলেন। তার মধ্যে যিনি বড়ো অপাদাদা (অপূর্বকুমাব) তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পবীক্ষা পাস কবে ডাক্তাব হবাব পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বাড়ি থেকেই বেঙ্গুনে যান ভাগ্যানুসন্ধানেব ধান্দায়। সেখানে গিয়ে অপাদাদাব বেশ প্র্যাকটিস জমেছিল। তাঁব বিয়ে হয়েছিল ভবাকব গ্রামেব দাবোগাবাড়ির মেয়ে তবলাব সঙ্গে। মা-ই এই বিয়ে ঠিক কবেছিলেন। সেই বৌঠানটিব বঙ ছিল ময়লা কিন্তু মুখেচোখে বুদ্ধিব দীপ্তি ছিল। লেখাপড়াও জানতেন কিছু কিছু। এঁদেব একটি মাত্র ছেলে শিশিব বেঙ্গুনে জলে ডুবে মাবা যাওয়ায় তাঁব বাপ মায়েব জীবনেব সকল সুখ ও আশা সমূলে মুষড়ে গিয়েছিল। সেজো পিসতুতো ভাই রোহিণী গেলেন বাঁকীপুবে এবং সেখানে একটি মণিহারী দোকান কবে বেশ দু পয়সা কবছিলেন। সেজো ভাই আমাদেব সোনাদাদা বেবতীও গেলেন বাঁকীপুবে মেজো ভাইয়েব অংশীদাব হয়ে। সচবাচব যা ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও তাব ব্যত্যয় হল না। অর্থাৎ অল্পদিনেই দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়ে সে কাববাব গেল উচ্ছন্নে। সোনাদাদা কলকাতায় ফিবে এলে বাবা তাঁকে কর্পোবেশনে বেলিফের চাকবিতে ঢুকিয়ে দেন। সেই চাকবি পেয়ে তিনি নিজ বাসায় গেলেন। ছোটো ভাই আমাদেব টোনা দাদা বইলেন আমাদের সঙ্গে। তখন তিনি বি.এ. পড়ছিলেন।

আমবা যখন পতিতুণ্ডি লেনে ছিলাম তখন আমাদেব বাড়িতে এলেন একজন আত্মীয়া, তাঁব মতো মানুষ দেখাই যায় না। তিনি হলেন আমার ঠাকুর্দা গোপীমোহনেব জ্ঞাতি-সম্পর্কে মামাতো ভাইয়েব বিধবা পত্নী। বাবা তাঁকে ডাকতেন সুন্দবখুড়ি বলে আব মা বলতেন সুন্দবঠাইন। এঁবই কন্যাব নাম ছিল কমলা, যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটেব রাজু

জ্যাঠামশায়ের। ইনি আমার মেজো ভাই নস্নুকে ভালোবাসতেন আপন নাতিরই মতো। আমরা এঁকে ডাকতাম 'ঠাকুমা' বলে। আমার আপন ঠাকুমাকে আমার মনে নেই। আমার ভাইবোনেরা কেউ-ই তাঁকে দেখেও নি। আমরা এই মহীয়সী নারীকেই আমাদের আপন ঠাকুমা বলে ভাবতাম এবং ভালোও বাসতাম। আর তেমনি তিনি ভালোবাসতেন আমাদের, বিশেষ করে নস্নুকে। আমাদের এই ঠাকুমার মুখে কখনো কারো নিন্দে শুনি নি। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করতাম—'ঠাকুমা গো, অমুকে কেমন গো?' তৎক্ষণাৎ জবাব দিতেন, 'বড়ো ভালো রে। বড়ো ভালো।' আমরা অনেক সময় পরখ করবার জন্যে এমন মানুষের নাম করেই প্রশ্ন করতাম যে মানুষ সম্বন্ধে কেউ ভালো বলতেই পারে না। ঠাকুমা নাম শুনে নিজের চোখ মুছে বলতেন, 'বড়ো দুঃখী মানুষ রে। সেই লেইগ্যা ওর মনটা এমনই হৈয়া গেছে।' এত বড়ো মন ছিল ঠাকুমার। নস্নুর পরেই বোধ হয় আমার স্থান ছিল ঠাকুমার মনে। খুকী, গুগু তত পাত্তা পেত না সেইখানে। রাত্রে ঠাকুমার দুই পাশে শুতাম নস্নু আর আমি। গল্প বলতেন ঠাকুমা। গল্প শেষ হলে ঠাকুমা শ্রীকৃষ্ণের শতনাম স্তব করে আবৃত্তি করতেন। এটা ছিল তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে। শুনতে শুনতে আমার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখনো কয়েকটা ছত্র মনে আছে সেই শতনামের এ জায়গা ও জায়গা থেকে। এখনো রাত্রে যখনি ঠাকুমার কথা মনে ভাবি অমুনি মনে পড়ে যায় সেই টানা-টানা একঘেয়ে অথচ মিষ্টি সুরে শ্রীকৃষ্ণের শতনামের সুললিত পদগুলি।

আর আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসে তন্দ্রায় যেমন করে ঘুমিয়ে পড়তাম সেই কিশোর বয়সে ঠাকুমার কোলে।

এই ঠাকুমার একটি বোনপো ছিলেন উপেন্দ্রমোহন, যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার ঠাকুরমামা যোগেশচন্দ্রের বড়ো মেয়ে বড়কি দিদির। ঠাকুরমার ছোটো বোনকেও আমি দেখেছি। কয়েকবার তিনি আমাদের বাড়ি এসেছেন। রঙ ময়লা, পাতলা গড়ন। বয়েস তখন প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে। ঠাকুমা একদিন বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন যে তাঁর এই বোনটির খুব অল্পবয়সেই বিয়ে হয়েছিল বেশ ভালো ঘরেই। কিন্তু বিয়ের পরদিনই এঁর বরটি কলেরা রোগে মারা গেলেন। এঁর নাকি শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই হয়নি। ঠাকুমার চোখে জল দেখে আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এঁকে অলক্ষুণে অপয়া বৌ বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাপের বাড়ির লোকেবা মুখে না বললেও যদি এঁকে গলগ্রহ মনে করে থাকেন তাতে আর আশ্চর্য হবাব কি আছে। এই শ্বশুরবাড়ি থেকে খেদানো বৌ এবং বাপের বাডিব অনাদরে তাড়িত মেয়েটি তাঁব অনতিদীর্ঘ জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে গেছেন সেই বাসব-ঘরেব একটি রাতেব স্বামী সহবাসেব স্মৃতি-সুবভিটুকু সম্বল কবে। যেদিন প্রথম এই করুণ কাহিনীটি শুনি তাব পবদিন এই অভাগিনী বমণীব বেদনাতুব চোখেব দৃষ্টি যে আমার কিশোব হৃদয়কে ভরে তুলেছিল বিগলিত করুণায় তা এখনো মনে আছে।

এই ২১ নং বাড়িতে আব একজন ছিল যাব কথা স্পষ্ট মনে আছে। সে ছিল একটি বৃদ্ধা পবিচাবিকা। তাঁর দেশ ছিল বিহাবে। কথাবার্তায় 'বা' শব্দটার প্রাচুর্যে অনুমান করি সে ভোজপুবী হিন্দি বলত। নসুব জন্যে তাকে রাখা হয়েছিল। নসু ছোটো বয়স থেকেই কেমন যেন পেটবোগা ছিল।' মায়ের কাছে শুনেছি যে ও যখন বেশ হামাগুডি দিয়ে চলে এবং একটু একটু হাঁটতেও শিখেছে তখন হামাগুডি দিয়ে ও কোথা থেকে একটা কেবাসিনেব ডিবে হাতে পেয়েই সেটাব পলতেব কাছটা খুলে চোঁ কবে কেবাসিন তেল খানিকটা খেয়েই চিৎকাব কবে উঠেছিল। সেই থেকেই নাকি ওর পেটেব গোলমাল লেগেই থাকত। মাব তখন শবীব খাবাপ সেইজন্যে নসুকে সামলাবাব জন্যে ঐ দাসীটিকে বাখা হয়েছিল। অসাধাবণ মমতা ছিল তাব নসুব উপবে। নিজে যা জলখাবাব পেত মাব কাছ থেকে, সে মুড়িই হোক কি মোয়াই হোক, তাব থেকে নসুব একটু ববাদ্দ থাকতই। এই পরিচাবিকাটি মাকে পবামর্শ দিয়েছিল যে তাদেব দেশে পেটরোগা দুর্বল ছেলেদেব নাকি ছাগলেব দুধ খাওয়ায়। নসুব জন্যে ছাগলের দুধেব বন্দোবস্ত হল। একটি লোক নিত্য একটি ছাগল নিয়ে আসত। সে ছাগলটার দুধের বাঁটের উপর পর্যন্ত সমস্ত ওলনটা বালিশের ওয়ারেব মতো একটা থলে দিয়ে বাঁধা থাকত। মা আমাদেব বুঝিয়ে দিলেন যে ওটা না থাকলে বাচ্চাটা দুধ খেয়ে ফেলবে এবং তারই প্রতিষেধক এই ব্যবস্থা। ছাগলের দুধে নসুর কিছুটা উপকারই হয়েছিল এবং সেইজন্যে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত কবা হল মস্ত বড়ো ব্রাউন রঙের দাড়িওয়ালা একটা রাম ছাগী কিনে। সেটা

থাকত ২১ নং-এর পেছনের উঠানটায়। সেই বিহারী দাসীই এ জীবটির পরিচর্যা করত এবং দুধ দোয়াত। পরে মা-ও শিখে গেলেন ছাগলের দুধ দোহন করতে। ছাগল-ছানা যেমন মায়ের দুধের ওলনটায় ঢুঁ মেরে মেরে দুধ নামায় মা-ও তেমনি হাত মুঠো করে ছোট্ট ছোট্ট ঘুঁষির মতো দিলেই বাঁট দুটো আবার দুধে ভরে যেত। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। এই ছাগলটার কত যে বাচ্চা হয়েছে এবং মা যে কত ছাগল-ছানা বিলিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২০শে তারিখে গোধূলির ধূসর আলো যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম করেছিল সেই লগ্নে সেই ২১ নং বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হলেন এখন যিনি আমাদের ছোটো ভাই। সন্ধ্যার সময় হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল প্রদোষরঞ্জন। সেদিনটি ছিল বুধবার। তাই মা সে ছেলেকে ডাকতেন 'বুধা' বলে। সেইটেই হয়ে গেল তাঁর ডাকনাম। আমাদের স্বভাবতঃই খুব আহ্লাদ হয়েছিল নূতন ভাই আসার জন্যে। তা ছাড়া আমরা ভাইয়েরা তিনজন হয়ে বোনেদের চেয়ে দলে ভারি হলাম। সেবারকার পূজার ছুটির পর আমি ফিরে গেলাম শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করবার জন্যে। খুকী তখন যেতো আমাদের ঐ ২১ নং বাড়িরই খুব কাছে মহাকালী পাঠশালার একটি শাখা স্কুলে। গুণ্ড তখন স্কুলে যেত কিনা মনে নেই। নয় তো যেতই না— রোগা ছেলে কি-না, তাই। এর পরের বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার এলাম শান্তিনিকেতন থেকে ওই ২১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডী লেনের বাড়িতে। বেশ ঘুড়ি ওড়াবার হিড়িক পড়ে ছিল সেবার। দক্ষিণের রাস্তাটার ওপারে ছিল একটা খালি জমি— সূতা মাঞ্জা দেবার অতি প্রকৃষ্ট স্থান। লাফিয়ে কাঁচা নর্দমাটা পেরিয়ে যেতে গিয়ে পড়লাম সেই খানায়। পা-টা বেশ ছড়েও গিয়েছিল। ক'দিন বাদে এল ধূম জ্বর। আমার নিশ্চিন্ত ধারণা হয়েছিল যে ওই খানায় পড়েই আমার শরীরে বিষ ঢুকে যাওয়াতেই আমার জ্বর হয়েছিল। ডাক্তাররা বললেন যে আমার নাকি ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরেছে। সেইজন্যে সে গ্রীষ্মের ছুটির পর মা আমাকে শান্তিনিকেতনে যেতে দেন নি। বাবা ছিলেন একটু খুঁতখুতে মানুষ। আমার অসুখ। বাড়ির দক্ষিণে কাঁচা নর্দমা এবং উত্তরে কর্পোরেশনের ময়লার ডিপো। এই-সব মিলিয়ে বাবা আর সেখানে থাকলেন না। তিনি বাড়ি বদল করে উঠে গেলেন ১৪নং মল্লিক লেনের একটি একতলা ভাড়াটে বাড়িতে।

৮

১৪৭ নং বসা রোডেব বাড়ির উত্তব গায়েই ছিল বেলতলা রোড। তার উত্তবে ছিল কৃষ্ণমোহন জজেব ও তার জামাতার পাশাপাশি বাড়ি। তারই উত্তর গা দিয়ে একটি ছোটো গলি পুব দিকে খানিকটা সোজা গিয়ে শেষ হয়েছিল ৩ নং বাড়িতে এবং সেই গলি থেকে উত্তব দিকে ঘুরে গিয়েছিল আবো সরু একটা শাখা গলি। এই সরু গলির নাম ছিল মল্লিক লেন। এই মল্লিক লেনে ঢুকেই দু'খানা বাড়ি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে ছিল এই ১৪ নং বাড়ি। বাড়িব মালিক ছিলেন আলিপুব জজ কোর্টেব প্রখ্যাত উকিল এবং কলকাতা কর্পোবেশনেব একজন ভাবিক্কি কমিশনাব রামতাবণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়। ইনি বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। এঁর স্নেহাশীর্বাদ পাওয়া আমাব অদৃষ্টেও ঘটেছিল। বাবা যখন এই বাড়িতে গেলেন তখন তার ভাড়া ছিল পনেবো কি ষোলো টাকা। এখন বোধ হয় ঐ টাকায় খোলার ঘরে এক-খানা ঘরও পাওয়া যায় না। বাড়িটি ছিল থাকবাব পক্ষে খুব সুবিধেব। রাস্তার উপবে প্রথমেই ছিল উঁচু একটুখানি চিলতে রক। মাঝখানে ছিল বেশ উঁচু এবং চওড়া সদব দবজা। সেই দরজাব একটা পাটে আবার ছোট একটি দরজা ছিল। দুপুবে বড়ো দবজা বন্ধ কবে সেই ছোটো দবজাই ভেজান থাকত। এই দরজায় ঢুকেই ছিল একটি বেশ চওড়া গলি। তাব দুধারে ছিল দুটি খোলা রক ও তার পব দুটি বেশ খোলা রক ও তাব পব দুটি বেশ মাঝাবি সাইজেব ঘব। টোনাদাদা দখল কব্‌লেন ঢুকেই বাঁ দিকেব ঘবখানা, যেটাব তিন দিকেই ছিল দবজা বা জানালা। ডান দিকের ঘবটাতে তখন থাকত চাকববা। গলির শেষে ছিল বেশ একটি প্রমাণ সাইজেব উঠান। উঠানেব বাঁ দিকে ছিল একটি জলের কল ও বড়ো চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার পাশেই ছিল খিড়কির দবজা, যেখান দিয়ে চাকববাকরবা যেত বাড়ির পেছনে বাইরের প্রাতঃকৃত্যাদিব জন্যে। ঐ উঠানেব উত্তর-পুব কোণায় ছিল আব একটি দবজা এবং তার পরেই লম্বা একটি গলি চলে গিযেছিল ভেতবের উঠানে। গলির বাঁ দিকেই ছিল অন্দবমহল। বেশ চাবখানা শোবার ঘর। ভেতবের উঠানের পবই ছিল খোলার চালওয়ালা রান্নাঘব দুই কুঠরীওয়ালা। তার বাঁয়ে খানিকটা জমি ছেড়ে উঁচু জায়গা অন্দবমহলেব অংশ। আর একটি ছোট শান-বাঁধান উঠান ছিল রান্নাঘরের পশ্চিমে যার শেষে ছিল একটি জলের কল ও চৌবাচ্চা। ছাতে উঠবার সিঁড়িও ছিল এবং দক্ষিণ-

খোলা বেশ প্রশস্ত ছাত ইঁটের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই বাড়িতে আমরা ছিলাম বোধ হয় পনেরো বছরেরও উপর। সেই বাড়ি এখন আর নেই। মল্লিক লেনের মুখটা চওড়া হয়ে নূতন বড়ো সড়ক ইন্দ্র রায় রোড বসা রোড থেকে শুরু হয়ে বাঁ দিকে চলে গেছে। আমাদের সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলে সেখানে এখন তাপ-নিয়ন্ত্রিত ইন্দিরা সিনেমা হয়ে গেছে। আমোদের সঙ্গে এই বাড়িতে এলেন টোনাদাদা, ঠাকুমা ও সেই বিহারী বৃদ্ধা দাসীটি। বেশ কিছুদিন নসুর তত্ত্বাবধান করে বার্ধক্যহেতু অবসর নিয়ে সেই দাসীটি তার দেশে চলে গেল। অবাঙালী এই পরিচারিকাটির বাক্যে ও ব্যবহারে যে মায়া-মমতার স্পর্শ আমরা পেয়েছি এবং বিশেষ করে নসু পেয়েছে তার তুলনা নেই। তখনকার আমলে বাড়ির চাকর-দাসীরা একেবারে আপন ঘরের লোক হয়ে সংসারের সুখদুঃখের ভাগী হতেন। তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি নিজেও দেখেছি বলেই আজকালকার চাকর-বাকরদের হালচাল দেখে মন খারাপ হয়ে যায়।

এই সময়ে আর দুজনের কথা মনে পড়ে। একজন লক্ষ্মণ গোয়ালা। সে রোজ দুধ দিত এবং মাস গেলে হিসেব-নিকেশ করে টাকা নিত। লক্ষ্মণের চিনি-পাতা দইয়ের তুলনা মেলে না। 'দধির অগ্র' যে কি তা বোঝা যেত লক্ষ্মণের চিনিপাতা দইএর উপরের অংশটা খেলে। অতি নরম অমায়িক লোক ছিল সে। যতদূর মনে আছে তার ছেলেটি বেশ লেখাপড়া শিখে-ছিল। আর ছিল এক জেলেনী, সবাই তাকে ডাকত 'আশুর মা' বলে। ভারি মায়াবী মেয়ে-মানুষ। আমরা আবদার ধরলে তার পরদিনই ও ঠিক সেইমত মাছ যোগাড় করে এনে দিত। সেকালে শুধু রুই কাতলা মাছ ওজন দরে কিনতে হত। ইলিশ মাছ গোটা গোটা, বড়ো কি ছোটো। মাস গেলে হিসেব হত কটা বড়ো ইলিশ আর কটাই বা ছোটো। কই, খলসে ও বড়ো চিংড়ি মাছের হিসেব হত কুড়ি গুণে। এখন তো সে-সব মাছ দেখিই না। 'আশুর মা'র মতো দরদী জেলেনীও বিরল। সংসারের সব হালচালই যেন বদলে গেছে।

আমাদের মধ্যে বুধা তখন নেহাৎ ছোটো এবং নসুর বয়স তখন পাঁচ হলেও সে খুব রোগা ছিল। সেইজন্যে বুধা ও নসুর পড়ার বালাই বড়ো ছিল না। নসু সেই বয়সেই কিন্তু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। মার কাছ থেকে দু' চারটে পয়সা যা পেতেন তাই দিয়ে ঘুড়ি ও সুতা কিনে

ওড়াবাব অভিনয় কবে বেশ মশগুল হয়ে উঠতেন। ঘুড়ি যে বেশি দূর উঠত কিংবা উঠলেও আকাশে থাকত এমন যে দেখেছি তা মনে হয় না। নম্রুর সেই বয়সেই তাঁব দিদিদেব সঙ্গে খুব ভাব ছিল। খুকী ও গুগু মায়েব কাছে বেশি পাত্তা না পেলেও বাবাব কাছ থেকে বেশ দুচাব পয়সা আদায় করে নিত। নম্রু—'দিদিভাই, দিদিভাই' বলে তোয়াজ কবে খুকী ও গুগুব কাছ থেকেও কিছু ভাগ আদায় কবে নিত। আমার মনে হত—আহা, আমার যদি একজন দিদি থাকত।

আমাদেব ভাইবোনেদেব মধ্যে গুগুই বাবাব বঙ পেয়েছিলেন। ছোটো বয়সে তিনি বেশ ফবসাই ছিলেন। বেঁটে খাটো ট্যাপা টোপা ফরসা ছোট্ট মেয়ে। যে দেখত সেই ওঁকে আদব কবত। চক্রবেড়েব কোণে যেখানে এখন নফব কুণ্ডু স্তম্ভ আছে তাবই কাছে মিশনাবী মেয়েদেব যে মেয়ে-স্কুল ছিল গুগু বোধহয় সেখানে যেত খুকীর সঙ্গে সঙ্গে। গুগুব স্কুলে যাবাব বয়স হোক আব না-ই হোক পাড়া বেডাবাব বয়স তাব যথেষ্টই হয়েছিল। সাবা সকাল ও বিকেলটা সে পাড়াময় বেড়িয়ে আসত। ছেলে-বুড়ো সবাইয়েব সঙ্গে ছিল তার ভাব। 'কোথায় গিয়েছিলি'— মা জিজ্ঞেস করলে এক-এক বেলায় এক একটা নাম করত—'নাকফোঁড়াদেব বাড়ি', কিংবা 'নেদেদেব বাড়ি' কিংবা আব কিছু। পাডাব লোকেবা খাঁটি কলকাতাব লোক। তাঁবা গুগুব বাঙ্গাল 'গুগু' নামটাকে সংস্কৃত করে বিশুদ্ধ কলকাতার নামকবণ কবলেন 'ঘুঘু' আব আমাদেব বাড়িটা পাড়ায় প্রসিদ্ধ হল 'ঘুঘুদেব বাড়ি' বলে। খুকীব বয়স তখন নয় কি দশ। তাকে কালীঘাটেব মহাকালী পাঠশালা থেকে নাম কাটিয়ে ঐ মিশনারী মেয়েদের স্কুলে দেওয়া হল। দেব-দেবীব স্তোত্র ও স্তবগান থেকে খুকী পড়ে গেল একেবাবে খ্রীষ্টানী আবহাওয়াব মধ্যে। নিত্য বাড়িতে ফিবেই আদম হবা এবং কতবকম বাইবেলেব গল্প বলে আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। তার উপর যখন ধবত যীশুব গান তখন আমবা হেসে গডাগড়ি এবং ভগবান যীশু বোধহয় স্বর্গে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তেন।

আমি যেতাম মিত্র ইনস্টিটিউশনে। অঙ্কে আমি কাঁচা ছিলাম বলে আমার এক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। তিনি ছিলেন উকিল। প্র্যাকটিসের চেয়ে ছেলে পডিয়েই বোধহয় বেশি রোজগার ছিল তাঁর। খুব ভালোমানুষ তিনি ছিলেন এবং অঙ্ক সত্যই ভালো করাতেন।

তবে গেয়ো হল যে তিনি আলিপুর কোর্ট থেকে সোজা আমাদের বাড়ি আসতেন। এসেই এক গ্লাস জল ও এক ছিলিম তামাক খেতেন। যাবাব আগে আব এক ছিলিম তামাক খেয়ে যখন তিনি যেতেন তখন খেলার সময় খুব কমই থাকত। আমাব মনে হল যে ঐ দ্বিতীয় ছিলিমটা একটু আগে-ভাগে দিয়ে দিলে বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই উঠবেন। চাকরকে সেই মর্মে সুপাবিশ কবলাম। সত্যি দেখলাম যে ব্যবস্থাটা ফলপ্রসূ হল। আমি এঁর কাছে মাস ছয়েক পড়েছিলাম। তাব পবই আমি আবাব ফেরত গেলাম শান্তিনিকেতনে। কালীবাবুব কাছে কিন্তু ঐ অল্পদিনেই অঙ্কটা ভালো শিখেছিলাম।

২১ নং কালিদাস পতিতুণ্ডী লেনেব বাড়িতে এবং পবে ১৪ নং মল্লিক লেনেব বাড়িতে থাকাকালে খুকীর বয়সটা বোধ হয় এমন হয়েছিল যে বয়সে ছোটো মেয়েবা হয়ে ওঠে ভীষণ ঝগড়াটে ও নালিশ-প্রবণ। অন্তত খুকী তাই হয়েছিলেন। খুকী ছিলেন বাবাব পেটোয়া মেয়ে। তাঁর আদবের নাম ছিল ফয়জন্‌নেসা। নামটা বঙ্কিমবাবু কি দ্বিজেন্দ্রলালেব কোনো বই থেকে বাবা সংগ্রহ কবেছিলেন কি-না জানি না। যাই হোক, নামটা সংক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে হল ফয়জন, তাব পব ফজি। খুকী বহুদিন ঐ নামেই আমাদেব বুড়ো আত্মীয়স্বজনদেব কাছে পবিচিত ছিলেন। খুকী ১৪৮ নং বসা বোডেব বাড়ি থেকেই আমাব নামে বাবাব কাছে নালিশ কবতে শুরু কবেন— আগেই তা বলেছি। এই নালিশেব মাত্রাটা উত্তবোত্তব বেড়েই চলেছিল। বাবা আফিস যাবাব আগেই খুকী কি একটা নালিশ কবতেন আব বাবা আমাকে শাসিয়ে যেতেন যে স্কুল থেকে ফিবে যেন বাড়ি থেকে না বেব হই এবং জলটল খেয়ে পড়াব বই নিয়ে বসি। আমি বিকেলে চলে যেতাম বেলতলার বাড়িতে অর্থাৎ কালীমোহন আলয়ে বৌঠানেব (বাসন্তী দেবী) কাছে এবং সেখানে মোনা ভোম্বল ও বেবীদেব সঙ্গে খানিকটা হুল্লোড় কবে ফিবতাম। আমাব ধাবণা ছিল যে কালীমোহন আলয়টা যেন আমাদেব বাড়িব বাইবে নয় অর্থাৎ মিলিটাবী ভাষায় ওটা আমার পক্ষে 'আউট অব বাউণ্ডস' নয়। বাবা বাড়ি ফিববাব আগেই কেবাসিনের একটা টেবিল-বাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসে যেতাম, বাবা খুসী হবেন ভেবে। আফিস থেকে মানুষ যখন সাবাদিনের পব ফেবে তখন মন মেজাজটা ভালো থাকে না সে কথা ছোটরাও বোঝে। খুকী বোধ হয় সেটা বেশ ভালোভাবেই

বুঝতেন এবং সেই মৌকায় তার মোক্ষম অস্ত্রটি নিক্ষেপ করতেন আমার বিরুদ্ধে। 'বাবা, দাদা বাইর হৈছিল। কাইল যে বাইর হৈছিল সেই কথা তোমারে কইয়া দিছিলাম বৈলা আমাবে বিকালে মারছিল।' নাকি-সুবে এই নালিশটা কবেই খুকী আমাব দিকে তাকাতেন। বাবা ভীষণ বিরক্ত হয়ে 'খোকা' বলে ডাকলেই বুঝলাম যে অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে। আলমারিব মাথায থাকত একখানি বেশ লিকলিকে বেত। দুর্ভাগ্য আমার যে তেলিববাগ থেকে আসবার আগে ওই বেতগাছাটি আমি নিজেই খাল পাবেব বেতঝাড় থেকে কেটে এনে বেশ তেল মাখিয়ে পাকা কবে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলাম। বাবা সেটিকে দখল কবে আলমারিব মাথায় রাখতেন প্রয়োজনবোধে আমাবই উপব ব্যবহাব কববাব জন্যে। সেই বেতখানা হাতে কবেই ডাকলেন—'খোকা'। গেলাম। বাবা জিজ্ঞাসা কবলেন, 'স্কুল থেইকা আইয়া বাড়িব বাইব হৈছিলি?' বলতে চেয়েছিলাম যে আমি তো কেবল বেলতলা বাডিতেই গিয়েছিলাম কিন্তু 'আমি তো' পর্যন্ত পৌছাতেই বাবা গর্জে উঠলেন, 'বাইবে গেছিলি কি না ক'। পবে ব্যাবিস্টাব হয়ে আমবা যেমন সাক্ষীকে তম্বি কবতাম—'ইয়েস ও নো'— ঠিক সেই ধরণেব তম্বি। আমি তবু বললাম 'ও বাডিতে' কথাটা শেষ না কবতেই শুরু হল সপাসপ বেতেব বাডি। আমি ব্যথাব চোটে 'গেছিলাম, গেছিলাম' বলে স্বীকার কবলাম। বাবা বললেন, 'ঠিক কইবা ক কাইল থেইকা ইস্কুল থনে আইয়াই পড়বি কি না'। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে প্রহাব্। আমি 'পড়ুম পড়ুম' বলে কেঁদে লাফাতে লাগলাম। একবাব এইরকম যখন শাসন চলেছে তখন দিদিমা ছিলেন আমাদেব বাডিতে। তিনি ত্বরিত দৌড়ে এলেন 'আরে বাখাল, থাম থাম' বলতে বলতে। বাবা বললেন, 'খোকার নাচন দেইখ্যা যায়েন।' মা এই শাসনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তেমন ঘাবডাতেন না। মাব খেয়ে মায়েব কাছে যখন ছুটে যেতাম মা 'ক্যান তবে যাছ' বলে আবো কয়েকটা থাপ্পড় বা ঠোনা মারতেন। মাব গলার আওয়াজে এবং চোখেব চাহনিতে বেশ বুঝতে পাবতাম যে তাঁব এই মাবটা আমার উদ্দেশ্যে নয় বাবাব ব্যবহাবেব প্রতিবাদেবই ইঙ্গিত মাত্র। এইবকম চলত মাসে তিন-চাবদিন তো বটেই। খুকী ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতেন যেন সে এসবেব কিছুই মর্ম বুঝতে পাবেন না। এই বৃদ্ধবয়সে খুকী ও আমি একত্রে মিললে পুবানো দিনেব এই সব গল্প বলে নিজেরাই হাসি আর

আমাদের কথা শুনে আমাদের ছেলেমেয়েরাও, বিশেষ করে নাতি-নাতনীরা তো হেসে লুটোপুটি। তারা খুকীকে বলে, 'তুমি তো বড়ো ঝগড়াটে ছিলে'। খুকী তার সেই নাকি-সুরে বলেন, 'আগে আমার মতো দাদারে ভালোবাসতে শিখ্যা লও তার পর তোমাগ দাদার লগে ঝগড়া কইরো।' আগেই বলেছি নম্ভু রোগা ছেলে, তিনি মারধোর প্রায় খানই নি। বুধার পর আমাদের দু'টি ভাই পর পর মারা গিয়েছিল বলে বুধা ছিল আদুরে। তাই তিনিও বিশেষ কিছু মার খান নি বাবার কাছে। অবিশ্যি আমাদের ছোটো বোন অন্নপূর্ণা (বুড়ি) যখন বেশ বড়ো হয়ে উঠল তখন তার সঙ্গে 'ছোড়দা'র প্রায়ই ঝগড়া হত। হঠাৎ বুড়ি চেঁচিয়ে উঠতেন-'মা, মা, এই ত্থাখ ছোড়দা মারল' বলে। বুধা বলতেন, 'কই মারলাম রে মিথ্যুক?' 'মারতে তো হাত উঠাইছিলা'। অর্থাৎ তাঁর মতে হাত ওঠান আর সত্যি সত্যি মারা একই জিনিস। বুড়ির আর্তনাদ শুনে মা এসে পড়ে বুধাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তাকে দু'একটা থাপ্পড় ও ঠোনা বসিয়ে দিতেন। সে মার কিছুই নয়— মশার কামড় মাত্র— আমার ভাগ্যে যে মার হত তার ধারেকাছেও পৌঁছাত না। শেষ বয়সে বাবা হাসতেন আর বলতেন, 'পোলাগুলাইনের উপর পরীক্ষা কইরা ত্থাখলাম পিট্টিই ওষুধ। খোকারে মারছি বইল্যা খোকাটা উৎরাইয়া গেছে'। বলতেই হবে যে বড়ো কষ্টেই উৎরে গেছি। দৈহিক ব্যথা তো ছিলই, অপমানটাও ছিল প্রচুর; এবং বিশেষ করে নিজের বেতেই মার— এ অপমান, হে ভগবান অতিবড়ো শত্রুরও 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ'।

৯

এই সময় বরাবর এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল যা আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। বাবা তখন কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইনস্পেক্টর। তাঁর অধীনে ছিলেন কয়েকজন বেইলিফ। কর্পোরেশনের বেইলিফরা সেকালে বিল নিয়ে এসে টাকা আদায় করে নিয়ে যেত এবং তার পর দিনই আপিসের খাজাঞ্চিখানায় জমা দিত। বাবার অধীনে যে বেইলিফরা ছিলেন তার মধ্যে একজন টাকা আদায় করে যে দিন কয়েক জমাই দেয় নি বাবা সেটা নজর করেন নি। এটা নিশ্চয়ই বাবার বিশ্বাসপ্রসূত গাফিলতিই বলতে হবে। জমা-না-দেওয়া টাকার অঙ্কটাও হয়ে পড়েছিল

বেশ ভারি রকমের, একুনে প্রায় তিন হাজার টাকা। সেই মোটা টাকাটা নিয়ে অর্থাৎ তহবিল তছরুপ করে রেইলিফটি ফেরার হলেন। তদানীন্তন কালের নিয়মানুসারে ইনস্পেক্টর হিসেবে বাবা তাঁর অধীনস্থ রেইলিফের সততার জন্যে দায়িক ছিলেন। তা ছাড়া এতগুলি টাকা সেই রেইলিফের হাতে একদিনের বেশি থাকতে দেওয়াটা বাবারই অফিস পরিদর্শন ক্ষমতার অভাব বলেই ধরতে হয়। রেইলিফ ফেরার হবার কথাটা যে দিন বাবার কানে এল সেদিন তো তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এতগুলি টাকা তিনি কোথায় পাবেন? সময়ও সংক্ষেপ, কেন না অচিরে সেই টাকাটা জমা করিয়ে দিতে না পারলে বাবার চাকরী নিয়েও টানটানি পড়বে। অকূল সমুদ্রে পড়ে গেলেন বাবা। খোঁজ খোঁজ, কোথায় গেল সেই রেইলিফ। তাঁর বাড়িতে এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব যাদের নাম-ঠিকানা জানা গেল তাদের বাড়িতে বাবা সাইকেলে করে যে কতবার গেছেন তার ইয়ত্তাই নেই। প্রত্যেক বারই বিফল মনোরথ হয়ে ক্লান্ত দেহে ও বিষণ্ন মনে ফিরে আসতেন। বাবার ও মায়ের দিকে তাকালেই আমরা ছোটোরাও অনুভব করতাম যে একটা অনির্দিষ্ট বিপদ যেন আমাদের বাড়ির উপর ঘনকালো ছায়াপাত করেছে। খবরটা দাদাবাবুর কানে কি করে গেল জানি না। তিনি বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে ভর্ৎসনা করে বললেন তহবিল তছরুপের খবর বাবা যখন জানলেন তখনই টাকাটা জমা দিলে কিছুই জানাজানি হত না। বাবার উচিত ছিল তক্ষুনি তাঁকে জানান ইত্যাদি। বাবার কাছে মবলগ সমস্ত টাকার অঙ্কটা জেনে নিয়ে টাকাটা যাতে বাবা সেই দিনই পান তার ব্যবস্থা দাদাবাবু করে দিলেন। বাবা যেন নূতন জীবন লাভ করলেন। এই ঘটনার কথা শেষ বয়সে বাবার কাছে অনেক বার শুনেছি। নালিশ করা হল সেই রেইলিফের নামে। ডিক্রিও বাবা পেলেন পুরা টাকার। সেই ডিক্রির সার্টিফায়েড কপিটিও আমি দেখেছি। কিন্তু ডিক্রিজারির চেষ্টা করেও এক পয়সা উদ্ধার করা যায় নি। বাবার উপরে দাদাবাবুর যে অগাধ মমতা ছিল এইটে তার একটি নিদর্শন মাত্র।

এই সময় বরাবরই বোধ হয় বাড়িতে কিসের সোরগোল শুনলাম। অনুসন্ধানে জানলাম যে আমাদের পিসতুতো টোনাদা রমণীমোহন রেঙ্গুনে যাবেন তাঁর বড়োদাদার কাছে। টোনাদাদা জিনিসপত্র কেনাকাটা সেরে বাক্স পেঁটরা বাঁধলেন নিবিষ্ট মনে। যাবার দিন এল। বাবা, কি

সোনাদাদা, মনে নেই ঠিক, টোনাদাদাকে জাহাজঘাটায় গিয়ে বেঙ্গুনেব জাহাজে তুলে দিয়ে এলেন। টোনাদাদা আমার মুরুব্বি স্থানীয় ছিলেন বলে প্রথমটা আমাব মনটা যেন একটু দমে গিয়েছিল। টোনাদাদা বেঙ্গুনে গিয়ে প্লীডাবসীপ পবীক্ষায় পাস কবে বেঙ্গুনেব ছোটো আদালতে প্র্যাকটিস শুরু কবলেন। কালক্রমে তিনি এ্যাডভোকেট হয়ে বেঙ্গুন হাইকোর্টেও কাজ কবতেন। বেশ পসাব যখন জমল এবং হাতে কিছু বেস্ত সঞ্চয় হল, টোনাদাদা কি নামে যেন একটা দৈনিক কি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনে লেগে গেলেন। বাড়ি ফেববাব কোনো নাম নেই দেখে মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন টোনাদাদার একটা বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসাবী কবাব প্রয়াসে। ঠাকুবমা বললেন—'টোনা শেষ কাটালে এউকগা সুন্দর বর্মি মাইয়াই বিয়া কইবা বইব।' টোনাদাদা ববাববই হিসেবি ও সেয়ানা লোক। সংসাবী হয়ে জানাশোনা কয়েকজনেব কি দশা হয়েছে তা দেখেই বোধ হয় টোনাদাদার সংসাবী হবাব কোনো বাসনাই ছিল না। কোনো সুন্দরী বর্মি মেয়েব খাতিবেও নয়। তা ছাড়া টোনাদাদা যে কোনো দেশেব কোনো বমণীকে মোহিত করেছেন বা কোনো দেশেব কোনো বমণী দ্বাবা নিজেই মুগ্ধ হয়েছেন এমন অপবাদও শুনি নি কখনো। কাজেই টোনাদাদাব আইবুড়ো নাম ঘুচল না। তাঁব বাপমায়েব দেওয়া বমণীমোহন নামটাকে ব্যর্থ ও মিথ্যে কবে টোনাদাদা চিবকুমাবই বয়ে গেলেন। কথায়-বার্তায় তো মনে হয় না যে এ চির-কৌমার্যেব জন্যে তাঁব মনে এতটুকুও আক্ষেপ আছে। ববঞ্চ মনে হয় যে স্বাধীনতা সুখে পবম আনন্দেই আছেন। টোনাদাদাব এখন বেশ বয়স হয়েছে—আমাব চেয়ে বছব পনেবোবও বড়ো। কিন্তু ভগবৎকৃপায় দাঁত একটিও খোওয়া যায় নি এবং বিনা চশমায় খববেব কাগজেব আগাগোড়া নিয়মিত পড়ে যাচ্ছেন। মানুষকে হক কথা শুনিয়ে দেবাব তাঁব স্বভাবজাত ক্ষমতাটি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই আছে এবং বলতে কি, ওই সৎকার্যে টোনাদাদার দোসব পাওয়া দায়।

১০

আগেই বলেছি তেলিববাগেব পুবেব বাড়িব মনোমোহন জ্যাঠামশায়ের স্ত্রী ছোটকাদাদাব মা-র সঙ্গে মায়েব খুব ভাব ছিল। সেই জ্যেঠিমাব আপন খুড়া মধ্যপাড়ার বামাচবণ গুপ্তমশায়েব দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রমোহনের বিয়ে

দিলে দুপক্ষেরই ভালো হয়। শোনা গেল ছেলে চায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ে ডাক্তার হতে। পাঁচ বছরের মামলা। মেডিক্যাল কলেজে পড়াব খরচাও বিস্তব। তা ছাড়া বিয়ের খবচাও তো নম নম করলেও সেকালেও হাজাব দেড়েক ছাড়িয়ে যাবে। কোথা থেকে টাকা আসবে? এই তো সেদিন দাদাবাবু দিলেন প্রায় হাজাব তিনেক টাকা বেইলিফ ফেরার হবাব পব। বাবা ইতস্তত: কবতে লাগলেন। কথাটা পৌঁছাল কি করে জ্যেঠিমাব কানে জানি না। তিনি বাবাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা কবলেন, 'খুকীব নেকি একটা সম্বন্ধ আইছে? কেমন বে পোলাউগা?' বাবা বললেন 'পোলাটি তো মনোমোহনদাব খুড়াত শালা জানাশুনা ঘর, সম্বন্ধটা ভালই, তবে খবচা অনেক। তা ছাড়া মাইয়াও তো বড না। তাড়াতাড়ি নাই।' বলে আমতা আমতা কবতে লাগলেন। খুকীব বয়স বেশি নয় ঠিকই— দশ ছাড়িয়ে এগাবোতে পড়েছে। কিন্তু খুকী দেখতে বেশ বাড়ন্ত মেয়েই ছিলেন। জ্যেঠিমা বললেন— 'টাকাব লেইগ্যা তব ভাবনা কবতে হৈব না। ভালো সম্বন্ধটা ছাড়িস না।' খুকীব বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

উপেন্দ্রমোহনেব মা অনেক দিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন। কখন কি হয়ে যায় ঠিকানা নেই। সুতবাং বিয়েব দিন খুব কাছাকাছি ঠিক হয়ে গেল। জ্যেঠিমা তাঁব শ্রীকৃষ্ণ স্যাকবাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজে পছন্দমত খুকীব যাবতীয় গহনাব অর্ডাব দিলেন। আমাদেব ১৪ নং মল্লিক লেনেব বাড়িব ছাদে বাঁধা হল মেড়াপ— তখন ঝড়-বাদলেব দিন ছিল বলে। মায়েব জ্যেঠতুত বোন থাকতেন উত্তব কলকাতাব কুমারটুলীতে। কুমাবটুলীব কবিবাজ ললিত গুপ্ত, মা যাকে ডাকতেন 'গুপ্তজী' বলে, তিনি ছিলেন উপেন্দ্রমোহনেব কিবকম সম্পর্কিত জ্ঞাতি। ঠিক হল যে বব উঠবেন সেখানে। আমাদেব মল্লিক লেনেব বাড়িতে আত্মীয় নাইয়বীতে ভবে উঠল। তখনকার দিনে বেওয়াজ ছিল কাছাকাছি থেকে নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনদের গাড়ি কবে আনান ও ফেবত পাঠান। অথবা তাঁবা নিজে গাড়ি ভাড়া কবে এলে সেই গাড়িব ভাড়া তক্ষুনি দিয়ে দেওয়া। এই-সব আনা-নেওয়াব জন্যে একটা তৃতীয় শ্রেণীব ঘোড়াব গাড়িব বন্দোবস্ত হল সাবাদিনেব জন্যে। আমি সব আত্মীয়স্বজনদেব বাড়ি চিনতাম এবং যেতাম। সুতবাং ঐ আনা-নেওয়ার দায়িত্বটা পড়ল আমাবই উপরে। আমি অবিশ্যি খুসীই হলাম সারাদিন গাড়ি চড়ে ঘুবে বেড়াবাব সুযোগ পেয়ে। আমি বসতাম কচুয়ানের পাশে কোচ-

বাক্সের উপর এবং কচুয়ানের খোসামোদ করে গাড়ি হাঁকাতাম। কোচবাক্সের পাদানিতে পা ঘষে ঘষে, হ্যাট হ্যাট আওয়াজ কবে ছপটির সপাং সপাং শব্দ কবে ঠিকে গাড়ি চালান যে কী মজাব ব্যাপাব তা যে ছেলে তা করে নি সে বুঝবেই না। আমার বয়স তখন বাবো এবং তেরোব মাঝামাঝি।

তিথি তাবিখ মনে নেই, খুকীব বিয়ে হল। কি দুর্যোগ হয়েছিল সেদিন। জলে ঝড়ে মেডাপ উড়ে যায় আব কি! বব এল সদলবলে। বিয়ের কাজ শুরু হল। পিঁড়িতে কবে খুকীকে আমবা বিবাহসভায় যজ্ঞেব জায়গায় নিয়ে এলাম বাইবের উঠানটাতে। আমি বড়ো ভাই, ওর পেছনে বসে ওকে ধরে বইলাম। মন্ত্র পাঠ হল, বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কিরকম যেন একটা দুশ্চিন্তাব কালিমা দেখলাম বাবা-মায়েব মুখে। ব্যাপারটা কি জানতে পাবলাম না। কিন্তু মনে একটা যেন আসন্ন অমঙ্গলেব আভাস পেলাম। বিয়েব পব রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে জেগে উঠলাম খুকীব কান্না শুনে। খুকী কুঁইপিটে ডুকবে ডুকবে কাঁদছিলেন— 'আমি কি অপয়া— আমি জন্মাবাব ক'দিন আগেই ঠাকুমা গেলেন। আবার একি হৈল।' অনুসন্ধানে জানলাম যে আগেব বাত্রেই উপেন্দ্রমোহনেব মা তাঁদেব মধ্যপাডার বাডিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। খবরটা চেপে বেখে ববপক্ষবা বিয়েটা শেষ কবে দিতেই বললেন। আমি খুকীকে একটু আডালে পেয়ে বকে দিলাম— 'তুই তাবে দেখছই নাই— তবে তব এত কান্নাব কি হৈল।' আমিও তখন বুঝি নি যে ইনি কাঁদছিলেন ঠিক যে শোকে তা নয়, বোধ হয় কাঁদছিলেন ভয়ে ভয়ে— পাছে অলুক্ষণে বলে শ্বশুববাডিতে গঞ্জনা খেতে হয়। এতে কবেই বোঝা যায় যে এ-সব বিষয়ে খুকীর বুদ্ধি আমাব চেয়ে ঢেব সবেস ছিল। যাই হোক, উপেন্দ্রমোহন অশৌচ অবস্থায় থান কাপড় পবে ও গলায় চাবি বেঁধে নূতন বৌ নিয়ে কুমাবটুলীব বাডি হয়ে দেশে গেলেন। খুকী সঙ্গে নিয়ে গেল এগাব বছবে যেটুকু বিদ্যা শেখা যায় তা এবং তাব স্বভাবজাত প্রখব সুবুদ্ধি ও বাবা-মায়েব অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। খুকীর বিয়েব প্রায় সব খবচই বহন কবেছিলেন জ্যেঠিমা অর্থাৎ দাদাবাবু।

খুকীর শ্বশুববাড়িব লোকেবা জানতেন এবং উপেন্দ্রমোহন নিজেও জানতেন যে তাঁর মা যাবাব জন্যে পা বাডিয়ে ছিলেন এবং সেইজন্যে খুকীর ঘাড়ে কোনো দোষারোপ হল না। উপেন্দ্রমোহন যতদিন মেডিক্যাল কলেজে পডতেন খুকী ততদিন মধ্যপাডাতেই বেশি থাকতেন। উপেন্দ্রমোহন

অ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জেনেব চাকরি পাবার পর খুকী স্বামীব সঙ্গে তাঁব সবকারী কাজেব জায়গায় থাকতেন। আমাদের পবম সৌভাগ্যক্রমে খুকী ও উপেন-বাবু উভয়েই জীবিত আছেন এবং একটি সন্তানের অকাল-মৃত্যু ছাড়া এঁদের সন্তান-সন্ততিবা সবাই বেশ ভালো ভাবেই আছেন। এঁদেব বড়ো মেয়ে রানী সর্বজনপ্রিয় এবং আমাব বিশেষ আদবের। বড়ো ছেলে অরুণ এখন এফ. আব. সি এস. হয়ে কানপুবে প্রফেসাব ও নামকবা অর্থপিডিক সার্জেন। অন্যান্য ভাগনেদেব কথা আগেই বলেছি। উপেনবাবুব মতো মানুষ দেখাই যায় না। মিষ্টভাষী ও পবহিতৈষী। এখন তিনি অবসব নিয়ে পাটনাতেই আছেন এবং পাটনাব সকলে একবাক্যে উপেনবাবুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কবে থাকেন। উপেনবাবু আমাদেব বাড়ির বড়ো জামাই কিন্তু বাবা-মায়েব কাছে তিনি ছিলেন যেন বড়ো ছেলে। এবং বাবা-মাব মৃত্যু পর্যন্ত উপেনবাবু জ্যেষ্ঠ-পুত্রেবই মতো মা-বাবাকে ভালোবেসে ও সেবা কবে আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত কবেছেন। উপেনবাবুব কথা বলে শেষ কবা যায় না। এমন লোক হয় না।

১১

কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই ১৪নং মল্লিক লেনেব বাড়িতে। তখনো আমি কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউশনে পডছি। বুধার জন্মাবাব পব আমাদের একটি ভাই হয়েছিল। মায়েব দেখাদেখি আমবা সবাই তাঁকে ডাকতাম মঙ্গলা বলে। বোধ হয় মঙ্গলবাব সে হয়েছিল। তার বয়স যখন বছব দেডেকের তখন তাব হয়েছিল ডিপথিবিয়া বোগ। আজকাল ডিপথিবিয়া বোগেব অব্যর্থ ওষুধ বেব হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু সে আমলে বর্তমান আবিষ্কৃত সিবাম ইনজেকসনেব কথা নাকি ডাক্তাবরাও জানতেন না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তখন কিছু ছিল না এ বোগেব। আমাদেব গৃহচিকিৎসক ছিলেন ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, ভবানীপুবেব অতি বিচক্ষণ ডাক্তাব ও আমাদেব পরিবাবেব একজন বিশিষ্ট হিতৈষী সুহৃদ। তিনিও মাথা নাড়লেন। বাবা একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাবেব ওষুধ দিচ্ছিলেন শিশুটিকে। ক্রমশঃ তাব গলাব সাদা দাগগুলি বেড়েই চলল এবং আস্তে আস্তে তাব শ্বাসনালীটি সাদায় ভবে যাচ্ছিল। শেষেব দিন সকালে দাদাবাবু বাবার মুখেব দিকে চেয়েই চমকে উঠে বললেন—'কাকা, কি হয়েছে?'

ছেলের অসুখেব কথা বাবা সব বলে, এই বলে শেষ কবলেন, 'পোলাটা বুঝি বাঁচবো না'। দাদাবাবু বাবাকে কিছু না বলে কাছারি চলে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী ললিতবাবুকে কি বলে। তাব পব সেই দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমাদেব মল্লিক লেনেব বাড়িতে যে ডাক্তাব সমাগম হয়েছিল তা ধনীগৃহেও সচবাচব দেখা যায় না। কর্ণেল ব্রাউন থেকে আবম্ভ করে নীলবতন সবকার, উপেন ব্রহ্মচাবী, ভবানীপুবেব সুহৃদ চৌধুবী, হেম সেন ইত্যাদি কেউই বাদ যান নি। সেদিন বিকেলে দাদাবাবু কাছাবি থেকে সোজা আমাদের বাড়িতে এসে নামলেন গাড়ি থেকে। মা তখন মুমূর্ষু ছেলে কোলে কবে কাঠ হয়ে বসে আছেন। দাদাবাবু বেশ কিছুক্ষণ বসে উপস্থিত ডাক্তাবদেব সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাড়ি চলে গেলেন। বাঁচল না আমাদেব সেই ভাইটি। জ্যেঠিমা তখন কলকাতা এসেছিলেন পুরুলিয়া থেকে। তাঁব নির্দেশে আমাদেব সবাইকে ১৪নং বাড়ি থেকে ঐ গলিরই খানিকটা গিয়ে ৩নং বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ১৪নং ভালো করে চুণকাম করা হল এবং দবজা-জানালা সব বন্ধ কবে কিবকম ধোঁয়া দিয়ে ঘবগুলি সব শুদ্ধ কবে দিল। শুধু তা-ই নয়, আমাদেব ব্যবহাবেব বিছানা-পত্তব সব ফেলে দিয়ে একবাবে একসেট নূতন বিছানা বালিশ সব এলো। বাকসেব ভেতবে যে-সব কাপড-চোপড ছিল সেগুলিকেও কি সব ওষুধ ও ধোঁয়া দিয়ে বীজাণু মাবা হল। জ্যেঠিমা সে দুঃসময়ে বোজ দুপুরে এসে মাকে খাইয়ে যেতেন। ভোলাদা আমাদেব বাড়ি এমনিতেই এক একসময় আসতেন। এসেই বলতেন, 'খুড়িমা, হিংয়ের কচুবি আব আলুর দম খাব' এবং বলতে বলতেই নিজেই পকেট থেকে টাকা বেব কবে দিতেন। এখন বুঝতে পাবি যে অস্বচ্ছলতাব জন্যে আমবা ওসব মুখবোচক খাবাব পাই নে আশঙ্কা কবে তিনি এসে আমাদেব খাইয়ে যেতেন। সেই ভোলাদাদাও সেই দুঃখের দিনে এসে মাকে কত আদর আপ্যায়ন কবে যেতে লাগলেন। চিকিৎসা ও অন্যান্য যাবতীয় খবচপত্রাদি বহন কবলেন আমাদের দাদাবাবু। আমাদেব পবিবাব যে দাদাবাবুব কাছে কতবকমে ঋণী তা বলে শেষ করা যায় না। সে ঋণ অপবিশোধনীয়।

কিছুদিন পবের আবো একটা দুর্ঘটনা এখানে বলি। আমাদের ঐ ভাইটি মারা যাবার কিছুকাল পবে আমাদের আর-একটি ভাই হয়েছিল। একটি ছেলে হাবিয়ে যাবার পর এই ছেলেটি যখন কোলে এল মা তাকে 'হারু'

বলে ডাকতেন। সেজন্যে আমরা সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতাম। একটু বয়েস হতেই সে কেমন যেন কমজোর হতে লাগল এবং নানারকম অসুখে সে ভুগত। একটু আবদারে ও খিটখিটে হয়ে উঠছিল। এখন মনে করলে খুবই কষ্ট পাই কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আমি অনেক সময় অসহিষ্ণুতা-বশে তাঁকে ধমকে উঠতাম। তিনি কেঁদে ফেলতেন। তখন বুঝি নি তাঁর শরীরের গ্লানিতে তিনি কত কষ্টই না জানি পাচ্ছিলেন। তাঁকে বাঁচাতে না পুরুলিয়াতে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল। বেশি কিছু উপকার দেখা গেল না। তখন চিকিৎসা করাবার জন্যে বাবা-মা তাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন। আমাদের সেই ভাইটি ট্রেনেই সাঁতরাগাছি স্টেশনে শেষনিঃশ্বাস ফেললেন মায়ের কোলে শুয়ে। হাওড়া স্টেশনে হল পুলিশের আবির্ভাব। ট্রেনে মারা গেছে বলে শিশুর মৃতদেহ মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। মার পক্ষে সেটা হল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। দাদাবাবুর সুপারিশে পুলিশরা মৃতদেহটি ছেড়ে দিল। আমি তখন শান্তিনিকেতনে। খবরটা শুনে মনে যে কী অনুশোচনা হয়েছিল হারুর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে তা এখনো মনে আছে।

১২

আমি যখন কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়ি তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরের সঙ্গেই চলছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রমহলে তখন স্বদেশীর সাড়া পড়েছিল ভালোরকম। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত রাখীবন্ধনের দিন ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের উৎসাহ ছিল অদম্য। বৃদ্ধ মৌলভি লিয়াকত হোসেনের নেতৃত্বে কলকাতার এবং বিশেষ করে গোলদীঘি অঞ্চলের রাস্তায় জন-মিছিল বের হত নানা দিক থেকে। আমাদের ১৪ নং মল্লিক লেনের বাড়ির পুব গায়ে ছিল একটা হোগলার চালাঘর এবং তৎসংলগ্ন ছিল বেশ খানিকটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা জমি। সেখানে একটি লাঠিখেলার ও ব্যায়ামের আখড়া ছিল। দলের নেতা ছিলেন ননীদা। তাঁর পদবীটি মনে নেই, তবে মনে হয় বোস। ননীদা আমাকে 'কালো' বলে ডাকতেন, আমার গায়ের রঙ দেখেই বোধ হয়। সেই থেকে বেশ কিছুদিন ভবানীপুর অঞ্চলে বন্ধু-মহলে আমার এ নামটাই চালু ছিল। আখড়ায় পাড়ার সব ছেলেই প্রায় আসত। বেপাড়া থেকেও কিছু কিছু আসত শিক্ষার্থী। সে কি পাঁয়তাড়া,

আর লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ! শুধু কি লাঠিব, গদকা তলোয়ার ও ছোরা ঘোবাবার কতরকম কায়দা আমবা তখন শিখেছিলাম। কেউ কেউ শিখত ডন, বৈঠক ও কুস্তি। সবলাদেবী চৌধুরানীর প্রবর্তিত বীরাষ্টমীব দিন সে কি উৎসাহ লাঠিখেলোয়াড়দেব। আব একজন ওস্তাদ ছিলেন মুর্তাজা বলে। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ননীদাব জয় যখন ঘোষণা হল তখন আমাদেব আব পায় কে। ননীদাকে আমবা একজন সর্বজয়ী সেনাপতির মতো সমীহ ও শ্রদ্ধা কবতাম।

এই স্বদেশী আমলেব আব-একটি স্মৃতিচিত্র এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজ হতে প্রায় যাট বছব আগে, বয়স যখন আমাব ছিল বার কি তেবো, তখন অত্যন্ত দূব থেকে, ক্ষণিকেব জন্যে মাত্র বাব দুই তিন শ্রীঅববিন্দকে চক্ষে দেখেছিলাম। সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, দূরনিবন্ধ দৃষ্টি ও নম্রমধুব বাক্য আমাব মানসপটে যে একটি অবিনশ্বব ছাপ বেখে গেছে তাবই খুব আবছায়া স্মৃতিটুকু আজকেব দিনে সকলেব কাছে তুলে ধবতে চাই। শ্রীঅববিন্দ তখনকাব দিনে আমাব ও আমাব মত সহস্র সহস্র সুকুমাবমতি বালক ও যুবকেব মনেব উপর যে কি প্রভাব বিস্তাব কবেছিলেন, আমাব এই স্মৃতিকথায় তাবই একটু আভাস হয়ত পাওয়া যাবে। আমাদেব দেশেব ইতিহাসেব সেই দুর্দিন সময়ে শ্রীঅববিন্দ ও তাঁব একদল নির্ভীক শিষ্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন দেশমাতৃকাব স্বাধীনতা অর্জনেব জন্যে তাব সঙ্গে অনেকেব মতেব অমিল হওয়া খুবই সম্ভব এবং এমন কি খুবই সহজ ও স্বাভাবিক বলেই আজকেব দিনে মনে হতে পাবে। কিন্তু শ্রীঅববিন্দেব এবং সেই নির্ভীক যুবকদেব আত্মবলিদান এবং আদর্শানুবর্তিতাব প্রশংসা না কবে থাকা একেবাবেই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে কবি না। ১৫ই আগস্ট আমাদেব স্বাধীনতা দিবস এবং ঐ দিনটি শ্রীঅববিন্দেব পুণ্য আবির্ভাবেরও সাম্বৎসবিক দিন। সেই দিনে যখন আমবা আমাদের 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করছি তখন তদানীন্তন আদর্শপ্রণোদিত শ্রীঅববিন্দ ও তাঁব সহকর্মীদেব স্মৃতিব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীঅববিন্দেব জীবনের এই পবিচ্ছেদটাও তাঁব পূর্ণ পবিণতিব পক্ষে প্রয়োজন ছিল— আগুনে পোড়ান যেমন প্রয়োজন হয় সোনাকে নিষ্কলঙ্ক কববার জন্যে। তাই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের দিনে তাঁকে স্মবণ করি ও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আপন হৃদয়কে পবিত্র করি।

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের অনেক সুসন্তান দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের স্তোকবাক্যে তাঁদের আস্থা একেবারেই চলে গিয়েছিল এবং তাঁরা বুঝেছিলেন যে সেদিনকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে প্রতি বৎসর কাগজে-কলমে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তাতে করে কোনো কাজই হবে না। তাঁরা স্থির জেনেছিলেন যে, স্বাধীনতা একে অন্যকে দান স্বরূপ দিতে পারে না এবং ক্ষমতাদীপ্ত উদ্ধত রাজপুরুষের হাত থেকে তা স্বীয় বলপ্রয়োগে কেড়ে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তখন নানা জায়গায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। পুণাতে এমনই একটি গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন বিপ্লবী বীর ঠাকুর সাহেব। ঐ সময়ে বরাবর শ্রীঅরবিন্দ বরোদাতে কাজ করছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ পুণার সেই গুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে এসেছিলেন বেয়েচেয়ে দেখতে যে এখানে কোনো গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা যায় কি-না। সেই সময়ে তিনি কয়েকটি যুবককর্মী বেছে নিয়ে মেদিনীপুর বিপ্লবকেন্দ্র গঠন করেছিলেন। বাছাই-করা যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র-কুমার ঘোষও ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি বরোদাতে ফিরে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপরে বাংলাদেশের ভার দিয়ে। এই সময়েই তিনি নিজের মনকে পাকাপাকি রকমে প্রস্তুত করেছিলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মাহুতি দেবার জন্যে। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে তিনি তদীয় পত্নীকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তা আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে সর্বজনবিদিত হয়ে আছে। সেই চিঠিতে তিনি বিদেশী শাসন থেকে দেশোদ্ধারের নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ঠিক এই সময়ে ভগবানের নীরব নির্দেশে বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে টেনে এনে একেবারে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির মুখবিবরে ফেলে দিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের খেয়ালখুশি মতে বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে মুসলমানপ্রধান পূর্ব-বঙ্গকে একটি আলাদা প্রদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেল। জনমতের প্রতি এরূপ অবজ্ঞায় দেশে আগুন জ্বলে উঠল। বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলাদেশকে এক

করতেই হবে এই হল জনগণেব দাবি। জনগণের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে সবকার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করলেন। ন্যায়বিচাবের নামে কত বালক ছাত্রকে বেত মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া হল, কত না উন্মুখচিত্ত যুবককে কারাগারের প্রাণহীন অন্ধকাবেব মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু দৈহিক নির্যাতনে উৎসর্গিত-প্রাণ নির্ভীক দেশসেবকদেব উৎসাহ দমে না গিয়ে বেড়েই গেল এবং দেশকে নানা দিক থেকে উন্নত কববাব প্রচেষ্টা পূবা দমেই চলল। জাতীয়-জীবনে বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানকল্পে কত না প্রকল্প গ্রহণ কবা হতে লাগল। জাতীয়-বিদ্যালয় খোলা হল, দেশী কাপড়ের কল, জাহাজ কোম্পানি এমন-কি দেশী ব্যাঙ্ক ও দেশী জীবনবীমা কোম্পানিও বাদ গেল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেব নবনাবী সেই দুর্দিনে বাঙালীদেব সঙ্গে হাত মেলালেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলন যেমন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল সবকাবেব দমননীতিও তেমনি প্রচণ্ড রুদ্র তেজে বেড়ে গেল। কত না গোপনীয় বিজ্ঞপ্তি বের হল, নির্যাতনেব কত না নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হল। হিংসাত্মক শাসনবিধিব পাল্টা জবাবে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন কবতে হল দেশেব লোকদেব। দেশোদ্ধাবেব প্রচেষ্টায় সাময়িক ব্যর্থতা যুবককর্মীদেব টেনে নিয়ে গেল হিংস্র আচবণেব দিকে। দেশেব এই বিপ্লবময় পবিবেশেব সুযোগ নিতে হয়েছিল শ্রীঅববিন্দ ও তাঁব সহকর্মীদেব।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেব মার্চ মাসে শ্রীঅববিন্দকে ববোদা কলেজেব অধ্যক্ষপদ ত্যাগ কবে কলকাতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়েব অধ্যক্ষপদ নিয়ে বাংলাদেশে ফিবে আসতে হল। এবাব তিনি এই দেশময় সংগ্রামে সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ কবলেন। প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষায় 'যুগান্তব' নামে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ কবতে শুরু কবলেন। সেই দৈনিকপত্রে শ্রীঅববিন্দ জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধসমূহ লিখে দেশেব যুবকসম্প্রদায়েব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে লাগলেন। দেশেব বাস্তব দুর্দশাব দিকে এবং তাদেব সকলকে দেশসেবায় চবম স্বার্থত্যাগেব মন্ত্রে দীক্ষিত হবাব জন্যে আহ্বান জানালেন। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে সরকার এরূপ কার্যপদ্ধতি কিছুতেই বরদাস্ত কবতে পারেন না। অচিবে 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীঅববিন্দ তখন হাত মেলালেন প্রবীণ যোদ্ধা বর্তমানে স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে। বিপিনবাবু তখন 'বন্দেমাতরম্'

কাগজ সম্পাদনা করছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ লেখনীনিঃসৃত জ্বালাময়ী ভাষা কারো চোখে ধুলা দিতে পারে না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে সরকারী হুকুমে শ্রীঅরবিন্দকে ঐ সব রাজদ্রোহী প্রবন্ধের রচয়িতা বলে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতের মামলায় বিপিনবাবুর ডাক পড়ল সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে যে ঐ সব আপত্তিজনক প্রবন্ধাদি শ্রীঅরবিন্দেরই লেখা। বলাই বাহুল্য যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক এবং একনিষ্ঠ দেশসেবক বিপিনবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে হল এই যে আদালতের অবমাননার জন্মে বিপিনবাবুকে ছয় মাস কারাবরণ করতে হল এবং প্রমাণাভাবে শ্রীঅরবিন্দকে সেই দফায় মুক্তি দিতে হল। এই সময়েই গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার জানিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন যা ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের 'বন্দেমাতরম্' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল— তার থেকে বোঝা যাবে শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং কবিচিত্তে দেশপ্রেমিকের কি উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছিল। দেশসেবককে উদ্দেশ করে কবি গাইলেন—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চির রাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকট যাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়— সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়

অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর?...

শ্রীঅরবিন্দের এই মুক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুর শহরে স্থানীয় ক্রূরমতি জেলাশাসকের প্রাণহানির প্রচেষ্টায় একটি নিরপরাধ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর সাথী প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলী করে মেরে পুলিশের গ্রেফতার থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড হল এবং তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসিকাষ্ঠে নিজেকে কী নির্ভীকভাবে আহুতি দিলেন সে কথা নানা গানে দেশময় ছড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখের অতি প্রত্যূষে মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে খানাতল্লাসী করে পুলিশবাহিনী কত না দেশী হাতবোমা, তলোয়ার, ছোরা ও রিভলবার বাজেয়াপ্ত করল। বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক গুপ্তসমিতির সভ্য যাঁরা সে সময় সে বাগানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হল। সেইদিনই কলকাতার অন্য এক স্থান থেকে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেফ তার করা হয়েছে বলে মুখে মুখে খবর প্রচারিত হল এবং 'সন্ধ্যা' নামক সান্ধ্য কাগজের সে কি বিক্রি সেদিন সন্ধ্যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের পর শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্য পঁয়ত্রিশজন যুবককে দায়রা সোপর্দ করা হল। ভাগ্যের পরিহাস যে সে বিচারের ভার গিয়ে পড়ল আলীপুরের তদানীন্তন সেসন্স জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফট্‌ সাহেবের কাছে। এই বীচক্রফট্‌ সাহেব শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এক সাথেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং পাশের তালিকায় শ্রীঅরবিন্দের কয়েক ধাপ নিচে তাঁর নাম বের হয়েছিল। মামলা চালু হল। তুমুল আইনের যুদ্ধ চলল দুই মহারথীর সঙ্গে। সরকারী পক্ষের কৌঁসুলীদের অগ্রণী ছিলেন ইয়ার্ডলি নর্টন সাহেব। আর আসামীদের পক্ষে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লড়লেন তখনকার দিনের উদীয়মান ব্যবহারজীবী সি. আর. দাস এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। এই সি. আর. দাসই পরে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' নামে জগদ্বিখ্যাত দেশনেতা বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এই মামলা অনেক দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের মতই চলেছিল। আসামীদের এবং

বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের যাতে দোষী বলে প্রাণদণ্ড হয় তার জন্তে সরকার পক্ষ থেকে যাবতীয় কাণ্ডই করা হয়েছিল, সরকারের সমস্ত আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। স্বদেশী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যই ছিল এই মামলার একমাত্র কাম্য। প্রত্যহ 'সন্ধ্যা' কাগজে আদালতের শুনানীর কাহিনী ছাপা হত এবং জনসাধারণ কি ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে কাগজ পড়তেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। আমার বয়স তখন বার কি তেরো। আমি তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্তে বেশ কয়েক মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ফিরে না গিয়ে কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছেই বাস করছিলাম এবং মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় পড়ছিলাম। সি. আর. দাস যাঁকে আমি দাদাবাবু বলতাম তিনি তখন ভবানীপুরে 'কালীমোহন আলয়' ভবনে— যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হয়েছে— সেখানে থাকতেন। বেশ মনে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় যখন দাদাবাবু বাড়ি ফিরে এসে তাঁর বাসগৃহের সামনের গাড়িবারান্দার উপরের বারান্দায় বসতেন তখন আমি এবং আমার বয়সী ছেলেরা নিঃশব্দে সেই বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম কেমনভাবে বোমার মামলা এগুচ্ছে।

সেই সময়ে একের পর এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেছে। নরেন গোঁসাই বলে একজন আসামী পুলিসের প্ররোচনা ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাপ চেয়ে রাজার সাক্ষী হয়ে সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষী দেবেন এইরূপ ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আসামীদের মধ্যে দুই যুবক— কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু— জেলের আঙিনার মধ্যেই রিভলবারের গুলিতে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে ফেললেন। জেলের মধ্যে অত পাহারা ও সতর্কতা সত্ত্বেও কেমন করে তাঁরা রিভলবার পেলেন তার খবর এখনো কেউ জানে না। জলন্ত রিভলবার হাতে গ্রেফতার হয়ে বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। প্রথম ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল কানাইলালকে। তাঁর মৃতদেহকে যখন কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে আনা হল তখন যে জনসমাগম দেখেছি তা দেশবন্ধুর শ্মশানযাত্রার পূর্বে আর কখনো দেখি নি। সে শব শোভাযাত্রা যে কোনো দেশের প্রবল পরাক্রম নৃপতিও আকাঙ্ক্ষা করতে পারতেন। জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে যায় দেখে সত্যেন বসুর ফাঁসির পর তাঁর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জেলের প্রাচীরের অন্তরালেই সমাধা হয়েছিল। এ ছাড়া আলিপুরের সরকারী

উকিল স্থরেশ বিশ্বাস, যিনি নর্টন সাহেবকে মামলায় সাহায্য করছিলেন, তাঁকে দিনে দুপুরে গুলি করে হত্যা কবা হল। তা ছাড়া পুলিস দারোগা আলম যিনি মিথ্যে সাক্ষী শেখাতেন বলে লোকে সন্দেহ করত তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টেব ভিতবেই তাড়িয়ে নিয়ে গুলি কবে মাবা হয়েছিল। কি উত্তেজনার মধ্যেই না আমবা সে সময় বাস কবেছি। এই সব খবব কাগজে পড়ে আমাদেব মন উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়ত এবং আমাদেব চক্ষে শ্রীঅববিন্দ ও তাঁব যুবক সহকর্মিগণ আদর্শ বীবরূপে প্রতীয়মান হতেন।

আলিপুবেব বোমাব মামলা যখন জমাটভাবে চলছে তখন শ্রীঅববিন্দকে চাক্ষুষ দেখবাব খুব ইচ্ছে হল। তাঁব ছবি মাঝে মাঝে খববেব কাগজেই দেখেছিলাম কিন্তু তখন পর্যন্ত জীবনে তাঁকে কখনো চক্ষে দেখি নি। "তাবে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি, মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি" মনের ভাবটা তখন খানিকটা এই ধবণেব। অনেক ভেবে ঠিক কবলাম যে আদালতে গেলেই সহজেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। একদিন কাউকে কিছু না বলে, স্কুলে না গিয়ে অর্থাৎ পালিয়ে চলে গেলাম আলিপুর সেসন্স কোর্টে। এব আগে কখনো কোনো আদালতে যাই নি। চাবি দিকে লোক গিজ্ গিজ্ কবছে। উর্দি ও লাল পাগড়ি পবা পুলিসেব বহব দেখে মনটা কেমন দমে গেল। তাব উপব শুনেছিলাম যে সাধাবণ পোশাকে গা ঢাকা দিয়ে অনেক ডিটেকটিভ যাদেব টিকটিকি বলা হত— তাবা নাকি সেখানে ঘুবে বেড়ায়। বিচাবগৃহে প্রবেশেব জন্যে টিকিট দরকাব কি-না তাও জানতাম না। সেই ধবপাকড়েব দিনে এতবড় ব্যূহ ভেদ কবে আদালতেব ভিতবে প্রবেশেব প্রচেষ্টা বুদ্ধিমানেব কাজ বলে মনে হল না। এবং এখন বলতে বাধা নেই মনে খানিকটা ভয়ও কবেছিল। সুতবাং কোর্টঘবেব আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাঝে মাঝে জন-সাধাবণেব মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য পবিলক্ষিত হওয়ায় চেয়ে দেখলাম হাতে হাতকড়া-পবানো কোমবে দড়ি বাঁধা কোন একজন আসামীকে পুলিশরা শৌচগৃহেব দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কে এই নিয়ে নানা গুঞ্জনও শুনলাম। এই ক্ষণিকেব দেখাতেই মনটা যেন কেমন বোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সারাটা দিনে একবারও শ্রীঅববিন্দেব দেখা পাওয়া গেল না। দিন শেষে যখন কাছারি ভাঙল তখন কোর্টঘব থেকে আসামীদেব বেব করে আনতে গেল

প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায়। প্রথমেই এলেন শ্রীঅরবিন্দ যাঁর চেহারা আগে ছবিতে দেখেছি। একবাব মুখ তুলে তিনি আকাশেব দিকে চাইলেন। সে দৃষ্টি কী সুদূব-নিবদ্ধ। বর্তমান পবিবেশেব কোনো ছায়াই পড়ে নি তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে। জেলে থাকাকালে গালে-মুখে লম্বা দাড়ি হয়েছিল বলে মনে পড়ে। ধীবে ধীবে তিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ জাল দিয়ে ঘেবা পুলিশ ভ্যানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাব পব বাবীন্দ্র, উল্লাসকব প্রমুখ অন্যান্য আসামীবা একে একে সেই ভীষণ গাড়িব মধ্যে অন্তর্ধান কবে গেলেন। আব একবাব গোণা-গুণতিব পব গাড়িব দবজা বন্ধ কবে তালা লাগান হল। সে সময়ে পুলিশ ভ্যান ঘোড়ায় টানত; মোটব তখন চালু হয় নি। নবেন গোঁসাই তখনো বেঁচে। তিনি আসামীদেব বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন বলে তাঁকে আসামীদেব সঙ্গে ভ্যানের ভিতবে ঢোকান হল না পাছে অন্যেবা তাঁকে গলা টিপে মেবে ফেলে। তাঁকে কোচবাক্সে অশ্বচালক ও একটি পাহাবাওয়ালাব মাঝে বসানো হল। অফিসাবেব হুইসিল বাজলেই ভ্যান চলতে শুরু কবল। আব অমনি ভেতব থেকে হিন্দি ভাষায় গানেব মূর্ছনা উঠল। সেই বাব-তেবো বছব বয়সে যে গান শুনেছিলাম জীবনেব এই সায়াহ্ন বেলাতেও তা মনে আছে। সেই গানেব প্রথম দুটি ছত্র ছিল—

আও মবদানা জঙ্গী জোয়ানা
জল্‌দি জল্‌দি লেও হাতিয়াব।

গানেব সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে সবাই তাল বক্ষা কবছিলেন। নরেন গোঁসাইও এককালে সেই গান গেয়েছেন এবং সুবও তাঁব কণ্ঠস্থ। ভ্যানের কোচবাক্সে বসে তিনিও মনে হল যেন গানেব তালে হাঁটুব উপব তান দিচ্ছিলেন। কি মর্মন্তুদ সেই দৃশ্য! ক্রমে ভ্যান দূবে সবে যেতে লাগল। গানেব সুবও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে একেবাবে ডুবে গেল। কিন্তু সেই গানেব মূর্ছনা ধ্বনিত হতে লাগল আমাব কিশোব মনেব মধ্যে। আজও সে ধ্বনি যেন কান পাতলেই শুনতে পাই। বাড়ি ফিবে এলাম মন্ত্রমুগ্ধ মানুষেব মত। শ্রীঅববিন্দেব প্রশান্ত মুখচ্ছবি এবং তাঁব ভক্ত সহকর্মীদেব উন্মুখচিত্ত আনন্দিত প্রাণেব যে ছবি চক্ষে দেখে এলাম আজও তা আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে বয়েছে। আবো দু-একবাব এই বকম কবেই তাঁদের দর্শনের জন্যে সেসন্স কোর্টে যেতে হয়েছিল আপন অন্তবেব তাগিদে।

অবশেষে একদিন মামলার শুনানী শেষ হল। আসামীদের পক্ষ থেকে সি. আর. দাসের শেষ সওয়াল জবাবটি আইনের দিক থেকে একটি অপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব ভাষণ বলে বরাবরই স্বীকৃত থাকবে। তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সরকারী কেসের যাবতীয় অসমাঞ্জস্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যবহারজীবীর আইনের জ্ঞান ও সুনিপুণ বাগ্মীতার সঙ্গে বন্ধুপ্রীতি মিলিত হয়ে সে ভাষণ একটি পরমরমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সে সওয়াল জবাব শুধু সেই আদালতের বিচারকের কাছেই পেশ করা হয় নি তা পৌঁচেছিল আরো অনেক উচ্চ আদালতের দেবতার পায়ের কাছে যিনি অন্তরালে বসে সারা বিশ্বের নরনারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কৌসুলী এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন—

My appeal to you, therefore, is that a man like this, who is being charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar of this Court but before the bar of the high court of History and my appeal to you is this that long after this controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is dead and gone he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across the distant seas and lands.

শুনেছি আদালতের নিস্তব্ধতা এরূপ গভীর হয়েছিল যে, একটি আলপিন পড়লেও নাকি শোনা যেত।

অবশেষে রায় দেবার দিন এল। ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ সাহেব রায় দিলেন। বারীন, উল্লাসকর এবং আরো অনেকের দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলে তাদের দণ্ডবিধান হল। বারীন ও উল্লাস-করের হল প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য ক'জন যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের নানা বছরের জন্যে সশ্রম জেলের ব্যবস্থা হল। শ্রীঅরবিন্দ এবং বাকীরা বেকসুর খালাস হলেন। পরে আপীলে হাইকোর্টে বারীন ও

উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড নাকচ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছিল এবং অন্যান্য কয়েকজনের কারাদণ্ড কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রায় হয়ে যাবার পরই শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য যাঁরা খালাস পেয়েছিলেন তাঁরা সোজা চলে এসেছিলেন 'কালীমোহন আলয়' ভবনে যেখানে দাদাবাবু বাস করতেন। যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা সেদিন কি উৎসাহে বাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত বড় পুকুরে মুক্তিস্নান করেছিলেন তা দেখবার মত হয়েছিল। কালীমোহন আলয়ের আকাশ-বাতাস তাঁদের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দুপুরবেলা খাবার পর সবাই বাড়ির পেছনের গাড়িবারান্দার উপরের বড় ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখান দিয়ে, ওখান দিয়ে, উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁদের দেখবার চেষ্টা করছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সকলের মধ্যেই বসেছিলেন— মিতভাষী এবং চক্ষে সেই সুদূরনিবদ্ধ দৃষ্টি! তিনি যেন তাঁর চারিপাশের পরিস্থিতি থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্তভাবে আত্মস্থ হয়ে বসে ছিলেন। দু'টি সহকর্মীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার নিষ্ঠুরতা যেন তাঁর মুখমণ্ডলকে দুঃখের কালিমায় লেপে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে নিচু গলায় দু'একটি কথা দাদাবাবুর সঙ্গে বলছিলেন। কী মৃদু কণ্ঠস্বর। উত্তেজনার লেশমাত্র তাতে ছিল না। বিকেল হতে একে একে মুক্ত আসামীরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

সুদীর্ঘদিন জেলে অবস্থানকালেই শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের মনের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন অদৃশ্যে হয়ে আসছিল। জেলের ছোট্ট, নোংরা ঘরে একা বসে বসে তিনি গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। জেলখানায় সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করেই হয়ত তিনি আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখেছিলেন তমসার পরপারে। ধীরে ধীরে তাঁর মনের প্রসার ও বিকাশ হচ্ছিল এবং তিনি নিশ্চয় করেই বুঝেছিলেন যে কেবল বিপ্লবের নীতিতেই তাঁর আত্মিক ক্ষুধা মিটবে না এবং জীবনের চরম চরিতার্থতা ও পরিণতির জন্যে প্রয়োজন হবে একটি বৃহৎ জীবনের আদর্শধারা।

জেল থেকে খালাস পেয়ে তিনি 'কর্মযোগীন' নামে একটি পত্রিকা বের করে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মর্মার্থ এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কেবল কর্মযোগীর জীবনদর্শনেই তাঁর আত্মার ক্ষুধা মিটল না। তিনি চাইলেন পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে মিলিয়ে দিতে। ইংরেজ রাজত্বে

বাস করা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় কলকাতায় চার বছর থাকার পরে ১৯১০ খৃস্টাব্দে তিনি ফবাসী উপনিবেশ প্রথমে চন্দননগবে এবং শেষে পণ্ডিচেরীতে চলে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। পণ্ডিচেবী বাসকালে তিনি একান্তই আপনার ধ্যান-ধাবণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। পণ্ডিচেরীর আশ্রম থেকেই তিনি মাঝে মাঝে আশ্রমবাসীদেব কাছে দর্শন দিতেন এবং দেশবাসীদেব জন্যে তাঁব জীবনেব জাগ্রত অভিজ্ঞতাব কথা লিখে প্রচার কবতেন। আগেই বলেছি শ্রীঅববিন্দেব জীবনদর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে কোনো কথা বলাব যোগ্যতা আমাব নেই। যে উচ্চ পর্যায়ে উঠলে এইরূপ ধীমান মনস্বীব স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম কবা যায় সেই উচ্চ চূড়ায় আবোহণেব কোনো সুযোগ ও সুবিধে আমাব হয় নি। আমি তাঁকে খুব দূবে থেকে ভাসাভাসা বকমে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত কবেছি সেই বিরাট মহাপুরুষেব পায়ে যিনি পববর্তীকালে পবমাত্মাব মধ্যে চিব শান্তি, সুখ ও স্বর্গীয় আনন্দ-লাভ কবে নিজেব আশ্রমেই দেহবক্ষা কবে গেছেন।

১৩

কলকাতায় মনকে বিক্ষিপ্ত কবাব যথেষ্ট উত্তেজনা ও আনন্দেব আকর্ষণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্প পবিসব ক্লাসঘবেব মধ্যে কেমন যেন একটি অস্বস্তি বোধ কবতাম। ঠিক বুঝতাম না কাবণটা কী। কেবলই মনে পডত পল্লবিত আলোছায়াখচিত তরুতলেব ক্লাস। শান্তিনিকেতনেব নীল আকাশ, খোলা মাঠ এবং সবুজ ধানেব ক্ষেতেব স্মৃতি মনকে উদাস কবে দিত। বাৎসবিক পবীক্ষায় পাস কবে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম। একদিন সাহসে মন বেঁধে বডদিদিকে বললাম, 'আমি শান্তিনিকেতনে ফিবে যেতে চাই।' ভয় ছিল বডদিদি হয়তো বেগেই উঠবেন। কিন্তু তাঁব মুখ দেখে মনে হল যে আমাব আগ্রহ দেখে তিনি বেশ খুশিই হলেন। বস্তুতঃ তাঁব খুশি হবাবই কথা, কেননা আমাব শান্তিনিকেতনে যাবাব গোড়াতে ছিল তাঁবই উৎসাহ। তাব পব কী হল সঠিক জানতে পাই নি, কিন্তু অল্প কয়দিনেব মধ্যেই শুনলাম যে আমাকে আবাব শান্তিনিকেতনে ফিবে যেতে হবে। বডদিদি নিশ্চয়ই বাবা-মাকে ও বৌঠানকে বুঝিয়ে বাজি কবিয়েছিলেন আমাকে আশ্রমে ফেবত পাঠাতে। ১৩১৫ সালের পূজাব ছুটিব শেষেই ফিবে গেলাম ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। আমাব

বয়স তখন সবে চৌদ্দ।

আশ্রমে ফিবে নানা রকমেব পবিবর্তন লক্ষ্য কবলাম। ছাত্রসংখ্যা কিছু বেড়েছে। প্রাক্‌কুটিবে জায়গাব সংকুলান হয় না, তাবই পুব দেয়ালের গা থেকে টানা লাইনে নূতন ঘব তৈবি হয়ে গেছে। পুবেব অংশটাব মেঝের কতকটা এক ফুট কি দেড ফুট উঁচু কবে বাখা হয়েছিল। এই নূতন ঘবটিকে বলা হত 'নাট্যঘর'। প্রাক্‌কুটিবেব মতো এ ঘবে উত্তব দক্ষিণ দু ধাবে টানা বাবান্দা ছিল না বলে এই নূতন ঘবখানা বেশ প্রশস্ত হয়েছিল, মাঝখানে একটা চলাব পথ বেখেও দুই দেয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ পেতে ছেলেদেব শোবার ব্যবস্থা কবা হয়েছিল। অভিনয়েব সময় ঘবটিকে খালি কবে শতবঞ্জি বিছিয়ে দর্শকদেব বসবাব জন্যে ঢালা ফবাশ পাতা হত, ঘবেব বেদীর মতো অংশটা হত বঙ্গমঞ্চ। কেবল শান-বাঁধানো মেঝেটা ছাডা এই নাট্যঘবেব কোনো চিহ্নই আজকাল আব নেই। আম্রকুঞ্জেব গা ঘেঁষে শালবীথি চলে গিয়েছে 'দেহলি'ব দিকে, তাবই দক্ষিণ দিকে 'বাগান' বলে যে ঘবটি ছিল সেটি আমি ফিববাব আগেই হয়েছিল কি কিছুদিন পবে ঠিক মনে নেই। সেই ঘরও এখন আব নেই।

ইঁটকাঠের বাহ্যিক পবিবর্তনেব থেকেও বেশি অনুভব কবেছিলাম চেনা-জানা মানুষেব অভাব। প্রথম যখন আশ্রমে আসি তখন যে আমাকে স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা করে এনেছিল এবং স্নানেব সময় মাঝে মাঝে কুয়ো থেকে সদ্য-তোলা একটিন জল মাথায় ঢেলে দিত সেই জোয়ান পুরুষ কোদোকে দেখলাম না। দ্বিপুবাবুব তখন দুটি বর্মা টাট্টু দিয়ে টানা আপিস-যানেব ব্যবস্থা হওয়ায়, না ছিল সেই নধব নিটোল দুটি বয়েল দিয়ে টানা 'সাবা ব্যাঙ্ক' আব না ছিল সেই আফতাবুদ্দি মিঞা। আব ছিল না সেই সেকালেব ডাকাত-দলের সর্দাব, যিনি হয়েছিলেন আমাদেব দিনের বৃদ্ধ ডাকহবকবা। ফিবে এসে-আব দেখলাম না সেই জাপানী ওস্তাদকে, বানানো হল না নূতন কোনো নৌকা। শুনলাম গ্রীষ্মেব ছুটিতে আশ্রম থেকে আমি কলকাতায় ফিবে যখন ম্যালেবিয়ায় পডেছিলাম তাব অব্যবহিত পবে সর্বাধ্যক্ষ মোহিতবাবুব দেহান্ত হয়। আমার আশ্রমে ফেবাব কদিন আগেই গুরুদেবেব মেজো জামাই সত্যবাবুও দেহত্যাগ কবেন। সবচেয়ে মনটা দমে গেল যখন দেখতে পেলাম না বালককালের সতীর্থ শমীকে। যে গ্রীষ্মকালে আমি আশ্রম থেকে যাই তারই পরের পুজোর ছুটিতে শমী গিয়েছিলেন সন্তোষদার ভাই ভোলার সঙ্গে মুঙ্গেরে।

সেইখানে হঠাৎ কলেবা রোগে আক্রান্ত হয়ে শমী চলে গেলেন পরমপিতার শান্তিময় ক্রোড়ে— আর ফিরলেন না শান্তিনিকেতন আশ্রমে। তাঁর অভাবে আশ্রম যে কতখানি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তা বুঝেছিলেন আশ্রমবাসী সকলেই এবং বিশেষ কবে অনুভব কবেছিলাম তাঁব সহপাঠী আমবা ক'জনা। ফুলের মতো সুন্দব ছিল তাঁব চেহাবা, তেমনি স্নিগ্ধ সুকোমল ছিল তাঁব স্বভাব। মনেব মধ্যে এখনো ফুটে বয়েছে সেই উজ্জ্বল মুখচ্ছবি। কিন্তু গুরুদেব এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মবশ ছিলেন, ঈশ্বরে তাঁব বিশ্বাস ও নির্ভব এমনি গভীর ও অটল ছিল যে, শমীব মৃত্যুশোকেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি। মা-মরা ছোটো ছেলেটিব 'পবে তাঁব যে স্নেহমমতা ছিল সে বোধ কবি ছড়িয়ে পড়েছিল আশ্রমেব সকল শিশুতে।

আশ্রমে ফিবে দেখলাম অনেক নূতন অধ্যাপক এসে গিয়েছেন। কাশী থেকে এম. এ পাস কবে শাস্ত্রী উপাধি পাবাব কিছু পবেই শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আসেন আশ্রমে ১৯০৮ সালেব আষাঢ় মাসে। গায়েব বঙ ছিল মোটামুটি গৌববর্ণ, লম্বায় বাঙালী ভদ্রলোক হিসাবে বেশ একটু দীর্ঘকায় ছিলেন, প্রস্থেও কম ছিলেন এমন নয়। ঠোঁটেব কোণে লেগে থাকত মুচকি হাসি। তখন দেশ বিদেশ পর্যটন কবে বহু ভক্তবাণী, ভজন, বাউলেব গান ও পাড়াগেঁয়ে ছড়া সংগ্রহ কবে তিনি ভবেছিলেন তাঁব বিদ্যাব ভাণ্ডাবে। গুরুদেবেব অনুপস্থিতিতে ক্ষিতিবাবু মন্দিবে উপাসনা কববাব সময় এই-সব ভক্তবাণী আমাদেব শোনাতেন এবং সহজ কবে বোঝাতেন। তাঁব কাছে কিছুদিন ইতিহাস পড়েছিলাম। ইতিহাস তিনি পড়াতেন খুব সবস গল্পেব মতো কবে। বাজীবাওকে জিলিপি খেতে দেখে কে নাকি বলেছিল, 'দেখো দেখো, জিলিপি জিলিপি খাচ্ছে'— সে কথা এখনো মনে আছে, এবং বাজীবাও যে বেশ একজন প্যাঁচালো ডিপ্লোম্যাট ছিলেন তা বিশেষ কবে বুঝে নিয়েছিলাম এই উপমাটুকু থেকে। ক্ষিতিবাবুর হাস্যপবিহাস ছোটো-বড়ো সবাইকে নিয়েই হত। সর্বদা সাবধানে থাকতাম পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলি, কি কবে ফেলি তাঁর সামনে —কেননা, ভুল কবলে তক্ষুনি একটা পবিহাসেব তীক্ষ্ণ বাণ বুকে এসে লাগবার নিত্য সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি দাড়িগোঁফে মাস্টাবমশায়েব হাসিটি অল্প-বিস্তব চাপা পড়লেও বচনগুলি পূর্বেব মতোই সতেজ ও সবস আছে। বহুদিন পবে আশ্রমে দেখা, তখন আমি কলকাতা হাইকোর্টের জজ। চাপরাশি নিয়ে

ঘুরে বেড়ানোটা আমার কখনোই বিশেষ রপ্ত হয় নি ; মাস্টারমশায় বললেন, 'কৈ বে সুধীবঞ্জন, তোব চাপরাশি তো দেখছি না— কী জজিয়তি করস্ রে? লোকে মানব ক্যান?' বললাম, 'মশায়, ওটা আমার তেমন সুবিধা হয় না।' তিনি বললেন, 'বলিস কী— চাপবাশি, তাব মানে হল চাপেব বাশি, অর্থাৎ ইংবেজিতে যাকে বলে concentrated pressure— চাপবাশি না থাকলে জজ কিসেব বে?' বলে মুচকি হাসতে লাগলেন। শান্তিনিকেতনেব মাঠে বাটে এমনি ঘুবে বেডাই দেখে চেনা অন্য কোনো জজেব সঙ্গে তফাতটা তাঁব নজবে পডেছিল বোধ হয, তাই এই পবিহাস— তাঁকেই লক্ষ্য কবে, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

আব মনে পডে কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে। শুনেছিলাম তখন যে তাঁব'পবে পুলিসেব খুব সুনজব ছিল না বলেই গুরুদেব তাঁকে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। তিনি অতি অমায়িক ও পবদুঃখকাতব মানুষ ছিলেন। পাতলা দোহাবা চেহাবা, রঙ বাঙালীব পক্ষে ফবসাই বলা যেতে পাবে। যে-কোনো সৎকার্যে তাঁব উৎসাহেব অন্ত ছিল না। কিছুদিন আশ্রমে থাকবাব পব তিনি বিলেতে পডতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পবে লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবেব সঙ্গে সুরুলেব চাবি দিকে পল্লীউন্নয়ন-কার্যে লেগে গেলেন।

পবে পবে আবো যে-কজন মাস্টাবমশায় এসেছিলেন আমাব সময়ে, তাঁদেব কথা এইখানেই বলে বাখি। তাঁবা কে কবে এসেছিলেন সঠিক মনে নেই। শবৎকুমাব বায় মশায়কে বেশ মনে পডে। দৈর্ঘ্যে বেঁটে বললেই চলে। রঙটি নিকষ-কালো— মনটি হাসিখুশিতে ভবা। মাস্টারমশায়দেব মধ্যে চায়েব মজলিশে তিনি জমিয়ে বসতেন। চা পবিবেশনেব ভাব ছিল তাঁব উপবেই। 'শরৎদা' বললেই মাস্টাবমশায়বা তাঁদেব নিজ নিজ ববাদ্দ পেতেন। ভাবী 'চা-চক্রে'ব চাবাগাছ এইভাবেই প্রথম বোপণ কবা হল অনুমান কবি। আমরা ছেলেবা বৃষ্টিতে ভিজে, গায়েব কাপড গায়ে শুকিয়ে আশ্রমে ফিবলে শবৎবাবুব ব্যবস্থা ছিল আদা-চা খেতেই হবে। তখন কিন্তু ঐ আদাব রস দেওয়া চা অমৃতসমান মনে হত। শবৎবাবু আমাদেব শিখ ও মারাঠি ইতিহাসেব গল্প শোনাতেন— সেই গল্পগুলিই পবে পুস্তকাকাবে ছাপা হয়েছিল।

আমি ফেববাব কিছু পবেই শুনলাম যে আমাদেব ইংবেজি পডাবাব জন্যে ভালো একজন মাস্টাবমশায় আসবেন— ইংবেজিতে তাঁব নাকি বেজায়

দখল, পুরো বাইবেলটা নাকি তাঁর মুখস্থ। এইরকম ডঙ্কা বাজাবার পর এলেন চুনিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বেশ বলিষ্ঠ শরীর এবং ভারিক্কি তাঁর চাল ছিল। ইংরেজি উচ্চারণ সত্যিই ইংরেজদের মতন এবং ইংরেজি সাহিত্যে যথার্থ দখল ছিল। মেজাজটা একটু রুক্ষ এবং রসবোধের গতি ছিল ধীর মন্থর। শরৎবাবুর চায়ের মজলিশে কোনো রসিকতার কথায় অন্যান্য মাস্টারমশায়দের হাসি হয়ে চুকে যাবার খানিকটা পর চুনিবাবু হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতেন। এই হাসিটি বিগত কোন্ সময়ের কোন্ রসিকতাপ্রসূত বুঝতে না পেরে অন্য সকলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে তিনি হাসতে হাসতে নিজেই তা সবিশেষ ব্যাখ্যা করে দিতেন।

সত্যেশ্বরবাবু ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ, এ দিকে পরম রসিক। তাঁর ভাই ছিলেন বীরেশ্বরবাবু, আমরা তাঁকে ডাকতাম বীরেশ্বরদা। তিনি এলেন রাজেনবাবুর জায়গায়। প্রতি বুধবারে কাগজ পেনসিল ও বাড়িতে চিঠি লেখার পোস্টকার্ড সরবরাহ করতেন আমাদের। হীরালালবাবুর উপর পুলিসের বিশেষ বক্রদৃষ্টি ছিল। বিশালকায় মানুষ ছিলেন, পালোয়ান বললেই হয়। কী প্রচণ্ড দেখাত তাঁর মাংসপেশীগুলো, যখন বাহুদুটি ভাঁজ করতেন হাত মুঠো করে— বুকের ছাতিই বা কী প্রশস্ত। এরকম চেহারার লোকের উপর সেই স্বদেশী আমলে পুলিসের নজর না পড়ে যায় না। কালী-মোহনবাবুর মতো তাঁকেও গুরুদেব এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে পুলিসের জুলুম থেকে রেহাই দেবার আশায়।

তেজেশদা এসেছিলেন পড়াতে, না পড়তে, আজ পর্যন্ত তার হদিস পাই নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকদিন ছোটোদের পড়িয়েছিলেন। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে 'তালধ্বজ' তাঁর শান্তিনীড়— পরবর্তীকালে গুরুদেব কবিতা লিখে এটিকে সাহিত্যে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তালগাছের একানড়ের মতো তিনি ছেলেদের মনে ভীতি সঞ্চার করেন না বরং তার বিপরীত— মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় এসরাজটি বাজিয়ে তিনি শিশুদের মনোরঞ্জনই করে থাকেন। সকলেরই তেজুদা, সকলের বন্ধু, অমায়িক মানুষ তিনি। বরানগরের যতীন মুখুজ্জে মশায়কেও বেশ মনে আছে। তাঁর নামেই তাঁর ভাই ধীমু প্রখ্যাত, না ধীমুর নামেই তাঁর পরিচয়, নিশ্চিত বলতে পারি নে। হাসপাতালে ছেলেদের সেবা-শুশ্রূষা করতে এসেছিলেন অক্ষয়বাবু। তিনিও স্বদেশী যুগের কর্মী— বিপিন পাল মশায়ের সঙ্গে ছিলেন

অনেক দিন। মাতৃসম স্নেহশীল ছিল তাঁর ব্যবহার অসুস্থ ছোটো ছেলেদের প্রতি। বিনোদবিহাবী বায় কলকাতা মেডিকেল কলেজেব ভালো ছাত্র ছিলেন, আগাগোড়া তাঁব পবীক্ষাব ফল ভালো ছিল। শেষ বছব পর্যন্ত এম. বি. পড়ে তিনি শেষ পবীক্ষাটা দেন নি। পবীক্ষা পাস করে ডাক্তাব হলে পাছে টাকা বোজগারে লোভ হয়, শুনেছি তাই তিনি শেষ পবীক্ষাটা দেন নি। লোকসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্রমেব হাসপাতালে কিছুকাল ডাক্তাবি কবে পবে তিনি আসামেব চেবাপুঞ্জিতে একটি ব্রাহ্মমিশন প্রতিষ্ঠা করে আজীবন জনহিতকব কাজ কবে গেছেন।

১৯১০ সালের জুন মাসে এলেন নেপালচন্দ্র বায় মহাশয়। বোধ কবি তখন তাঁব মাঝবয়স পেবিয়ে গেছে। চেহাবা ছিল সুদর্শন, মোলায়েম কণ্ঠস্বব, কথাও বলতেন খুব মিষ্টি কবে। ব্যবহাবে শান্ত ও অমায়িক কিন্তু চরিত্রবলে দৃঢ় অটল— এবকম মানুষ খুব কমই মেলে। মাস্টাবমশায়েব মতো এমন ভোলা-মন লোকই দেখি নি। অন্তত একবাব ট্রেন ফেল না কবে তিনি বোধ হয় জীবনে কখনো ট্রেন ধবতে পাবেন নি। আশ্রম থেকে বোলপুব স্টেশনে যাবাব পথে যে কটি চেনা লোকেব সঙ্গে দেখা হবে তাদেব প্রত্যেকেব সপবিজন-কুশলসংবাদ খুঁটিয়ে নেওয়া চাই— সেটা যে সময়সাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ততক্ষণ সবকাবী বেলগাড়ি তো স্টেশনে অপেক্ষা কবে দাঁড়িয়ে থাকে না— কাজেই মাস্টারমশায়েব প্রায়ই ট্রেন ফেল হত। বহুবিধ জ্ঞানেব তিনি ভাণ্ডারী ছিলেন কিন্তু জ্ঞানেব অভিমান তাঁব ছিল না একেবাবেই। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথেব সান্ধ্যসভায় তাঁব প্রায়ই ছিল আমন্ত্রণ। সত্যি আমাদের তিনি পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ কবে গেছেন। আশ্রমবাসেব শেষ বছবটা তাঁর কাছে ইংবেজি পড়েছিলাম।

দ্বিপুবাবুব স্ত্রী হেমলতা দেবী থাকতেন নিচুবাংলায়। তিনি তাঁর শ্বশুব ও গুরুদেবেব দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথেব দেখাশুনা কবতেন। ছেলেদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। আমবা সকলেই তাঁকে 'বড়োমা' বলে ডাকতাম। কে যে কবে প্রথমে তাঁকে 'বড়োমা' বলে ডাকলেন সে কথা আশ্রমেব ইতিহাসেব পাতায় লেখা নেই। কিন্তু এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বৎসর ধবে আমবা তাঁকে 'বড়োমা' বলেই ডেকে এসেছি। মাঝে মাঝে তাঁব কাছে নিচুবাংলায় গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আসা যেত পবমান্ন ও পিঠে খেয়ে। নিচুবাংলায় গেলেই উঁকিঝুঁকি মারতাম দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরের দিকে। বেশির ভাগ

সময়েই দেখতাম তিনি পড়ছেন কি লিখছেন। মাঝে মাঝে দেখেছি কাগজ দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্স বানাচ্ছেন। সে বাক্স নাকি অনেক অঙ্ক কষে মাপ ঠিক করে করতে হত। শুনেছি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও রচনার মধ্যে মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড কী করে লেখা যায় তারও চর্চা করতেন। তাঁর ঘরে কাঠবিড়ালী শালিখ প্রভৃতির খুব আনা-গোনা ছিল। শুনেছি তাঁর খাবার সময় তারা নাকি তাঁর ঘাড়ে কি টেবিলে বসে যেত খাবার জন্যে। এগুলিও ছিল নিচুবাংলার আকর্ষণ। মুখ্য আকর্ষণ অবশ্য ছিল বড়োমার ঘরের দাওয়ায় বসে খাওয়া। বড়োমা আমাদের ইংরেজি ক্লাসে বসে ইংরেজি শিখতেন। বড়োমা পরে পুরীতে এক বিধবাশ্রম স্থাপন করে সেখানে দুঃস্থ বিধবাদের কিছু কিছু লেখাপড়া, সেলাইয়ের কাজ এবং তাঁতের কাপড়-গামছাও বোনান শেখানোর জন্যে একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে আশ্রমটি দেখে বড়োমাকে প্রণাম করে এসেছি। খুব বড়ো কাজ তিনি করেছেন নীরবে ও অকাতরে। তিনি শেষ জীবনে আরও বেশিসংখ্যক ছেলেমেয়েদের বড়োমা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করি, শান্তিনিকেতনের ছেলে, তাঁরা বুড়োই হোন আর ছেলেমানুষই হোন— যখন 'বড়োমা' বলে ডেকে দাঁড়ান তখন নিশ্চয়ই তারা একটু বিশেষ রকমে সাড়া পেতেন তাঁর কাছ থেকে আমরা যে স্নেহ পেয়েছি তা ভোলবার নয়। বড়োমার লেখা অনেক সুললিত কবিতায় সুর দিয়ে আমরা গাইতাম। অপূর্ব ছিল সে সকল কবিতার ভাব ও ভাষা।

১৪

পূর্বে বলেছি আশ্রমে ফিরে এসে দেখি ছাত্রসংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। আমি এবার তৃতীয় শ্রেণীতে বছরের মাঝামাঝি ভর্তি হলাম। ক্লাসে তখন আমরা জন-দশেক ছেলে। এক ভোলা ছাড়া আমাদের ক্লাসের সবাই নবাগত, অর্থাৎ গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কলকাতা চলে যাবার পর আগত। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর (দেববর্মন) মহাশয়ের ছেলে সোমেন্দ্রর মতো ছেলে কমই দেখা যায়। চেহারাটা ছিল তাঁর যেমন নধর নরম, স্বভাবটিও ছিল তেমনি নম্র মধুর। পরকে আপন করে নেবার এবং ভালোবাসার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সোমেন্দ্রর গানের গলা তেমন ছিল না, কিন্তু গাইবার

উৎসাহ ছিল অদম্য। মনে আছে, একবার একটি ভদ্রমহিলা যিনি পরে আমারই সহধর্মিণী হয়েছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি তো শান্তিনিকেতনের ছেলে, আপনি রবীন্দ্রনাথের গান করেন না?' তার জবাবে অম্লানবদনে সোমেন্দ্র বলে ফেললেন, 'তা গুরুদেবের প্রায় সব গানই মোটামুটি গাইতে পারি বই-কি।' দাবির বহর দেখেই মহিলাটি বোধ হয় আমার বন্ধুটির কেরামতি বুঝেছিলেন, তাই গানের কথা ঐখানেই শেষ করেছিলেন। ভাগ্যিস গানের পরীক্ষাটি হয় নি। শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সোমেন্দ্র আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পর ত্রিপুরা-দরবারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েছিলেন। কলকাতায় আমাদের বাড়ি খুবই আসতেন, আমার মাকে 'মাসিমা' বলে ডাকতেন। মা তাঁকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন, তিনি এলে ঘরে যাই থাক্ খাইয়ে দিতেন। শান্তিনিকেতনের বড়োমাও সোমেন্দ্রকে খুব স্নেহ করতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সোমেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতির কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের একটি দান সংগ্রহ করে গুরুদেবকে দেন আশ্রমের কাজে। চেকখানা দিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে সোমেন্দ্র কলকাতায় আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মা তাঁকে খেয়ে যেতে বলায় সোমেন্দ্র বলেছিলেন, 'মাসিমা, আজকে আর খাব না। লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি বউকে আনতে, ফিরে এসে দুজনেই খেয়ে ও থেকে যাব দু দিন।' সোমেন্দ্র সেই রাত্রিরেই রওনা হয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌ-অভিমুখে। সে যাত্রা যে অগস্ত্যযাত্রা হবে কে তখন তা জানত। যাবার পথে ভীষণ রেল-দুর্ঘটনায় সোমেন্দ্র মারা গেলেন। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর একমাত্র নিশানি পাওয়া গিয়েছিল ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্কের আধপোড়া চেকবইখানা। শেষ গুরুদক্ষিণা দিয়ে সোমেন্দ্র চলে গেলেন, বন্ধুপ্রীতির স্মৃতিটুকু মাত্র রেখে।

মনোরঞ্জনদার বয়স ছিল আমার চেয়ে কয়েক বছর বেশি। গৌরবর্ণ সৌম্য মূর্তি ছিল তাঁর। সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ, সুন্দর বাংলা কবিতা তিনি লিখতেন। মনে আছে, তখনকার দিনের চার আনা দামের একখানা বাঁধানো খাতায় তাঁর লেখা অনেকগুলি কবিতা স্বহস্তে নকল করে বইখানা আমার নামে উৎসর্গ করে আমারই হাতে তিনি সমর্পণ করেছিলেন। আমার খুব আদরের জিনিস ছিল সেই কবিতাগ্রন্থ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমার যে, কোনো-এক সময়ে বাড়ি বদলাবার গোলমালে অন্যান্য জিনিসের

সঙ্গে সতীর্থের সে অমূল্য উপহারটিও হারিয়ে ফেললাম। মনোরঞ্জনদার দু-চারটে লেখা আশ্রমের সাময়িক পত্রিকা 'শান্তি'তে এবং পরে কলকাতা ও ঢাকার অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। মনোরঞ্জনদার বিবাহ হয়েছিল ঢাকার শ্রদ্ধেয় প্রসন্নকুমার সেন মশায়ের কন্যা ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ইন্দুর সঙ্গে। খুবই আনন্দের সংসার তাঁদের হয়েছিল, আর্থিক অনটন সত্ত্বেও।

বিশুদা (বিশ্বেশ্বর বসু)-কে সুপুরুষ বলা চলত না অত্যুক্তি করেও। তবে চেহারাটা যতটা না রুক্ষ ছিল, মুখের ভাবটি করে থাকতেন তার চেয়ে ঢের বেশি রুক্ষ। কাব্যে তাঁর পরম অশ্রদ্ধার ভান ছিল। ইংরেজি কি বাংলা কোনো ভালো কবিতা বিশুদার কাছে আওড়ালেই বিশুদা বলতেন, 'আমি কাব্যকাননের কাঠঠোকরা— আমায় আর কেন?' কথাটা আমাকেই ঠেস দিয়ে বলা। ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি। আমাদের মাস্টারমশায় শরৎবাবু একবার আমাকে বলে ফেলেছিলেন 'আশ্রম-কোকিল'। আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম যে আমার কণ্ঠের তারিফ করেই মাস্টারমশায় ঐ নামটি আমায় দিয়েছেন— মনে বেশ স্ফূর্তি অনুভব করেছিলাম। বিশুদা বললেন, 'মাস্টারমশায় যে নামটা দিয়েছেন সেটি দ্ব্যর্থক হতেও পারে।' কথার ধাঁচে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, বিশুদা আমার গায়ের রঙের প্রতি কটাক্ষ করেই কথাটা বললেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে মাস্টারমশায়ের গায়ের রঙ আমার চেয়েও নিদেনপক্ষে দুই পোঁচ গাঢ়তর ছিল, সুতরাং রঙ নিয়ে তিনি আমাকে উপহাস করেছেন এ কথা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। প্রথমে তবু মনটা কেমন দমে গেল। আমার কোকিল বলে খ্যাতি ছিল বলেই বিশুদা নিজেকে কাঠঠোকরা বলে পরিতোষ লাভ করলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নানা নূতন ছন্দে কবিতা লিখছিলেন। তাঁর 'তীর্থরেণু'তে একটি অভিনব ছন্দের কবিতা ছিল। সেটির প্রথম স্তবক ছিল চার অক্ষরের ছত্রে গাঁথা: স্তবকে স্তবকে ছত্রের মাত্রাসংখ্যা বেড়ে বেড়ে বেশ দীর্ঘায়ত হয়ে আবার কমতে কমতে শেষ স্তবকে চার অক্ষরের ছত্র গেঁথে সমাপ্ত হল। পেটমোটা, আগেপিছে ক্রমশ টিকটিকির মুখ ও লেজের মতো। মনোরঞ্জনদা যখন ছন্দটার তারিফ করছিলেন বিশুদা উঁকি মেরে কবিতার চেহারাটি দেখে হাই তুলে বললেন— 'সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি হল বেজি ছন্দ।' বিশুদার একটা পোষা বেজি ছিল— বেশ বোঝা গেল যে ছন্দের

আকৃতি দেখেই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সেই পোষ্যটির ছুঁচলো মুখ ও লম্বা সরু লেজটি। বিশুদা আমাদের সঙ্গে পাস কবে বেরিয়ে শেষে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তাবি পাস কবে স্বস্থান সাহেবগঞ্জেই ডাক্তাবি কবতেন।

বিশুদাব মেজো ভাই বীবেনও এসে জুটলেন আমাদেব ক্লাসে—ক্ষিতিবাবু তাঁব নামকবণ করলেন 'শিশু'। পবে যখন তাঁদেব সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি এলেন আশ্রমে তখন তাকে 'যীশু' বলা ছাড়া গত্যন্তব থাকল না। বীবেন পবে অ্যাটর্নি হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বেশ পসাব জমিয়েছিলেন, ইতিহাসচর্চাও কবতেন। তিনি স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক স্যাব যদুনাথ সবকাবেব কন্যাকে বিবাহ কবেছিলেন।

মাস্টাবমশায় জগদানন্দবাবুব ছেলে সাহিত্যসমাজে এক সময়ে ত্রিগুণানন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সতীর্থ আমবা তাঁকে 'পটলদা' বলেই ডাকতাম। পটলদা ভালো বাংলা লিখতেন। গদ্যে লিখতেন বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ আব ছন্দে বেশ একটু ভাবিক্কি ভাবেব কবিতা। তাঁব অনেক লেখা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থতাবশত পটলদা সাহিত্যে ও জীবনে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ কবতে পাবেন নি, অকালেই দেহত্যাগ কবেন।

সত্যেন ভট্টাচার্য ছিলেন উপেনদাব মেজো ভাই—দেখতে ফবসা, মাথায় খুব পাতলা চুল। পবে যখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন, তখন ছাত্রাবাসে যে নাপিত ক্ষৌবকার্য কবতে আসত তার সঙ্গে নাকি সত্যেন অর্ধেক দামে চুল ছাঁটবাব বন্দোবস্ত কববাব চেষ্টা কবেছিলেন, এইবকম কিংবদন্তি শুনেছি। মোটেব উপব খেলাধুলা পড়াশুনো দুই-ই ভালো কবতেন। তাঁদেব যমজ ছোটো ভাই ছিলেন জিতেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র—লব কুশ নামে পবিচিত। ব্রজেন্দ্র শ্রীবামপুবেব উইভিং কলেজেব সর্বাধ্যক্ষ হযেছিলেন।

শ্যামদা ছিলেন শাস্ত্রীমশায়েব আত্মীয় এবং হীবালালদা ছিলেন ক্লাসের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ—দুজনেই খেলাব মাঠে নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। জ্ঞানবাবুর ছোটো ভাই সুধীন চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গেই পড়তেন। পরে তিনি বেঙ্গল ভেটারেনাবি কলেজ থেকে পশুচিকিৎসাব ডাক্তারি পাস কবেছিলেন। ভুল জায়গায় বেফাঁস কথা বলে ফেলবাব একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল আমাদের সোমেন্দ্রর। সুধীন ডাক্তারি পাস করবার পব ক্ষিতিবাবুর সামনেই সোমেন্দ্র বলে বসলেন, 'যাক, আমাদের একজন

ডাক্তার হল।' আর যাবে কোথায়—তীবেব মতো জবাব এল ক্ষিতিবাবুব—'হ্যাঁ, তোমাদেব চিকিৎসাটা ভালো বকমেই হৈব।'

বডোমাও আমাদের সঙ্গে ইংরেজি ক্লাসে যোগ দিতেন। অজিতবাবুব স্ত্রী লাবণ্যদিও বোধ কবি কিছুদিন এসেছিলেন ক্লাসে। যতদূব মনে পড়ে গুরুদেবেব ছোটো মেয়ে মীবাদিও আসতেন। হিবণদি বলে একজন ছিলেন আমাদেব নিত্যকাব সহপাঠিনী। ইনি হলেন ঢাকাব প্রসন্নবাবুব বডো কন্যা, ইন্দুব দিদি।

আমি যখন আশ্রমে ফিবে এসে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলাম তখন উপরে আবো দুটো ক্লাস ছিল। সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে পডতেন উপেনদা ও অরুণদা, আর আমাদেব ঠিক উপবেব ক্লাসে ছিলেন গোবদা ও দেবলদা, তাঁদেব কথা আগেই বলেছি। ফিবে এসে দেখি অরুণদা আগেবই মতো লিকলিকে বয়ে গেছেন কিন্তু গোবদাব চেহারা হয়ে উঠেছে আবো বলিষ্ঠ; এক মাবে ফুটবলটি বডো মাঠেব মাঝ-ববাবব পৌঁছে দিতে পাবতেন। তাঁর সুগঠিত দেহ সার্কাসেব খেলোয়াড়দেব মতো দেখাত। দেবলদাব ছেলেমানুষি ছিল একই বকম। বয়সে পনেবোব কাছে পৌঁছলেও কাঠেব নৌকোতে পাল তুলে তখনো মাঝে মাঝে জলে ভাসাতেন, তবে সেটা সামনেব ছোট্ট ডোবাটিতে নয়, দূবে ভুবনডাঙাব তালদিঘিতে।

অনেক নূতন ছেলে আমাব ফেববাব আগে এবং তাব পব ধীবে ধীবে ক্রমাগত এসেছেন; এঁদেব মধ্যে পববর্তীকালে যাঁদেব সঙ্গে দেখাশোনা হত তাঁদেবই বিশেষ কবে মনে পড়ে। ক্ষিতিবাবুব সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এসেছিলেন তাঁব দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বীবেন ও ধীবেন। বীবেন ছিলেন খেলোয়াড। গৌরদা যখন কলকাতায় কলেজে পডতে গিয়ে মোহনবাগানে ঢুকে পডলেন বীবেন তখন শান্তিনিকেতনে গোবদাব সিংহাসনটি দখল কবে বসলেন। পবে তিনি বি. এম. সেন নামে খ্যাত হয়ে কনট্রাক্টাব ও ইঞ্জিনিয়াব রূপে প্রচুব পসাব-প্রতিপত্তি লাভ কবেছেন। বীবেনেব মধুব স্বভাবে শিক্ষক এবং সতীর্থেবা সকলেই আকৃষ্ট ছিলেন। বীবেন বেশ হাসিখুশি ও বসিক প্রকৃতির ছেলে ছিলেন, সেই স্বভাব এখনো আছে। বীবভূমেব ভাষাটি তাঁব তখন থেকেই সডগড় হয়েছে এবং সেই ভাষায় বসাত্মক গল্প বলায় তাঁব যথেষ্ট ক্ষমতা এখনো রয়েছে। ছেলেমহলে তাঁর চিবকালই প্রতিপত্তি—তাঁব জীপে চড়ে নি এমন ছেলে আশ্রমে দুর্লভ। ধীবেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির

ছেলে ছিলেন। মনে মুখে এক—কালোকে কালো বলতে মুখে আদৌ বাধে নি কোনোদিন। লণ্ডন থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়ে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ-পদে কয়েক বছর কাজ করবার পর তিনি পশ্চিমবাংলা সরকারের শিক্ষাসচিব হয়ে যশস্বী হন। বর্তমানে তিনি বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য। দুই ভাই মিলে শান্তিনিকেতনেই বসতি করেছেন—প্রাচীনকালের বন্ধুজনেরা তাঁদের মায়ের স্নেহ-সমাদর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পেয়েছেন। এই দুটি ভাইয়ের স্ত্রী দুটিরও তুলনা নেই অতিথিসেবায়, তার সত্য সাক্ষ্য দিতে পারি নিজের জ্ঞানমতে।

সে সময় আর এসেছিলেন ক্ষিতিবাবুর শ্যালক প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, যাঁকে আমরা পিলু বলেই জানি। পরে পিলু বিহারের সমবায় সমিতির চীফ অডিটার হয়েছিলেন এবং পাটনাতে বসতিকালে সেখানকার আশ্রমিক-সংঘের সভাপতিত্ব করেছেন। এখন শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে বাড়ি করে আশ্রমবাস করছেন। পিলুর ছোটো ভাই সেবক, যিনি এখন আশ্রমের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করছেন, তিনি বোধ হয় কিছুকাল পরেই এসেছিলেন। ক্ষিতিবাবুর পরামর্শেই বোধ করি সুবকুমার সেনকে তাঁর বাবা মা পাঠিয়েছিলেন আশ্রমে। যেমন ডানপিটে দুরন্ত ছেলে, তেমনি জোয়ান চেহারা, ভয়ডর তাঁর ছিল না। লঙ জাম্প, হাই জাম্প, গাছে চড়ে লাফ, সবেতেই তিনি ছিলেন ওস্তাদ। বর্ষার দিনে কোপাই নদীতে বান ডাকলে তার উজানে সাঁতার দিতে হবে এই ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। মাস্টার-মশায়দের অনুমতি পেলে লাইব্রেরি-বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তেও বোধ হয় তার মজা লাগত। তিনি খেলাধুলায় বীরেন সেনের ছিলেন সাকরেদ, কিন্তু পড়াশুনায় উঠেছিলেন তাঁর সেই গুরুটিকেও ছাড়িয়ে। আর কী অপূর্ব মিষ্টি ছিল তার গানের গলা! একদল ছেলের মধ্যে সুবকুমারকে আগে চোখে পড়তই। অল্পবয়সে তিনি বিলেতে অধ্যয়ন করতে যান। এখন তিনি শুনেছি খনি খুঁড়ছেন মধ্যপ্রদেশে।

সে সময়ে এসেছিলেন সুহৃদ ও তাঁর ভাই প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। এঁরা হলেন নামকরা আই. সি. এস. বি. এল. গুপ্ত সাহেবের প্রথমা কন্যা স্নেহলতা সেন যাঁকে আমরা লটিদিদি বলতাম, তাঁরই দুই ছেলে। সুহৃদ ছিলেন আমার সমবয়সী, যদিও আমার এক ক্লাস নীচে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়েছিল। গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকালে তাঁব মৃত্যু হয়। এমন নম্র মধুর স্বভাবেব ছেলে কমই দেখা যায়। প্রদ্যোতকে আমবা হাবলু বলেই জানি। মন্দিবে গুরুদেবেব উপাসনা এবং উপদেশ তিনি লিখে নিয়ে গুরুদেবকে দিয়ে সংশোধন কবিয়ে নিতেন। হাবলুব অনুলিখিত গুরুদেবেব অনেক ভাষণ 'শান্তিনিকেতন' পত্রে ছাপা হয়েছিল, গুরুদেব-কৃত 'বলাকা'ব ব্যাখ্যান তাব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাবলু ববাববই আশ্রমটিকে হৃদয়মন দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কর্মক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছিলেন। আয়কব-কমিশনাবেব পদ থেকে অবসব গ্রহণ কবে এখন তিনি বিশ্বভাবতীব সেবায় ও পক্ষিতত্ত্বেব আলোচনায় আত্মনিয়োগ কবেছেন। এঁবই ছোটো ভাই কুলপ্রসাদ ওবফে মটুক এসেছিলেন পবে। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে পাস কবে বেবিয়ে শেষে কলকাতায় পড়া সাঙ্গ কবে ডাক ও তাব বিভাগে উচ্চপদে চাকবি কবে বাংলা দেশেব পি. এম. জি হয়ে অবসব নিয়ে সপবিবাবে শান্তিনিকেতনেই বাড়ি ও ক্ষেত খামাব কবে বসবাস কবছেন। মটুক বিবাহ কবেছেন শ্রদ্ধেয় সুবেন ঠাকুব মশায়েব কন্যা জযাকে।

এখন তপনমোহনেব কথা উল্লেখ কবি। তিনি নয়নদাব ছোটো ভাই। সম্পর্কে তিনি গুরুদেবেব নাতি, তাঁব মা গুরুদেবেব বডদাদাব কন্যা, তাব উপব তিনি বডোমাব ভ্রাতুষ্পুত্র। এই-সব মিলিয়ে আশ্রমে তপনেব একটু খাতিব ছিল। তপনেব অভিনয়পটুতা ছিল। বঙ্গবসেব ভূমিকায় তাঁকে মানাত সবচেয়ে বেশি। তাঁব চেহাবা, হাত ও মাথা নাডার বিশেষ ভঙ্গী এবং গলাব স্ববেই দর্শকবা সকলে হেসে খুন। 'বোগেব চিকিৎসা' এবং 'বিনি পয়সাব ভোজ' নকশা দুটিতে যথাক্রমে হাবাধন ওবফে হারু এবং আপিস-ফেবতা অক্ষয়েব ভূমিকায় তপনেব অভিনয় দেখবাব মতো হয়েছিল। তপনেব গানেব গলা ঠিক তাঁব মামাবাড়িব যোগ্য ছিল না বললে অপপ্রচাব হবে না। সেইটেই ছিল তপনেব মনেব দুঃখ। কিন্তু কোথায় সে দুঃখেব লাঘব কববেন, না আরো সেটা উসকিয়ে দিতেন তাঁব দিন্‌দা। সন্ধ্যাব সময় গানেব ক্লাসেব দিকে তপনকে ঘোবাঘুবি কবতে দেখলেই দিনুবাবু যেন আঁৎকে উঠে বলে ফেলতেন— 'ঐ বে।' নেহাৎ আত্মীয় না হলে কি এমন কেউ কবে? শান্তিনিকেতন থেকে আমাদেব পবেব বছব প্রবেশিকা পবীক্ষা পাস হয়ে কলকাতাব বিশ্ববিদ্যালয়েব ডিগ্রি লাভ কবে তপন বিলেত গিয়ে ব্যাবিস্টার হয়ে আসেন। পরে তিনি পশ্চিম-বাংলা সবকাবেব অ্যাডমিনিস্ট্রেটাব

জেনাবেলেব পদে নিযুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন। সেই সময়ে বাংলা দেশেব বহু গণ্যমান্য বনেদী বংশেব উইল ও নানা বকমেব দলিল দেখে ইংবেজ-বাজত্বেব আদিযুগে বাংলাদেশের বীতিনীতি এবং সামাজিক অবস্থার অনেক তথ্য আহবণ কবেন ও এ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লেখেন। তাঁব 'পলাশীব যুদ্ধ' বইখানাব তুলনা মেলে না। যেমন তাঁব ভাষা তেমন তাঁব খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহ— তদানীন্তন বাংলা দেশেব বাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন অতি মনোবম কবে। তাঁব লেখা 'স্মৃতিবঙ্গ' ও 'বাংলা লিবিকের গোডাব কথা'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অল্প কিছুকাল আগে তাঁব মৃত্যু হয়েছে।

হিতেন হীবেন ও নবেন ধর্মনিষ্ঠ মথুবানাথ নন্দী মহাশয়েব তিন পুত্র। হিতেনেব সে আমলে নানা বিষয়ে উৎসাহেব অন্ত ছিল না। তিনি বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন। কোদোব মতো লম্বা লম্বা টানে কুযো থেকে জল তুলতে ছিলেন ওস্তাদ। হিতু এককালে কাজলকালী বলে কালীব ব্যাবসা কবতেন। এখন তা ছেড়ে দিয়েছেন। হিতু বাংলা কবিতা লেখেন ভালো এবং পডাশুনা নিয়েই এখন আছেন। হীবেনও ফুটবল খেলতেন ভালো। আমেরিকায় পডতে গিয়ে তিনি সেখানে বয়ে গিয়ে সেখানেই ডাক্তাবি কবতেন। সম্প্রতি তিনি সেখানেই দেহবক্ষা কবেছেন। নবেন গম্ভীব প্রকৃতিব মানুষ ছেলেবয়স থেকেই। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বরোপাসনা ছিল তাঁর দৈনিক কৃত্য, এখনো তাই আছে শুনতে পাই। নিজ জীবনে যা সত্য বলে জেনেছেন তাকে এতটুকু খাটো কবে কোনোবকম বফা-বন্দোবস্তে তিনি বাজি হতেন না। কোনো একটা বিষয়ে গুরুদেবেব সঙ্গে মতেব অনৈক্য হওয়ায় নবেন বিনা দ্বিধায় আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন। বহু বছব পবে তাঁকে ফিবিয়ে আনা হযেছিল এই সবে সেদিন। এখন তিনি অবসব নিয়েছেন।

প্রমোদদাব ভাইয়েব নাম ছিল তরুণকুমাব বায়। প্রমোদদাব ছিল বেশ দোহারা চেহাবা, তরুণ ছিলেন লিকলিকে রোগা। প্রমোদদাব বঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং তরুণ ছিলেন তামাকেব টিকের মতো মিশকালো। সেই অপ্রিয় সত্যটায় আগুন ধবিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় অনেকে তাকে ডাকত টিকে রায় বলে। তরুণকুমারেব বলবাব কিছু ছিল না— তাব নামেব আদ্যক্ষর টি. কে. ই তো। পবে বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তরুণ কলকাতা কবপোবেশনেব উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। গানের ক্লাসে

তরুণের ভালো গাইয়ে বলে পসার ছিল।

বেশ ক বছব পরে আমার ভাই নিশীথবঞ্জনও কিছুদিন আশ্রমে বাস করে গেছেন। 'ধন্যি ভায়েব অধ্যবসায়' বলতেই হবে। ঘটনাটা খুলেই বলি। একবার স্পোর্টস্ হচ্ছিল। একটা ছিল হুইল বেস—অর্থাৎ চাকা ঠেলে দৌড়ে যাওয়া। নিশীথ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিযোগীবা যখন বেস শেষ কবে জিতে গেছেন এবং বাকি সকলে রণে ভঙ্গ দিয়ে হাস্যমুখে বসে পড়েছেন, ভায়া তখনো কোনো দিকে দৃক্‌পাত না কবে চাকা মেবেই চললেন যতক্ষণ না সাবা পথটা শেষ হল। মাঠসুদ্ধ লোক হেসে খুন, কিন্তু নিশীথেব তাতে গ্রাহ্যই ছিল না। পবে গ্লাসগো থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়াবিং পড়ে ডিগ্রি নিয়ে দেশে আসেন। পরে তিনি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টেব চীফ ইঞ্জিনিয়াব পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এক্ষণে বিশ্বভারতীব অবৈতনিক মুখ্যবাস্তুকাব রূপে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছেন। তাঁব জীবনেব এই উন্নতি তাঁব নিজেব কেবামতি এবং বোধ কবি সেই বালক বয়সেব অধ্যবসায়গুণে। নিশীথ বিবাহ কবেছেন আমাবই শ্যালিকা বেণুকাকে।

মনোবঞ্জনদাব ছোটো ভাই সবোজ, যাব ডাকনাম ছিল বতু, তিনি আমাব নীচেব ক্লাসে পড়তেন। কিন্তু বয়সে আমাব সমান ছিলেন বলে সুহৃদেব মতো তাঁর সঙ্গেও আমার সদ্ভাব ছিল বিস্তব। সবোজ খেলাধুলায় ভালো ছিলেন। তাঁব কাব্যেব ঢেউ কবিতায় পৌঁছতে দেখি নি বটে, তবে তা তাঁব মাথাব চুলে দেখতে পাওয়া যেত। সবোজেব মনেব স্ফূর্তিব সীমা ছিল না। চীনেদেব মতো হাত পা নেড়ে এবং বিড বিড অবোধ্য উচ্চাবণে সবোজ অনর্গল বকে যেতেন, যেন বিশুদ্ধ চীনে ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। সে বক্তৃতাব প্রহসন শোনবাব মতো। এই সেদিন বন্ধুবব সবোজ কলকাতাতেই মাবা গেছেন।

ত্রিপুবা না কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন কবিযশঃপ্রার্থী গিবিজা— পদবী বোধ হয় চক্রবর্তী। বিশুদাব কাছ থেকে 'কপিবাজ' উপাধি পেয়ে গিবিজা বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন।

মুকুল দে থাকতেন 'বাগান'-বাড়িতে। অতি বিচিত্র ধবনেব ছেলে তিনি ছিলেন। কাপড়চোপড়েব দিকে কোনো নজবই ছিল না, জামাটাব বুকে কিংবা হাতাটায় হয়তো বোতামই নেই— কে তার খবব বাখে। পড়াশুনার জন্যে তাঁর খ্যাতি বিশেষ বটে নি এবং সে দিকে তাঁব মনও তেমন ছিল

না। ক্ষিতিবাবু বলতেন, 'ওর মূলের মধ্যিখানেই ওর বাবা মা বসিয়ে দিয়েছেন 'কু'— ওর আর কী হবে।' কিন্তু মুকুলের ড্রইংএর হাত ছিল অসাধারণ। পরে তিনি অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ছবি আঁকা শিখে বিলেতে থেকে এচিং ভালোরকম আয়ত্ত করে ফিরে এসে কলকাতার সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হন। ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট শিল্পী বলে তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কিছু আগেপিছে এসেছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে কীটপতঙ্গের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। পিঁপড়ের বাসা এবং উই-ঢিবির যাবতীয় নকশা তাঁর জানা ছিল। গুটিপোকা পোষা ছিল তাঁর এক বাতিক। এ-সব বিষয়ে কিছু কিছু রচনাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বয়সে নবীন হলেও গুরুদেব ও বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণদের মহলেই ছিল তাঁর আনাগোনা— তাঁর কথাবার্তা বলবার ধরনটাও ছিল বিজ্ঞের মতো। বড়োদের সঙ্গে জমে যাওয়ার এই অভ্যাসটা ছিল বলে সুধাকান্তর ঘন ঘন ডাক পড়ত নিচুবাংলায় এবং সেই সূত্রে তিনি বড়োমার দাওয়ায় পাত পাতবার কায়েমী বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলেন। সমান রসবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যে ও ভোজ্যসামগ্রীতে। পরে তিনি শ্রীনিকেতনের পাব্‌লিক রিলেশন্‌স্ অফিসার বা জনসংযোগ-সচিব হয়ে এই সেদিন অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনেই বাড়ি করে বসবাস করছেন। এঁর পুত্র ও দুই কন্যাই বিশ্বভারতীতে কাজ করছেন। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিকথায় গুরুদেবের জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আর ছিলেন কিরণ— খাইয়ে ছেলে বলতেই হবে। দিস্তেখানেক রুটিতে তাঁর মন উঠত না। সতীশ ঠাকুর এবং চণ্ডী ঠাকুর তাঁকে চিনে রেখেছিল, সুতরাং খাবার সময় রসদ-সরবরাহে ত্রুটি করত না। একবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে কিরণও ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ক্ষিতিবাবুর তত্ত্বাবধানে। জনৈক আশ্রমবন্ধুর বাড়িতে রাত্রে খেতে বসে অন্য সকলে যখন প্রায় হাত গুটিয়েছেন, কিরণের খাওয়া তখনো চলেছে সশব্দে। ক্ষিতিবাবু পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে কিরণ, আর কিছু দিবো?' অন্য ছেলে হলে তক্ষুনি হয়তো বুঝত ইঙ্গিতটা, কিন্তু কিরণচন্দ্র প্রসন্নমুখে জবাব দিলেন— 'থাকে তো দেবে।' সেই থেকে কিরণের খ্যাতি রটে গেল যে ভোজন-ব্যাপারে কিরণের দোসর মেলা কঠিন।

প্রমথ বিশীও আসেন এই সময়ে অত্যন্ত ছোটো বয়সে। কোনো কথা না বুঝলে বিশী তা মেনে নিতে পারতেন না, তর্কের জন্যেও তাই তাঁর খ্যাতি ছিল। বিশীর বরাবরই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল, এখন তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। কী প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি শান্তিনিকেতনের আদিযুগের কথা লিখেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইখানিতে, পড়লে মনে জেগে ওঠে পুরানো দিনের কত কথা।

স্বর্গীয় বরদাকান্ত রায় ছিলেন বিহার সরকারের একজন নামকরা সিভিল সার্জন ; এমন অমায়িক, মিতভাষী এবং আদর্শবাদী পুরুষ কমই দেখেছি— গুরুদেব ও আশ্রমের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর বড়ো ছেলেটি ছাড়া অন্যান্য পাঁচটি ছেলেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন ; এঁদের মধ্যে বড়ো জ্যোতিষ এ দেশে এবং ইউরোপে ডাক্তারি শিক্ষা লাভ করেএকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে কাজ করছেন। ক্ষিতীশ ইউরোপে শিক্ষা পেয়ে আমাদের দেশের একজন কৃতী ভাস্কর বলে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। সম্প্রতি মারা গেছেন। ভাগ্যক্রমে টুলু, ফুলু ও মণ্টু এখনো জীবিত আছেন। মণ্টু গ্রন্থনবিভাগে কাজ করছেন বেশ উচ্চপদে।

ধীরেন মুখুজ্জে ছিলেন মাস্টারমশাই যতীনবাবুর ভাই— সংক্ষেপে তাঁকে ডাকা হত ধীমু বলে। অনুমান কবি ধীরেন সেন কিংবা রংপুরের ধীরেন রায়চৌধুরীর সঙ্গে পাছে গোলযোগ হয়ে যায় এই ভয়েই এঁকে ছোট্ট নাম দেওয়া হয়েছিল। বিভূতি গুপ্ত ছিলেন ধীমু ও নরেন নন্দীর সমবয়সী। পড়াশুনা সাঙ্গ করে এই তিন বন্ধু শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন, পরে তিনজনে মিলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুরূপে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতায়। নেহাৎ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে সে বিদ্যালয়টি বাড়তে পারে নি এবং পরে তাকে বন্ধই করে দিতে হয়।

যতদূর খেয়াল আছে আমার ফেরবার পর প্রভাতদা— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— এসেছিলেন। তেজেশদার মতো প্রভাতদাও পড়তে এসেছিলেন, না পড়াতে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছুকাল মাস্টারি করে প্রভাতদা পরে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক হয়ে বহু বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে এখন যে-সব সুবন্দোবস্ত হয়েছে এর মূলে রয়েছে প্রভাতদার অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রভাতদার সাহিত্যিক সামর্থ্য দেখা গিয়েছে 'রবীন্দ্রজীবনী'

রচনায়। বহু বৎসব ধরে বহু পবিশ্রমে তথ্যাদি সংগ্রহ কবে তবেই এই সুবৃহৎ জীবনী বচনা সম্ভব হয়েছে। আশ্রম থেকে একটু দূবে প্রভাতদা এখন সপবিবাবে ভুবনডাঙাব কাছে বাসা বেঁধেছেন। তাঁব ছোটো ভাইকে আমবা 'সু' বলেই চিনতাম ও ডাকতাম। তিনি ব্রহ্মদেশে বহুকাল ছিলেন, পবে আবাব শান্তিনিকেতনে ফিবে সেখানেই অধ্যাপনাব কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। খুবই অসময়ে তাঁব মৃত্যু হয়েছে।

তুহিনশুভ্রকে মনে আছে তাঁব অভিনব নামটাবই জন্যে বোধ হয়। তাঁব গানেব গলাটি ছিল চমৎকাব। বাবা বংশুব যে ভালো নাম একটা কিছু ছিল বা আছে তা টেব পেলাম সেদিন ববীন্দ্র-মেলাব অনুষ্ঠানপত্রে। কি কবে শ্রী পি. কে. সেন বাবা বংশু হয়েছিলেন সে ইতিহাস আমি তো জানি নে। তিনি দামোদব ভ্যালি কর্পোবেশনেব অন্যতম জনসংযোগ-সচিব পদে কৃতিত্বেব সঙ্গে কাজ করে অবসব নিযে এখন শান্তিনিকেতনে নিজ বাড়িতেই বসবাস কবছেন। এ ছাড়াও মনে পড়ে হৃষীকেশ সিংহ ও শশধর সিংহকে। 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ে বাজশ্যালক সেজে হৃষীকেশেব নামই হযে গিয়েছিল 'মামা'। শশধব কৃতী ছাত্র। লণ্ডনেব পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিবে ভাবত-সবকারেব প্রকাশন-বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে কল্যাণীতে বাস কবছেন। অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ তিনি লিখে যশস্বী হয়েছেন। আবো মনে পড়ে অতুলদা, হবগোবিন্দ, শুধু-গোবিন্দ ও সাহেবগঞ্জেব বিজন চ্যাটার্জিব কথা— আবো কত ছেলে এল আব গেল। যাঁদেব নাম এখানে উল্লিখিত হল না, তাঁবা যে সম্মানার্হ বা স্মবণীয় নন, এমন কেউ যেন কল্পনাও না কবেন— আমাব স্মৃতিশক্তিব ক্ষীণতাই অনুল্লেখেব একমাত্র কাবণ; আব, সকলেব সঙ্গে উত্তবজীবনে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি— জীবনস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে কে কোন্ দিকে চলেছি তাব ঠিক নেই।

সেবাব আশ্রমে ফিবে নজবে পড়ল আব-একটা জিনিস। প্রথম যখন আশ্রমে এসেছিলাম তখন বিদ্যালয়ে মেয়ে-পড়ুয়া কেউ ছিলেন না। এবাব দেখলাম বেশ কজন মেয়ে পড়ছেন ছেলেদেব সঙ্গে। ঢাকাব প্রসন্ন সেন মশায়েব দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দু তখন এসে গেছেন। হিবণদি পবে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তাবি পাস করে নেপাল রাজ-পরিবাবেব মেয়ে-ডাক্তাব হয়েছিলেন। প্রফুল্লব বোন টুলুও তখন পড়তেন সেখানে। পবে তিনি ও তাঁব স্বামী ননীবাবু শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীতে বসতি করেছিলেন নিজেদের

বাড়িতে। ননীবাবু চলে গেছেন ; কিন্তু টুলু তাঁর মেজো মেয়ে রমাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনেই রয়েছেন। অপর দুই কন্যা উমা ও ক্ষমা শান্তিনিকেতনেই আছেন। প্রমোদদা ও তরুণের দুই বোনও পড়তেন ছেলেদের সঙ্গে—প্রতিভা ও সুধা। মোহিতবাবুর কন্যা দুটি—মীরা আর বুলা—তখনো আশ্রমে ছিলেন, না চলে গিয়েছিলেন, মনে নেই। বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা এই বোধ হয় প্রথম।

১৫

সে আমলে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -স্কুল বলেই মানতেন না। সুতরাং শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘরে-পড়া ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবার আগে কোনো সরকারী স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় পাস করতে হত। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯১০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন গৌরদা ও দেবলদা। আমরা ছিলাম পরবর্তী দল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর বরাবর জগদানন্দবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন সিউড়ি সরকারী স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দেওয়াতে। সেখানে গিয়েও মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছাড়া পাবার জো নেই। পাটীগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি-চর্চা সকালে আর বিকেলে নিয়মিত চলল পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত। সরকারী স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে ফেরবার কিছুদিন পরেই যখন খবর এল যে আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছি, মনে ভাবলাম, জগদানন্দবাবু খুশি হয়ে লাগামে একটু ঢিল দেবেন। আদবেই না—মাস্টারমশায় বরং বললেন, ‘টেস্ট পরীক্ষা একটা পরীক্ষাই নয়। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল পরীক্ষায় ফেল করলে সিউড়ি সরকারী স্কুলের তো নিন্দে হবে না, তাই দয়াপরবশ হয়ে সেখানকার হেডমাস্টারমশায় তোমাদের পাসের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এইবার হবে আসল পরীক্ষা। এখানে ট্যা ফোঁ চলবে না।’ কাজেই পড়াশুনা আবার তেড়ে চলল। অবশেষে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আবার আমাদের সিউড়ি যেতে হল। সঙ্গে জগদানন্দবাবু তো গেলেনই— বোধ হয় নেপালবাবুও গিয়েছিলেন আমাদের ইংরেজিটাতে শেষ পোঁছ বুলিয়ে দিতে। না আছে খেলাধুলা, না আছে হাসিতামাশা গান। ‘প্রাণ যায়’ বলে হাঁফ ছাড়তে শুনলে জগদানন্দবাবু বলতেন, ‘বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেদের

প্রাণ অত অমনিতেই যায় না।' প্রাণ গেলও না শেষ পর্যন্ত। যেদিন শেষ পরীক্ষা হল সেদিন বিকেলে সরকারী স্কুলের খেলার মাঠে আমাদের হুটোপাটি এখনো মনে পড়ে। কী মুক্তি। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, সেদিন জগদানন্দবাবুও কোনো বাধা-বাঁধন জারি করেন নি। আশ্রমে ফিরে নিজেদের তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে আমরা চললাম যে যার বাড়ি।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, আমি পাস হয়ে গেছি। যতদূর স্মরণ আছে, আমাদের মধ্যে কেউই ফেল হন নি। তবে কে কোন্ বিভাগে পাস হয়েছিলেন মনে নেই। নিজে যে প্রথম শ্রেণীতে পাস হয়েছিলাম সেটা ভুলি নি। বিশ্বভারতী তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি; সুতরাং কলকাতার কোনো কলেজেই ঢুকতে হবে। কলকাতার কলেজে জায়গা পাওয়া তখনই কঠিন হতে শুরু হয়েছে। দরখাস্তের সঙ্গে মার্কশীট দিতে হত। মার্কশীট আনিয়ে দেখা গেল নম্বর মন্দ নয়। কম্‌পাল্‌সরি অঙ্কে নিরানব্বই এবং অ্যাডিশনাল অঙ্কে অষ্ট-আশি। স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হতে বেগ পেতে হয় নি। কলেজ খুলবার আগে আশ্রমে গেলাম গুরুদেব ও মাস্টারমশায়দের প্রণাম জানিয়ে আসতে। প্রথম জগদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হতে যেই-না ঢিপ্ করে প্রণাম করতে গেছি তিনি এক পা পিছিয়ে বললেন, 'বাস রে, আবার এযেছে।' 'মশায়, আমি পাস হয়েছি। স্কটিশ চার্চে আই. এ ক্লাসে ঢুকেছি।' এই বলে তাঁর মনোরঞ্জন করবার প্রয়াস পেতেই মনে হল, একটু চোরা হাসি যেন চোখের কোণে দেখা গেল। মুখে কিন্তু বললেন, 'ভাগ্যিস পাস হয়েছ, নইলে তো আবার আর-এক বছর ভোগাতে।' দেখলাম মাস্টারমশায়ের মনটা একটু ভিজে আসছে। বললাম, 'মশায়, প্রথম শ্রেণীতেই পাস নয়— দেখুন-না মার্কশীটটা।' মার্কশীট সামনে ধরতেই 'বাস রে, মারবে নাকি!' বলে খপ্ করে সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে সাগ্রহে পড়তে লাগলেন। কথা আর কিছু বললেন না। দেখলাম চোখদুটি জল জল করছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে— নম্বরটা দেখে মাস্টারমশায় যে খুশি হলেন এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কিছু হতে পারত না। শেষটায় বললেন, 'ঐ সব গানটানের হাঙ্গামা না থাকলে আর পরীক্ষার আগে টৈ টৈ করে ঘুরে না বেড়ালে ঐ কটা নম্বরও যেত না। যাক, যা হয়েছে ঢের হয়েছে।'

গুরুদেব কখনো চান নি যে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলেরা কেবল পাস

কববে ও অর্থই উপার্জন কববে। তিনি এও প্রত্যাশা করেন নি যে আমরা প্রত্যেকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। তিনি চেয়েছিলেন, আমরা যেখানেই যাই, যে কাজই কবি, আমাদেব কর্মে ও জীবনে শান্তিনিকেতনের আদর্শ প্রতিফলিত হবে ; দেখে লোকে যেন বলে, হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনের ছেলে বটে। তাই আশ্রম ছেড়ে আসবাব দিন গুরুদেবকে যখন প্রণাম কবলাম তিনি বললেন, 'এখান থেকে যা পেলে তাকে জীবনে ফুটিয়ে তুলে ধন্য হোয়ো, এই আশীর্বাদ কবি।' হবিবাবু বললেন, 'শিব শিব, এসো বাবা, মাঝে মাঝে যেন দেখা পাই।' শাস্ত্রীমশায় বললেন, 'কল্যাণমস্তু!' ক্ষিতিবাবু বললেন, 'আশ্রমজননী তোমাব মঙ্গল করুন।' নেপালবাবু বললেন, 'এই তো পবীক্ষা আবম্ভ হল ; জীবনসংগ্রামে জয়লাভ কবো।' জগদানন্দবাবুকে প্রণাম কবতে তিনি মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু অনেকখানি জানালেন কেবল মাথাব উপব একবাব হাত দিয়ে।

গুরুজনদেব সেইদিনেব আশীর্বাদ বয়ে গেল আমাব জীবনেব পবম পাথেয় ও অক্ষয় সম্পদ হয়ে।

১৬

শান্তিনিকেতনে যে-সকল মাস্টাবমশায়েব কাছে পড়েছি তাঁবা ছিলেন যথার্থ গুরু। গুরুদেবেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এঁবা শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ কবেছিলেন। সেই-সব উৎসর্গীকৃত-প্রাণ গুরুদেব কথা স্মবণ করলে মন ভবে ওঠে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতাবোধে— তাঁদেব দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝতে পাবি সত্যকাব গুরু কাকে বলে। গুরুদেবেব ভাষায় বলি— এই-সব শিক্ষক বুঝেছিলেন যে, তাঁরা গুরুব আসনে বসেছেন ; তাঁরা জেনেছিলেন যে, তাঁদেব জীবনেব দ্বাবা ছাত্রদেব মধ্যে জীবন সঞ্চাব কবতে হবে, তাঁদের স্নেহের দ্বাবা ছাত্রদেব কল্যাণসাধন কবতে হবে। তাঁবা জীবিকাব অনুবোধে কিছু বেতন নিলেও তাব চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত কবে গেছেন। তাঁবা বিদ্যা বেচেন নি, বিদ্যা দান কবেছেন অকাতবে। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদেব দান কবতে কৃপণতা কবেন নি বলেই আমরাও সম্পূর্ণভাবে সে মহাদান গ্রহণ কবতে পেরেছি। মাস্টারমশায়রা জ্ঞানের চর্চায় নিত্যনিযুক্ত ছিলেন বলেই আমবা ছাত্রেবা বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি। বাইরের যে-কোনো বিদ্যায়তনে এঁরা প্রত্যেকেই অধিক আর্থিক

সমৃদ্ধি এবং প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। এঁরা কিন্তু সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনের সেবার গৌরবে, আর্থিক অনটন অগ্রাহ্য করেও। একে একে সকলেই চলে গেছেন অন্য লোকে। আমার জীবনের এই সায়াহ্নবেলায়, যে-সকল গুরু চলে গেছেন এবং যাঁরা রয়েছেন আজও তাঁদের সকলের উদ্দেশেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

আমাদের আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা যা বলেছি তাতে করেই সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেকালের শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল সুন্দর ও সরস ছিল। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র স্বরূপ লক্ষ্য করেছি সেই বালক বয়সেও। নিদাঘতাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে দেখেছি বৈশাখের রুদ্র মূর্তি। উত্তপ্ত হালকা বাতাস দুপুরবেলায় কেঁপে কেঁপে ছুটে যেত উন্মুক্ত প্রান্তর ও খোয়াইয়ের উপর দিয়ে। দিনশেষে ঈশান কোণে কালবৈশাখীর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ হঠাৎ দেখা দিয়েই যখন মুষলধারায় এসে পড়ত আচমকা ঝাপটে চির-পিপাসিত ধরিত্রীর বুকে, তখন বোঝা যেত 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' কী প্রত্যক্ষ। স্পষ্ট দেখেছি দূরে সুরুলে 'শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে'। তার পর বনরাজিকে ঝাপসা করে বৃষ্টি চলে আসত, যেন হেঁটে হেঁটে ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে ভিজে মাটির গন্ধ বহন করে। বর্ষার দিনে দেখেছি 'জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে', তার পর সে জল গড়িয়ে পড়ত খোয়াইয়ের মধ্যে, তার পরে বহু ধারা এক হয়ে মিশে ছোটো নদীর মতো হয়ে গিয়ে পড়ত কোপাই নদীতে। অচিরে সে নদীতে বান এসে পড়ত কলধ্বনি করতে করতে এবং কান পেতে শুনেছি 'উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।' বর্ষার জোলো হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসা কেয়াফুলের গন্ধে মাতিয়ে দিত আমাদের তরুণ হৃদয়গুলিকে। 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদলবাতাস মাতে মালতীর গন্ধে' এ কেবল গুরুদেবের কাব্যেই যে পড়েছি তা নয়—প্রত্যক্ষ করেছি শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাস-কালে। দেখেছি, পুঞ্জীভূত আষাঢের ঘন কালো মেঘের বুক-চেরা বিদ্যুতের রুদ্রমূর্তি এবং পরক্ষণেই শুনেছি 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে, গুরু গুরু গুরু গুরু গগন-মাঝে'। বিদ্যুৎ ও অশনিপাত উভয়ে মিলে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় সৃজন করেছে আমাদের শিশুচিত্তে। শ্রাবণের ঘনঘটায় কখন অজানিতে 'নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে'—চোখ জুড়িয়ে গেছে বাইরের

দিকে চেয়ে। তার পর 'গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায় তব আলসে-অবলুণ্ঠন সারা' করে প্রকৃতিদেবী যখন মুখের অবগুণ্ঠন খুলে জেগে উঠেছেন, তখনো তাঁর 'নয়নপাতে সজল মেঘের কাজল বুলানো' একেবারে মুছে যায় নি। দেখতে দেখতে শরতের 'শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে, মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী' বলা শুরু হয়ে যেত— শরৎকালের 'ধৌতশ্যামল আলো ঝলমল' ধানক্ষেত আর সুনীল আকাশ শান্তিনিকেতনে যেমনটি দেখেছি তেমনটি দেখি নি আর-কোনো দেশে। ছুটির দিনে 'রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা' দেখেছি ধানের ক্ষেতে সারাদিনমান। ভেবে অন্ত পাই নি মাথার উপরে 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা'। সেই-সব খণ্ড মেঘগুলির ছায়া পড়ত তালপুকুরের স্বচ্ছ সুনীল জলে। বিকেলবেলায় ভাসিয়ে দিতাম আমাদের কাগজের নৌকাগুলি আর মনে মনে ভাবতাম, 'ঐ মেঘ আর তরণী আমার কে যাবে কাহার আগে।' তালপুকুরে 'চিত্রা' নৌকার 'পরে দাঁড় ধরে বসলে তবে-না গান জমত 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।' 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' যে কী তা পলকে প্রত্যক্ষ করা যেত শান্তিনিকেতনের শরৎকালের মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালে। তার পর বসন্তের বাহার দেখেছি শান্তিনিকেতনের পুষ্পতরুলতায়—'থরথর-কম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত' বসন্তকে আমরা আহ্বান করেছি উচ্ছ্বসিত গলায় গান গেয়ে, অচিরে দেখা যেত পলাশফুলের টকটকে লাল রঙে 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।' কত বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত আমাদের আশ্রমটি।

এইরকম পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা ছিলাম আনন্দে বিহ্বল, অকারণে চঞ্চল; গুরুদেবের ভাষায়— আমাদের হৃদয় তখন নবীন ছিল, কৌতূহল ছিল সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ছিল সতেজ। সেই সময় মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় আমরা খেলা করেছি এবং ভূমার আলিঙ্গন থেকে আমরা বঞ্চিত হই নি। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় আমাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন আমাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত

অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করে দিয়েছে। তরুলতা-পুষ্প-পল্লবিত নাট্যঘরে ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতনৃত্যাভিনয় আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। আমরা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল মেঘ নিয়ে গুরু গুরু গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপর আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে ; শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র সফলতার আদিগন্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখে আমরা ধন্য হয়েছি। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে, মুক্ত আকাশের তলায়, খোলা মাঠের খেলায়, অধ্যয়নে, অভিনয়ে, গানে, মাস্টারমশায়দের ভালোবাসায় এবং গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টির আশ্রয়ে বেড়ে উঠবার সুযোগ আমরা পেয়েছি, গুরুদেবের নিত্যসান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি। আশ্রমের আকাশ এবং বাতাস, আলো এবং জল আমাদের শরীরকে ব্রহ্মচর্যপালনে স্বাস্থ্যবান, মনকে অনুকূল এবং হৃদয়কে প্রশস্ত করেছে নিভৃতে, নিঃশব্দে এবং আমাদের অজানিতে। সেই ভিত্তির আশ্রয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের জীবন। আশ্রমজননী আমাদের জীবনপাত্র ভরে দিয়েছেন অমৃতসুধায়।

সেই আশ্রম যখন ছেড়ে এলাম তখন হৃদয়তন্ত্রীগুলিতে খুবই টান পড়েছিল, মনের মধ্যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম। আশ্রমের আকাশ বাতাস আলো, পরিচিত তরুলতা যা আমাদের সঙ্গে বেড়ে উঠছিল, তারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে পিছু ডেকেছিল। নতমস্তকে বেদনাতুর হৃদয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। পরে জেনেছি, আশ্রমজননী তো আমাকে ছাড়লেন না— এখনো নিত্য টানেন তাঁর স্নেহময় ক্রোড়ে। শুষ্ক জীবন ভরে নিতে ফিরে ফিরে যাই আশ্রমের নিত্য-উৎসারিত আনন্দের ঝর্নাতলায়, হৃদয়পাত্রটি আবার ভরে নিই আশ্রমজননীর বিগলিত করুণার কল্যাণে, পুণ্যে ও পুলকে—

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যৌবনে কলকাতার কলেজে

১

খুবই বেদনাতুর মন নিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছেড়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। প্রথমে কিছুকাল বাবা-মায়ের আদরে ও ভাইবোনেদের ভালোবাসায় দিনগুলি একরকম কেটে গেল। পরীক্ষার ফলাফল বের হতে অনেক বিলম্ব হবে। এই গরমের সময়টা কোথায় কাটানো যায় এই নিয়ে বেশ আলোচনা চলল কদিন। শেষে সাব্যস্ত হল যে আমি ঢাকায় মেজো-মামা ও সোনামামাদের বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসব। মামারা তখন ঢাকায় 'ছোটো কাট্রা' বলে একটি বিরাট বাড়ি লম্বা মেয়াদে ভাড়া নিয়ে সেইখানেই বসবাস করছিলেন ও তাঁদের কন্ট্রাকটারী কারবার চালাচ্ছিলেন। কালবিলম্ব না করে আমি রওনা হলাম ঢাকায় মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে।

'ছোটো কাট্রা' বাড়িটি এক কালে কোনো একজন হোমরা-চোমরা মুসলমান আমীর ওমরাহ শ্রেণীর লোকের প্রমোদকানন কিংবা বাসস্থান ছিল। বাড়িতে ঢুকবার জন্যে প্রকাণ্ড উঁচু এবং চওড়া খিলান-দেওয়া প্রবেশদ্বার প্রথমেই চোখে পড়ত। খিলানের মাথা পর্যন্ত উঁচু খুব মোটা কাঠের দুপাল্লার মধ্যে মধ্যে গোল মাথাওয়ালা বড়ো বড়ো লোহার পেরেক-মারা বিশাল ভারী সিংহদ্বার দিয়ে একটা দেউড়ি পার হয়ে ভিতরের খোলা চত্বরে পড়তে হত। একটা প্রমাণ সাইজ হাতি অক্লেশে সে সিংহদরজা দিয়ে যেতে পারত। দেউড়িটা ছিল প্রকাণ্ড লম্বা ও চওড়া। দেউড়ির ভিতরে দুপাশে অনেকগুলি কুঠরি ছিল। নিঃসন্দেহে সেগুলি ছিল মোগল আমলে রক্ষী, প্রহরীদের থাকবার জন্যে। প্রবেশদ্বারের উপরে ছিল বড়ো নহবতখানা। এখন সেখানে সানাই বাজে না। মামাদের কর্মচারীরা কজন সেখানে বাস করতেন। ঐ প্রশস্ত দেউড়িটা পার হতেই প্রকাণ্ড একটা চত্বর দেখলাম। ঐ চত্বরের মধ্যে গোটা দুয়েক বস্তি বা পাড়া অনায়াসে এঁটে যেতে পারত—এত বিশাল ছিল তার আয়তন। এই চত্বরটি ঘিরে ডাইনে বাঁয়ে অসংখ্য একতলা কুঠরি। বোধ হয় এককালে

তা সেই মুসলমান আমীরের শরীররক্ষী সৈন্যদের ব্যারাক এবং ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। অর্থাৎ চত্বরে ঢুকেই দেখলাম ডাইনে বাঁয়ে ও পিছনে তিন সার ব্যারাক ও আস্তাবল। কত অসংখ্য লোকলস্কর নিয়ে সেই সম্ভ্রান্ত আমীরটি যে ওই কাটরায় থাকতেন তা এই-সব ব্যারাক দেখলেই অনুমান করা যায়। চত্বরের সামনের সমস্ত দিকটা জুড়ে বিরাট দোতলা বাড়ি। তার খিলানের সারি দেওয়া একটানা চওড়া বারান্দার পিছনে উপরে নীচে অনেকগুলি ঘর। দেখলেই বোঝা যায় যে ঐ অংশটা ছিল কাটরার মালিকের আপন বাসগৃহ অর্থাৎ অন্দরমহল। সেই ঘরগুলি পেরিয়ে ছিল আর-একটা বিশাল চওড়া বারান্দা। সে পিছনের বারান্দায়ও বড়ো বড়ো খিলানের মাঝে মাঝে ছিল জাফরি-কাটা রেলিং। তার পরেই ছিল নদী। এই বাসগৃহের একতলার পিছনে মস্ত চওড়া শান-বাঁধানো ঘাট নেমে গেছে নদীর জলের মধ্যে। এক কথায় এ কাটরাটি নদীর উপরে একটি সুরক্ষিত, সুরম্য প্রমোদভবন। মাঝখানের চত্বরটার একাংশ এককালে হয়তো প্রহরীদের কুচকাওয়াজ করবার মাঠ রূপে ব্যবহৃত হত এবং বাকিটা বোধ হয় ছিল মোগলরীতি-অনুসারে সাজানো বাগান। নদীর উপরে গ্রীষ্মকালে আরামে থাকবার মতো জায়গাই বটে।

আমি যখন সেখানে গেলাম তখন অবিশ্যি সেখানে সৈন্য প্রহরী বা রক্ষী কেউ ছিল না। ছিল বোধ হয় একজন কি দুজন দরোয়ান। চারি দিকের ব্যারাকগুলিতে মামাদের কারবারের কিছু কুলিমজুরও থাকত। চত্বরটার মধ্যে স্তূপাকার অনেক ইঁট সুরকি লোহা-লক্কড় টাল করে এখানে ওখানে রাখা ছিল মামাদের ব্যবসায়ের কাজে লাগবে বলে। নদীর উপরে সামনের দোতলায় থাকতেন মামারা। নীচের তলায় তাঁদের অফিস ও কর্মচারীদের থাকবার জায়গা। দোতলার উপর উঠলেই নদীর শীতল হাওয়ায় সমস্ত দেহ মন যেন জুড়িয়ে যেত। নদীর দিকে একসারি খিলানে জাফরি-কাটা রেলিং দেওয়া চওড়া বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসে পা দুটা রেলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে নদীর শোভা দেখা আমার একটা নেশা হয়ে গেল। প্রায়ই পালতোলা নৌকা নদীর ওপার ঘেঁষে দুলতে দুলতে যেত তাদের যাত্রী বা পণ্য বহন করে। শুশুকগুলি জলের উপর দিকে উঠে উলটিয়ে গড়িয়ে পড়ত, আবার উঠত আর পড়ত। এই খেলা চলত সারা দিনমান। এই বাড়িতে আসবার পর দোতলার বারান্দা থেকে নীচে বাঁধানো ঘাটের

শ্রেণীগুলি দেখে গল্পগুচ্ছের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের কথা কেবলি মনে হত। ভাবতাম এককালে দারুণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় নবাব-বাড়ির কত নবনারী ও শিশুরা ঐ ঘাটের ধাপে ধাপে নেমে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দিনের নিদাঘতাপদগ্ধ শরীরটা জুড়িয়ে নিতেন এবং তাঁদের উচ্ছ্বসিত আনন্দগানের সুরধ্বনি নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে কোথায় না জানি ভেসে চলে যেত। খুব উপভোগ করেছিলাম নদীর উপরে 'ছোটো কাট্‌রা' বাড়িতে ক্ষণকালের বাস।

আবার দেখা হল আমার শৈশবের আদর্শ শ্যামাদাদার সঙ্গে। দিনের বেলায় তিনি যেতেন 'সাইটে' অর্থাৎ যেখানে বাড়ি তৈরির কাজ চলেছে সেখানে রাজমিস্ত্রি ও কুলিকামিনদের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে। অবশ্য মাইনে-করা ওভারসিয়ারী পাস কর্মচারীর অভাব ছিল না, কিন্তু শ্যামাদাদা যেতেন যেন কর্তাদের প্রতিনিধিস্বরূপে। বাড়ির বড়ো ছেলে বলে খাতিরও তাঁর ছিল যথেষ্ট। দুপুরে খেতে আসতেন বাড়িতে। খেয়ে ও খানিকটা গড়াগড়ি করে আবার যেতেন কাজে। আমিও তাঁর সঙ্গে অনেক সময় গেছি কাজ দেখতে। তখন প্রচণ্ড বেগে কাজ চলেছে রমনার ওদিকে। কার্জন হল, সেক্রেটারিয়েট এবং আরো কত বড়ো বড়ো বাড়ির কন্‌ট্রাক্ট মামারা তখন পেয়েছিলেন। মামাদের কারবার তখন উন্নতির উচ্চশিখরে উঠেছিল। পরে এর পতন হল এক লোহার কারখানা স্থাপন করে। সে-রকম কারখানা তত্ত্বাবধানের লোকজনও ছিল না এবং মামাদের ঐ কাজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বোধ হয় ছিল না। ক্রমে সে কারখানায় ঘাটতি পড়তে লাগল এবং দেনার দায়ে অত বড়ো কারবারটাই উঠে গিয়ে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। তবে সেটা কিছু পরের কথা। সন্ধ্যার পরে শ্যামাদাদার সঙ্গে আমার বেশ বৈঠক জমত। গল্পে গানে সময়টা কোথা দিয়ে যেন চলে যেত। শ্যামাদাদা বাঁশি বাজাতেন বেশ ভালো এবং আমি তা তন্ময় হয়ে শুনতাম। শ্যামাদাদা অনেক সময় আমাকে নানা উপদেশ দিতেন। হাজার হোক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। একটা উপদেশের কথা এখনো মনে আছে। একদিন তিনি বললেন—"দেখ, খোকা, মাইনসেরে ভালোবাসবি, কিন্তু পুরা বাসিস না। হাফ ভালোবাসবি।" আমি যেন কেমন হকচকিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "ভালোই যদি বাসলাম তবে হাফ ক্যান?" তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "মাইনসেরা তো মরবই।

পুরা ভালোবাসলে তখন মনে খুব কষ্ট হৈব। তার থেইকা হাফ ভালোবাসলে কষ্টটাও হাফ হৈব।" তার পর কি কথাবার্তা হল মনে নেই। নিক্তির ওজনে ভালোবাসার এই পরামর্শটা কেমন যেন ঠেকল।

ঐ বাড়িতে থাকতে দুটি ঘটনা যা ঘটেছিল তা অল্প অল্প মনে আছে। আমি শান্তিনিকেতনে থাকতে অভিনয় করেছি এবং দেখেছি। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারে আমার ঐ বয়স পর্যন্ত আমি কখনো যাই নি। এখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে খানিকটা ভারিক্কী হয়ে গেছি এবং থিয়েটার দেখলে আমার নৈতিক অবনতি ঘটার আশঙ্কাটা তত নেই— এই-রকম একটা ভাব নিয়ে মামাদের জিজ্ঞাসা করলাম শ্যামাদাদার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে পারি কিনা। মামাদের অনুমতি নিয়ে শ্যামাদাদা আর আমি গেলাম ঢাকার পেশাদারী থিয়েটার দেখতে। জীবনে এই প্রথম থিয়েটার দেখবার অভিজ্ঞতা। শুনলাম যে ডি. এল. রায়ের 'মেবার পতন' নাটক হচ্ছে। টিকিট কিনে যথাস্থানে বসলাম। থিয়েটার-বাড়িটার ছিল টিনের চাল। অভিনয় বেশ ভালোই লাগছিল। বিশেষ করে চারণীদের গান 'মেবার পাহাড় একদা যাহার' ইত্যাদি গান। আমি খুব মুগ্ধ হয়ে বললাম, "রাজপুতানার এই-সব মাইয়ারা দেশের লেইগ্যা কত ত্যাগস্বীকারই না করছে।" শ্যামাদাদা ভাবলেন বোধ হয় যে স্টেজে যারা গান করে গেল সে-সব মেয়েদের আমি রাজপুতানী বলে ভ্রম করেছি। বললেন, "দূর বোকা, অরা তো মাইনা-করা ভাড়াইটা মাইয়া মানুষ।" আমার সমস্ত উৎসাহ এবং মনের মধ্যে মেবার পতনের গল্পের যে আমেজটুকু গড়ে উঠেছিল তা এক মুহূর্তে দমে গেল এই-সব মেয়েদের বর্ণনা শুনে। তার পর এক অঙ্কের পর বিরতির সময় উঠল এক মহা কলরব। 'পান-সিগারেট', 'সোডা' 'লেমনেড' ইত্যাদি ফেরিওয়ালাদের আওয়াজ এবং ঐকতান-বাদন একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটা যেন তুমুল তাণ্ডব শুরু হল। তার পর যখন আবার পাদপ্রদীপ জ্বলে উঠে ড্রপসিন উঠল এবং অভিনয়ের একটা নূতন অঙ্ক শুরু হল তখন মাথার উপর নানা-রকমের কান্না ও কথাবার্তার শব্দে অভিনয়ের কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তলা থেকে দর্শকরা লাঠি দিয়ে উপরের পাটাতনে ঠক ঠক করে ঠোকা মেরে চিৎকার করছেন, 'থামুন', 'কান্না থামান' ইত্যাদি। শান্তিনিকেতনের নাট্য-ঘরে যে পরিবেশের মধ্যে আমরা অভিনয় করেছি তার সঙ্গে এই থিয়েটারের একেবারেই খাপ খেল না। পেশাদারী থিয়েটারের এই প্রথম অভিজ্ঞতাটা

আমার কাছে একেবারেই ভালো ঠেকল না।

আমার মামাদের একজন হেডমিস্ত্রির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর পুরো নামটা সঠিক মনে নেই। বোধ হয় তাঁর নাম ছিল আব্বাস এবং তিনি রাজমিস্ত্রিদের সর্দার ছিলেন বলে তাঁকে আমরা ডাকতাম 'ওস্তাগর' বলে। তিনি নিজে কর্নিক হাতে কাজ করতেন না। কিন্তু কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য রাজমিস্ত্রিদের কাজের নির্দেশ দিতেন। একদিন ওস্তাগর বেশ হাসিহাসি মুখে বিশুদ্ধ ঢাকাই কুট্টী ভাষায় জানালেন যে তিনি আর-একটি নিকা করতে চলেছেন এবং তদুপলক্ষে তাঁর বাড়ি গিয়ে খেলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হবেন। ঢাকাই কুট্টী ভাষা যে কত শ্রুতিমধুর ও ভাবব্যঞ্জক তা যাঁরা স্বকর্ণে না শুনেছেন তাঁরা বুঝবেনই না। মামাদেরও নিমন্ত্রণ হল। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর আমরা গেলাম সেজেগুজে ওস্তাগরের বাড়ি। এর পূর্বে আমি আর কখনো কোনো মুসলমানের বাড়িতে বিবাহাদি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে যাই নি। কর্তারা এসেছেন সেইজন্যে তাঁদের আদর-আপ্যায়নের বহরও ছিল খুব বড়ো। গোলাপদানি থেকে নিমন্ত্রিতের গায়ে-মাথায় সুগন্ধি গোলাপজল ছিটানো হল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত চকচকে সিল্কের লুঙ্গি গায়ে গোলাপী রঙের গেঞ্জির উপরে ফিনফিনে পাঞ্জাবির সে কী বাহার মামাদের ওস্তাগরের। পাঞ্জাবির গলায়, হাতে এবং বুকের উপর দিয়ে বোতামের পট্টিটার দুই পাশে সাদার উপরে সাদা সুতায় নিখুঁত ছুঁচের কাজ দেখবার মতো। মাথায় যে কাপড়ের টুপি ছিল সেটা খানিকটা আজকালকার গান্ধী-টুপিরই ধাঁচের ছিল তবে তাতেও সেই সূক্ষ্ম সেলাইয়ের সাদা কাজ। শ্যামাদাদা আমাকে জনান্তিকে বললেন, "ওই গুলাইন লক্ষ্ণৌয়ের কারিগরেরা করছে।" আমি যা দেখি তাইতেই তাজ্জব হয়ে যাই। তার পর ডাক পড়ল খাবার জন্যে। একটা ঘরে বেশ গালিচা বিছানো। তার উপরে খুব ধবধবে পরিষ্কার বিছানার চাদর পাতা। চাদরের চারি পাশ দিয়ে গালিচার আঁচলাটার অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কলাই-করা পিতলের থালায় স্তূপাকার পোলাও— তার উপর কুচি পেঁয়াজ ভাজা ও বাদাম ছড়ানো। অন্য দু-একটা থালায় মাংস নানারকমের। এইরকম কয়েকটা আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত। আমাদের বসবার জন্য কোনো আসন কিংবা খাবার জন্যে অন্য কোনো থালা বা প্লেট কিছু ছিল না। শ্যামাদাদার এই-রকম নিমন্ত্রণের অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল। আমার মুখে অস্বস্তির

লক্ষণ দেখে চুপি চুপি বললেন, "অগ এক-থালায় একলগে খাওনই দস্তুর।" আমি মাথা নাডলাম এবং মনের ভাবটা যা হল তা সেই প্রসিদ্ধগানেই বলা হয়েছে— 'পডেছি মোগলেব হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' জন ছয়েক কবে এক-একটা বডো থালা ঘিবে বসলাম, খাওয়া শুরু হল। প্রত্যেকে সেই প্রকাণ্ড পোলাওয়ের থালাটাব এক-একটু অংশ আলাদা ভাবে নিজের করে নিয়ে অন্য ছোটো থালাটাব থেকে মাংস ও ব্যঞ্জনাদি হাতে কবে তুলে সেই পোলাওয়েব মধ্যে মেখে পবমানন্দে খেতে লাগলাম। বান্নাটা যে অপূর্ব হয়েছিল তা বলবই। হ্যাঁ, মুসলমানেবা মুবগীব কাবি বাঁধতে পারে বটে। খুব খেয়েছিলাম সেদিন। তাব পর ঝাবি কবে জল আব ডাবব এল হাত মুখ ধোবাব জন্যে। হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে পাওয়া গেল চমৎকার পানেব দোনা। মিঠে পানে কতবকম ভাজা মসলা ও সুগন্ধি কেয়া খয়েব। খেয়েদেয়ে অনেক রাতে যখন মামাবা উঠলেন ওস্তাগব প্রসন্ন হাসি মুখে— "কর্তাগো কেবল তকলিফই দিলাম।" বলে নিচু হয়ে সেলাম কবলেন। আমরা খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবে বিদায় নিলাম। ঐ একসঙ্গে এক থালায় খাওয়াব জন্যে প্রথমে যে গা ঘিন ঘিন কবেছিল সেটা খেতে বসেই চলে যাওয়ায় ভোজটা বেশ জমেছিল।

এব কিছুদিন পব ঠিক হল যে আমি একবাব তেলিববাগ ও হাসাডা ঘুরে কলকাতায় ফিবে যাব। আমাব এই ছুটিটা বেশ উপভোগ্যই মনে হচ্ছিল। ঢাকা থেকে বেলে নাবায়ণগঞ্জ হয়ে স্টীমাবে তাবপাশা বা লোহাজঙ্গে নেমে নৌকা কবে বহবেব বন্দবে নেমে হেঁটে স্বগ্রাম তেলিববাগে গিয়ে উঠলাম মধ্যেব বাড়িব দোতলায়। বাড়িব ভিতবেব উঠানেব পশ্চিমেব বডো টিনেব বাড়িতে থাকতেন দাতব্য চিকিৎসালয়েব ডাক্তাব অখিলবাবু। দু-একজন জ্ঞাতি তাঁদেব বাড়ি খাবার জন্যে পীডাপীডি কবেছিলেন। কিন্তু এক জায়গায় শোওয়া আব-এক জায়গায় খাওয়াব অসুবিধেব জন্যে বন্দোবস্ত হল যে আমি ঐ দোতলা বাডিতেই থাকব এবং অখিলবাবুব বাডিতেই খাব। গ্রামেব মধ্যে মুখে মুখে রটে গেল— 'পশ্চিমেব বাডিব ভুইঞা আইছে।' গোয়ালা বাড়ি থেকে এল ভেট— চিনিপাতা দই-এব বেশ বডো একটি হাঁডি। তখনই নীলপূজা বা চডকপূজাব ধুম লেগে গেছে। সন্ন্যাসীবা এল পট নাচাতে। আবাব মুগ্ধ হয়ে শুনলাম তাবা যে-সব নূতন গান বেঁধেছে সেবাব। সেই পবিচিত 'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম, ব্যোম' ববে মুখবিত হয়ে উঠল

আমাদের ছোট্ট গ্রামখানা। সন্ন্যাসীদেব কিছু বকশিশ দিতে হল মান বাঁচাবার জন্যে। প্রাণ ভবে ঘুবে বেড়ালাম কদিন আমাব শৈশবের লীলাভূমি তেলিববাগ গ্রামেব অলিতে গলিতে। জ্যেঠা, খুড়া, পিসা ও ভাইদের বাড়ি বাড়ি ঘুবে এলাম আদব কুড়িয়ে। পুকুবঘাটে ঝাঁপাঝাঁপি কবে স্নান কবলাম। পুবোনো মাস্টাবমশায়দেব প্রণাম কবলাম। কতবাব গেলাম আমাদের পশ্চিমেব বাড়িতে আব খালপাড়েব সেই বৃহদাকাব তালগাছ দুটিব তলায়।

তাব পব গেলাম মামাবাড়ি হাসাড়ায়। কত পবিবর্তন হয়ে গেছে। মায়েব ঠাকুমা তখন আব ইহজগতে নেই। ধন দাদামশায়ও চলে গেছেন। যতদূব স্মবণ আছে, ধনদিদিমাব একমাত্র সন্তানটির জীবন-প্রদীপেব শিখাটুকুও নিভে গেছে অকস্মাৎ দৈব-দুর্বিপাকে। নিশিমামাও তখন পবলোকে। কৈলাস সিং মাউসাকে সেবার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁব দুই ছেলে বমণী ও জগদীশ ওবফে জগা, যে খুব চিকি অর্থাৎ মিহি স্ববে কথা বলত, তাদের সঙ্গে দেখা হল। মাদিদিব ভাই আমাদেব ললিতদাদামশায়ও তখন গত হয়েছেন। কাজেই আমাকে 'যদু' বলে ডাকবাব আব তখন কেউ-ই সেখানে ছিলেন না। দিদিমা ছিলেন তখন ঢাকাব 'ছোটো কাটবা' বাড়িতে। হাসাড়াব বাড়িতে তখন ছিলেন কেবলমাত্র দক্ষিণেব দালানে ধনদিদিমা ও ছোটো মামী, মধ্যেব দালানে ছিলেন মাদিদি ও ঠাইনমামী এবং উত্তরের দালানে সেই দুই সতীন, সোনাদিদিমা ও নয়াদিদিমা। শ্যামাদাদাব লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক মতিবাবু, যাঁব কাছে আমিও ক মাস ছোটো বয়সে পড়েছিলাম, তিনিও চলে গেছেন। হেডমাস্টাবমশায় শ্রীনাথবাবুও নেই। তখন হাসাড়া স্কুলেব হেডমাস্টাব হয়ে এসেছিলেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কালীকিশোবেবই ছোটো জামাই, আমাদেব মায়ের আপন মামা ববদাকান্ত সেন। ইনি হাই তুললেই 'জগদীশ, জগদীশ' বলে হাতের দুই আঙুলে তুড়ি দিতেন। সেই অজুহাতে আমবা তাঁকে 'জগদীশ দাদামশায়' বলে অভিহিত করতাম, অবশ্য আড়ালে। সেই যে হাবা ছেলেটি যে ঢেঁকিব আওয়াজ শুনলেই চলে এসে ঢেঁকিব পাড়েব তালে তালে নিজের হাতে তাল ঠুকত তাকেও দেখলাম না। ঠাইনমামীব নিজেব হাতেব রান্না ভালো ভালো ব্যঞ্জনাদি অবশ্যই ছিল। সেবাবে ঠাইনমামীব নিজ হাতে রান্না শাপলা ডগা দিয়ে ইলিশমাছেব হলুদ ঝোল যা খেয়েছিলাম তা এখনো যেন মুখে লেগে আছে। তেমনটি আব পবে খাই নি। প্রতি রাত্রে হত

ভূরিভোজন। 'ভোজনেষু জনার্দন' স্মরণ করে পেট ভরে খেয়ে বিছানায় শুয়ে 'বাতাপি ভক্ষতে যেন, পীত যেন মহোদধি' এই শ্লোকটি আওড়িয়ে তিনবার 'বাতাপি, বাতাপি, বাতাপি' বলে ডেকে পেটে হাত বুলিয়ে 'শয়নে পদ্মনাভ'এর নাম নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শটা এই সময়েই শিখেছিলাম। বেশি খেয়েও তখন মন্ত্রজোরে কখনো অজীর্ণ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। দিনের অনেকটা সময় কাটত ধনদিদিমার সঙ্গে রসালাপের মসকরা করে। শান্তিনিকেতনে সত্ত শেখা শারদোৎসবের গান— 'আমার নয়ন ভুলান এলে, আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে' গেয়ে গেয়ে তাঁকে টালাতাম। ধনদিদিমা লেখাপড়া জানতেন এবং শারদোৎসবের গানের রসবোধ করবার যথেষ্ট ক্ষমতাই তাঁর ছিল। 'ছালি ভস্ম কি কয় এই পোলায় রে' বলে রাগের অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে নাতির ঠাট্টাটুকু তাঁর বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে খারাপ লাগত না। খুবই তিনি ভালোবাসতেন আমাকে। এইসব স্নেহময়ী নিকট আত্মীয়দের কাছে যে অপরিসীম স্নেহমমতা পেয়েছি তা সঞ্চিত হয়ে আছে আমার প্রাণের মণিকোঠায়।

২

হাসাডায় কিছুদিন থাকবার পর ফিরে এলাম কলকাতায় ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে। যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফল বের হল। দেখলাম যে আমি পাস করে গেছি। নগদ দুটাকা দক্ষিণা দিয়ে একখণ্ড মার্কসীট আনা হল। কলেজে ঢোকা নিয়ে টানাটানি, সুপারিশ তখনই অল্প অল্প শুরু হয়ে গেছে। যাই হোক, মার্কসীটে নম্বর দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং সেইটে শান্তিনিকেতনের মাস্টারমশায়দের দেখাবার লোভ সংবরণ করা গেল না। মার্কসীটটা পকেটে করে ছুটলাম শান্তিনিকেতনে এবং সেখানে কি সব কথাবার্তা হল এবং গুরুদেব ও মাস্টারমশায়রা সবাই কে কেমন খুশি হলেন এবং আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দিলেন সে কথা আগেই বলেছি। গুরুজনদের সেই আশীর্বাদ রয়ে গেল আমার জীবনের পরম পাথেয় ও অক্ষয় সম্পদ হয়ে।

দিদিমণি তরলার ছেলে সুধাংশু ও তাঁর খুড়তুত ভাই হিমাংশু (বড়কু) তার আগের বছর ম্যাট্রিক পাস করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকে গেছেন। সুধাংশুর

টেনিস ও ক্রিকেট খেলায় তখনই বেশ উৎসাহ এসে গেছে। আমি যা নম্বর পেয়েছিলাম তাব জোরে আমি প্রেসিডেন্সীতে বেশ স্বচ্ছন্দেই ভর্তি হয়ে যেতে পাবতাম। কিন্তু বাড়ির গুরুজনেবা মনে করলেন যে আমিও যদি প্রেসিডেন্সী কলেজে যাই তবে ব্র্যহস্পর্শ হয়ে নবক গুলজাব হয়ে যেতে পাবে। গুরুজনেবা তাঁদেব মনোগত ভয়টা অবিশ্যি আমাব কাছে প্রকাশ্যভাবে বলেন নি এবং তাঁবা আমাকে বোঝালেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজেব চেয়ে তখন হেদোব স্কটিশ চার্চ কলেজই ভালো। বড়োদেব মনের ভেতবেব কথা বুঝবাব বয়স তখন আমাব হয়েছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললাম না। আমার তখনকাব মনোভাব হল যে যে-কোনো কলেজে ঢুকলেই হল। স্কুলেব পড়ুয়া নাম কাটিয়ে কলেজেব ছাত্র হয়ে কৌলীন্যলাভ কবতে পাবলেই বাজিমাৎ।

সুধাংশুবা তখন বিজ্ঞান নিয়ে আই. এস-সি পড়েন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ঠিক হল যে আমি যাব স্কটিশ চার্চ কলেজে, সাহিত্য নিয়ে আই. এ পড়ব। তখন প্রশ্ন উঠল যে স্কটিশ চার্চ কলেজে ঢুকবাব চাহিদা এত বেশি যে একটু সুপাবিশ না হলে নাকি ঢোকাই যাবে না। যদি একবাব দবখাস্তটা নামঞ্জুব হয়ে যায় তবে পবে তা কাটানো মুশকিল হবে। সে সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের হেড ক্লার্ক ছিলেন স্বনামধন্য ব্যাবিস্টাব ও অগ্রগণ্য দেশনেতা পি. মিত্র সাহেবেব এক ভাই। এই হেড ক্লার্কই নাকি ছিলেন ছেলে নেওয়া বা না নেওয়াব হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁকে একটু ধবতে পাবলে ল্যাঠা থাকবে না। কথাটা দাদাবাবুব কানে কি ক'ব গেল জানি না। বাবা একদিন আমাকে বললেন যে সেদিনই আমাকে হাইকোর্টে গিয়ে দাদাবাবুব সঙ্গে দেখা কবতে হবে এবং তিনি আমাকে সেখানে একজন কাব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দেবেন।

হাইকোর্ট। মনটা কেমন দমে গেল। আমি হাইকোর্টে কোনোদিন যাই নি এব আগে। সেখানে কাউকে চিনিও না। শুনেছিলাম যে সেটা একেবাবে সবাব চেয়ে বড়ো আদালত এবং অনেক সাহেব-সুবো-জজ-ব্যাবিস্টাব সেখানে যায় কাজ কবতে। বাবা বললেন, 'অতি সহজ কথা। হাইকোর্টে যাবে এমন একটা ট্রামগাড়িতে চেপে সেই গাড়ি যেখানে গিয়ে থামবে তাব সামনেই হাইকোর্ট এবং যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলেই সে পথ দেখিয়ে দেবে।' যেতে যে ঠিক ভয় কবছিল তা-ও না। কিবকম যেন একটা অজানা অচেনা জায়গা বলে মনে অস্বস্তি হচ্ছিল।

যাই হোক মন ঠিক করে সেজেগুজে মল্লিক লেন থেকে রসা রোডে পড়ে বেলতলার মোড়ে দাঁড়ালাম ট্রামের অপেক্ষায়। তখন বারোটা দুপুর হবে। একটা ট্রাম এল, তার মাথায় 'এসপ্ল্যানেড' লেখা। সেটা ছেড়ে দিলাম। পরে এল 'হাইকোর্ট' মার্কা ট্রামগাড়ি। গাড়িতে ভিড় ছিল না একেবারেই। উঠেই প্রথম শ্রেণীর একটা জানলার কাছের বেঞ্চে বসলাম। সময়মত কণ্ডাকটার এল, টিকিট কাটলাম। গাড়ি রসা রোড দিয়ে চৌরঙ্গী হয়ে এসপ্ল্যানেড ঘুরে হাইকোর্টের দিকে চলল। লালদীঘির পাশ দিয়ে ছোটো আদালত ছাড়িয়ে বাঁ দিকে মেটকাফ হলের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পশ্চিমে মোড় ঘুরে গঙ্গার ধার দিয়ে ইডেন গার্ডেনের উত্তরে একটা গোল চত্বরে ঘুরে গাড়ি দাঁড়াল। তখন আইনসভার গোল গম্বুজওয়ালা বড়ো বাড়িটা তৈরি হয় নি। ইডেন গার্ডেনের ঠিক উত্তরে দেখলাম একটা বড়ো ব্রোঞ্জের মূর্তি—নাম লেখা লর্ড অকল্যাণ্ড। সেটার পাশ দিয়ে উত্তর মুখে রাস্তা গিয়ে যেখানে বড়ো রাস্তায় মিশেছে সেখানে দেখলাম লর্ড নর্থব্রুকের একটি বড়ো ব্রোঞ্জমূর্তি। তারই সামনে চমৎকার এক প্রকাণ্ড সৌধ। বুঝলাম যে এইটেই হবে হাইকোর্ট। তবু সন্দেহভঞ্জনের জন্যে এক পদাতিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ মশায়, এইটেই কি হাইকোর্ট?' লোকটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মানুষের মুখেচোখে ভাবের অভিব্যক্তি যে কেমন করে এক মুহূর্তেই ফুটে ওঠে তা সত্যই আশ্চর্য। মুখে কোনো কথা না বলে তার চেয়ে অনেক স্পষ্টতর করে তার ভ্রুকুটি কপালে তুলে সেই ভুরুর নীচে চোখের জিনিক মেরে লোকটি আমাকে যা বললেন কথায় তর্জমা করলে সেটা দাঁড়ায়—'কি অজ বাঙগাল রে।' মুখে কিছু বলবার আগেই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশায়, রাব লাইব্রেরিটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?' লোকটি প্রকাণ্ড সৌধটার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, 'সোজা উপরে উঠে যান।' লোকটিকে আর ঘাঁটানো সমীচীন বলে মনে না করে তাঁর নির্দেশমতই হেঁটে গেলাম সেই বাড়িটার সামনে।

লর্ড নর্থব্রুকের ব্রোঞ্জমূর্তির সামনেই বিরাট সৌধ। একতলায় এবং দোতলার সমস্ত দক্ষিণটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা বারান্দা—আর উপরে অসংখ্য খিলান-করা স্তম্ভের সারি। স্তম্ভগুলি অসম্ভব মোটা এবং তার গা-টা গোল বা চৌকোনা নয়। কোঁকড়ানো নকশা কেমন যেন ছোটো ছোটো ঢেউ-খেলানো। মনে হল যেন অনেকগুলি ছোটো স্তম্ভ একসঙ্গে জুড়ে একটা

বড়ো স্তম্ভ হয়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় যেখান থেকে খিলান উঠে গেছে চৌদিকে সেখানে নানারকমের মূর্তির মুখ। বড়ো বিস্ময়কর লাগল, কেননা এরকম কারুকার্য আগে কখনো দেখি নি। সামনেই প্রকাণ্ড প্রবেশপথ। দরজা ছিল না— কেবল খিলান। ঢুকেই দেখি পেছনে এক সার ঘর এবং তার পর আবার খিলান দেওয়া বারান্দা। বারান্দার ওপারে পেল্লায় উঠান। অর্থাৎ বাড়িটা ছিল মস্ত বড়ো একটা চকমেলান প্রাসাদ। সাধারণ সিঁড়ি যেমন খানিকটা উঠে মোড় ঘুরে দোতলায় পৌঁছয় এ বাড়ির সিঁড়িটা ঠিক তেমন ছিল না। এখানে নীচের দিকে সিঁড়িটা ডাইনে বাঁয়ে দুই দিক দিয়ে উঠে মাঝপথে এক হয়ে উপরে উঠে গেছে দোতলায়। মস্ত চওড়া সিঁড়িটা। উপরে উঠে দেখি মস্ত বারান্দায় সেইরকম স্তম্ভের প্রত্যেকটির মাথায় গোটা আষ্টেক করে খিলান। পেছন ফিরে দেখি একটা শ্বেত-পাথরের মূর্তি। বুঝলাম না কার মূর্তি। পরে জেনেছিলাম যে সেটা স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের মর্মরমূর্তি। বারান্দায় লোক গিজগিজ করছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে বিস্তর লাল পাগড়ি-পরা পুলিস ও সার্জেন্ট। কালো পোশাক-পরা লোকেরা যে উকিল হবে তা জানতাম। তবে সেই কালো পোশাক-পরাদেরও নানা ধরণের সাজ। কেউ চাপকান পরেছেন। কারো মাথায় বা শামলা। কেউ পরেছেন ঢোলা হাত নীল জোব্বা অর্থাৎ গাউন পা পর্যন্ত লম্বা। কেউবা গলার শক্ত কলারে সাদা দুটো চওড়া ফিতে বেঁধে কালো জোব্বা বা গাউন পরে হন হন করে চলেছেন। একটা ভীষণ কর্মতৎপরতার চিহ্ন ও আওয়াজ। কোথা দিয়ে যেতে হবে, কোন্‌খানে যাওয়া বারণ তা কিছুই জানতাম না বলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যাই হোক, এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 'এই দিকে আসুন' বলে আমাকে দক্ষিণের বারান্দা থেকে উত্তরে মোড় ঘুরে একটা বারান্দার মধ্যে প্রকাণ্ড দরজাওয়ালা একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে ব্যারিস্টারেরা বসেন। ঐ ঘরে আপনি দাশ সাহেবকে পাবেন।' ধন্যবাদ জানালাম মাথা নেড়ে।

ঘরের সামনেই উর্দি-পরা দরওয়ান। দাদাবাবুর নাম করায় দরজাটা একটু ফাঁক করে ভিতরে যেতে বলল। ঘরে ঢুকে দেখি সাদা দুটো ফিতে গলায় বেঁধে, কালো কোট গায়ে বিস্তর লোক। কেউ-বা বসে নথিপত্র দেখছে, কেউ-বা টেবিলের উপর একটা পা তুলে চুরুট বা সিগারেট সেবন করছে।

অনেকগুলি ছোটো বড়ো কালো বনাতে মোড়া টেবিল। ঘরের চারি দিকে অনেক উঁচু পর্যন্ত দেয়াল-আলমারিতে অসংখ্য বই। চাপরাসী, পেয়াদা, কেরানীরা ছুটোছুটি করছে সাহেবদের হাঁকডাকে। ঢুকেই দেখি সামনের পুব-পশ্চিমমুখো লম্বা টেবিলটার উত্তরে একটি ছোটো টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে আছেন দাদাবাবু। দাদাবাবুকে দেখে ধাতস্থ হওয়া গেল। তাঁর পাশে যিনি বসে ছিলেন তিনি দাদাবাবুর চেয়ে কিছু বড়ো মনে হল। চোখে চশমা— নাকটা টিয়েপাখির ঠোঁটের মতো। পরে জেনেছিলাম যে তিনি বিখ্যাত কৌঁসুলী বি. চক্রবর্তী অর্থাৎ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। দাদাবাবুর টেবিলের পেছনের দিকে একটা গোল টেবিলে দেখলাম কজন কালো কোট পরে ও সাদা ফিতে ঝুলিয়ে বসে গেছেন দাবা খেলতে। দাদাবাবু বললেন, 'আয়।' সেই বড়ো ঘরটার উত্তর-পশ্চিম কোণায় যে উত্তর-দক্ষিণ টানা বড়ো টেবিলটা ছিল সেখানে বসে ছিলেন কয়েকজন কৌঁসুলী কালো কোট গায়ে ও সাদা ফিতে গলায় বেঁধে। দাদাবাবু তাঁদের একজনকে বললেন যে আমারই কথা তিনি তাঁকে বলে রেখেছিলেন এবং যেন তিনি অবশ্য অবশ্য তাঁর কাকাকে বলে আমার স্কটিশ চার্চ কলেজে ঢুকবার বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁরা সমস্বরে বলেন, 'এ আর কথা কি।' তার পর আমায় বললেন, 'কাকাকে আমরা আজই বলে রাখব। তুমি কালই হেদোর কোণায় কলেজের আফিসে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে আমাদের নাম ক'রে দেখা করে দরখাস্ত খানি একেবারে তাঁর হাতে দিয়ে এসো। সব ঠিক হয়ে যাবে।' পরে জানলাম ইনি এবং এর পাশেই বসেছিলেন যে আর-এক জন— এরা দুজনই সেই বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও স্বদেশী নেতা মিঃ পি. মিটারের দুই ছেলে— মেঘনাদ মিটার ও পৃথ্বীরাজ মিটার। নমস্কার করলাম তাঁদের কৃতজ্ঞতা ভরে। দাদাবাবু বললেন—'যা, বাড়ি যা।' চলে এলাম বার লাইব্রেরি ছেড়ে। হাইকোর্টটা একটু ঘুরে দেখলাম। তার পর সেই ইডেন গার্ডেনের সামনে 'কালীঘাট' মার্কা একটা ট্রামগাড়িতে চেপে ফিরলাম আমাদের মল্লিক লেনের বাড়িতে। আমার জীবনে এই প্রথম হাইকোর্ট দেখা। কে সেদিন জানত যে একদিন আমিও কালো কোট পরে গলার কলারে সাদা ফিতে ঝুলিয়ে বার লাইব্রেরিতে ঢুকব কৌঁসুলী হয়ে এবং আমার কর্মজীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় কাটবে এই হাইকোর্টেরই মধ্যে। সেদিন হাইকোর্টের ঐ অপরিচিত পরিবেশে আমাকে আতঙ্কে হাঁকপাঁক করতে দেখে আমার

সুপারিশের জোরে স্কটিশ চার্চ কলেজে ঢুকতে আর বেগ পেতে হল না। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ক্লাস আরম্ভ হল। সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে রওনা হলাম কলেজের উদ্দেশ্যে। রসা রোড ও বেলতলার মোড়ে একটা এসপ্ল্যানেডের ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে চেপে বসা গেল। তখনকার দিনে যাত্রীর ভিড় যে একেবারে ছিল না তা বলা যায় না। অন্তত আফিসের সময়ে বেশ ভিড় হত, কিন্তু পাদানিতে জীবনমরণ পণ করে ঝুলতে হত না আজকালকার দিনের মতো। এসপ্ল্যানেডে ট্রাম বদলিয়ে একটা শ্যামবাজারের ট্রাম ধরে হেদোর কোণায় বিডন স্ট্রীটের মোড়ে নেমে কলেজে যেতে হবে। সারাটা পথ যেন একটা উত্তেজনায় কেটে গেল। দু-একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হতে যেই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছি অমনি ব্যগ্রভাবে তাঁকে এবং ট্রামের আর সবাইকে বেশ শুনিয়ে জানিয়ে দিলাম যে 'কলেজে' চলেছি। সে ভদ্রলোকেরা 'তা বেশ, বেশ' বলায় মনটায় যেন স্ফূর্তি বোধ করলাম। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে পৌঁছে যাবার গরিমাটা ফেলনা নয়।

স্কটিশ চার্চ কলেজে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ওয়াট্‌স সাহেব। বেশ ভারিক্কী ধরণের অথচ ছেলেদের শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছিলেন তিনি। আমি নিলাম ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস ও লজিক। ইংরেজি পড়াতেন যাঁরা তাদের মধ্যে মনে আছে স্ক্রামজার সাহেবের কথা। তাঁর গলার আওয়াজটা ছিল যেন ফ্যাঁসফেঁসে। ক্লাসের সামনে না বসলে ভালো শোনা যেত না। তা ছাড়া একেবারে খাস স্কটল্যাণ্ডের মানুষের উচ্চারণ বুঝতে প্রথমটা দিন কতক অসুবিধেই হত। খুবই ভালো পড়াতেন কিন্তু কোনোরকম বকাবকি করতেন না। তাঁর যেন মনের ভাবটি ছিল—'ভালো করে কান পেতে শুনে পড়া শিখলে তোমারই মঙ্গল, আর তা যদি না কর তো আমি আর কি করতে পারি'। ইতিহাস পড়েছি একেবারে স্বয়ং অধর মুখুজ্যের কাছে। তাঁর লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক। প্যান্টালুন ও চাপকান পরে তিনি কলেজে আসতেন। ইতিহাসের নামকরা

অধ্যাপক বলে তখনই তাঁর খ্যাতি পাকা হয়ে গেছে। লজিক পড়াতেন পুণ্য, কি, পূর্ণ বাবু। তাঁব পদবিটা মনে নেই। তিনিও প্যাণ্টালুন ও চাপকান পবে ক্লাসে আসতেন। মোটাসোটা মানুষ তিনি ছিলেন। চাপকানের গলাটা একটু আঁট কবে বোতাম লাগাতেন বলেই হোক কি আর যে-কোনো কাবণেই হোক সার্টেব কলাবটা যা চাপকানেব বাইবে দেখা যেত সেটাও ছাপিয়ে উঠত তাঁব গলাব চামড়া ও চর্বিব একটা পুরু ভাঁজ। তাঁর ক্লাসেব ঘণ্টা পড়লেই আমাদেব ৪৮ বোল নম্বর ব্যানার্জি এবং আবো কয়েকজন ছেলে বলতেন—'যাই, ঘাড়ে ভুঁড়িব ক্লাসেব ঘণ্টা বাজল'। ডাক্তাব পি. কে বায়েব লেখা লজিকেব সিলজিস্‌ম্‌ জিনিসটা তিনি নানা উদাহবণযোগে বুঝিয়ে দিতেন— বেশ ভালো লাগত। তাব পব মুখস্থ করতে হত যতদূব মনে পড়ে—'বাববাবা সিলাবেণ্ড ডেবিযাই ফেবিও'। এব মর্মার্থটা কি তা তখন যদি বা বুঝে থাকি তো পবীক্ষাব পবেই তা ভুলে গিয়েছিলাম এবং এখন তো সাফই মনে নেই। সংস্কৃত পড়াতেন এক নিষ্ঠাবান পণ্ডিতমশায় ধুতি ও সার্টেব উপব মোটা চাদব গায়ে দিয়ে। তিনি ছিলেন এম. এ. পাস কিন্তু ক্লাসে তাঁকে ইংবেজি বলতে শুনি নি কখনো। আমাদের ক্লাসে তিনি পড়াতেন ভট্টি কাব্য। শক্ত জিনিস, ব্যাকবণেব কচ্‌কচিতে ভবা। পণ্ডিতমশায় বড়ো বৈয়াকবণিক হতে পাবেন কিন্তু কাব্যবসের যে বড়ো সমজদাব ছিলেন তা মনে হয় নি। তবে ভট্টি কাব্যে বোধ হয় বসেব বাড়াবাড়ি ততটা ছিল না। সুতবাং পণ্ডিতমশায়কে দোষ দেওয়া সমীচীন হবে না। বাংলা পড়াতেন কালী পণ্ডিতমশায়। তিনি ইংবেজিতে এম. এ. না হলেও ক্লাসে অনর্গল ইংবেজি বলতেন। তিনি আমাদের বঘুবংশও পড়াতেন— সেবাব পাঠ্য ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ। প্রথমদিনেই বেশ মনে আছে সুব কবে টেনে টেনে প্রথম সর্গেব প্রথম দুটা লাইন পড়লেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাক্যর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতবৌ বন্দে পার্বতী পবমেশ্ববৌ।

প্রথমে সন্ধিবিচ্ছেদেব পালা। সেটা শেষ হলেই শুরু হল বিশ্লেষণ এবং তার পব রসিয়ে কসিয়ে ব্যাখ্যান। ঠিক সময়মত মল্লিনাথেব টীকা-টিপ্পনীব ফোড়ন দেওয়ায় সেই ভাবব্যঞ্জন হয়ে উঠল পবম উপাদেয়— একেবারে রসে টুবু টুবু। এই চলল ঝাড়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ক্লাস শেষ

হবার ঘণ্টা পড়তেই কালী পণ্ডিতমশায় উপসংহার টানলেন এই বলে —'বাক্যের মধ্যেই অর্থ যেমন নিহিত হয়ে সেঁটে থাকে হরগৌরীও তেমনি একাত্ম হয়ে নেপ্টে থাকেন এবং সেই অভিন্নাত্মা পার্বতী ও পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করে কবি রঘুবংশ লিখতে প্রবৃত্ত হলেন।' বলেই তিনি 'হায় কালিদাস, হায় মল্লিনাথ' বলে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বইটি বন্ধ করলেন তখন বুঝলাম যে এঁর ক্লাসটা জমবে ভালো। জমেও ছিল খুব শেষ পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তিনি দু-একজন অমনোযোগী ছাত্রকে লক্ষ্য করে সোজা বলে দিতেন যে বাপ বা শ্বশুরের টাকার শ্রাদ্ধ না করে পড়াটা কান পেতে শুনলে তাঁদের বাপ বা শ্বশুর কৃতকৃতার্থ হবেন। কালী পণ্ডিতমশায়ের ভর্ৎসনাটা তখনকার ছেলেদের গা-সওয়া হয়ে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হত না। আজকালকার দিনে কোনো ছেলের বাপ বা শ্বশুর তুলে উপদেশ দিলে সেই অধ্যাপকের চাকরি খতম করার জন্যে চাই কি দু-একটা ধর্মঘটও হয়ে যেতে পারে।

যাঁদের কাছে পড়ি নি অথচ প্রায়ই কলেজে দেখেছি তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে স্টীফেন সাহেবকে। তিনি পড়াতেন দর্শনশাস্ত্র। পোশাক সম্বন্ধে একেবারেই তাঁর খেয়াল ছিল না। সস্তা ছিটের প্যান্টালুন ও কোট এবং পায়ে চীনেবাড়ির সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। তখনো বাটা কোম্পানি বোধ করি হয় নি। ধীরস্থির মানুষ ছিলেন আর্কুহার্ট সাহেব— তাঁর কাছে বড়ো ঘেঁষতাম না। আর-একজনকে বেশ মনে আছে— ছোট্টোখাট্টো লোক, যিনি সবাইকে এড়িয়ে যেতেন। অনুসন্ধানে জানলাম যে তিনি বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ গৌরীশংকর দে। এরই বইয়ের প্রত্যেকটি অঙ্ক কষিয়েছিলেন আমাদের জগদানন্দবাবু। সসম্ভ্রমে গৌরীশঙ্করবাবুকে খুব সমীহ করে চলতাম। আমরা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠলাম সেই সময় এলেন এক মাস্টার সদ্য স্কটল্যাণ্ড থেকে। নাম তাঁর ছিল ক্যামারন। ওয়াট্‌স ও আর্কুহার্ট সাহেবের পর তিনি শুনেছি ঐ কলেজের সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দেখতে ছিলেন খুব ছেলেমানুষ। কিন্তু এই ছোকরা-বয়সে কি করে ডি. ডি. পাস করলেন তাই নিয়ে আমাদের অবাক লাগত। গোড়ার দিকে তিনি কলেজ ক্রিকেট টিমের তদারক করতেন। নিজেও খেলতেন।

যে-সব সতীর্থদের সঙ্গে পড়েছি তাঁদের কাউকে কাউকে বেশ মনে

আছে। জৈনসাবেব শরৎ দত্ত ও করুণা দত্তগুপ্ত যাঁরা কলকাতার ভবানীপুবেব হাজবা বোডে থাকতেন তাঁদের বাড়ির এক ছেলে পড়তেন আমাদেব সঙ্গে। নাম ছিল তাঁব শুকুমার দত্তগুপ্ত। টম ডাকনামেই বন্ধুবান্ধবের মহলে তাঁব পবিচয় ছিল। মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচেব মুখের গডন এবং কিরকম ফ্যাকাশে চাঁপা ফুলেব মতো ছিল তাঁব গায়েব বঙ। উচ্চতা প্রমাণসই। তিনি লেখাপডায় ভালো ছিলেন এবং উত্তবকালে আই. এম এস. ডাক্তাব হয়ে উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন সবকারি কাজে মোতায়েন ছিলেন। কান্তি সেন ওবফে জজ ছিলেন আব-একজন সহপাঠী। হাসিখুশি ছেলে ছিলেন। পডাশুনা শেষ কবে বার্ড কোম্পানিতে বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচাবী হযেছিলেন। অবসব নিয়ে ম্যাডাক্স স্কোয়াবে পালিত স্ট্রীটে বসবাস কবে সম্প্রতি তিনি গতায়ু হয়েছেন। আব-একজন ছিলেন ব্যানার্জি বলে। তাঁব পুবা নামটি মনে নেই, তবে কী কাবণে জানি না তাঁব বোল নং যে ৪৮ ছিল সেটা মনে আছে। তাঁকে আমরা সবাই ইংবেজিতে ‘ফর্টি-এইট্’ বলে ডাকতাম বলেই বোধ হয় তাঁব মা-বাপেব দেওয়া নামটাব বন্ধুমহলে তেমন চলন ছিল না। তিনি এক সময়ে ল্যান্সডাউন বোড ও লোয়াব সার্কুলাব বোডেব মোডে যে একসাব একতলা দোকান-ঘব আছে সেখানে একটা মোটবেব কলকব্জাব দোকান দিয়েছিলেন। হংসেশ্বব বায় ছিলেন বেশ গম্ভীব ভালো মানুষ পডুয়া ছেলে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ছাড়বাব পব তাঁব সঙ্গে সংযোগ হাবিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু প্রায় পঞ্চান্ন বছব পবে তাঁব সঙ্গে দেখা হল আমি যখন বিশ্বভাবতীব উপাচার্য হয়ে শান্তিনিকেতনে গেলাম। হংসেশ্বব শুনলাম ওকালতি পাস কবে বোলপুবেই নিজ বাড়িতে বসে প্র্যাক্টিস শুরু কবেছিলেন। কিন্তু অচিবে তিনি নানা জনহিতকব কর্মে লিপ্ত হয়ে দেশেব ও দশেব অনেক সেবা কবেছেন ও কবছেন। তিনি অনেকগুলি স্কুলের সচিব হয়ে বীবভূমেব গ্রামে শিক্ষাবিস্তাব কাজে ব্যাপৃত আছেন। অতি অমায়িক সতীর্থকে দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। অনিল বসু ছিলেন সদাজাগ্রত সমালোচক। বাজনীতি, সমাজনীতি কিছুই বাদ যেত না। কোন্ সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সম্বন্ধে কখন কী বলেছেন অনিলের তা নখাগ্রে থাকত। এখনো নিত্য প্রাতে খবরেব কাগজটি আদ্যোপান্ত পড়ে থাকেন। পবে দেখলাম, তিনি আমাব সহধর্মিণীব নিকট-আত্মীয়। ডাক নাম তকু। দুটা সম্পর্ক হয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য সতীর্থদের কথা

স্মরণে নেই এবং তাঁদের কারো সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই একজন ছাড়া। তিনি হলেন ঝামাপুকুরের ববি হাজরা। পরে ইনি হাইকোর্টের অ্যাটর্নী হয়ে তাঁর পিতার আফিস চালিয়ে যাচ্ছেন। ববি আমাকে আজ পর্যন্তও ভোলেন নি। প্রতি নববর্ষে ও বিজয়ার দিনে তাঁর প্রীতি ও শুভেচ্ছা-লিপি রীতিমতো এখনো পেয়ে থাকি।

যাঁদের সঙ্গে পড়ি নি অথচ খুব দেখেছি বলে মনে আছে তাঁদের নাম করলেই কর্তব্য সমাধা হয়। বিভূতি চাটুয্যেকে বেশ মনে আছে। ছিপছিপে চেহারা, বাঙালীদের পক্ষে রঙ অত্যন্ত ফরসা। তিনি আমাদের দু-তিন ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় দখল ছিল খুব ভালো এবং বেশি সময়ে ইংরেজি বলে সেটা বেশ বুঝিয়েও দিতেন। শেক্সপীয়রের নাটকে অভিনয়ও করতেন ভালো। পরে ইনি ব্যারিস্টার হয়ে বি. বি. চ্যাটার্জি নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। এঁর ইংরেজ সহধর্মিণীর মুখে এঁর ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ অনবরত শুনে শুনে আমরা এঁকে "নিষ্পাপ বিব" (immaculate Bib) বলে ডাকতাম। আর দুজনের কথা মনে পড়ে। তাঁরা হলেন ভাগলপুরের বিখ্যাত জমিদার তিলকধারী লালের দুই ছেলে— কমলধারী এবং শ্যামলধারী। এঁরা দুইভাই একসঙ্গে বাড়ি থেকে আসতেন, যেতেন এবং সর্বদা একসঙ্গে চলাফেরা করতেন— একেবারে অভিন্নাত্মা বললেই চলে। কমলধারী পরে ব্যারিস্টার হয়ে পাটনা হাইকোর্টে নাম লিখিয়ে বোধ হয় ভাগলপুরেই প্র্যাকটিস ও জমিদারী দেখাশুনা দুই কাজই করতেন। শ্যামলধারী আই সি. এস. পাস করে দিল্লীর নানা দপ্তরে সচিব হয়ে শেষে ইউনাইটেড নেশনসে ভারতের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছেন। এঁরা দুই ভাই-ই ক্রিকেট খেলায় বেশ উৎসাহী ছিলেন এবং সেই সূত্রে মার্কাস স্কোয়ারে মাঝে মাঝে দেখা হত।

৪

আমি এখন কলেজে পড়ুয়া। তাই পড়াশুনা যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার সব বন্দোবস্তই করা হল। সর্বপ্রথমে আমি অন্দরমহল থেকে প্রোমোশন পেয়ে ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ির দক্ষিণে বড়ো উঠানটা পেরিয়ে বার-বাড়িতে যে ভালো ঘরটাতে টোনাদাদা থাকতেন ও পড়তেন সেটি পেলাম

আমার পড়ার জন্যে। ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি ছিল না। আমাদের কাজ চলত কেরোসিনের লণ্ঠনে এবং রেড়ির তেলের বাতিতে। আমার পড়ার ঘরে একটা চলনসই ভালো টেবিল বাতি এল। ফ্যান বলে কোনো পদার্থ ছিল না। দিনে দক্ষিণে বাতাস আর রাতে মায়ের হাতে তালপাতার হাতপাখার বাতাসেই যথেষ্ট আরাম হত। সন্ধ্যার পর মা রান্নাঘর থেকে অন্দরের বড়ো শোবার ঘরটাতে এলে দক্ষিণের জানালা দিয়ে উঠান পেরিয়ে আমার ঘরের দিকে কান পেতে আওয়াজ না শুনতে পেলেই বলতেন, 'খোকা, পড়ছ্‌ না যে?' আমি জবাব দিতাম, 'পড়তেই তো আছি।' মা তবু ছাড়তেন না, বলতেন, 'শুনি না যে।' আমি বলতাম, 'মনে মনেই পড়তে আছি।' মা বলতেন, 'আইন পড়তে হৈব না— চ্যাচাইয়া পড়্‌।' পরে যখন আমি সত্যই আইনের বই পড়তাম তখন মা আমার আফিস-ঘরে এলেই আমি কতবার মাকে টালাবার জন্যে বলেছি, 'মা, আমি আইন পড়্‌তে আছি।' মা আমার বড়ো চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসিমুখে চলে যেতেন সে কথা আজও মনে পড়ে। আমি পড়তাম বটে বাইরে কিন্তু শুতে যেতাম ভেতরের ঘরে। ছোটো বয়স থেকে যখন আমি শান্তিনিকেতনে যাই তার আগে এবং তার পর শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে আমি বরাবর মায়ের বিছানায় মায়ের এক পাশে শুতাম এবং যে ভাই কি বোন তখন মার কোলে সে শুত মায়ের অন্য পাশে। যখন কলেজে ঢুকলাম তখনও আই. এ. পাস করা পর্যন্ত আমি মায়ের পাশেই শুতাম আগের মতো। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণের জানালা দুটো দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসত কিন্তু মা তালপাতার হাতপাখা দিয়ে আমাদের দুজনকেই বাতাস করতেন যত ক্ষণ না ক্লান্তিতে তাঁর হাত এলিয়ে পড়ত। কিন্তু যেই-না আমাদের দুজনের কেউ উস্‌-খুস্‌ করে উঠতাম অমনি আবার পাখার বাতাস শুরু হত নিঃশব্দে। হাতপাখায় বাতাস করাটা মায়ের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল কলের মতো। মা ছাড়া এমন অক্লান্ত পরিচর্যা কে করে করে বা করতে পারে।

আমি যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি এবং ১নং মল্লিক লেনের বাড়িতে থাকি তখন একবেলা করে বৌঠান (বাসন্তী দেবী)এর কাছে যাওয়া ছিল আমার নিত্যকর্মপদ্ধতি। মানুষ, সে তার বয়স যাই হোক, ঠিক বোঝে কোথায় একটু আদর পাবে এবং কোথায় আবদার

চলবে। তাই বৌঠানের কাছে দিনে অন্তত এক বেলা হাজিরা না দিলে কেমন৺,
যেন খালি খালি লাগত। বৌঠানও হাতেব কাছে আমাকে পেয়ে বেশ
ফুটফবমাস কবতেন এবং এটা-ওটা নিউ মার্কেট থেকে কি অন্য কোনো
দোকান থেকে কিনে আনতে পাঠাতেন। সেই ফাই-ফবমাস খাটবাব
জন্যে সুধাংশু, ভোম্বল ও আমি, হোলি ট্রিনিটি, আমবা প্রত্যেকেই এক পায়ে
খাড়া, কেননা এই বাণিজ্যে মুনাফা ছিল। জিনিস কিনে যা পয়সা বাঁচত
তাই দিয়ে নিউ মার্কেটেব উপাদেয় প্যাটি পেট ভবে খেয়ে তাব পব সেগুলিকে
ববফ দেওয়া আইসক্রীম সোডা দিয়ে গলাধঃকবণ কবা যে কী উপভোগ্য
ব্যাপাব যে তা উপভোগ কবে নি সে বুঝবেই না। তাব পব বাড়ি ফিবে
জিনিসগুলি বৌঠানকে বুঝিয়ে দিযে আমাদেব অবস্থা হত সেই ছড়াব বইয়েব
খোকাব মতো 'খোকা বসে হিসেব মেলায় আব পয়সা কৈ?' শেষ
পর্যন্ত গবমিল বা প্যাটিখাতে খবচা লিখতে হত। বৌঠান প্রথম প্রথম হিসেব
চাইতেন কিন্তু পবে গতিক দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'কি ফিবল
বল।' এই ব্যবস্থায় হিসেবেব জটিলতা অনেকটাই কমে গেল।

এব উপব আবাব শুরু হল টেনিস খেলাব ধুম। কালীমোহন আলয়ের
পেছনে বেলতলা বোডেব দিকে যে একটা ছোটো ডোবা ছিল সেটাকে
বুজিয়ে চমৎকাব একটি ঘাসে ঢাকা মাঠ কবা হয়েছিল। সেইটে হল
খাসা টেনিস কোর্ট। অচিবে এসে গেল নেট, খেলাব মাঠেব দুই প্রান্তে উঁচু
নীল পবদা, স্লেজেনজাবেব বল ও খানকয়েক ভালো ব্যাকেট। এস. বায়
অ্যাণ্ড কোং বা কাব অ্যাণ্ড মহলানবীশ দুই-ই ছিল চেনা দোকান। আর তা
ছাড়া বিল হল সি. আব. দাশেব নামে। কোনো অসুবিধেই হল না। খুবই
জমল খেলা। আমবা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা ছাড়া পাড়াবও কতক ছেলে
জুটে গেল। খেলাব চেয়েও জমত খেলাব পব চায়েব পালা। কেক, পেস্ট্রী
ছাড়াও বাড়িতে তৈবি চিজ টোস্ট সে যেন মুখে লেগে বয়েছে। ভুলু
বয় যে গরম গবম চিজ টোস্ট এনে দিত প্লেট ভরে ভবে সেবকমটা আব
খাই নি কোনোখানে। এই টেনিস হুল্লোড়ে বৌঠান বোধ হয় কিছুটা
অস্বস্তি বোধ কবছিলেন এবং অচিরেই আমাদেব টেনিস ক্লাবেব অপঘাত
মৃত্যু হবে এইরকম একটা আশঙ্কা যেন ভেতরে ভেতবে আমরা অনুভব
কবতে আবম্ভ করেছিলাম। রাখে কৃষ্ণ মাবে কে। ভগবান মুখ তুলে
চাইলেন। একদিন আমবা খুব জোরসে টেনিস খেলছি। খেলাটা খুব

জমেছে—কে হাবে কে জেতে। উল্লাস উচ্ছ্বাস একেবারে লাগামহীন। এমন সময় দেখি একতলার ছোটো আফিসঘবের পুবের দিকের জানালাটায় দাদাবাবু দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন। আমাদের হুল্লোড়ে কেউ কি কাজ করতে পারে? আমরা তো বিপদ গণলাম। কিন্তু দাদাবাবু হাত নেড়ে আমাদের বেশ উৎসাহই যেন দিলেন এবং বদবী, তাঁর মোটা গোলগাল বেয়াবাটি, সুসংবাদ দিয়ে গেল যে কাল থেকে তাব সায়েবও খেলবেন। আর আমাদেব পায় কে। দাদাবাবুব ধাবণা হল যে একটু হাত-পা চলাচল কবলে শবীবটা ভালো বোধ কববেন। খববটা তক্ষুনি বৌঠানেব কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া গেল। বৌঠানেব মুখে দেখলাম হাসি-হাসি ভাব কিন্তু রাগেব ভান কবে বললেন, "বুড়োবাও ছেলেদেব সঙ্গে খেপল।" খুব জোর খেলা আবম্ভ হল। দাদাবাবু নামলেন খেলতে। এককালে যে খেলতে পারতেন তা দু-একটা মাবেই বোঝা গেল। তবে তিনি খেলতেন একেবাবে কোর্টেব শেষ সীমানাব লাইনে দাঁড়িয়ে। নেটেব কাছে দৌড়ে আসাব যে আধুনিক বেওয়াজ এখন হয়েছে তিনি তা কবতেন না। দেখাদেখি এলেন ময়নাবাবু—সি সি. দাশ—বৌঠানেব ছোটো বোন মাধুবীদিদিব স্বামী। সেই সঙ্গে জুটলেন তাঁব বৈমাত্রেয় ভাই সুধীন্দ্র দাশ এবং বৌঠানেব জেঠতুত ভাই মহীন্দ্রনাথ হালদাব—সংক্ষেপে মহিনদা। মোনা বেবীবা নেটেব পাশে চেয়াব নিয়ে বসতেনই, দেখি বৌঠানও মাঝে মাঝে এসে বসতে লাগলেন। বলাই বাহুল্য যে চায়ের ব্যবস্থাটা নূতন মেম্বাবদেবও পাতে দেবাব যোগ্যতা অর্জন কবল।

এই সময়ে যে দুটো অপ্রীতিকব ঘটনা ঘটেছিল তা এইখানে বলে রাখি। একদিন বৌঠানেব ঘবে গেছি। দম নিতে না নিতেই বৌঠান হয়ে উঠলেন অগ্নিশর্মা। বললেন 'তোকে আমি মাবব'। ব্যাপাব কি? মার খেতে আপত্তি নেই—কিন্তু কিসের জন্যে মার খাব সেটা তো জানা দরকার। অনেক সাধ্য-সাধনায় বৌঠানকে ঠাণ্ডা কবে যে খবব সংগ্রহ কবা গেল সেটা সংক্ষেপে এই—সব ভাইঝিয়েদেব মধ্যে আমাদেব নদিদি প্রমীলাকেই বাবা বেশি স্নেহ করতেন। আগেই বলেছি যে একবার এদেব দুজনেব মধ্যে ঝগড়া হয়ে কথা বন্ধ হয়েছিল এবং সেই আড়ি ভেঙেছিল নদিদির মৃত্যুশয্যায়। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস কবে যখন কলকাতাব স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম তখন একদিন বাবা নদিদির প্রতি মমতা-

জনিত ভাবাবেশে বলেছিলেন যে আমাব সঙ্গে নদিদির শ্বশুববাড়ির একটি মেয়েব বিয়ে দিলে নদিদিব আত্মা খুশী হবে। কথাটা বৌঠানের কানে যেতেই বৌঠান বললেন, 'এইতো একবত্তি ছেলে, সবে কলেজে ঢুকছে। এব কখ্খনো বিয়ে হতে পাবে না এখন।' বাবা কথাটার মোড় ঘুবিয়ে দিয়ে বললেন, 'না, এখনি বিয়া না। তবে সম্বন্ধটা কইবা রাখলে হয়।' বৌঠান বললেন, 'এব কোনো মানেই হয় না। এখন থেকেই ছেলেটাব গলায় একটা কলসী বেঁধে দেওয়াব কি দবকাব? হ্যাঁ, যদি বুঝতাম যে মেয়ে একেবাবে ডানাকাটা পবী, দেবি হলে তাব বিয়ে হয়ে গিয়ে ফসকে যাবে তা হলেও না হয় বোঝা যেত।' বাবা আব কিছু বললেন না। কথাটা পবম্পবায় নদিদিব স্বামী শবৎবাবুব কানে গেল। এরকম খবব তাঁর কানে তুলে দিযে মজা দেখবাব লোকেব অভাব ছিল না। যেই না সে কথা শোনা অমনি শবৎবাবু অসম্ভব বেগে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, যাতে বৌঠান শুনতে পান—'আমাদেব বাডিব মেয়ে ডানাকাটা পবী কি না সে-কথা বলবাব অধিকাব বাসন্তীকে কে দিল? তার কোনো রাইট নেই এবকম কবে মেয়েটাকে অপদস্থ কবা।' বেগে তিনি সেইদিনই কালীমোহন আলয় থেকে বেবিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিন তিনি ও-বাডি মাডান নি। মৃত কন্যাব স্বামীকে বাডি থেকে তাডানো হল বলে বৌঠানেব নামে দোষাবোপ হল দেখে বৌঠানেব যত বাগ গিয়ে পড়ল আমাবই ঘাডে। বৌঠান তখন শবৎবাবুকে ঠাণ্ডা কবতে লাগলেন এবং আমি বৌঠানকে তোয়াজ কবতে লাগলাম। ভাগ্যক্রমে শবৎবাবু প্রসন্ন হলেন এবং সেই সঙ্গে বৌঠানেব খোশ মেজাজও ফিবে এল। পবে বৌঠানকে হাসতে হাসতে বলেছি—'আমাব দোষটা হল কোন্ জায়গায়? আমি তো হৈছিলাম বলিব পাঁঠা মাত্র।'

আব-একটা ঘটনা যা ঘটেছিল তা সেই সময়ে যতই অপ্রীতিকব হয়ে থাকুক তাব প্রভাব আমাব জীবনে খুব ভালো কাজ কবেছে। কথাটা লজ্জার কিন্তু খুলেই বলি। আমি যখন সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছি তখন দেখলাম যে আমাদেব পাডায় একটা ফুটবল ক্লাবেব আড্ডা ছিল। আমি ফুটবল, ক্রিকেট মন্দ খেলতাম না। সুতবাং ভর্তি হলাম সে ক্লাবে। বেলতলার মোড়ে কৃষ্ণমোহন জজেব বাড়ির পেছনে একটা পোড়ো জমিতে যে খালি খোলার ঘব ছিল সেইটেই ছিল ক্লাবঘব। সেখানে খেলাব সবঞ্জাম থাকত।

একটা বক্স হারমোনিয়াম এবং বাঁয়া তবলা এক জোড়াও ছিল। গান-বাজনা কাবা করতেন এবং কখন কবতেন তা আমি বড়ো একটা জানতাম না। আমি যেতাম খেলাব সবঞ্জাম যখন মাঠে নিয়ে যায় সেই সময়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভিড়ে মাঠে যাবাব জন্যে। কলেজে ঢোকাব পব প্রথম যে পুজাব ছুটি হয়েছিল সে সময়ে আমাদেব ক্লাবে বেশ লোকসমাগম হয়েছিল এবং আড্ডাটাও জমেছিল ভালো। বিজয়াব দিন বিকেল থেকেই সেখানে হৈচৈ হচ্ছে দেখলাম। বিকেল থেকেই 'হাউস ফুল' যাকে বলে। পান বিড়ি সিগাবেট ও চা বিলি হচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসতেই এল একটা প্রকাণ্ড জাগ ভর্তি সববত ও গোটা কয়েক গ্লাস। সববত পবিবেশন শুরু হল। সববতেব চেহাবা দেখেই আমাব কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে উঠল। বুঝেছিলাম যে বাবুবা সিদ্ধিব সববত খেয়ে মহাদেবেব ভজনা কববেন। বিজয়া দশমী কিনা। আমাকে যখন দিল একটা গ্লাস, তখন গ্লাসটা নিয়ে যদি পাশে বেখে দিতাম হয়তো কোনো গোলই হত না। কিন্তু আমি বলে ফেললাম, 'না ভাই, ও আমি খাব না।' যেই না একথা বলা অমনি উপস্থিত সবাইয়েব বোখ চেপে গেল 'খেতেই হবে। বিজয়াব দিন এক গ্লাস সববত খেলে তোব জাত যাবে না। বেহ্মজ্ঞানী কিনা।' বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। সে সভায় আমাব চেয়ে ঢেব উঁচুদবেব চবিত্রেব ছেলেও কাত হয়ে যেত। এক চুমুকে সেই সবুজ হড়হড়ে পানীয় গলাধঃকবণ কবে ফেললাম। গোল মিটল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাব যেন কেমন গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। মুখ শুকিয়ে গেছে মনে হল এবং চোখ আব খুলে বাখতে পাবি না যেন। আমি উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে মাকে বলে অল্প একটু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। বাবা বোধ হয় নসু, বুধাকে ভাসান দেখাতে নিয়ে গেছেন। কখন বাবা ফিবলেন টেব পাই নি। একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে ঘুমটুকু ছুটে গেল পেটেব মধ্যে যন্ত্রণাব চোটে। মাথা ঘুবছিল আব তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আবাব পেটটা গুলিয়ে উঠলেই আমি উঠে পড়ে পেছনেব বারান্দায় গিয়েই বমি করে ফেললাম— সেই কালো কালো সববতগুলো আব অজীর্ণ ভাত যা খেয়েছিলাম। মা ধড়ফড়িয়ে উঠে এলেন লণ্ঠনটা বাড়িয়ে নিয়ে। বাবা-- 'কি হৈছে' বলে বেবিয়ে এলেন। দ্বিতীয়বাব শান্তিনিকেতনে যাবাব পব এবং কলেজে ঢুকে বাবাব কাছে মাব খাই নি। খুকী শ্বশুরবাড়ি যাওয়ায় নালিশ কববারও লোক ছিল না। বাবাকে দেখেই ভীষণ ভয় হতে লাগল। মনে

পড়ল সেই বেতটার কথা। বাবা উপুড় হয়ে বোধ হয় বমিটা দেখলেন। আমি ভাবলাম এইবার বুঝি শুরু হয় সেই বেত পিট্টি। সেদিনটা বিজয়া দশমী ছিল বলে কিংবা গভীর মনোদুঃখে বাবা মারলেন তো না-ই, বকলেনও না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেবলমাত্র বললেন—'এ-ও হৈছে।' আমাকে যেন চাবুক মারল ঐ দুটো কথা। এই চাবুক আমার জীবনে দরকার ছিল এবং আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি জীবনে আর কখনো দেশে কি বিদেশে কোনো মাদক দ্রব্য স্পর্শও করি নি।

উনিশ শো এগারো সালের ডিসেম্বর মাসে হল দিল্লীর দরবার। ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ এসে দিল্লীতে দরবার করবেন সারা ভারতের বড়ো ছোটো সব রাজন্যবর্গের ও হোমরাচোমরা লোকজনদের নিয়ে। বিপুল আয়োজন চলেছিল। ঠিক হয়েছিল যে পয়লা জানুয়ারিতে সম্রাট কলকাতায় আসবেন এবং গড়ের মাঠে সকালে হবে দারুণ প্যারেড— সৈন্যরা নানারকমের রঙ-বেরঙের পোশাক পরে কুচকাওয়াজ করবে এবং সন্ধের পর হবে বাজি। আমি বাবার সঙ্গে গেলাম প্যারেড দেখতে। গুপ্ত, নসু, বুধা সঙ্গ ধরেছিল কি না মনে নেই। তারা সে মৌকা ছেড়েছিল বলে মনে হয় না। গড়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের রাস্তায় গাড়ি আর গাড়ি। আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে চেয়ে রইলাম। তোপ পড়তে লাগল। তার পর বাজল কত যে ভেরী (বিউগল্) ও ব্যাণ্ড। হঠাৎ একটা জয়ধ্বনি উঠল আকাশ কাঁপিয়ে। বাবা বললেন যে "রাজা বড়োলাটের বাড়ি থেইকা রওনা হৈয়া প্রায় আইসা পড়েছেন।" অল্পক্ষণ পরেই এল দুই দুই করে তিন লাইনে জোতা ছয় ঘোড়ার গাড়ি, তাতে লাল পোশাক ও টুপি-পরা তিনটে লোক বাঁ দিকের তিনটে ঘোড়ার উপর বসে। ভেতরে বসেছিলেন সম্রাট ও তাঁর মহিষী এবং তাঁদের সামনে জমকালো পোশাক-পরা ও টুপিতে উষ্ণীষ উড়িয়ে এ. ডি. সি এবং গাড়ির পেছনে চটকদার সোনালী রঙের উর্দি-পরা দুটা ছত্রধারী বড়ো রাজছত্র ধরে দাঁড়িয়েছে। সম্রাট সমস্ত মাঠটা প্রদক্ষিণ করে গেলেন জনতাকে দর্শন দিয়ে। মাঝে মাঝে তিনি সাদা দস্তানাপরা হাত তুলে জনতার অভিনন্দনের স্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন। তার পর শুরু হল প্যারেড। কত বিভিন্ন সেনাবাহিনীর কতরকম জমকালো পোশাক। কতরকমের গড়ের বাজনা, ব্যাগপাইপ, কত তোপধ্বনি, কত বিউগল্ যে বাজল তা কি বলব। অনেকবার গড়ের মাঠে প্যারেড দেখেছি কিন্তু

সেবারের মতো আর কখনো দেখি নি। প্যাবেড শেষ হতে ফিরে এলাম বাড়ি খুব স্ফূর্তি করে। এসে দেখি কিনা— আমাদেব ছোট্টো ফুটফুটে একটি বোন হয়েছে। পবে এঁব নামকরণ হয়েছিল অন্নপূর্ণা। ছোটো বয়স থেকে খুব টবটবে মেয়ে ছিল বলে এব ডাকনাম হয়ে গেল বুড়ি। আজ পর্যন্ত সেই নামেই ডাকি এবং তাইতেই ভালো লাগে। আমাদেব সব চেয়ে ছোটো এবং আদুবে বোন এই বুড়ি, অতি অসাধাবণ স্নেহশীলা, বুদ্ধিমতী মেয়ে। সুন্দব দুটি চোখ, টিকলো নাক এবং পাতলা দুটি ঠোঁটে বুড়িব মুখখানা তখনই খুবই সুন্দব দেখাত। দিল্লীব দববাবেব বছবে কলকাতাব প্যাবেড, এই পটভূমিকায় বুড়িব জন্মদিনটি আমাদেব কখনো ভুল হয় নি—পয়লা জানুয়াবি উনিশ শো বাবো।

৫

দেখতে দেখতে বছব ঘুবে গেল। আমবা প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে পবমানন্দে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রোমোশন পেলাম। আগবতলার সোমেন্দ্র দেববর্মন ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমাব শান্তিনিকেতনেব সতীর্থ, তাঁবা থাকতেন অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে। সে হোস্টেলটা ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেব পেছনে। হোস্টেলেব প্রবেশদ্বাব ছিল নন্দকুমাব চৌধুবী লেন থেকে। আমাব ইচ্ছে হল ঐ হোস্টেলে সোমেন্দ্রব সঙ্গে থাকি। মাকে বললাম যে ঐ হোস্টেলে থাকলে বাড়ি থেকে বোজ টানাপোড়েন কবে অতদূবে কলেজ কবতে হবে না। তা ছাড়া হোস্টেলটা কলেজেব অতি নিকটে। পবীক্ষাব বছব সেখানে থাকলে পড়াশুনাবও সুবিধে হবে। বাবা-মাব মত হতেই সোমেন্দ্রব সঙ্গে গিয়ে দেখা কবলাম হোস্টেলেব সুপাবিনটেনডেন্ট ফাদাব হোম্‌স্‌ সাহেবেব সঙ্গে। একটা ঘব খালি ছিল, আমি শান্তিনিকেতনেব ছাত্র এবং সোমেন্দ্রব সনির্বন্ধ সুপারিশ এইসব মিলিয়ে ফাদাব হোম্‌সের আমাকে নিতে আপত্তি হল না। বাড়ি থেকে তল্পি-তল্পা নিয়ে সেইদিনই গেলাম হোস্টেলে।

নন্দকুমাব চৌধুবী লেন থেকে হোস্টেলে ঢুকবাব বড়ো দরজা। শুনলাম সেটা প্রত্যহ রাত নটাব সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং সেইজন্যে ছেলেদের তাব আগেই নিজ নিজ ঘবে ফিবতেই হবে। দবজা দিয়ে ঢুকেই

ছিল একটা শান-বাঁধানো উঠান এবং তাব তিন দিকেই ছিল তিনতলা হোস্টেল বাড়ি। দক্ষিণেব দিকে ছিল উঁচু পাঁচিল— যা টপকানো ছিল অসম্ভব। প্রত্যেক ছেলের জন্তে ছিল একটি কবে স্বতন্ত্র ঘব। উঠানে ঢুকতেই বাঁ দিকে একেবাবে শেষেব ঘবটা আমি পেলাম। তাব দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটা কবে জানালা ছিল। পশ্চিমেব জানালা দিয়ে মিশনাবী সাহেবদেব মহলটা ও তৎসংলগ্ন বাগান পেরিয়ে একেবাবে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেব ট্রাম চলাচল দেখা যেত। আসবাবপত্রেব বাড়াবাড়ি ছিল না মোটেই। একটা তক্তাপোশ, একটা শক্ত কাঠেব টেবিল, একটা সোজাপিঠ হাতলবিহীন চেয়াব একটা কাপড় বাখবাব ব্যাক। এইতেই বেশ চলে যেত। কোনো অসুবিধা বা উদ্‌বেগ বোধ কবি নি।

শুনলাম যে ওই হোস্টেলে সকালে চা বা জলযোগ কিছু দেওয়া হয় না। কলেজে যাবাব আগে পেট ভবে ভাত, ডাল, তরকাবি, মাছেব ঝোল ও দই পাওয়া যেত। বিকেলে জলখাবাবে পেতাম লুচি খানচাবেক কবে ও ছোলাব ডাল, নয়তো পাতলা ডিমেব ঝোল। বাত্রে ভাত কিংবা হাত-রুটি যাব যেমন অভিরুচি; ডাল তবকাবি ও মাছেব একটা কিছু এবং সপ্তাহে দুদিন বোধ হয় মাংস হত। হোস্টেলেব ছাত্রদেব মধ্যে মাসে দুজন কবে হতেন ম্যানেজাব। তাঁবাই ঠাকুব-চাকবদেব যাবতীয় নির্দেশ দিতেন। মাস গেলে একবাব কবে হত ফিস্ট বা খ্যাঁট। মোটেব উপব বান্না বেশ ভালোই হত। এই তিনবাব খাবাব জন্তে কি টাকা দিতে হত তা এখন বলতে সংকোচ লাগে লোকেবা পাছে বিশ্বাস না কবে এই ভয়ে। মোট মাসিক খবচা বাবোটি টাকা ঘবভাড়া সমেত। সকালবেলা চায়েব কোনো অসুবিধেই ছিল না। নন্দকুমাব চৌধুরী লেন থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পড়লেই দুধাবে অসংখ্য চায়েব দোকান। এক পয়সায় এক কাপ চা ও দু পয়সায় একটি কবে হৃৎপিণ্ড আকাবেব ছোটো তিনকোনা কুইন্স কেক। তিন পয়সায় বেশ চা খাওয়া হয়ে যেত।

অক্সফোর্ড মিশনেব সর্বাধ্যক্ষ তখন ছিলেন ফাদাব ব্রাউন। এবকম অদ্ভুত লোক খুবই কম দেখা যায়। তাঁব পবনেব আলখাল্লাটা কোমব পর্যন্ত গুটিয়ে এনে কোমবেব কালো দড়িটাব মধ্যে গুঁজে নিতেন। পায়েব মোজাটা পেনটুলুনেব উপর টেনে নিয়ে তিনি সাইকেলে বেব হতেন এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। সাইকেলেব সামনে হ্যাণ্ডেলেব থেকে ঝোলানো থাকত একটা

বেতের চুবড়ি। তার মধ্যে থাকত যিশুর নানারকমেব ছবি। তাঁকে দূর থেকে দেখলেই পাড়াব ছেলেবা ছুটত তাঁর সাইকেলেব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে— 'ছবি দাও, ছবি দাও' বলে। দিতেন অনেককে। কোনো কোনো ছোকরা একেবাবে নাছোড়বান্দা হলে তাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাঁব হাতে থাকত একটা ছোট্টো লাঠি— বড়ো সেনাপতিব ব্যাটনেব মতো। কোনো ছেলেই তাঁকে ভয় পেত না এবং ছবি আদায় না কবে তাঁকে ছাড়তই না। অক্সফোর্ড মিশনেব কাজে তিনি সাবা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়ে গেছেন। এবকম নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গ খুবই বিবল।

হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট বেভাবেণ্ড ফাদার হোম্‌সেব কথা আগেই বলেছি। এবকম জনপ্রিয় পাদ্রী কমই দেখেছি। তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। একটা পা বোধ হয় ছোটো ছিল। কিন্তু শাবীবিক এই অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁব উৎসাহেব অন্ত ছিল না। ফুটবল খেলাব মাঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে বেফাবিও হয়েছেন। খুব ভালোবাসতেন তাঁর হোস্টেলেব ছেলেদেব। সবাই তাঁব কাছে তাদেব সুখদুঃখের কথা বলে আসত। কোনোবকম বিবাগ বা মনে বিকৃতি দেখি নি। একটা ঘটনা বেশ মনে আছে। একটি ছেলে, কি কাবণে জানি না, আফিং খেয়ে আত্মহত্যা কববাব চেষ্টা কবেছিল। হোস্টেলময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। হোম্‌স্‌ সাহেব নিজে অ্যাম্বুলেন্স বন্দোবস্ত কবে মেডিক্যাল কলেজেব হাসপাতালে সে ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। আমবা পরে গিয়ে দেখলাম তাব জিভটা ফুটো কবে একটা তাব দিয়ে সেই জিভটাকে বাইবের দিকে একটা সাঁড়াশিব মতন জিনিস দিয়ে টেনে বেখেছে এবং মুখ দিয়ে পেটেব মধ্যে একটা ববাবেব নল ঢুকিয়ে দিয়ে পাম্প কবে কালো কালো জল বের কবছে। এবকম দৃশ্য আমি জীবনে আগে কখনো দেখি নি বলে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সেইজন্যে মেডিক্যাল কলেজেব ডাক্তার ও পড়ুয়াদেব 'প্রেমেব ব্যাপাব আছে নাকি মশায়'— এই ধবণেব পবিহাসটা সেই পবিবেশে ভালো ঠেকে নি। বস্তুত ছেলেটি খুবই সচ্চবিত্র ও পড়াশুনায় ভালো ছেলে ছিল। সেই সময়ে পাদ্রী হোম্‌সেব মুখে যে দুঃখ ও করুণার ছবি দেখেছি তা ভোলবাব নয়। সময়মত চিকিৎসা হওয়ায় ছেলেটি বেঁচে উঠল। কিন্তু তাব পব লাগল পুলিসেব আনাগোনা। কেবলমাত্র হোম্‌স্‌ সাহেবেব জন্যে ছেলেটি বেঁচে গেল, কেবল প্রাণে নয়, আত্মহত্যার চেষ্টা

করবার দায়ে ফৌজদারী মামলা থেকেও। শুনেছি এই ছেলেটি পরে হোম্‌স্‌ সাহেবের সুপারিশে খুব ভালো চাকরি পেয়ে জীবনে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

আমার বর্তমানের টাক মাথা দেখে আমার নাতিনাতিনীরা বিশ্বাসই করেন না যে এককালে আমার মাথায় বেশ ঘন ঢেউখেলানো মিশমিশে কালো চুল ছিল। এই-সব বালখিল্যদের বোধনার্থে আমার চব্বিশ বছর বয়সের ছবিখানা বসবার ঘরে রাখতে হয়েছে। তেমনি তাঁরা বিশ্বাসই করেন না যে আমি কোনোদিন গান গাইতে পারতাম। পিয়ার্সন সাহেবের একটি চিঠি পড়ে তাঁরা একেবারে চুপ। এ ছাড়া আমার গান শুনে যদি পিয়ার্সন সাহেব মন ঠিক করে থাকেন যে তিনি শান্তিনিকেতনে যাবেনই তবে সেটাও আমার কম কৃতিত্ব নয়। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

আমি যখন অক্সফোর্ড মিশনে বেশ গুছিয়ে বসেছি তখন একদিন রেভারেণ্ড ফাদার হোম্‌সের সঙ্গে একটি সৌম্য ও সুদর্শন ইংরেজ যুবক এলেন আমাদের হোস্টেলে। শুনলাম তাঁর নাম উইলিয়ম পিয়ার্সন। তাঁর সঙ্গে নাকি গুরুদেবের বিলেতে আলাপ হয় এবং তিনি অল্পদিনেই গুরুদেবের খুব ভক্ত হয়ে পড়েন ও শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানে গুরুদেবের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলে ভাবতে আরম্ভ করেন। এই হোস্টেলে সোমেন্দ্র ও আমরা কয়টি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র আছি জেনে তিনি এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। খুব মিষ্টভাষী ও সদাচারী যুবক তিনি ছিলেন। আমাদের চেয়ে বয়সে অল্প একটু বড়োই ছিলেন। অল্প অল্প বাংলা তখনই শিখেছিলেন, কিন্তু বেশি কথা বলতেন না বাংলায়— বোধ হয় লজ্জা হত বলে। রবীন্দ্রসংগীত শুনতে চাইলেন। সোমেন্দ্র অবশ্য বরাবরই দাবি করতেন যে গুরুদেবের সব গানই তিনি জানেন। কিন্তু গানের সভায় আমল পেতেন না বলে এবার তিনি আর আগ বাড়িয়ে গান গেয়ে ফেলেন না। আমাদের মধ্যে আমিই যা একটু গান করতাম। অনুরুদ্ধ হয়ে গেয়ে ফেললাম— 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'। মানুষটি দেখলাম যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন ভাবাবেশে। খুব খুশি হলেন আমার গান শুনে। এই সেদিন Visva-Bharati News-এ ছাপা হয়েছে যে চিঠিখানা এই পিয়ার্সন সাহেব এই সাক্ষাৎকারের পরই গুরুদেবকে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

Cashmere Gate
Delhi
Dec. 17, 1912

My dear Guru,

...But I must mention first two visits I paid in Calcutta before leaving for Bolepur. The first was a visit to your nephews in Chitpore where I spent a very delightful hour talking, looking at drawings and listening to music. The second visit was a foretaste of what I afterwards expected at শান্তিনিকেতন। I heard from Mr. Holmes of the Oxford Mission that there were some Bolepur boys in the hostel who had been friends of Somendra. So I went and had a talk first with Satyendra and then with Sudhi[r]. In Sudhi[r]'s room there were besides Satyendra, Triguna and Gour Gopal. We talked of Somendra and of you and then Sudhi[r] at my request sang the song you sang to us at Cambridge beginning জীবনে যত পূজা। He has a very sweet voice and the song moved me deeply as I remembered the scene at Cambridge. It was a delight to see the wonderful love of these boys both for you and the school...

Ever yours in শান্তিনিকেতন bonds
W. Winstanley Pearson

আমি যখন সেই হোস্টেলে ছিলাম তখন শান্তিনিকেতনের দেবলদাও সেখানে ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার যেটুকু স্মরণ ছিল তা আগেই বলেছি। আর একজন ছিলেন আসামের জ্যোতিষদা। বহুকাল পরে তাঁর সঙ্গে একবার গৌহাটি না ডিব্রুগড়ে দেখা হয়েছিল। তিনি বোধ হয় উকিল হয়েছিলেন। আর-একজন যে অল্পবয়স্ক ছেলে ছিলেন সেই সময়ে অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে তাঁর নাম ছিল কিরণ বসাক। যেমন লেখাপড়ায় ভালো তেমনি ভালো খেলতেন টেবল টেনিস। এই সময়ে সোমেন্দ্রর মাধ্যমে আর-একজনের সঙ্গে বেশ আলাপ জমেছিল। তাঁর নাম ছিল বঙ্কিম হালদার। তিনি বেশ সাহিত্যরসিক ছিলেন। মাঝে 'প্রীতি' নাম দিয়ে একটা মাসিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। পরে ইনি

পাটনায় বাংলার অধ্যাপক হয়ে সাহিত্যজগতে বেশ নাম করেছেন। আমি ওই হোস্টেলে কম দিনই ছিলাম। বোধ হয় ছমাস মাত্র ছিলাম। পূজার বন্ধ হতেই আমি মার সঙ্গে পুরুলিয়া যাই। ছুটির পর পুরুলিয়া থেকে এসে আমি অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে আর থাকি নি।

৬

ঐ সময় বরাবর দিদিমণি তরলা ছিলেন ল্যান্সডাউন রোডের ৭৮নং বাড়ির একতলায়। পালিত স্ট্রীট তখন ছিল না— ম্যাডাক্স স্কোয়ারও তখন হয় নি। ল্যান্সডাউন রোড থেকে একটা ছোটো রাস্তা এই বাড়ির ভিতরে চলে আসত। সেই ছোটো গলিটা ছিল ঐ বাড়িরই ড্রাইভ অর্থাৎ প্রবেশপথ। ওটা অনেক পরে হয়ে গেল পালিত স্ট্রীট এবং ৭৮নং-এর ফটকটা ল্যান্সডাউন রোড থেকে পিছিয়ে পালিত স্ট্রীটের উপরেই তৈরি হল। ড্রাইভের দক্ষিণে ছিল একটা প্রকাণ্ড খালি মাঠ। তার পুবে ছিল দুখানা বাড়ি, ৮০/১ এবং ৮০/৫ ল্যান্সডাউন রোড। ৭৮নং বাড়িটির মালিক ছিলেন শশীভূষণ মজুমদার মশায়ের স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী মজুমদার। শশীবাবু তখন পি. ডবলিউ. ডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রথম শ্রেণীর অফিসার। জ্ঞানদাসুন্দরী পড়তেন দিদিমণি তরলার সঙ্গে বেথুন কলেজে। সেই সূত্রে দুই পরিবারের অনেক দিনের চেনাশোনা। শশীবাবুর তখন দাড়িগোঁফ ছিল না। বেশ লম্বাচওড়া ছিল তাঁর চেহারা। একটু গম্ভীর ধরণের কিন্তু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। কথাবার্তা কমই বলতেন। প্রশান্ত মুখশ্রী। ছোটো বয়েস থেকে কঠিন পরিশ্রম করে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জ্ঞানদা দেবী ছিলেন বেশ বেঁটেখাটো মহিলা। গায়ের রঙ ময়লা হলেও বেশ মার্জিত। বেশ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। দয়ালু ও আশ্রিতবৎসলা। শশীবাবু এবং জ্ঞানদা দেবী উভয়েই ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। দিদিমণি তখন কলকাতায় থাকবেন বলে বাড়ি খুঁজছিলেন এবং যতদিন না ভালো বাড়ি পাওয়া যায় ততদিনের জন্যে ঐ ৭৮নং-এর একতলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন।

অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল থেকে এক শনিবার বাড়ি এসে বিকেলের দিকে গেলাম সুধাংশুর সঙ্গে দেখা করতে ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে। ল্যান্সডাউন রোড থেকে বাড়িতে প্রবেশের গলি দিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে

বাড়িতে ঢুকতেই বাড়ির সামনে দক্ষিণ দিকে দেখলাম একটি নাতিবৃহৎ ঘাসে ঢাকা উঠান। বাড়িখানার পুবের দিকে ছিল একটি গাড়ি-বারান্দা ও তার উপরে ঘর। আমি জানতাম যে সুধাংশুরা একতলাতেই থাকতেন। সুতরাং গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত না গিয়ে তার অব্যবহিত আগে যে ক-ধাপ ছোটো সিঁড়ি ছিল তা বেয়ে উঠে একটা ছোটো ফালি ঘরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে পড়লাম। সেই বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে ছিল একটি ঘর যেখানে থাকতেন সুধাংশু।

আমাকে দেখে সুধাংশুর দুই ছোটো বোন বিবনু (অরুণা) ও ঝুনু (সাহানা) সমস্বরে 'আরে মামু এসেছে' বলে খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁরা আমাকে নিয়ে বসালেন সুধাংশুর পড়ার চেয়ারটার উপরে। সুধাংশু খাটের উপরেই বসেছিল। বেশ জমে উঠল গল্প। এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওই দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে খানিকটা এসে আমাকে দেখেই একেবারে মোড় ঘুরে ফিরে চললেন। ঝুনুও এই রাইট অ্যাবাউট টার্নটা দেখেছিলেন। তিনি অমনি—'আরে বুবু, কোথায় পালাচ্ছিস? আর কেউ নয়, আমাদের মামু। আয়, চলে আয়।' বলে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তার পর পরিচয় করিয়ে দিলেন—"জ্ঞানদা মামামার মেজ মেয়ে বুবু— ভালো নাম স্বপ্না।"

খুব চকিতে মেয়েটিকে একবার দেখে নিলাম। ছিপছিপে রোগা মেয়েটি, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ বটে তবে 'উজ্জ্বল' বিশেষণটা প্রয়োগ করাও যেতে পারে। ছোট্টোখাট্টো মেয়েটি··· বেঁটে বললেও সত্যের অপলাপ হয় না। আর-একবার মেয়েটিকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটির চোখের উপর দিয়ে বুদ্ধির একটা দীপ্ত আলো যেন ঝিলিক দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চোখে ধাঁধা লেগে ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটি কালো কি ফরসা, মোটা কি রোগা, বেঁটে কি লম্বা সে-সব কথা মনেই রইল না। পরে যখন মেয়েটিকে আরো বারকয়েক দেখলাম তখন বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে মেয়েটির মধ্যে এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্যে এক ঘর লোকের মধ্যেও তাঁকে চোখে পড়বেই। স্বভাবজাত সৌজন্য ও ভদ্রতার লালিত্য যথেষ্টই ছিল কিন্তু গায়েপড়া ঘনিষ্ঠতার কোনো প্রয়াসই তাঁর ছিল না। বেশ দূরত্ব রক্ষা করে মেয়েটি চলতে জানতেন। খালি তাঁর ভিতরকার স্ফূর্তিটি ফুটে বের হত চোখের চাহনিতে। সে চাহনিতে

আলো ছিল, জ্বালা ছিল না। মেয়েটির চাল-চলনে এমন একটা সহজ সংযত ভাব ছিল যে মেয়েটিকে বেশ ভালোই লাগল এবং এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে তাঁকে আরো জানবার কৌতূহল এমন-কি ঔৎসুক্যও যথেষ্ট হয়েছিল সেই প্রথম দিন থেকেই।

তার পর আগে পিছে সুধাংশুদের জ্ঞানদামামীমার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গেও পরিচয় হল। তাঁদের বড়ো বোনের নাম ছিল প্রতিভা। মুখখানা ছিল তাঁর গোলগাল— চোখে ছিল চশমা। ভারি সুন্দর তিনটি সরু লাইন থাকায় তাঁর গলাটি হয়েছিল কাব্যে যাকে বলে কম্বুগ্রীবা। এর সব কটি বোনেরই এইরকম গড়ন ছিল। মুখের রঙ গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণের মাঝা-মাঝি। শান্ত, গম্ভীর ও শিক্ষিতা। চমৎকার ছিল তাঁর ছবি আঁকবার হাত যার প্রমাণ ছিল দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটি ছবি। ঘরের কাজকর্মে তিনি ছিলেন চৌকস। বোনেদের ও ছোটো ভাইয়ের প্রায় অভিভাবক বললেই হয়। কথা বলতেন কম— কিন্তু সুন্দর ছিল তার কণ্ঠস্বর। এক-একজন স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের দেখলেই 'দিদি' বলতে ইচ্ছে হয়— ইনি ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

বুবুর পরের বোনটির নাম সলিলা ওরফে রবু। জাহাজে বা নৌকায় জন্মেছিলেন বলেই নাম রাখা হয়েছিল 'সলিলা' কিনা তা জানি না। মাথাভরা চুল। টানা টানা নাক ও চোখ। রঙ ময়লা হলেও মুখের মধ্যে একটা অপূর্ব লালিত্য ছিল। চোখের দৃষ্টিতে একটা আভিজাত্য ভাব তাঁর ছোটো বয়স থেকেই পরিলক্ষিত হত। সেই ছোটো বয়স থেকেই হক কথা সোজা বলতে পারতেন।

তার পরের বোনটির নাম রেণুকা যাঁর ডাকনাম ছিল ছোট্‌কোন। অনেকটা বুবুর মতোই দেখতে। মেয়েটি একটু গম্ভীর হলেও বেশ গল্প করতে পারতেন। একটা সুন্দর লাবণ্য ও বুদ্ধির দীপ্তি সব সময়েই লেগে থাকত তার মুখে। মিতভাষী, ভদ্র, সুদর্শনা ও সুন্দর ছোটো মেয়েটি।

আরো ছোটো একটি মেয়েকে দেখলাম ঐ ৭৮নং বাড়িতে। তাকে সবাই 'আপু' বলে ডাকত। পরে শুনেছি যে তার পোশাকী নাম সুজাতা। এ বাড়ির মেয়েদের সবাইকে ইনি 'দিদি' বলেই ডাকতেন এবং মজুমদারমশায় ও তাঁর স্ত্রীকে 'বাবা' ও 'মা'-ই বলতেন। ফুটফুটে ছোট্টো মেয়েটি, স্ফূর্তিতে ভরা। টানা টানা নাক ও চোখ। এক কথায় সুন্দর একটি

মেয়ে। শুনলাম ইনি বুবুদের এক মাসতুতো বোনের মেয়ে। এঁর মা-ও নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে আমি দেখি নি। এঁর জন্মাবার সময়েই কিংবা অল্প পরেই এঁর মা মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ছোটো মামীমা জ্ঞানদা দেবীর হাতে এই মেয়েটিকে তিনি সঁপে দেন। সেই থেকে এই মেয়েটি এ বাড়ির মেয়ের মতোই লালিত পালিত হয়ে বেড়ে উঠেছেন। বহুকাল পর্যন্ত ইনি জানতেন না যে মজুমদার-দম্পতি এঁর আপন বাবা মা নন এবং তাঁদের মেয়েরা এঁর আপন বোন নন। বহুকাল পরে কে একজন বিজ্ঞের মতো এঁকে পুরানো ইতিহাসটা শুনিয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষতি হয় নি, কেননা তাতে করে এর পাতানো সম্পর্কটার উপরে এতটুকুও আঁচড় পড়ে নি। একদিন না একদিন তো শুনতেনই তাঁর জীবনের ইতিহাস।

সব চেয়ে ছোটো ছিলেন একটি ছোটো ছেলে। তাঁকে সবাই ডাকত 'খোকা' বলে। পরে তাঁর নাম হয়েছিল দেবকুমার। ফরসা ছেলেটি। আমি যখন প্রথম দেখি বয়স ছিল তাঁর বছর দেড়েক কি দুই। সব ভাই-বোনদের পরম আদরের একমাত্র ভাই।

আলাপ-পরিচয় হবার পর থেকে প্রায়ই যেতাম ৭৮নং বাড়িতে সুধাংশুদের সঙ্গে দেখা করতে। কতরকম গল্প হত এবং কতরকমের নির্দোষ খেলা ও আমোদ-প্রমোদ হত। একটা খেলার কথা এখনো মনে আছে। সে খেলার নাম ছিল 'কাঁইবিচি খেলা'। সবাই বেশ ছড়িয়ে গোল হয়ে বসতাম। এবং একজন একটা পাকা তেঁতুলের বীচি হাতের মুঠোয় করে সবাইয়ের হাতে ছুঁইয়ে যেত। এই ছুঁইয়ে যাবার সময় কারো হাতে চট করে সেটা গুঁজে দিত। কিন্তু গোঁজবার পরও বাকি কয়জনের হাতে হাত ছুঁইয়ে যেতে হত। তারও পর একজনকে বলতে হত কার হাতে সেই কাঁইবিচিটা রয়েছে। এটা অনুমান করতে হলে সব সময়টা লক্ষ্য রাখতে হত হাত ছোঁয়ার সময় কার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এই তো সামান্য খেলা। এইরকম করে গল্পে ও খেলায় ৭৮নং বাড়িতে সান্ধ্যসভা বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছিল। এবং কি একটা অজানা টানে অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল থেকে ও বাড়িতে আমার যাতায়াতটা একটু ঘন ঘনই হয়ে উঠছিল। সে কথাটা আমার খেয়ালই হয় নি যতদিন পর্যন্ত না বিবুনু একদিন একটু হাসি হাসি মুখে মন্তব্য করলেন—'হ্যাঁ মামু, হোস্টেল

ছেড়ে তুমি এখন বাড়িতেই থাক নাকি? বেশ ঘন ঘন যে দেখতে পাই।' এই ঘন ঘন যাতায়াতে তাঁব যে খুব বেশি আপত্তি ছিল তা তার হাসি দেখে মনে হল না। তবে টিপ্পনী দেবার অভ্যাসটা যাঁর স্বভাবজাত এত বড়ো একটা মওকা পেয়ে তিনি কি কবে চুপ করে থাকেন? পরে শুনেছি যে আমার ৭৮ নং-এ যাতায়াতেব বাব প্রাচুর্য আবো একজনের নজরে নাকি পড়েছিল এবং সেটা তাঁর খুব অপ্রীতিকব বলেও মনে হয় নি। যাই হোক, তিনি তখন সে হিসাবটা মনে মনেই নাকি রেখেছিলেন। কথাটা নিছক মিথ্যে বা কাল্পনিক ছিল না। কিন্তু আমি কি করে তখন জানব যে আমার ৭৮ নং-এর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতটাব হিসেব কেউ কেউ রাখছেন।

দিনগুলি যেন হুহু কবে কেটে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে এসে গেল প্রায় পূজার ছুটি। হোস্টেল আবাব ছুটিতে বন্ধ। আমার হোস্টেলে থাকার তাগিদটা আগে যেমন প্রবল ছিল এখন যেন ততটা রইল না। বাড়িতে জানালাম যে ছুটির পব থেকে পবীক্ষা পর্যন্ত বাড়ি থেকে পড়লেই পরীক্ষার জন্যে আমি বেশি ভালো কবে তৈবি হতে পাবব। সুতবাং আমাব যাবতীয় তল্পিতল্পা গুছিয়ে আমি ছুটি হওয়া মাত্র হোস্টেল ছেড়ে ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে চলে এলাম।

৭

দাদাবাবুব পুরুলিয়াব 'বিট্রিট' বাড়িটি তখন খালি ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দেব পূজাব বন্ধে বাবা, মা ও আমাদেব পুরুলিয়াব বাড়িতে রেখে এলেন। সেবাব আমাদের সঙ্গে বিবুনু ও ঝুনুও গিয়েছিলেন। আমি থাকতাম পুব-উত্তর কোনার ছোটো ঘবটাতে। সকালে বিকালে বেশ বেড়ানো হত। তখন পুরুলিয়াতে খাওয়ার জিনিস দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য হয়ে ওঠে নি। মায়েব তত্ত্বাবধানে চার বেলা খাওয়াটা বেশ ভালোই হত। সকালে সন্ধ্যায় পড়তেও বসতাম। সামনেব এপ্রিলেই আই. এ. পরীক্ষা ছিল আমার।

এইরকম সমান চালে যখন দিনগুলি কাটছিল হঠাৎ বিবুনু একদিন কী একটা চিঠি পেয়ে আমাকে বললেন, 'একটা ভালো বাড়ি দেখতে পার? জ্ঞানদামামীমা ও তাঁব মেয়েরা এখানে হাওয়া বদলাতে আসতে পারেন লিখেছেন।' মনে হল যেন তিনি কথাটা বলেই আমারই দিকে

চেয়ে ফিক্ করে একটু হেসে ফেললেন। ইঙ্গিতটা বুঝলেও যেন বুঝি নি এইরকম নির্বিকারভাবে মন্তব্য করলাম—'পুরুলিয়া এখন আর চেঞ্জের জায়গা নেই।' বিনু বললেন, 'আহা, দেখোই-না খোঁজ করে পাও কি না কোনো ভালো বাড়ি।' বিনু যখন এত করে বলছেন একটু খোঁজ করতে একটা বাড়ির তখন কী করা যায়— ভদ্রতার খাতিরে অন্তত খুঁজতেই হবে। সেই শুরু হল আমার পুরুলিয়ার বাড়ি-খোঁজা।

এখন বলতে বাধা নেই যে পুরুলিয়া শহরটাকে একেবারে চষে ফেলেছিলাম খালি বাড়ির খোঁজে। পুজো এসে পড়েছে— বাড়ি কিছু খালি আছে বলে সন্ধানও পাচ্ছিলাম না। একে ধরি, ওকে জিজ্ঞাসা করি— 'কোনো বাড়ি খালি আছে জান?' এই বাড়ির খোঁজে আমার টই টই ঘোরা আর দুপুরে বাড়ি ফেরায় রোজ দেরি দেখে মা তো গেলেন একদিন ভীষণ চটে। বললেন—'ল্যাখন নাই পড়ন নাই, রোদে রানে সারাদিন টই টই। খাওয়ন নাই, বিশ্রাম নাই। কিসের লেইগ্যা? কে আইব কৈলকাতার থনে— তর তাতে কি? তুই কেন মরস্ হাইট্যা? তারা তর কে?' মায়ের সঙ্গে আমার সুখদুঃখের সব কথাই হত কিন্তু তাঁর ঐ শেষ প্রশ্নটার পাকা জবাব দেবার মতো ভরসা আমার তখনো হয় নি। চুপ করে রইলাম অপরাধীর মতো। ঝুনু চাপা গলায় বললেন, 'কেমন হল? যাও বাড়ি খোঁজ গিয়ে!' বিনু দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে একটু হাসলেন এবং বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল।

শেষকালে সন্ধান পাওয়া গেল যে নীলকুঠিডাঙায় কী যেন একটি বাড়ি খালি আছে। মালিকের নাম শোনা গেল ত্রিবেদী মাড়োয়ারী। পুরুলিয়ার পোস্ট-আফিসটা ছাড়িয়ে স্টেশনে যাবার পথে তাঁর দোকান ও তার উপরে তাঁর বাসা। ছুটে গেলাম ত্রিবেদীবাবুর কাছে। শুনে বললেন যে বাড়ি আছে বইকি, তবে এক মাসের ভাড়া ৫০৲ টাকা অগ্রিম দিতে হবে। সে আর কি, কোনো অসুবিধাই নেই বলে তক্ষুনি গেলাম নীলকুঠিডাঙায় বাড়ি দেখতে। গিয়ে দেখি যে সে বাড়িটা বহু পুরানো নীলকুঠি। চারি দিকে অপরিষ্কার নোংরা। সেই বাড়িতে দেখলাম কয়েকজন দরওয়ান-জাতীয় লোক পরিবার নিয়ে থাকে। রাস্তার পরেই ছোটো উঠানটা পেরিয়ে সামনের বারান্দাটাতে কয়েকটা ছাগল ও গোরু শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। বারান্দাটা বোধ হয় গোয়াল বলেই ব্যবহার হচ্ছিল সেই

সময়ে। মাঝের ঘরগুলির উপরে যে উঁচু চাল ছিল সেগুলি একরকম চলনসই বলেই মনে হল অর্থাৎ রোদ-বৃষ্টি আটকাবে। কিন্তু শোবার ঘরের সঙ্গে যে স্নানের ঘর দুটি ছিল তার চাল বেশ জখম হয়ে বড়ো বড়ো ফুটো হয়ে গেছে দেখলাম। বারান্দার ও ঘরের মেঝের উপর নিদেন পক্ষে এক ইঞ্চি পুরু গোবর ও কাদার একটা পলস্তারা পড়ে আছে। ফিরে গেলাম মালিকের কাছে। বললাম বাড়ির অবস্থাটা। তিনি বেশ নির্বিকার ভাবেই বললেন—'ভালো করে চুনকাম করিয়ে দেব'খন। মেঝেগুলো চেঁছে পরিষ্কার করলে কিছু খারাপ দেখাবে না। এবং স্নানের ঘরের ফুটোগুলি একেবারে ঢেকে দেওয়া হবে।' মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে বিরনুকে সব বললাম। তিনি বললেন, 'বাড়িটা ধুয়ে-মুছে একরকম দাঁড়িয়ে যাবে'খন। তুমি একটা টেলিগ্রাম লিখে দাও, আমি এখুনি পাঠিয়ে দেব।' আমার মন সরছিল না। তাই একটা টেলিগ্রামের মুসাবিদা করলাম—'হাউস নট অ্যাভেলেব্‌ল।' বিরনুকে দিলাম। তিনি অম্লান বদনে 'নট' কথাটা কেটে দিয়ে শেষের দিকে সংযোগ করে দিলেন—'মানথলি রেণ্ট ফিফটি' এবং তক্ষুনি পুরুলিয়ার বাড়ির বুড়ো দরওয়ানকে দিয়ে পোস্ট-আফিসে পাঠিয়ে দিলেন। বিষয়টার যা হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার অস্বস্তিটা কেটে গেল। তার পর শুরু হল বাড়ি মেরামতের কাজ এবং নিত্য গিয়ে সে কাজের তদারক করা।

অবশেষে নির্ধারিত দিন এসে পড়ল। কলকাতা রাঁচী মেল তখনকার দিনে পুরুলিয়া হয়েই যেত। গাড়ি আসত বেশ ভোরের দিকে। আমি গেলাম সেই প্রত্যূষে পুরুলিয়া স্টেশনে দুজন চাকর সঙ্গে নিয়ে। ট্রেন যেন আর আসে না। তার পর দূর থেকে আসছে দেখা গেল। ট্রেন থামল। সুধাংশু হাসি মুখ করে নামলেন একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে। ভাবটা এমন দেখালেন যে তিনিই কর্মকর্তা এবং আমি যেন সে কথাটা ভুলে না যাই। যাই হোক সুধাংশুর জ্ঞানদামাসীমা ও তার তিনটি মেয়ে ও ছোটো একটি ছেলে নামলেন— বুবু, এবু, ছোটকোন ও খোকা। এঁদের দিদি প্রতিভা আসেন নি এবং আপুও আসেন নি। ওঁদের এবং ওঁদের সঙ্গের জিনিসপত্র একটা ঠিকে গাড়িতে তুলে সুধাংশু রওনা হলেন সেই নীলকুঠি বাড়ির দিকে আমার হাতে লগেজের রসিদটা গুঁজে দিয়ে। মুখে

বললেন, 'লগেজের মাল খালাস করে পরে অন্য ঠিকে গাড়িতে নিয়ে সে বাড়ি পৌছে দিস।' আমি তো হকচকিয়ে গেলাম সুধাংশুর মুরুব্বিয়ানা কথা শুনে। কী করা যায়।

পূজাব ভিড়। লগেজেব মাল খালাস করতে কিছুটা দেরি হল। তার পর সেই জিনিসপত্র নিয়ে অন্য একটা ঠিকে গাড়ি কবে আমি চললাম নীলকুঠি বাড়িতে। গিয়ে দেখি ভোঁ ভাঁ। সেখানে জনমানব নেই। কেবল আমাদেব চাকবটি বাবান্দায় ওঠবাব সিঁড়িতে বসে আছে। ইশারায় জিজ্ঞেস কবলাম, কী হল? সে বললে যে—'মা গাড়ি থেকে নেম্যে বাডিটা দেখ্যে চৈল্যে গেলেন।' প্রমাদ গণলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা কোথাকে গেলেন?' সে বললে, 'আমাদিগেবই বাড়ি বটে।' বোঝাই মাল গাডি নিয়ে চললাম বিট্রিটেব দিকে শশব্যস্ত হয়ে।

বিট্রিটেব গেটেব কাছেই সুধাংশু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখে এক গাল হাসি ঠিকরে পড়ছে। জিজ্ঞাসা কবলাম, 'কী হল বে?' সুধাংশু হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে পিছনেব দিকে হাওয়ায় খোঁচা দিয়ে বললেন, 'ভেতবে গিয়ে নিজের কানেই শুনে নাও।' ভেতবে ঢুকে বাডিব সামনেব গোল চত্বরটা ঘুবে গাড়ি দাঁড়াতেই সুধাংশুদেব জ্ঞানদামাসীমা একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে উঠলেন—'আচ্ছা সুধী, ও বাড়িটা কি বলে ঠিক কবেছিলে?' আমি বললাম, 'আমি তো না-ই বলেছিলাম কিন্তু বিবুনুই ওটা ঠিক করতে বললেন।' তিনি বললেন, 'বিবুনু না হয় ছেলেমানুষ, তুমি কি বলে ওর কথায় বাজি হলে; ও বাড়িতে কি মানুষ থাকতে পাবে?' দূরে বিবুনুর বিডাল-তপস্বীব মতো মুখখানা দেখে মনে হল যে তিনি এই পবিহাসময় পরিস্থিতিটা ভেতবে ভেতবে বেশ উপভোগই কবছিলেন। ওঁদের মাসীমা বললেন— আজকেই যদি বাসযোগ্য বাডি না পাওয়া যায় তবে আমি রাত্রেব মেলেই ফেবত যাব।

পুরুলিয়ায় খালি ভাড়াটে বাড়িব যে প্রাচুর্য নেই তা তো আগে হাতে হাতেই জেনে গিয়েছিলাম। সুতরাং ওঁরা ফিরেই যাবেন এটাই ধরে নিলাম। কিন্তু সুধাংশুব বিপদকালে বুদ্ধি যোগায়। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'স্টেশনে অ্যাম্বুলাব সাহেবকে দেখলাম। তাঁর বাড়িটা খালি থাকলে পাওয়া যেতে পারে।' সুধাংশুব জ্ঞানদামাসীমার নির্দেশে সুধাংশু ছুটল সাইকেল করে স্টেশনের দিকে। রাঁচীর ছোটো

ট্রেনটার ছাড়তে তখন বেশ দেরি হত, যাত্রীরা যাতে করে পুরুলিয়াতে প্রাতরাশ সেরে নিতে পারে। যাত্রীরা কেউ যেত রিফ্রেসমেণ্ট রুমে, কেউ-বা ঠোঙায় খাবাব কিনে ছোটো গাড়িটাব জায়গা দখল করে বসে বসে খেত। ববাত জোবে সুধাংশু অ্যাম্বুলাব সাহেবকে পেল রিফ্রেসমেণ্ট রুমে। তিনি মওকা বুঝে এক মাসেব জন্যে আড়াইশো টাকায় তাঁর বাড়িটা ভাড়া দিতে বাজি হয়ে তাঁব বাড়িব মালির কাছে কাকে দিয়ে খবর দিলেন। সুধাংশু বিজয়গর্বে ফিবে এসে সুসংবাদটা জানালেন। তক্ষুনি অ্যাম্বুলার্স বাংলোটা ওঁদেব জ্ঞানদামাসীমা ভাড়া কবলেন আড়াইশো টাকায়। অর্থাৎ গোড়াপত্তনেই তিনশো টাকা গচ্ছা। নীলকুঠিব আগাম দেওয়া পঞ্চাশ টাকা এবং এই বাড়িব দুশো পঞ্চাশ। সেদিন ওঁবা আমাদের বাড়িতে নাওয়া-খাওয়া সেবে বিকেলেব দিকে গেলেন অ্যাম্বুলার্স বাংলোয়। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম বাড়িব একটা সুবাহা হল দেখে।

তাব পব এ-বাড়িব লোকেদেব ও-বাড়ি এবং ও-বাড়িব লোকেদেব এ-বাড়ি যাতায়াত শুরু হল। তা ছাড়া বিকেলে একসঙ্গে বেড়ানোটাও বেওয়াজ হয়ে উঠল। আমি সকালে একটা সাইকেল কবে ঐ অ্যাম্বুলার্স বাংলোব আনাচে-কানাচে একটু বেড়িয়ে এসেই সকালেব খাবাব খেয়ে পড়তে বসতাম মাথা গুঁজে এবং আইন না পড়ে মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আওয়াজ কবেই পড়তে আরম্ভ কবলাম। আবাব বাত্রেও সেইবকম কবে পড়া চলত। মা তখন একটু প্রসন্ন হলেন। বিব্নু মায়েব মন-মেজাজ বুঝে একদিন মাকে বললেন, 'ছোড়দিদিমা, ও-বাড়িব মেয়েদেব একদিন এখানে ডেকে খাওয়ালে হয় না?' মা বললেন, 'হ্, বলতেই হয়।' আব কথাবার্তা বা আলোচনা নয়। বিবনু স্বয়ং গিয়ে মেয়েদেব নিমন্ত্রণটা তাঁব জ্ঞানদা-মাসীমাব কাছে পেশ কবে এলেন। ঠিক হল একদিন মেয়েবা আমাদেব বাড়ি বিকেলে এসে বাত্রে খেয়ে এইখানেই থাকবেন এবং তাব পব দিন খেয়েদেয়ে বিকেলে ফিবে যাবেন।

মেয়েবা এলেন তেইশে অক্টোবব বিকেলে। বিট্রিটে সেদিন হৈ হৈ কাণ্ড। কতরকম খেলা, দৌড়াদৌড়ি চলল বাড়ির পুব দিকে যে বাঁধানো টেনিস কোর্টটা ছিল তাব উপরে ও আশেপাশে। ফলভবা পেয়াবা গাছ থেকে টেনে ছিঁড়ে কটা পেয়ারাও খাওয়া হয়েছিল। খেলাটা চলেছিল সন্ধে পর্যন্ত। খেলা যখন ভাঙল তখন মাথাব উপবে শুক্লপক্ষের খণ্ড চাঁদেব জ্যোৎস্নায়

একটি অপূর্ব স্বপ্নবাজ্য গড়ে উঠেছিল।

আমবা বাগান থেকে ঘবে গেলাম। বসবাব ঘবে বসে বেশ গানটানও হল। ঝুনুব সে কি গলা। গানটান শেষ হলে ভুবিভোজন করে আমরা গেলাম বাড়িব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে খোলা বারান্দাটা ছিল সেখানে। শুক্লপক্ষেব খণ্ড চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছিল এবং অমলধবল জ্যোৎস্নাধাবায় সাবা বাবান্দা ও বাগানটি একেবারে ঝল-ঝল কবছিল। খোলা বাবান্দায় মাদুব পেতে আমবা সবাই বসলাম। আবাব ঝুনুব গান শুরু হল। 'নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে কে জাগে' থেকে শুরু কবে বেহাগ সুবে কত গানই না সেদিন ঝুনু কবেছিলেন অপূর্ব দবদ দিয়ে। আমাদেব সভা যখন বেশ জমে উঠেছিল তখন হঠাৎ বিবৃনু বললেন— 'আচ্ছা মামু। তুমি তো শান্তিনিকেতনেব ছাত্র ছিলে। শুনেছি ববীন্দ্রনাথেব কবিতা তুমি বেশ ভালো পড। তা আমাদেব একটা পড়ে শোনাও-না।' প্রথমে সামান্য একটু আপত্তি জানিয়ে শেষ পর্যন্ত বাজি হতেই হল। বিবৃনুকে বললাম—'কাব্যগ্রন্থটি এনে দাও, তবে তো পড়ব।' বিবৃনু নিঃশব্দে বাবান্দা থেকে ড্রইং রুমে গিয়ে ববীন্দ্রনাথেব 'সোনাব তবী' বইখানা এনে আমাব দিকে এগিয়ে ধবলেন। শুধালাম—'কোন্‌টা পড়তে বলছ?' বিবৃনু বিনা বাক্যব্যয়ে বইখানা খুলে 'মানসসুন্দবী' কবিতাটি বেব কবে আমাব হাতে দিয়ে, মনে হল যেন, একটু মিচ্‌কী হাসলেন। সুধাংশুও নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'ন্যাকামি ছেড়ে পড়েই ফেল্‌-না।' বলেই তিনি একটা তাকিয়ায় বেশ আবাম কবে ঠেস দিয়ে কাত হয়ে পড়লেন। বুবুব দিকে চাইতেই তিনি চোখ ফিবিয়ে নিয়ে শবৎকালেব মাধুবী দেখতে লাগলেন আকাশেব দিকে চেয়ে। গলা একটু খেকুব দিয়ে পড়তে শুরু কবলেম—

আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ গ্রন্থ গীত, এসো তুমি প্রিয়ে,
আজন্মসাধনধন সুন্দবী আমাব
কবিতা, কল্পনালতা। শুধু একবাব
কাছে বোসো।···

এব পব লাইন-বাবো পড়া হলে যেই-না পড়লাম—

বীণা ফেলে দিয়ে এসো মানসসুন্দবী—

শুধু দুটি বিক্ত হস্ত আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—

সুধাংশু তক্ষুনি দীর্ঘ হাই তুলে বললেন—'তোমার মানসসুন্দরী তাঁর দুই বাহু দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছেন সে দৃশ্য দেখবার আমার কিছুমাত্র বাসনা নেই। আমি চললাম শুতে।' বলেই তিনি বালিশটা নিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

দল ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় কাব্য আর জমল না। ঝুনু, বিবৃনু, বুবু, ছোটকোন একে একে উঠে পড়লেন। আমিও শোবার ঘরে গেলাম। দেখলাম সুধাংশুটা বেশ আরামে শুয়ে রয়েছেন। বললেন, 'আসা হল? বাপ রে। কী কাব্যই না শোনালি, এখন বাতিটা নেবা।' আমিও জামাটা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল 'মানসসুন্দরী' কবিতাটার অপূর্ব মূর্ছনা। সে রাত্রে মানসসুন্দরীর যে সব অংশ অপঠিতই রয়ে গেল তা পরে বুবুকে ঐরকম এক চাঁদনী রাতে পড়িয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলাম। তবে সেটা কিছু পরের কথা এবং সেদিন বুবু চোখ ফিরিয়ে নেন নি।

পরদিন অতি প্রত্যুষে কেমন যেন শীত-শীত করে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি চাঁদ অস্ত গেছে। রাতের অন্ধকারটা একটু যেন ফিকে হয়ে উঠছে। আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল না। জুট ফ্ল্যানেলের শার্টটা পরে সুধাংশুকে ডাকলাম, 'ওরে, ভোর হয়েছে, বেড়াতে যাবি?' বিরক্তি স্বরে—'মাথা খারাপ? জ্বালাস্ নে' বলে তিনি পাশ ফিরে আরাম করে কোলবালিশটা টেনে নিলেন। আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ির চারি দিকেই কাঁকর-বিছানো রাস্তা। প্রত্যেক রাস্তার দুইধারে এক লাইন করে ফুলের গাছ এবং বেশ কাছাকাছি ছিল অনেক ফলের গাছ। বড়ো এবং ছোটো ঘাসের উপর পা ফেলে মনে হল শিশির পড়েছে। কাঁকরের রাস্তায়ই পায়চারি করতে লাগলাম। এমন সময় দেখি বিবৃনু এবং বুবু বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই বিবৃনু বললেন, 'একি মামু, তুমি তো আজকে খুব ভোরে উঠেছ?' আমি বললাম, 'ভোরে ওঠাটা আমার শান্তিনিকেতনেরই অভ্যেস।' বিবৃনু হেসে বললেন, 'শান্তিনিকেতনের কাব্যভাব এখনো তোমার যায় নি বুঝি?' আমি উত্তর দিলাম, 'গেল আর কই।' পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা এত ভোরে উঠেছ যে?' বিবৃনুর চোখে তখন সেই দুষ্টু হাসি। মুখে বললেন, 'দেখলাম তুমি একলাটি

বেড়াচ্ছ, তাই সঙ্গ দিতে এলাম— এই আর কি।' আমি খালি বললাম, 'ও, তাই নাকি?' আমবা তিনজনে বেশ একটু বেড়ালাম ওই পুব-পশ্চিম টানা কাঁকবেব রাস্তাটাব উপরে। একটু পরে বিবৃন্নু বলে উঠলেন, 'আমার বাবা একটু শীত-শীত কবছে। একটা গায়েব ব্যাপার-ট্যাপার নিয়ে আসি গে।' বলেই তিনি চললেন বাড়ির ভিতরে।

বিবৃন্নুব ফিবতে দেবি দেখে বুবু এবং আমি ঐ বাস্তায় পায়চাবি করতে লাগলাম। পাশেব দিকে চেয়ে দেখলাম বুবু একটা মেরুন বঙেব জামার উপব একটা চাঁপা বঙেব গরম আলোয়ান ভাঁজ কবে পিঠেব উপব ফেলে বেখেছেন। দু-তিন পাক সেই একই বাস্তায় হাঁটাহাঁটি কবলাম আমরা দুজনে। কথা বেশি কিছু যে হয়েছিল তাও নয়। সেই নিস্তব্ধ প্রভাতে কথা বলাব চেয়ে একসঙ্গে নীববে হেঁটে বেড়ানোতেই ছিল বোধ হয় বেশি আনন্দ। বিসর্জন নাটকেব জয়সিংহেব উক্তি 'মন হতে মনে যাক কথা' একটা নিছক কবি-কল্পনাপ্রসূত অতিশয়োক্তি যে নয় তা নিশ্চয় কবে অনুভব কবেছিলাম সেই শবতকালেব প্রভাতে।

তাব পব সেই বাস্তা ধবে বাড়িব পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত গিয়ে ফেব ঘুবে যেই পুবমুখো হয়ে কয়েক পা এগিয়েছি তখন দেখলাম পাশেব স্নভল সাহেবেব বাড়িব ওপাব দিয়ে একটি আসন্ন সূর্যোদয়েব সোনালী আভা ফুটে উঠেছে পুব আকাশ বাঙিয়ে দিয়ে। অপূর্ব শোভন হয়ে দেখা দিয়েছিল আমার জীবনে সেই প্রভাতেব সূর্যোদয়টি। আমবা দুজনেই যেন চমকে উঠে একই সঙ্গে মুখ তুলে দেখলাম পূর্বতোবণেব ওপাব হতে একটি নির্মল প্রভাত নেমে আসছে ধীবে ধীবে রাত্রিব অন্ধকাবকে মুছে দিয়ে। সেই নবীন অরুণবাগেব আভা এসে ঠেকল আমাদেব উভয়েব মাথায় কপালে ও মুখে। কি যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে আমাদের দুজনেবই মাথা নত হয়ে গেল। স্বপ্নাবিষ্টেব মতো আমবা দুজনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বইলাম নীববে, নতমস্তকে। জগদীশ্ববেব শুভাশীর্বাদ যেন বর্ষিত হল আমাদেব সেই নতমস্তকে।

কিছু পবে আমবা দুজনে ফিবে গেলাম বাড়িব ভিতবে। বাড়িব ভিতরে তখন জীবন-চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। প্রায় সবাই উঠে পড়েছেন। সকালেব জলখাবাব খেয়ে আমি চলে গেলাম আমাব ঘবে। পড়াব টেবিলে গিয়ে বসে লজিকেব বই খুলে পড়তে শুরু কবলাম সুর কবে টেনে টেনে, 'বারবাবা, সিলাবেণ্ট, ডেবিয়াই, ফেরিও।' কিন্তু আমাব সমস্ত লজিক এলোমেলো

করে শরতকালের সেই প্রথমঅরুণকিরণবাগে অনুরঞ্জিত আমার চিত্তাকাশের নীরবতাকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা প্রভাতী সুর গুন গুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার পর থেকে আজকে ছাপ্পান্ন বছর ধরে প্রতি বছর সেই চব্বিশে অক্টোবর বহন করে নিয়ে এসেছে সেই উনিশ শো বারো সালের চব্বিশে অক্টোবরের সূর্যোদয়ের সোনালী আভা আর সেই করুণ প্রভাতী সুরটি—

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহনার ধারে।

৮

ছুটির বাকি দিনগুলি কোথা দিয়ে যে কেটে গেল জানতেই পারা গেল না। মাস গত হলেই সুধাংশুদের জ্ঞানদামাসীমা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। তার কিছুদিন পরে আমরাও চলে এলাম কলকাতায়। আমি আর অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে ফিরে গেলাম না। ১৪নং মল্লিক লেনের বাহির বাড়ির সামনের পড়া-ঘরটায় বসে আবার শুরু হল রুটিন ধরে পড়া। সুধাংশুরা বোধ হয় এর পরই ৮০।৫ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে উঠে গেছেন। সেখানে ওঁদের কাছে মধ্যে মধ্যে যেতাম এবং সেখানে ৭৮নং-এর লোকেদের সঙ্গে কচিৎ কদাচিৎ দেখা হত। কিন্তু সুধাংশুরা ৭৮নং-এ না থাকার দরুণ আমি সে-সময় সে বাড়িতে যেতাম না। পরীক্ষা এসে গেল। ফিস দাখিল হল। পরীক্ষাও দিলাম। ভালো মনে হল না। কাতরাতে কাতরাতে পাস করে যাব বোধ হয়— বেশি কিছু হবে না।

পরীক্ষার পর হাতে কোনো কাজ না থাকায় প্রায়ই যেতাম বৌঠানের কাছে। কানাঘুষো শুনতে পেলাম যে ঝুনু, বিবুনু ও মোনা, বেবিরা মিলে ঠিক করেছেন যে তাঁরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাটি মঞ্চস্থ করবেন। মহড়াও নাকি তাঁদের আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। তবে খবর শুনলাম যে ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের মজুমদার-বাড়ির মেজো মেয়ে বুবুও কি একটা অংশ গ্রহণ করবেন। কথাটা শোনা মাত্র পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা এই ত্রয়ীর মিটিং বসল। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে আমরা ছেলেরাও একটা নাটক মঞ্চস্থ করব। কি নাটক করা যায়? আমি বললাম রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' বইখানা বেশ ছোটো এবং তাতে চরিত্রসংখ্যাও কম;

সুতরাং ঐ বইটাই ধরা যাক। তা ছাড়া আমি শান্তিনিকেতনে থাকতে গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে ওই নাটিকাটি সেখানে অভিনীত হয়েছিল। অতএব মহড়ার সময় আমি বেশ শিখিয়ে দিতে পারব। পাড়ার দুটি ছিপছিপে ছেলেকে করা হল মালিনী ও মহিষী। সুধাংশুর বন্ধু রজনী যাঁকে বলা হত নেড়াপণ্ডিত তিনি হলেন কাশ্যপ। আমি নিলাম সুপ্রিয়ের অংশ, আর নাটোর মহারাজার ম্যানেজার রজনী ভট্টাচার্য মশায়ের ছেলে রেবতী ওরফে রেবা সেজেছিলেন ক্ষেমঙ্কর। ভোম্বলকে দেওয়া হল সেনাপতির পার্ট। বেশ উৎসাহে মহড়া শুরু হল। যাঁরা যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে তাঁরা যেন বেশ স্বাভাবিকভাবে স্টেজের উপর চলে-ফিরে বেড়ান এবং আড়ষ্ট হয়ে না থাকেন। ঠিক হল যে আমাদের অভিনয় হবে প্রথম এবং তার পরদিন হবে মেয়েদের নাটক। আর বন্দোবস্ত হল যে দাদাবাবু ও বৌঠান দুটো নাটকই দেখবেন এবং যেটা তাঁদের ভালো লাগবে সে দলকে একটা কিছু উপহার দেবেন। সুধাংশু তখন বাঁকুড়া Wesleyan College-এ পড়তেন। তিনি চলে এলেন অভিনয় দেখতে কলকাতায়।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিন সমাগত। একতলার বড়ো খাবার ঘরে স্টেজ করা হল। দাড়ি গোঁফ, পরচুলা ও অন্যান্য সাজপোশাক এল। হাতে মুখে ঘষে ঘষে সাদা রঙের পলস্তারা দেবার লোকও ডাকা হল। ভোম্বলকে একটা জমকালো ভেলভেটের প্যান্টালুন ও কোমরে বেল্ট দেওয়া একটা কোট পরিয়ে ও তলোয়ার ঝুলিয়ে একটা জাঁদরেল সেনাপতি সাজিয়ে দেওয়া হল। সাজটা একটু আঁটই হয়েছিল আর এক সাইজ বড়ো হলেই হয়তো আরাম পেতেন। যাই হোক, সব যখন তৈরি তখন দাদাবাবু, বৌঠান, বাবা, মা, দিদিরা যাঁরা তখন উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মচারী ও চাকর-বাকর এবং আমাদের ও মেয়েদের জনকয়েক বন্ধু সবাই এসে বসলেন। ফুটলাইট জ্বলে উঠতে ড্রপসিনটা সরে গেল এবং 'মালিনী'র প্রথম দৃশ্য আরম্ভ হল।

কাশ্যপ বাঁ হাতে কমণ্ডলু ধরে ডান হাতখানা তুলে মালিনীকে বরাভয় দিয়ে— 'ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা' বলতে বলতে এক পা এগিয়েই হঠাৎ চলা থামিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ডান হাতে দাড়ি দিয়ে ঢাকা চিবুকটা ধরে পাঠটা বলতে লাগলেন। কী হল? দাড়িটা ধরে আছে কেন? এত করে বলা হল যে স্বাভাবিকভাবে চলবি ফিরবি,

তবুও দাঁড়িয়ে রইল কেন? কি করা যায়। কাশ্যপ তার পাঠ শেষ করলেন 'আমি তবে চলিলাম তীর্থ-পর্যটনে।' ব'লে, এবং মালিনী বললেন—'লহো দাসীর প্রণাম' তার পর কাশ্যপ এমন দ্রুতবেগে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেলেন যে মনে হল যেন তাঁর তীর্থের রেলগাড়ি ফেল হয়-হয়। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম রজনীকে যে ব্যাপারটা কি? রজনী বললেন যে এক পা এগুতেই তাঁর নজরে পড়ল যে তাঁর পাদুটোতে কোনো রঙই দেওয়া হয় নি। সাদা হাত মুখ আর কালো পা দেখে আতঙ্কে তাঁর ডান হাতটা আপনা হতেই চলে গেল থুতনিতে এবং যেই-না সেখানে হাত দেওয়া অমনি দাড়ির স্প্রীংটা এমন টেনে ধরল যে হাত দিয়ে টিপে না ধরে কোনো উপায় তাঁর ছিল না।

ইতিমধ্যে নাটক চলেইছে। প্রথম দৃশ্যের শেষভাগে সেনাপতি সগৌরবে প্রবেশ করেই তলোয়ারটা ঈষৎ খুলে তক্ষুনি খট্ করে বন্ধ করে রাজাকে যখন অভিবাদন করে—

"মহারাজ, বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ ব্রাহ্মণবচনে।..." খবর দিলেন সেনাপতি। তৎক্ষণাৎ দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বাকি পাঠটুকু শেষ করলেন—

"... তারা চায় নির্বাসন রাজকুমারীর।"

তার পর রাজা যেই তাঁকে আজ্ঞা দিলেন যে সামন্তদের নিয়ে এসো তখন যবনিকা পতন হয়ে প্রথম দৃশ্য শেষ হল। কাণ্ডটা কি? গিয়ে শুনি তলোয়ারটা খুলতে যেতেই সেনাপতির প্যান্টালুনের কোমরের দুটি বোতামই ছিঁড়ে গেল এবং সেই পরিস্থিতিতে দর্শকদের দিকে পেছন করা ছাড়া বেচারী সেনাপতির গত্যন্তর ছিল না। একই দৃশ্যে দুটো দুর্ঘটনা হওয়ায় আমরা যেন অনেকটা দমে গেলাম। তার উপর মেয়েদের খিল্ খিল্ হাসিতে আমরা আরো যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম। যাই হোক, অভিনয়ে আর কোনো অঘটন ঘটে নি। সুপ্রিয়, ক্ষেমঙ্কর এবং মালিনীর পাঠটা চলনসই হয়ে নাটকটা একরকম উৎরে গেল। দর্শকরা বললেন— 'বেশ, বেশ।'

পরদিন সন্ধ্যায় হল মেয়েদের পালা। দর্শকের মধ্যে আমরা ছেলেরা খুব সামনেই বসলাম এবং মেয়েদের অভিনয়ে সামান্য একটু খুঁত হলেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে মেয়েদের একেবারে ডাউন করে দিতে হবে এই হল আমাদের সংকল্প। অভিনয় আরম্ভ হল। একটু উঁচু করে শাড়ি পরে,

আঁচলটা কোমবে জড়িয়ে, চুলটা খুব জোরে পেছনে টেনে ঢিপিখোঁপা বেঁধে, মুড়ো খ্যাংরাটা ডান হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কোমবে বাঁহাত রেখে উপুড় হয়ে বুবু সাবা স্টেজটা ঝাঁট দিতে লাগলেন। সে ঝাঁটের কি বহব! তাব পব নেপথ্যে বানী কল্যাণী যখন 'ক্ষীবি, ক্ষীবি, ক্ষীবো' বলে ডাকলেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমবেব আড ভেঙে 'কেন ডাকাডাকি, নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি' বলে ক্ষীবো যখন ঝঙ্কাব দিয়ে উঠলেন তখন দর্শকেব দল খুব খুশি হয়ে উঠলেন এবং আমাদের ছেলেদেব হাসি যেন নির্বাপিতপ্রায় হয়েই এল। যতদূব মনে আছে বানী কল্যাণীব অংশটা নিয়েছিলেন আমাদের মোনা। সর্বাঙ্গে গহনা ও মাথায় মুকুট চড়িয়ে মোনাকে সত্যিই খুব রানী-বানীই দেখাচ্ছিল। আব অপূর্ব সাজ ও অভিনয়ভঙ্গি হয়েছিল মালতীব অংশে আমাদেব ঝুনুব। একেবাবে মোগলাই পোশাকে ও চালে, হাতে বঙিন রুমাল ঝুলিয়ে মালতী যখন বিনি বিনি কাশীদের কায়দা-দোবস্ত চাল-চলন শেখালেন এবং অভাগিনী প্রতিবেশিনীটিকে কুর্নিস কবাতে কবাতে স্টেজেব বাইবে নিযে গেলেন তখন কবতালিব ঠেলায় আমবা একেবাবে জর্জবিত হয়ে উঠলাম। অভিনয়শেষে দর্শকেবা যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ কবতে লাগলেন তা শুনে কাদেব অভিনয় ভালো হয়েছে সে প্রশ্ন কবতে আমবা সাহসই পেলাম না। বাবা মাথা নেড়ে 'খাইছে বে, পোলাটাবে খাইছে' বলে বুবুব হাতে পড়ে আমাব ভবিষ্যত কি হবে তা ভেবে— উদ্‌বেগ প্রকাশ কবায় বেশ বোঝা গেল যে বুবুর অভিনয়কৌশল বাবাব ভালোই লেগেছিল।

৯

এই সময়টায় ৭৪নং ল্যান্সডাউন বোডেব মজুমদাব-পবিবাবের এবং ১৪নং মল্লিক লেনেব আমাদেব পবিবাবের আর্থিক সঙ্গতিব পার্থক্যটা আমার মনকে খুবই পীড়া দিত। কেবলি ভাবতাম যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবাব বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? মনে পড়ে যেত কলেজে কালী পণ্ডিতমশায়েব কাছে পড়া বঘুবংশেব দুটি ছত্র—

মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম,
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুবিব বামন।

মনে কেবলি ঘুবে ফিবে এই সংকল্প আসত যে আমাকে নিজেব পায়ে নিজেকে

দাঁড় করাতেই হবে এবং সেটা যত শীগগির কবা সম্ভব তাই করতে হবে। গল্পের বইয়ে পডেছিলাম এবং চেনা দু-একজনেব কাছ থেকে শুনেওছিলাম যে আমেরিকায় নাকি পড়ুয়া ছেলেবা অনেকে গ্রীষ্মেব ছুটিতে চাকরি করে টাকা জমিয়ে তাব পর শীতকালে পডাশুনা কবে এবং জমানো টাকা দিয়েই তাদের পড়ার ও যাবতীয় খরচ চলে যায়। এক-একবাব মনে হত আমেবিকা যেতে পারলেই আমাব সব সমস্যা মিটে যায় এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের এ ছাডা অন্য কোনো সহজ পন্থাব হদিশ তখন পেলাম না। কিন্তু আমেরিকা গিয়ে কী পড়ব? সেখানে তো ব্যাবিস্টারী পডা চলবে না? তা ব্যাবিস্টাব হয়ে দাদাবাবু কি এস. পি. সিনহা না হয় নাই হলাম। আরো তো কিছু হওয়া যায়? কেন? এই ধব না, খুশিদিদির স্বামী দ্বাবিকবাবু (ডাঃ ডি. এন. বায়) তো আমেবিকা থেকে ডাক্তাবি পাস করে এসে কলকাতায় ইউনান সাহেব, প্রতাপ মজুমদাবদেব সঙ্গে টক্কব দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বোজগাব কবছেন এবং পবিবাবে এবং সমাজে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছেন। আমাব কেন হবে না? হ্যাঁ, আমেবিকা গিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি পাস কবে ফিবে এলেই তো হয়। একটু প্র্যাকটিস জমাতে পারলেই তো খাতিব হবে সমাজে। কিন্তু আমেবিকা যাই কি করে? অন্তত যাবাব খবচাটা আসে কোত্থেকে?

পবীক্ষাব পবে অলস দিনগুলিতে যখন আপন মনে এইরকম জল্পনা-কল্পনা করছি তখন একদিন সুধাংশু এসে সুসমাচাবটা দিলেন যে তাঁব বন্ধু চারু যাচ্ছেন আমেবিকায় কি পডতে। চারু ছিলেন জেলেপাডার গিরিশ মুখুজ্যে বোড-নিবাসী আলিপুরেব নামকবা উকিল ও নদিদির স্বামী শবৎ-বাবুব বন্ধু গোবর্ধন বোস মহাশয়ের কিরকম ভ্রাতুষ্পুত্র। বেশ ফরসা, বলিষ্ঠ চেহাবা ছিল চারুর। খুবই ভদ্রঘবেব সন্তান। তাঁব সঙ্গে দেখা হলে তিনি কি করতে, কবে, কোথায় যাবেন সব খবব পেলাম। চারুব একটি আত্মীয় ও জমিদাব-বন্ধু ভবানীপুবেব নবেশ বসুমশায় তাঁর যাবার ও আনুষঙ্গিক কাপড-চোপড়ের খরচা দিতে বাজি ছিলেন। তবে সেখানে গিয়ে চারুকে গতর খাটিয়ে আমেরিকাব ছেলেদেব মতো টাকা বোজগাব করতে হবে। বোঝা গেল যে চারু তাঁর বিধবা মাকে না জানিয়ে পালিয়ে আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু একা একা সেখানে যেতে মনে তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। তাঁরও মন যখন এইরকম দোটানায় ঠিক সেই সময়েই

আমার সঙ্গে তাঁর দেখা ও কথাবার্তা হল।

আমারও আমেরিকা যাবার ইচ্ছে কিন্তু রাহাখরচা নেই। গিয়ে পড়লে খেটে খেতে পারব। তা ছাড়া দাদাবাবু নিশ্চয়ই সেখানকার খরচাটা দেবেন। ছোটো বয়েস থেকেই শুনতাম যে আমি বড়ো হলে দাদাবাবু আমাকে বিলেত পাঠাবেন। সুতরাং সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে তখন আমার খরচের জন্যে পরোয়া নেই। আর নিদেন পক্ষে গতর খাটানো তো রয়েইছে। মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে চারুর পাথেয় আছে কিন্তু সেখানকার খরচা নেই এবং আমার রাহাখরচা নেই কিন্তু গিয়ে পৌঁছলে কিছু সংস্থান হবার বেশ আশা আছে। এবংবিধ অবস্থায় একটা রফা খুবই স্বাভাবিক এবং হয়েও গেল। কথা হল চারু তাঁর জমিদার-বন্ধুকে ধরে আমার জাহাজ ভাড়াটাও যোগাড় করবেন এবং দুজনে ওখানে পৌঁছবার পর দাদাবাবুর কাছ থেকে আমি যা পাব তাতেই দুজনের খরচা চালাতে হবে। ঘাটতি যা পড়বে তা দুজনে একসঙ্গে চাকরি করে পূরণ করে নিতে হবে। চারুর বন্ধুও রাজি হলেন। একেবারে যাকে বলে একটা জেনট্যালমেন্স চুক্তি হয়ে গেল চারুতে আর আমাতে।

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে মনে হল বাবাকে সবটা না বললেও আমি যে আমেরিকা যাব সেটা অন্তত জানানো উচিত। একদিন খুব নির্লিপ্তস্বরে বাবাকে বললাম, ‘বাবা, আমি ভাবছি আমেরিকা যাব।’ কথাটার মধ্যে যে কিছু সত্য থাকতে পারে তা বাবার ধারণাই হল না। তিনি কি কাজ করছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, ‘বেশ, যাও।’ কথাটা ওইখানে শেষ হয়ে গেল। আমার তো বাবাকে বলা হল। মনটা হাল্কা হল।

তার পর তোড়জোড় শুরু হল। ভোলাদাদার অনেক পুরানো কিন্তু বেশ ভালো গরম স্যুট বাবাকে দিয়েছিলেন। সেগুলি আলমারিতে ছিল জানতাম। চৌরঙ্গি ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে সেকালে একটা সস্তা ইংরেজ দর্জির দোকান ছিল, তার নাম ছিল ‘সেপার্ড অ্যাণ্ড হপেন’। সেই দোকানে গোটা দুই-তিন স্যুট বদলে আমার গায়ের মাপে করে নিয়ে বাবারই আলমারির উপর থেকে বড়ো গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটাকে নামিয়ে তার মধ্যে সযত্নে ভরে আবার সেটা আলমারির মাথায় তুলে রাখলাম। কিছু মোজা গেঞ্জি আর শার্টও কিনেছিলাম। এবং এখনো মনে আছে একটা ড্রেসিং গাউনও শখ করে সস্তায় করিয়েছিলাম ঐ দোকান থেকে। বাবার

আলমারির মাথায় ব্যাগটা যেমন ছিল তেমনি রইল। কারো চোখেও পড়ল না যে আমি সেটাকে রাত্রে মাঝে মাঝে নামিয়ে তার মধ্যে আমার বিদেশ যাবার কাপড় ভরে রাখছি।

যখন এ ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক হল তখন একদিন চারুতে আমাতে গেলাম আগেকার বড়োলাটের বাড়ির পুব গা দিয়ে যে বড়ো রাস্তাটা চলে গেছে ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে সেই রাস্তাটার উপরে বড়োলাট সাহেবের বাড়ি ছাড়িয়ে একটু উত্তরে গিয়ে ডান হাতে বিখ্যাত 'টমাস কুক কোম্পানি'র আফিসে। আমরা আগেই ওদের কাছ থেকে কাগজপত্র আনিয়ে জেনে-ছিলাম যে ওরিয়েন্ট লাইনের ইমিগ্রেশন ক্লাসে এক-এক কেবিনে দশ-বারো জনের সঙ্গে গেলে সব চেয়ে সস্তায় হয়। কলম্বো থেকে লিভারপুল পর্যন্ত মাথাপিছু ভাড়া ছিল খালি একশো পঁচিশ টাকা। এখন ভাবতেও অবাক লাগে। তার পর লিভারপুল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে। তারা বেশ খাতিরই করল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট কোথায়?' সে আবার কি? লোকটি বললে যে ইমিগ্রেশন ক্লাসে যেতে অনেক নটখটি আছে। এই ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট তার মধ্যে একটা। যেন আছে কিন্তু আনতে ভুলে গেছি, এইরকম ভাব দেখিয়ে 'আচ্ছা, ওটা নিয়ে পরে আবার আসব'খন, নমস্কার' বলে বের হয়ে এলাম সেই প্রকাণ্ড আফিসটা থেকে। কী করা যায় এখন? গেলাম একজন চেনা ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন, 'কবে তোমার শেষ টীকে হয়েছে?' আমি বললাম যে প্রত্যেক বছরই নিয়ে থাকি। তিনি আমার হাতের আস্তিনটা খুলে সারা হাতটা দেখে নিলেন। বললেন তোমাকে সার্টিফিকেট দিতে পারব। তার পর চারুকে শুধালেন, 'তোমার কবে শেষ টীকে হয়েছে?' চারু হাতটা দেখিয়ে বললেন যে তাঁর জীবনে কখনো টীকেই হয় নি। ডাক্তারটি ঈষৎ হেসে বললেন, 'একটাও দাগ নেই—সার্টিফিকেট দিই কি করে?' ডাক্তার পরামর্শ দিলেন কর্পোরেশনের যে-কোনো ভ্যাকসিনেশন আফিস থেকে টীকে নিয়ে তাঁকে দেখালে তিনি সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। তিনিই বাতলে দিলেন যে হাজরা রোড আর হরিশ মুখুজ্যে রোডের মোড়ে কর্পোরেশনের একটা টীকে দেবার আফিস আছে। গেলাম দুজনে সেখানে। টীকে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। যাওয়াটা হপ্তাখানেক পেছিয়ে গেল বলে মনটা খারাপ হল।

কিন্তু কী আব কবা যাবে।

চারুর জীবনে কখনো টীকে হয় নি—এইটেই হল তাঁর প্রাইমারী বা প্রাথমিক টীকে। তাঁর বাঁ হাতটা টীকের জন্যে এইস্যা লাল হয়ে ফুলে উঠল যে বলবাব নয়। ধুম জ্বব এসে গেল তাঁর। চারুব মা কেবলি ভর্ৎসনা কবেন—'কেন মরতে টীকে দিতে গেলি?' ব্যথাব যন্ত্রণায় চারু তাঁর মাকে বলে ফেললেন ভেতবেব ব্যাপারটা। তাঁর একমাত্র ছেলে ঘর ছেড়ে বিলেত চলে যাবে বলে বিধবা তো কান্না জুড়ে দিলেন। এদিকে আমাদেব পবীক্ষাব ফলাফল বের হব-হব। বাবা বললেন, 'সেনেট হাইসে গিয়া জাইন্যা আয় কি হৈল পবীক্ষায়।' ফল বেব হল। আমি সেবার মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস। দক্ষিণেব বাড়িব উপেন্দ্র জ্যাঠামশায় ডবলিউ. এম. দাশেব ছোটো মেয়ে ছুটকি প্রথম শ্রেণীতে পাস। আমার তো শিরশ্ছেদ। তবু বুক ফুলিয়ে বললাম, 'ছুটকি যদি আমার মতো কম পড়ত তবে সে ফেলই হৈত।' তবে আমাকে কে কম পডতে বলেছে সে কথাটা তখন আর কেউ তোলে নি।

দিন আর কাটে না। চারুব বাঁ হাতটা পেকে ঘা হয়ে গেল, শুকোয়ই না। চারুব মা বললেন গোবর্ধনবাবুকে যে চারু সি. আব দাশের এক ভাইয়েব পাল্লায় পডেছে এবং দুজনে পালিয়ে আমেরিকা যাবার মতলব করেছে। গোবর্ধনবাবু নিজে কিংবা শবৎবাবুর মাধ্যমে দাদাবাবুর কানে কথাটা পৌঁছে দিলেন। ইতিমধ্যে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পবীক্ষার ফল বাইর হৈল—তবে কলেজে যাছ্ না যে বড?' আমি বললাম, 'আমি তো কইছিই যে আমেবিকায় যামু।' বাবাব তখন টনক নডল। তিনিও গিয়ে দাদাবাবুকে খববটা দিলেন।

আমাব তলব পডল দাদাবাবুব কাছে। গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। দাদাবাবু বললেন, 'শুনলাম তুই নেকি আমেরিকা যাবি?' মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'খবচা কোই থেইকা আইবো?' আমি জবাবে বললাম যে যাবাব খবচা চারুই যোগাড় করেছে। তিনি প্রশ্ন কবলেন—'সেখানে গিয়া খাবি কি?' তাঁকে তো আর বলতে পারি নে যে খাবাব খরচাটা তিনিই দেবেন। মুখে খালি আমতা আমতা করে বললাম যে আমেবিকায় গ্রীষ্মকালে কাজ করে টাকা জমাব। দাদাবাবু বললেন, 'আমার কাছে মন খুলে কথা বলতে তোর বোধ

হয় একটু বাধ বাধ ঠেকতেছে। তুই এক কাজ কর। বাড়ি গিয়া তুই আমারে লেইখ্যা জানাইস যে তোদের প্রোগ্রামটা কি, তোদের বাড়ি থেকে রওনা হইয়া কোথায় যাবি, কোন জাহাজ ধরবি এবং একেবারে আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছতে কত খরচ লাগব এবং কত টাকা তোদের আছে এবং সেখানে পৌঁছে কত টাকা হাতে থাকব—এই সব লেখবি। আমি যদি বুঝি যে তোদের সংকল্পটা প্র্যাকটিক্যাল তবে আমি তোদের দুজনেরই সেখানে থাকবার খরচ দেব।' চলে এলাম বাড়ি।

বাড়িতে বসে মাথা গুঁজে অনেক ভেবেচিন্তে মস্ত একটা চিঠি লিখলাম দাদাবাবুকে। বোধ হয় বদরীই ছিল তখনো দাদাবাবুর বেয়ারা। তার হাতে দিয়ে এলাম। এই আমার প্রথম রম্যরচনার প্রয়াস। ইতিমধ্যে চারু তাঁর মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমেরিকা যাবার সংকল্পটা পরিহার করে মাতৃ আজ্ঞাবহ হয়ে বিয়ে করে সংসারী হয়ে বসলেন। উত্তরকালে তিনি একটা বড়ো সদাগরী আফিসের ক্যাশিয়ার হয়ে খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করে এখন অবসর নিয়ে বসেছেন। এদিকে দাদাবাবু আমার চিঠি পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, 'যদিও তোর লেখাটায় বেশ বাঁধুনী আছে কিন্তু বাস্তবজগতে ঐরকম ভাবপ্রবণতায় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। তুই মন দিয়ে বি এ. পড়্। তার পর পাস করলে বিলেত যাওয়ার কথা দেখা যাবে।' মনটা যে খুব খারাপ হল তা-ও নয়, কেননা আমি জানতাম যে চারু কেটে পড়ায় এখন আর আমার আমেরিকা যাবার প্রশ্নই ওঠে না। চুপ করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার জীবনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চারটা অকালে কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝরে পড়ল, ফুল্ল কুসুমিত হয়ে উঠতে পেল না। কিন্তু আমার মনের আকাশে সেটা একটা আকাশকুসুম হয়েই ফুটে রইল। হল না আমার ডি এন. রায়ের মতো বড়ো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হওয়া।

১০

গোটা দুয়েক ঘটনার কথা যা মনে পড়ছে তা কালের ক্রম-নির্ণয়ে এইখানেই বলে রাখা ভালো। এই সময় বরাবর জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের শরীরটা উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। শেষে এমন হয়ে পড়ল যে তিনি বিছানায় চিৎ হয়ে শুতে পারতেন না। বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে

বসে সামনে তাকিয়াগুলোর উপর হাত রেখে তার উপর মাথা পেতে একটু তন্দ্রার মতো ঘুমোতেন। চোখ বুজে ঘুম আনবার চেষ্টা মাত্র। বাড়িতেই মোতায়েন হলেন একজন ডাক্তার বাতদিনেব জন্যে। শুশ্রূষাব জন্যে এলেন একজন নার্স। তা ছাড়া রাত জাগতেন পালা করে বাড়িব পরিজনেবা। তাঁদের মধ্যে বেশ মনে আছে কালীনারায়ণ ঠাকুব আব ললিতবাবুকে। আমাব তখন পবীক্ষা হয়ে গিয়ে হাতে অফুবন্ত সময়। আমিও পালা কবে মাঝে মাঝে বাত্রে জ্যাঠামশায়েব বিছানায় বসে তাঁকে বালিশ দিয়ে ঠেলে ধবে থাকতাম।

কালীনাবায়ণ ঠাকুরেব কথা বলে শেষ কবা যায় না। পুবা নাম তাঁর ছিল কালীনাবায়ণ ভট্টাচার্য। কবে কোথা থেকে তিনি জ্যাঠামশায়েব কাছে চাকবি নিয়ে এলেন তা আজ পর্যন্ত জানি না। জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠি-মাকে তিনি একেবাবে আপন বাপ-মায়েবই মতো ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা কবতেন। নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি দবকাব পডলে জ্যাঠা-মশায়েব মলমূত্রেব পটটা পর্যন্ত বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বেখে আসতেন। জ্যাঠা-মশায় ও জ্যেঠিমাও তাঁকে নিবতিশয় ভালোবাসতেন। জ্যাঠামশায় যখন পুরুলিয়াব বিট্রিট বাড়িতে থাকতেন কালীনাবায়ণ ঠাকুবই তখন তাঁদেব দেখা-শুনা করতেন। তিনি সেখানে বাত্রে থাকতেন গেটেব দুপাশে যে দুটো একতলা কুঠবি ছিল তাবই পুব দিকেব কুঠবিতে। মাথাভবা ছিল তাঁব টাক এবং নাকটি বোঁচা বললেও চলে। একটু নাকিসুবে কথা বলতেন। বামপ্রসাদী ও দেহতত্ত্বের গান খুব সুন্দব কবে গাইতেন। আমবা সবাই তাঁকে ডাকতাম 'কাকু' বলে। তিনি হিসেব বাখতেন, বাজাব কবতেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যেঠিমাব দেখাশুনা কবতেন। এক কথায় যাকে বলে কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড।

বহুদিন আগে একবাব জ্যেঠিমা পুবী গিয়েছিলেন হাওয়া বদলাবাব জন্যে। সুধাংশুরাও গিয়েছিলেন। খবব পেয়ে আমিও সেবারকাব পূজাব ছুটিতে পুরী বেড়িয়ে এলাম। সেখানে জগন্নাথদেবেব মন্দিব থেকে বেশ বড়ো সাইজেব ভোগেব মহাপ্রসাদ আনা হয়েছিল। আমবা জানতাম যে শ্রীক্ষেত্রে জাতবিচার কবতে নেই। আব যায় কোথায়। সবাই মিলে কাকুকে টেনে এনে বসিয়ে সেই মহাপ্রসাদ তাঁব মুখেব কাছে ধবতেই কাকু সংস্কাববশে যেই-না মুখ ঘুবিয়েছেন অমনি আমরা সমস্বরে— 'মুখ বেইক্যা যাইব কিন্তু' বলায় অগত্যা মুবগী-খাদক আমাদেব হাত থেকে প্রসাদ খেতে হল সুড

সুড় করে। বাড়ির কার যেন বিয়েব আগে তাঁর সঙ্গে যাঁর বিয়ে হবে তিনি নিত্য সন্ধ্যায় এসে গল্প করে যেতেন। কাঙ্কু তাঁকে বলেছিলেন 'তোমরা কি কথা কও বোজ বোজ হে? তোমাগো দেখি কথাই ফুবায় না।' একেবারে ঘবের মানুষ পবিবাবের সুখদুঃখের সমভাগী।

আব-একটি উঁচুদবের মানুষ ছিলেন ললিতবাবু— ললিতমোহন সেন। বরিশালেব মানুষ। কথা বললেই বরিশালেব কথাব টান বেবিয়ে পড়ত। শেষের দিকে যখন দাদাবাবুর অফিসেব ক্লার্ক বা মুহুবী কেউ বইলেন না তখন এই ললিতবাবুই ছিলেন তাঁব পি. এ. অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহায়ক। কোনো কোনো দিন কাজেব ভিড় থাকলে ঘন ঘন দাদাবাবুব গলাব ডাক শোনা যেত, 'ললিত'। ঘবের ভিতবে কাজ, বাইবে কোথায় যেতে হবে— সবই সেই 'ললিত'। কাকে কি টাকা দিতে হবে—'ললিত'। ট্রেনে বার্থ বিজার্ভ কবতে হবে— 'ললিত'। মায়াবতীর পথে— 'ললিত'। অনেক সময় তাঁকে যা বলা হত সেটা পুবা না বুঝে এক-এক সময় অঘটনও ঘটিয়ে বসতেন। বকুনিও খেতেন বিস্তব। তা কিন্তু নীববে সহ্য কবতেন। ভালোবাসতেন সবাই তাঁকে। এবকম সৎ, বিশ্বাসী ও ভক্তিমান কর্মচাবী দেখা যায় না। তা ছাড়া লোকেব অসুখে-বিসুখে সেবা কবায় ললিতবাবুব দোসব মেলে না। কাব হয়েছে আসল বসন্ত। কে কববে সেবা? বুক পেতে দিলেন ললিত-বাবু। কাঙ্কু ও ললিতবাবুব মতো মহানুভব ব্যক্তিব সংস্পর্শে এসে যে আমবা উপকৃত হয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্যাঠামশায়েব এই শেষ অসুখেব সময় ঐ দুইজন লোক তাঁর সেবা করে-ছিলেন নিষ্ঠাব সঙ্গে পালা কবে। আমিও পরীক্ষাব পব মাঝে মাঝে জ্যাঠা-মশায়কে সেবা করতে যেতাম। একদিন আমাব পালা পড়েছিল আগ রাত্রে। আমি সন্ধ্যা না হতেই জ্যাঠামশায়েব ঘবে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি ছিলেন পবিবর্তিত ও পবিবর্ধিত কালীমোহন আলয়ের পেছন দিকেব গাড়ি বাবান্দাব উপরেব ঘবে। ধীবে ধীবে সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘনিয়ে এল। জ্যাঠামশায় যেন উৎকর্ণ হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কব-ছিলেন 'চিত্ত আসল?' আমি ঠিক বুঝছিলাম না তখন যে কেন তিনি দাদা-বাবু আসাব জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। অবশেষে বার্লিয়েট গাড়িব আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ি-বারান্দাব নীচে গাড়ি থামল। দবজা খোলবার ক্ষীণ আওয়াজও পেলাম। তাব পর শুনলাম কাঠের সিঁড়িব উপব পায়ের শব্দ।

দাদাবাবু ঘরে ঢুকে বললেন— 'ফাইল হইয়া গেছে।' পরে জানলাম যে সেইদিনই হাইকোর্টে দাদাবাবু পুরানো পাওনাদাবদের সমস্ত বাকি দেনা শোধ করবার জন্যে টাকা জমা দেবার অনুমতি চেয়ে যে আরজি দাখিল করেছিলেন আদালতে তা ফ্লেচার জজসাহেব মঞ্জুর কবেছেন অতি সুখ্যাতির সঙ্গে। দেউলিয়া আইন-অনুসাবে দাদাবাবু এই টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁব ধর্মবুদ্ধিব কাছে নিজেকে দায়ী স্বীকাব কবেছিলেন। সেদিন হাইকোর্টে ও সাবা দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল এই অশ্রুতপূর্ব সদাচরণেব কথা শুনে। দাদাবাবুর কথা শেষ হতে না হতে জ্যাঠামশায়ের মুখে-চোখে এমন একটা আনন্দবিহ্বল ভাব জেগেছিল যে তা ভোলবাব নয়। চোখ তুলে দেখি বৌঠান, ছুটকিদিদি, মোনা, বেবীরা সব ভিড় কবে দাঁডিয়ে আছেন খাটেব চাবি পাশে। এর অল্প পবেই— ২২শে জুন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাঠামশায় ইহধাম ছেড়ে মহাপ্রয়াণ কবলেন— শান্ত ও শুদ্ধ চিত্তে।

এই সময়ে আবো একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদেব বাড়িতে। আমাদের মেজোবোন গুগুব তখন বয়স তেরো থেকে চোদ্দোব মধ্যে। ওব বিয়ের একটা কথা উঠল বিক্রমপুর টঙগীবাড়ি গ্রামেব ভুবনমোহন গুপ্তমশায়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। ভুবনবাবু রংপুবেব নিলফামাবি কোর্টে ওকালতি করতে করতে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যান স্ত্রী, চারটি ছেলে ও একটি শিশু-কন্যা ফেলে। তাঁব কোনো সংবাদই তখন পাওয়া যাচ্ছিল না— এবং আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নি। বাপ নিরুদ্দেশ—·এইবকম ঘরে মেয়ে দিতে স্বভাবতই আমাদেব বাপ-মাব একটু দ্বিধা হচ্ছিল। তবে পরম্পবায় শোনা গেল যে ছেলেটি খুবই ভালো। ছেলেব মা ছিলেন মধ্যেব বাড়িব মেজবাবু দুর্গামোহনের সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ীব বোনঝি। সে বাড়িব সতীশবঞ্জনই তাঁর মাসতুতো বোনের ছেলেদেব পড়াশুনার সকল দায়িত্ব বহন করছিলেন। হেমবাবু তখনো এম. এ. পরীক্ষা দেন নি— সেবাবেই দেবেন। সতীশদাদা এই বিয়েব প্রস্তাবে খুশি হন নি— কেননা ছেলে তখনো নিজেব পায়ে দাঁড়ান নি। কিন্তু বাবাকেও তিনি ভালোবাসতেন— সুতবাং 'না' বললেন না। কেবলমাত্র বললেন, 'এই বিয়েব ভালো-মন্দর ঝক্কি কিন্তু, কাকা, তোমার।'

একটা কথা বেশ মনে আছে। আমাদেব পিসতুতো ভাই সোনাদাদা রেবতী আমাকে বললেন, 'দেখ, কাউলকা গুগুরে দেখতে আইব। তুই কিন্তু গিহ্য ওই দিকে যাইছ না। তর চেহারা দেখলেই তারা মাইয়া না দেইখ্যাই

পলাইব।' সোনাদাদা দুর্মুখ লোক কিন্তু আমার গায়ের রঙটার দিকে ঐরকম ইঙ্গিত করাতে আমার বেশ রাগই হয়েছিল। যাই হোক, সেদিন আমি প্রথমটা একটু গা ঢাকা দিয়েই রইলাম। বরপক্ষেরা এলেন। শুনলাম যে ছেলেও এসেছেন। আবে যাঃ। আমাব গায়ের রঙয়ের চেয়েও ববের গায়েব কালো বঙ দু পোঁচ বেশি তো বটেই তিন পোঁচও হতে পারে। আমাব চেয়ে অনেকটা আবাব বেঁটেও। তবে গুগুও ছিলেন ছোট্টখাট্ট মেয়ে— সুতবাং সে দিক থেকে বেমানান হয় নি। আমি তখন বুক ফুলিয়ে মেয়ে দেখাবাব সভায় হাজিব হয়ে সব ব্যাপারটা দেখে নিলাম।

শেষ পর্যন্ত ওইখানেই বিয়ে ঠিক হল। আমি গুগুব পিছনে বসে তাঁকে ধবে বইলাম। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। সে দিন, কি তাব পরেব দিন, আমি হেমবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, 'ভাইগ্যে গুগুটা ঘুমাইয়া পডছিল। না হৈলে ওই কালা চেহাবা দেইখ্যা মাইয়া মূর্ছাই যাইত।' হেমবাবু ঈষৎ হাসলেন। গুগু ব্যাপাবটা সামলিয়ে নেবাব জন্যে বললেন, 'দাদা যে কি কয়।' বিয়েব পব হেম এম. এ. পাস কবলেন। তাব পর চাকবিব জন্যে লাহোবে হাজিব হবাব সমন পেয়ে সেখানে গেলেন এবং ইন্টাবভিউতে ভালো কবায় চাকবি পেয়ে বহাল হলেন অডিটাব অফ লোক্যাল অ্যাকাউন্টস পদে। সেই যে বিয়ে হল সেই থেকে হেমবাবু হয়ে গেলেন আমাদেবই ঘবেব ছেলে। এবকম অমায়িক ও সাদা মন মানুষ দেখি নি। আমাদেব সুখে দুঃখে আমাদেব সঙ্গে বরাববই তিনি অংশ নিয়েছেন। আপন ভাই-কটি ও বোনেব ভাব ওই অল্পবয়সেই তাঁকে নিতে হয়েছিল এবং তিনি তা নিয়েও ছিলেন স্বচ্ছন্দচিত্তে। তিনি অপরের অপরাধ মার্জনা কবতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। সব সময়ে সব লোকেরই ভালো দিকটা তিনি দেখতেন। তিনি কাজ কবতেন নীবস হিসাবপত্র নিয়ে। কিন্তু মনটি ছিল তাঁব সবুজ। সত্যকাব কাব্যবসিক তিনি ছিলেন। আগেই বলেছি তার বড়ো ছেলে, সিদ্ধার্থ (রামু) বিলেতে কলিয়াবী ম্যানেজাবেব সার্টি-ফিকেট পেয়ে সেইখানেই কাজ কবছেন এবং বিয়ে করে সেখানেই রয়ে গেছেন। বাডিব খবর অবিশ্যি বীতিমত নেন। মেয়ে দুটিবই বিয়ে হয়ে গেছে। এরা আছেন পুণায়, তাঁর স্বামী ডাক্তাব ডি এন. সেনের কর্মস্থলে। তাঁদেরই কাছে হেমবাবু দেহত্যাগ করেছেন এই কমাস হল। ছোটো মেয়ে

সোনা ও তাঁর স্বামী পবিতোষ ব্যানার্জি এম. এ. কলকাতাতেই আছেন এবং একই অফিসে কাজ করেন।

১১

আমার আমেবিকা যাবাব অ্যাডভেঞ্চাবটা যখন ভেস্তে গেল তখন অগত্যা আবাব কলেজে গিয়ে বি. এ. ক্লাসে নাম লেখাতে হল। কাজটা খুব বেশি সহজ হয় নি। গেলাম চলে স্কটিশ চার্চ কলেজে। ওয়াটস্ সাহেব তখনো প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কবলাম। 'খবব কি হে? কোথায় ছিলে এতদিন? ভালো তো?' বলে তো তিনি আপ্যায়িত কবলেন। বললাম, 'গোলেমালে আসতে দেরি হয়ে গেল। এখন ইংবেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পডব ঠিক কবেছি। তাই এলাম, সাব্।' তিনি তো গালে হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাব আশায় আশায় আমরা এতদিন একটা জায়গা খালি বেখেছিলাম। কিন্তু এলে না দেখে আমবা অন্য আর-একটি ছেলে যে ভর্তি করে ফেলেছি। বড়োই দুঃখেব কথা।' আমি একটু নাছোড়বান্দা হয়ে বললাম, 'আমি তো পুবানো ছাত্র, স্যার' কথাটা শেষ না হতেই ওয়াটস সাহেব বলে উঠলেন, 'আবে, সেইজন্যেই তো দুঃখের কথা। কিন্তু জায়গা যখন নেই, তখন তো কিছু কবা যাবে না। তুমি সময় নষ্ট না করে শিগ্গিব অন্য কোনো কলেজে ঢুকে পড়ো।' বুঝলাম যে এখানে কিছু হবে না এবং বৃদ্ধ আমাকে তাঁব সময় নষ্ট না করিয়ে উঠে পডবার স্পষ্টই ইঙ্গিত দিলেন। নমস্কাব কবে চলে এলাম।

একে তো সব কলেজেই ক্লাস আবম্ভ হয়ে গেছে, তাব উপবে কেবামতি তো দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস। সুতবাং প্রেসিডেন্সীতে ঢোকাব চেষ্টা কবাটা একটা ধাষ্টামি হবে ভেবে সে দিকেই গেলাম না। সোজা গেলাম গোলদীঘিব দক্ষিণে সিটি কলেজে। জবাব পেলাম, 'ন· স্থানম্ তিল ধাবণম।' গেলাম হ্যাবিসন বোড আব শিয়ালদাব মোডেব বিপন কলেজে— 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।' ফিবে এলাম মেট্রোপলিটানে— একই জবাব, সব জায়গাই ভর্তি হয়ে গেছে। মনে মনে প্রমাদ গণলাম। বাকি রইল খালি বঙ্গবাসী। সেদিন আর গেলাম না সেখানে। মুখ চুন কবে বাড়ি ফিবে বাবাকে দুঃসংবাদটা দিলাম। একটা বছব হয়তো নষ্টই হবে। আমাব উপরে বাগ হবার যথেষ্ট কাবণই ছিল বাবার।

কিন্তু তিনি কিছুই রাগারাগি করলেন না। আমার আমেরিকা যাওয়াটা ফস্কে যাওয়ায় মন খারাপ আছে ভেবেই বোধ হয় বাবা কিছু বললেন না। খালি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ।' সেটা বোধ হয় মারেরই সমান মনে হয়েছিল সেদিন।

পরদিন সকালে বাবা আমাকে বললেন, 'চিত্তের এই চিঠি লইয়া শিগ্‌গির যা বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল গিরীশ বোসের কাছে। দেখ্ কিছু হয় কি না।' বলবার ছিল না আমার কিছু। চিঠিখানা নিয়ে গেলাম স্কট লেনের বঙ্গবাসী কলেজে। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে বড়ো সাহেবের ঘরে গিয়ে চিঠি ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম। ডাক এল। ঘরে ঢুকে দেখলাম দাদাবাবুর চিঠি খোলা পড়ে আছে টেবিলের উপরে। সামনে বসে আছেন একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি। লক্ষ্য করে দেখলে চুলে একটু পাক ধরেছে বলে মনে হল। গায়ে টুইল সার্ট এবং তার উপর একটা মোটা বিছানার চাদরের মতো চাদর ডান বগলের তলা দিয়ে গায়ে জড়ানো, চোখে নিকেলের চশমা, পায়ে চকচকে ব্রাউন ফিতে বাঁধা জুতো। আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পড়বে তুমি।' বললাম যে ইংরেজিতে অনার্স নেব এবং অর্থনীতি ও ইতিহাস পড়ব তারই সঙ্গে। তিনি 'বড়ো দেরি করে এয়েছ, দেখি কি করতে পারি' বলে একটা ঘণ্টা দিলেন। বেয়ারা এলে তাকে বললেন বড়োবাবুকে পাঠিয়ে দিতে। আমি বসে রইলাম। আমার তখন মনের ভাব 'ধরণী দ্বিধা হও'। বড়োবাবু এলেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দাদাবাবুর চিঠিখানা বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'দাশ সাহেব চিঠি দিয়েছেন। এঁকে কোনোরকমে ভর্তি করে নিতেই হবে'। আমার মুখের দিকে একবার বেশ ভালো করে চেয়ে বাবুটি বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

গেলাম তাঁর সঙ্গে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো। তিনি তাঁর টেবিলে বসে একটা রেজিস্টার দেখেন—সেটা বন্ধ করে আর-একটা দেখেন। সময় যেন আর কাটে না। হঠাৎ বললেন, 'ভর্তি হবার ফি এনেছ?' টাকাটা আগের দিনে যখন স্কটিশচার্চ কলেজে গিয়েছিলাম তখন থেকেই পকেটে ঘুরছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছি বই-কি। কত লাগবে?' তিনি যে কি একটা অঙ্ক বললেন তা ভুলে গেছি। টাকাটা তক্ষুনি গুনে দিয়ে দিলাম। তিনি কোথায় কী সব লিখে আমাকে একটা

রসিদ দিলেন। রসিদখানা নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে দেখিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি 'থাক থাক' বলে একটু পেছিয়ে গিয়ে বললেন, 'তা বেশ, তুমি এবার মন দিয়ে পড়ায় লেগে যাও।' আবার একটা প্রণাম করে ফিবে এলাম বাড়িতে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি অনার্স-ক্লাসে ভর্তি হয়ে। বুক থেকে জগদ্দল একটা পাথব নেমে গেল।

প্রিন্সিপ্যাল গিরীশবাবুব কাছে পড়বাব সৌভাগ্য আমার হয় নি, কেননা তিনি পডাতেন বটানি। কিন্তু সেই প্রথম দিন থেকেই তাঁর উপবে কিরকম যেন একটা শ্রদ্ধা ও সমীহ ভাব এসে গিয়েছিল আমাব মনে। অনেকবাব দেখেছি তাঁকে কলেজে— সেই সাদাসিদে টুইল সার্ট, মোটা চাদর ও ফিতে-বাঁধা জুতো— সেই প্রশান্ত মুখেব চাহনি। তখন বঙ্গবাসী কলেজে ইংবেজি পডাতেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়— বেশ নামী অধ্যাপক। শেক্সপীয়ব পডাতেন বেশ রসকস দিয়ে। তার পব সংস্কৃত কাব্য থেকে প্যাবালাল প্যাসেজ উদ্ধৃত কবার ক্ষমতা ছিল তাঁব অসাধারণ। অনেক মজাব মজাব উদ্ধৃতি শুনেছিলাম। একটা এখনো মনে আছে। শেক্সপীয়বেব নাটকে একটি চবিত্র যখন নারীচিত্তেব অস্থিরতা সম্বন্ধে মন্তব্য কবলেন তখন সেই মন্তব্যগুলি নিয়ে ললিতবাবুব কি ব্যাখ্যান। 'মেয়েমানুষকে কে কবে চিনতে পেরেছে'— এই কথাটা বঙ্কিম চাটুজ্যে থেকে আবম্ভ কবে একেবাবে শেষ হল মৃচ্ছকটিক না অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্যেব 'অঙ্কে স্থিতাপি পরিশঙ্কনীয়া' দিয়ে। অপূর্ব পডাতেন শেক্সপীয়বেব নাটকগুলি সে কথা বলতেই হবে। বাংলা সাহিত্যে ললিতবাবুব লেখক ও সমালোচক বলে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধ আমবা মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। অর্থনীতি পডাতেন দেবেনবাবু— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবেনবাবুব পডানো ছিল মনোজ্ঞ। মার্শালেব বই ছিল তখন পাঠ্য। ম্যালথাসেব থিওবি, উৎপাদন ও চাহিদাব পারস্পবিক সম্বন্ধীয় নীতি ইত্যাদি তিনি খুব প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ক্লাসেব বক্তৃতা মন দিয়ে শুনলে এবং নোট লিখে নিলে পডাব কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যেত। ইনি পবে আলিপুরের নামকবা অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি ও কলকাতাব মেয়বও হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে ইনি এখনো জীবিত আছেন। আমাকে খুবই তিনি স্নেহ কবেছেন বরাববই। ইতিহাস কার কাছে পডেছি তা মনে নেই। আর দুজন যাঁরা আমার সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক

হয়ে এলেন তাঁদের বেশ মনে আছে—একজন হলেন ডাক্তার এস. কে. গুপ্ত এবং অন্যজনের নাম এস. সি. চৌধুরী। দুজনেই ইংরেজি পড়াতেন। এঁদের সঙ্গে পরে আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কেননা উভয়েই ছিলেন ব্যারিস্টার। অতি ভদ্র মিষ্টভাষী অধ্যাপক ছিলেন এঁরা দুজনেই। খেলাধুলাতেও এঁদের খুব উৎসাহ ছিল।

১২

বঙ্গবাসী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ক্লাস আরম্ভ হবার অল্প পরেই এসে গেল পূজার ছুটি। ঠিক ছুটির মাথায় একদিন সন্ধ্যায় গেলাম বেল-তলার বাড়িতে অর্থাৎ কালীমোহন আলয়ে বৌঠান বাসন্তীর কাছে হাজিরা দিতে। গিয়ে ভীষণ কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। বাক্স, পেঁটরা ঘরের মেঝেটাতে চারি দিকে ছড়িয়ে আছে। কারো বা ডালাটা খোলা, কোনোটার ভেতর থেকে কাপড়-চোপড় খানিকটা অগোছালো অবস্থায় বাইরেও বের হয়ে আছে। বুঝলাম যে শিগগিরই বাইরে যাবার জন্যে জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?' শুনলাম যে দাদাবাবু ও বৌঠান মোনা ভোম্বল ও বেবিকে নিয়ে পূজার ছুটিতে নৈনিতাল যাবেন। বিনা দ্বিধায় ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম, 'বাঃ রে। নৈনিতাল শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা—বিশেষ করে অত উঁচু পাহাড়ে অত বড়ো হ্রদ নাকি খুবই মনোরম। আমিই বা যাব না কেন?' যেই না বলা অমনি ভোম্বল উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সে তো খুব ভালোই হবে। কী মজাই না করব। মা, কাকা চলুক-না আমাদের সঙ্গে?' মোনা ও বেবিও সায় দিয়ে বললেন, 'কাকা গেলে খুব জমবে।' বৌঠানের কাছে ছিল আমার নানা আবদার। নইলে এরকম হুস করে বলতেই পারতাম না যে আমিও যাব। মোনা, ভোম্বল, বেবির আমি সম্পর্ক হিসেবে কাকা হতাম বটে কিন্তু বয়স হিসেবে আমি ছিলাম ওদের দাদার মতোই। ওঁরাও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার উৎসাহটা তাদের খালি মৌখিক ভদ্রতাই ছিল না। শেষমুহূর্তে অতদূরের পথে আর-একজন মানুষকে সঙ্গে জুটিয়ে নেওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে এবং আমার ঔৎসুক্য দেখে আমার মুখের উপর 'না' বলতেও যেন বৌঠানের মন সরছিল না। তবু একবার বললেন, 'যাবো বললেই

কি হয়? পাহাড়ে যে খুব ঠাণ্ডা। তোর গরম কাপড়-চোপড লাগবে যে। এত অল্প সময়ে সে ব্যবস্থা কি করে হৈব?' আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে বললাম, 'গরম কাপড়ের জন্যে ভাবনা করতে হৈব না। সে সব আমি ঠিক কইরা নিমু।' ভাইপো ভাইঝিবা বলে উঠলেন, 'বাঃ, তবে আর কি। তা হলে তুমি এক্ষুণি গিয়ে কাপড গুছিয়ে তৈরি হয়ে যাও। আমবা কাল সন্ধ্যায় যাব।' আমাব যাবাব ব্যবস্থাটা আমরা ছোটোবাই ঠিক করে ফেললাম। বৌঠানেব অনুমতি সম্বন্ধে যেন সংশয়ের কোনো হেতুই নেই এবং তিনি তাঁব অনুমতি যেন দিয়েই দিয়েছেন এইরকমই আমরা ধবে নিলাম।

হৃষ্টচিত্তে বাড়িব দিকে ছুটে যাবাব উদ্দেশ্যে যেই-না উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি দবজাটা ঠেলে ঘবে ঢুকলেন বৌঠানেব জাঠতুতো ভাই, মহিনদাব ছোটো ভাই সর্তীন্দ্রনাথ হালদাব ওবফে টগব। ভোম্বলের তর সইছিল না। উৎসাহে বলে দিলেন, 'জান, ছোটো মামা, কাল সন্ধ্যায় কাকাও আমাদের সঙ্গে নৈনিতাল যাইব।' কথাটা শুনেই টগব বললেন, 'বা বে! সাহেবের ভাই যদি যায় নৈনিতাল তবে মেমসাহেবেব ভাই বা যাবে না কেন?' কথাটা অযৌক্তিক বলে মোনা, ভোম্বল ও বেবিব মনে হল না এবং তাঁবা বৌঠানেব দিকে ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। সে তো বেশ হবে।' হঠাৎ আচমকা দু-দুটা অনাহূত অতিথি জুটে যাওয়ায় বৌঠান হয়তো একটু বিব্রতই বোধ কবছিলেন। কিন্তু তিনি এটাও বুঝছিলেন যে দাদাবাবু আমাদেব আগ্রহাতিশয্য শুনলে কখনোই আমাদের সাধে বাদ সাধবেন না। অতএব ঠিক হল যে সাহেব এবং মেমসাহেবেব ভাই দুজনেই যাবেন নৈনিতাল পাহাড়ে সৌন্দর্য দেখতে ও হাওয়া বদলাতে। দাদাবাবু ও বৌঠান আমাদেব এই অহেতুক এবং অসংগত বায়না ও আবদাবও সয়ে নিলেন হাসিমুখে।

পরদিন সন্ধ্যায় সদলবলে যাওয়া হল হাওড়া স্টেশনে। লোক গিজ্ গিজ্ কবছিল। এক আধবাব মনে হল যে শেষ সময়ে টিকিট যদি না পাওয়া যায় তবে তো টগব ও আমাকে মুখ চুন কবে ফিবতে হবে বাড়িতে। টগবেবও বোধ হয় সেইবকমই মনোভাব ছিল তখন। যাই হোক স্টেশনে গিয়ে দেখি দাদাবাবুব জন্যে একটা ছোটো কিন্তু গোটা বগিব বন্দোবস্ত কবা হয়েছে। বগিটার ছিল দুটা কামরা। মাঝখানে

ছিল একটা স্লাইডিং দরজা। দরজাটাকে এক পাশে টেনে দিলে দুই কামরার মধ্যে যাতায়াতের পথ খুলে যেত— যেন একটাই কামরা। এক দিকের কামরায় ছিল দুটা চামড়ায় মোড়া স্প্রিং-এর গদিওয়ালা লম্বা বেঞ্চ। দাদা-বৌঠানের জন্যে ছিল সেটা। অন্য কামরায় ছিল নীচে তিনটে গদিওয়ালা বেঞ্চ ও বগিটার দুই দিকে উপরে দুটি বাঙ্ক বা শোবার জায়গা। দুই কামরাতে আলাদা কল-পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। মোনা, ভোম্বল, বেবি, টগর ও আমার চমৎকার আস্তানা হল সেই কামরাটায়। বাড়ি থেকে খেয়েই আসা গিয়েছিল এবং বৌঠানও খাবার এনেছিলেন বিস্তর। গাড়ি ছাড়বার আগে বদরী না বেণী দাদাবাবুর গড়গড়াটায় ছিলিম লাগিয়ে দিয়ে তার নিজের কামরায় চলে গেল। আমরা খাবারের পাত্রগুলির বেশির ভাগ নিয়েই টেনে দিলাম মাঝের দরজাটা। একেবারে স্বায়ত্তশাসন বললেই হয়। হুল্লোড় করে খেয়ে, গান করে আমরা বহুরাত পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম জেগে। মাঝখানে বৌঠান একবার দরজাটা ঠেলে ফাঁক করে শাসালেন, 'ঘুমো।' কথাটা এমন আস্তে বললেন যে আমরা বেশ বুঝলাম যে দাদাবাবু এবার ঘুমোবেন। সুতরাং আমরাও বাতি নিবিয়ে যে যার বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম এবং ক্লান্ত হয়ে গাড়ির একঘেয়ে একটানা ঝক ঝক করে আওয়াজে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টেরই পাই নি।

একটা খুব হট্টগোল আওয়াজে, ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম। তখনো রেলের কামরাগুলির জানালায় গরাদ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। তা-ই বেশ খানিকটা মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলাম যে একটা মস্ত বড়ো স্টেশনে গাড়ি থেমেছে এবং যাত্রীরা কেউ গাড়ি থেকে নামছেন এবং কেউবা উঠছেন। অসংখ্য ফিরিওয়ালা নানা সুরে বেসুরে চিৎকার করে তাদের পসরা মাথায় নিয়ে ছুটোছুটি করছে। অনুসন্ধানে জানলাম যে আমরা মোগলসরাই পৌঁছে গেছি। তখন সবে ভোর হয়েছে, অন্ধকার একেবারে যায় নি, রোদ উঠতে তখনো কিছু দেরি আছে। ভাবলাম একবার প্ল্যাটফরমে নেমে হাত পায়ের আড় ভাঙিয়ে নিই। ভাগ্যিস নামি নি, কেননা ঠিক তখনই আমাদের বগিটা কেটে নিয়ে চলল একটা ফালতু ইঞ্জিন। খানিকটা আগে-পিছে টানাটানির পর সেই বগিটা আর-একটা রেলের গাড়ির

পেছনে জুড়ে দিল। এইরকম আরো একবার হয়েছিল বোধ হয় বেরিলি স্টেশনে। সেখান থেকে কাঠগুদাম স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেনযাত্রা শেষ হল পবেব দিন প্রত্যূষে। আমরা চটপট নেমে পড়লাম। ট্রেনে সেবাব হুল্লোড কবে পেটভবে খাওয়া এবং প্রাণভবে গল্পগাছা কবা গিয়েছিল।

কাঠগুদাম স্টেশনটি হিমালয়েব পাদদেশে। স্টেশন থেকেই দেখা গেল উঁচু পাহাড়— একটাব পিছনে ও পাশে আব-একটা পবতে পরতে উচ্চ শির তুলে দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তব্যাপী মহিমায়। আমি আগে কখনো পাহাডে যাই নি। সুতবাং আমি যা-ই দেখছি তাতেই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। পাহাডেব উপবদিককাব সবুজ গাছপালাগুলি আসন্ন সূর্যোদয়েব রক্তিম আভায় তখন ঝলমলিয়ে উঠছিল। শুনলাম কাঠগুদাম থেকে আমবা টাঙায় চড়ে হ্যাপি ভ্যালি বলে একটা জায়গায় গিয়ে নামব এবং সেখান থেকে ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে বা পদব্রজে যাব নৈনিতালে। কাঠগুদামে চা ও খাবাব খেয়ে আমবা বেশ কযেকটা টাঙায় ভাগাভাগি করে উঠে বসলে টাঙাব জুড়ি ঘোডা চলল পাহাড়েব পথে। টাঙায় চড়াব মুশকিল এই দেখলাম যে একজন যিনি কচুয়ানেব সঙ্গে সামনে বসেন তিনি ছাড়া অন্য যাঁবা পেছনে বসেন তাঁদেব মুখ থাকে টাঙা যে দিকে চলেছে তার উল্টো দিকে। চলতি গাড়িতে সামনে চেয়ে যে আনন্দ হয় সেটা টাঙাব পেছনের দিকে বসলে পাওযা যায় না। যাই হোক, এই অসুবিধা সত্ত্বেও আমার কাছে সবই নূতন ঠেকছিল। ক্রমশ যখন টাঙাগুলি উপবে উঠতে লাগল দেখলাম পথ গিয়েছে খুবই এঁকেবেঁকে এবং বেঁকেব মুখে বেশ গা দোলা দিচ্ছিল। পাছে টাঙাটা পাশেব খাদে পডে যায় এই ভেবে ভয় যে বেশ একটু হচ্ছিল না তা বলতে পাবি নে। মাথাব উপবে ছৈয়েব যে ডাণ্ডাটা পাশের দিকে ছিল সেটা বেশ শক্ত কবে ধরে বসলাম। এইবকম কবে ক্রমাগত আমরা উপরেব দিকে উঠতে লাগলাম। বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে গেল— যা দেখি সবই নূতন। এক দিকে খাড়া খাত অন্যদিকে লতাগুল্ম-সুশোভিত পাহাডেব দেয়াল। এখানে-ওখানে ছোট্ট দু-একটা ঝরনা উপচিয়ে পড়ছিল উপব থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে। বাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যাচ্ছিল বড়ো ছোটো পাহাডী ছেলেমেয়েরা। পরনে তাদের নানা রংয়ের কাপড়। মুখে তাদের ছিল একটি আনন্দোচ্ছল হাসিভরা চাহনি।

যতই উপরে উঠছে টাঙা, শীতটাও ততই যেন বেশ বেড়ে চলল। বৌঠান আমারই টাঙায় ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিরে, খোকা, তোর শীত করছে নাকি।' আমি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম। বৌঠান একটু উষ্মার সঙ্গেই বললেন, 'মাগো, ছেলের ঠোঁটটা কালা হইয়া গেছে। বলছিলাম না যে যাইস না গরম কাপড় ছাড়া। কইলে কথা শোনে না'। এখন, বকলেন বটে কিন্তু টাঙা থামিয়ে দাদাবাবুর কাপড়ের বাক্স থেকে কলকাতা পার্ক স্ট্রীটের তখনকার দিনের বিখ্যাত উইলিয়াম হীদের বাড়ির তৈরি বড়ো ভারি একটা স্কটিশ টুইডের ওভারকোট আমাকে দিয়ে বললেন, 'নে, পইরা নে!' গরম ভারি ওভারকোটটা, গায়ে দিয়ে বেশ ধাতস্থ হয়ে বসা গেল। আর সেই যে ওভারকোটটা আমার গায়ে চড়ল সে আর নামল না— অর্থাৎ আজ পর্যন্তও সেটা আমারই সম্পত্তি হয়ে আছে। যথাসময়ে আমরা হ্যাপি ভ্যালি পৌঁছলাম।

হ্যাপি ভ্যালিতে নেমে হাতমুখ ধুয়ে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে আবার রওনা দিলাম নৈনিতালের পথে। দাদাবাবু ও বৌঠান চললেন দুটি ডাণ্ডিতে বসে। ভোম্বল চড়ে বসল একটা ঘোড়ায়। দেখাদেখি বৌঠানের ভাই টগরও উঠে পড়ল আর-একটা ঘোড়ার উপর। মোনা গেলেন একটা ডাণ্ডিতে। বেবি ডাণ্ডিতে না ঘোড়ায় গেলেন মনে নেই। আমি বললাম যে হেঁটেই যাব, তবে ক্লান্ত হলে ডাণ্ডিতে চড়ব। রওনা হলাম সবাই হৃষ্টচিত্তে। অল্প একটুখানি যেতে-না-যেতেই দেখা গেল যে টগর বহু পিছনে পড়ে রয়েছে ঘোড়ার পিঠে চেপে।' 'আরে আয় না, দেখছিস কি?' বলে আমি হেঁকে বললাম। টগরও চেঁচিয়ে বললেন, 'যাব কি করে, ঘোড়া যে ঘাস খাচ্ছে। পেটে তো মারছি লাথি কিন্তু ঘোড়া যে শুনছে না।' আমরা হেসে আকুল। 'আচ্ছা ঘোড়সওয়ার। অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল আর কি।' বলে মসকরা করা গেল। শেষ পর্যন্ত সহিসটা গিয়ে ঘোড়াকে ঘাস থেকে ছাড়াল। ভোম্বলের ঘোড়া সামনে যাচ্ছে দেখে টগরের ঘোড়াও চলল তার পিছু পিছু, আর থামে না টগরের বারণ সত্ত্বেও। টগর বেতালে ঘোড়াটার উপর থপ থপ করে উঠছিল আর বসছিল। পথে আর কিছু দুর্ঘটনা হয় নি টগর-বাবুর। আমরা নৈনিতালে পৌঁছলাম শেষ বেলায়।

শরৎকালের সূর্যাস্তের বঙ্কিম আভা ভাঙা ভাঙা জলহারা সাদা মেঘগুলিকে রাঙিয়ে দিয়েছিল অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে এবং সেই রঙ ঠিকরিয়ে

পড়েছিল সুবিস্তৃত নৈনিতালের অতল নীল জলের উপর। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম-পাহাড ঘেরা গভীর হ্রদটিকে। দুদিনের পথক্লিষ্ট দেহ-মন নিয়ে হ্রদেব চাব পাশটা ঘুরে আসবাব উৎসাহ তখনকার মতো কাবোরই হল না। সবাই ব্যস্ত কোনো মতে বাড়ি পৌঁছিয়ে নাকেমুখে কিছু গুঁজে বিছানাব গবম আবামেব মধ্যে গা এলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা তাই সোজা নৈনিতালের পুব গা দিয়ে যে বড়ো বাস্তাটা ঘুবে উত্তরে চীনা পাহাডে উঠে গেছে সেটা ধবে পৌঁছে গেলাম যে বাড়িটি দাদাবাবু ভাড়া নিয়েছিলেন সেই বাড়িতে। কোনোমতে একটু খেয়ে আমবা শুয়ে পডলাম এবং অচিবে ডুবে গেলাম অঘোব ঘুমে। পবদিন প্রত্যূষে আমাদেব ঘুম ভাঙল কিন্তু টগববাবু আব বিছানা ছেড়ে উঠতে পাবেন না, কেননা বিষম ব্যথা হয়েছিল তাব সর্বাঙ্গে বিশেষ কবে কোমরে ও পাছায় ঘোড়াব পিঠেব থপ-থপানিব জন্যে। ভদ্রলোকেব জঙ্গী মনোবৃত্তি একেবাবে হিমশীতল হযে গিয়েছিল এবং এর পব যতদিন তিনি নৈনিতাল ছিলেন 'শতহস্তেন বাজিনাম্' এই ঋষিবাক্য অনুসবণ কবেই চলেছিলেন।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যাবাব পব হাতমুখ ধুয়ে গরম কাপড়চোপড় যা-কিছু ছিল সব পবে বাড়ির সামনে একটু পায়চাবি কবতে গিয়ে শহরটাকে একবার চীনা পাহাড়েব উপব থেকেই দেখে নিলাম। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুবটাকে চিৎ করে ফেললে যেমন দেখায় নৈনিতাল শহবটি দেখতে ঠিক সেই বকম। তিন দিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে শহবটি ঘেবা এবং তাবই মাঝখানে বিস্তৃত একটি হ্রদ। সমুদ্রজল-বেখাব প্রায় সাত হাজাব ফুট উপবে এত বড়ো জলাশয় কেমন করে সৃষ্টি হল তা ভাবতেও বিস্ময় লাগল। তিন দিকের পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্তরে স্তরে উপবে নীচে অনেকগুলি লাল টিনের চালওয়ালা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতেই বেশ মনোবম ফুলেব বাগান ও কিছু বড়ো ছোটো ফলের ও অন্যান্য গাছ। হ্রদের উত্তব দিকে চীনা পাহাড়ের পাদদেশে ছিল প্রকাণ্ড পোলো খেলাব মাঠ। সে মাঠ পেবিয়ে ছিল একেবাবে হ্রদেব উপরে নয়নী দেবীব মন্দিব। পাহাডের পাদদেশে সমস্ত হ্রদটিকে ঘিরে ছিল একটি প্রশস্ত রাস্তা। সেখানে অশ্বপৃষ্ঠে বা রিক্সা চডে বা পদব্রজে বেডানো ছিল স্বাস্থ্যানুসন্ধিৎসু নরনাবীর নিত্য কর্তব্য সকালে ও বিকেলে। শহরের বাড়িগুলি থেকে সোজা বরফের

পাহাড় দেখা যায় না। বরফ দেখতে গেলে চীনা পাহাড়ের পিছন দিকে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয় বলে পরে জানলাম। বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে করতে অনুভব করলাম যে শীতটা বেশ চন্‌চনেই। কান ও নাকের ডগাগুলি যেন চিন্‌চিন্ করতে লাগল এবং হাতের আঙুলগুলো যেন অবশ হবার যোগাড় হল। সাহেবরা কেন তাদের প্যান্টালুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখে তার কারণটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা গেল। কথাটা বৌঠানের কানেও গেল কি করে জানি না। তিনি বললেন শহরে নেমেই যেন সবাই একজোড়া করে দস্তানা কিনে নিই।

আমরা খেয়েদেয়ে সেজেগুজে পদব্রজেই চললাম শহরটা পরিদর্শন করতে। চীনা পাহাড় থেকে নেমে হ্রদের পুব পারের বড়ো রাস্তাটা ধরে আমরা দক্ষিণের দিকে যেতে যেতে দেখলাম কত বড়ো বড়ো সাজানো-গোছানো সাহেবী দোকান। একটাতে ঢুকে পড়লাম সবাই মিলে. দোকানটার নাম 'হোয়াইট-ওয়ে লেডল' কি 'হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন' ভুলে গেছি। মোদ্দা কথা সেটা কলকাতার ঐ নামের একটা দোকানের শাখাবিশেষ। সবাই কিনলাম চামড়ার দস্তানা এক জোড়া করে। দস্তানার ভিতর দিকে ছিল কিরকম লোমওয়ালা চামড়া। পরতে চমৎকার আরাম। আমি ও টগর একটি করে চেরীর লাঠিও কিনলাম। লেকটার দক্ষিণ পাড়ে মনে হল একটা বিরাট চওড়া বাঁধ দিয়ে হ্রদের জলটাকে আটকিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। একবার যদি সে বাঁধ ভাঙে তবে হ্রদের সমস্ত জল উপছিয়ে পড়ে তলার ঘরবাড়ি ও তার বাসিন্দাদের যে কি সর্বনাশ হবে সে কথা স্মরণ করে যেন গা শিউরে উঠল। হঠাৎ নাকে এল একটা ঘোড়ার আস্তাবলের গন্ধ। ভোম্বলেরই টনক নড়ল সবায়ের আগে। সে চট্‌পট্ সেই আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গিয়ে টক্ করে একটা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। আমি ভাবলাম যে আমি-ই বা কম যাই কেন। আমিও নিলাম একটা ঠাণ্ডা ধরণের পোনি। টগরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে তাঁর ঘোড়ার সখ মিটে গেছে এবং আমাকে সতর্ক করে দিলেন যে মজাটা পরদিন না কি টের পাওয়া যাবে। মোনা, বেবিকে ও আমার চেরীর লাঠিটা টগরের জিম্মায় রেখে ভোম্বলের পিছু পিছু আমিও চললাম ঘোড়ার পিঠে নাচতে নাচতে। আমাকে কিছুই করতে হচ্ছিল না। আমার ঘোড়াটা সামনের ভোম্বলের ঘোড়াটা যে চালে যাচ্ছিল ঠিক সেই চালে চলছিল। অর্থাৎ ভোম্বল যখন ট্রট্ করে যাচ্ছিলেন আমার ঘোড়াও

তখন ট্রট্ করছিল। আমার সাধ্য ছিল না তাকে আস্তে আস্তে হাঁটাই। আবার ভোম্বলের ঘোড়া যখন আস্তে আস্তে হাঁটছিল আমার ঘোড়া কিছুতেই তাকে ছাড়িয়ে দৌড়ে যেতে ইচ্ছুক হল না আমার হ্যাট হ্যাট ও গোড়ালির গুঁতো সত্ত্বেও। তার উপর দেখলাম যে ঘোড়া যখন দৌড়ায় ঘোড়ার সহিসটা ঘোড়ার লেজ ধরে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। প্রথমদিনের ঘোড়সওয়ার হবার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হল যে ঘোড়ায় চড়াটা একেবারেই শক্ত নয় যদি সামনে থাকে ভোম্বল আর পেছনে থাকে ঘোড়ার লেজ ধরে তার সহিসটি।

সারাটা হ্রদ প্রদক্ষিণ করে এলাম ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা দুজন। সেই গোলাকৃতি রাস্তার ধারে ধারে কত গাছ ছায়া বিস্তার করেছে। তার মধ্যে ছিল কতকগুলি গাছ যাদের বড়ো বড়ো ডালগুলি প্রায় জলের উপর ঝুঁকে নুয়ে পড়েছিল। এইরকম নুয়ে থাকে বলেই নাকি এই গাছগুলিকে উইপিং উইলো বলে। হ্রদের জল ছিল ঘন নীল— দেখলেই মনে হয় ভীষণ গভীর। জলের উপর দেখলাম অনেকগুলি ছোটো ছোটো নৌকা জেটির গায়ে গায়ে বাঁধা রয়েছে। পরে জানলাম সেগুলি সাহেবদের ইয়ট ক্লাবের নৌকা। গ্রীষ্মের সময় তাতে পাল চড়িয়ে বাইচ খেলেন তাঁরা। কিছু দাঁড়ওয়ালা নৌকাও ভাড়া পাওয়া যায় হ্রদের উপর নৌকা-বিহারের জন্যে। ওই গভীর অতল জলে এই ভাবি ভাবি গরম কাপড়-চোপড় পরে নৌকা উলটে গেলে লোকেদের কী দুর্দশাই না হবে সে কথা পরে মোনা বেবি অনেকবার বলেছেন। আমি গেঁয়ো ছেলে এবং তেলিরবাগের ও আশেপাশে খালেবিলে নৌকা চালানো আমার জানা ছিল। সুতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের দুজনের দুশ্চিন্তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম এই বলে যে হুস করে নৌকা অমনি ডুবে যায় না। আমার কথায় তাঁদের মন মানল কি না বলতে পারি নে।

সেই হ্রদটার পুব পাড়ের রাস্তার মাঝামাঝি দেখি মোনা বেবি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে কি দেখছে। ঘোড়া ছেড়ে ভোম্বল ও আমি নেমে পড়লাম। দোকানটার বড়ো দরজার মাথায় লেখা রয়েছে তার নাম—মার্সেটি। সেটা ছিল তখনকার দিনের কলকাতার বিখ্যাত হালুইকরের দোকানের একটি শাখা। মোনা আমাকে ও ভোম্বলকে দোকানটা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেখ, কী চমৎকার ক্রীম রোল।' মোনার

ক্রীম রোলের সম্বন্ধে যে দুর্বলতা ছিল সেটা আমাদের আগে থেকেই জানা ছিল। কিছু ক্রীম বোল কিনে খানিকটা পথেই খেয়ে বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া গেল। বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই মোনা দাদাবাবুর পড়াব ঘরে গিয়ে সুখবরটা দিলেন, 'জান বাবা? এখানে মার্সেটির দোকান আছে এবং কী চমৎকাব ক্রীম বোল। কিনে এনেছি, খাবে?' দাদাবাবু হেসে বললেন, 'তুই-ই খা আমাব ভাগটা।' যাই হোক, এই আপাতলাভেব উপরে মোনার আসল মনোগত মনোবথ পূর্ণ হল। সেইদিনই পাকা হুকুম গেল মার্সেটির দোকানে যে নিত্য বিকেলে চায়েব আগেই যেন দু ডজন ক্রীম বোল নিয়মিত সববরাহ কবা হয়। এই ক্রীম বোলেব সদ্ব্যবহাব হত বোজ বিকেলে দুপুবেব ভুবিভোজন সত্ত্বেও। নৈনিতালেব জল-হাওয়াব গুণেই বোধ হয় আমাদেব প্রত্যেকেব ক্ষিদে যেন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমাদেব তাতেও যেন কুলোয় না। একদিন খাবাব টেবিলে খাবাব টান পড়েছে দেখে দাদাবাবু বিবক্তই হলেন। বৌঠান দাদাবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন যে আমাদেব এই ক্ষিদেটা একেবাবেই স্বাভাবিক নয়। তাঁকে অপ্রস্তুত কববাব জন্যেই নাকি আমবা পাঁচজন ছেলেমেয়ে বদ্ধপবিকব হয়ে ক্ষিদেব বেশি খেয়ে ফেলি। এই ব্যাখ্যানটা দাদাবাবুব মনে ধবল বলে মনে হল না তাঁব মাথানাড়া ও মুখচোখেব ভাব দেখে।

আমবা যখন নৈনিতাল গেলাম সে সময় সেখানে এসেছিলেন বেনাবসেব মহাবাজা এবং ঐ অঞ্চলেব কমিশনাব এ. সি. চ্যাটার্জি আই সি. এস.। দুজনেরই সঙ্গে দাদাবাবুর পবিচয় ছিল। মাঝে মাঝে তাঁদেব বাড়িতে কিংবা ক্লাবে নিমন্ত্রণ ছাড়া দাদাবাবু বাইবে বড়ো একটা যেতেনই না। তখন বোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা দাদাবাবু তাঁব সাগব-সংগীতের কবিতাগুলিতে কলমেব শেষ ছোঁয়া দিচ্ছিলেন তন্ময় হয়ে। সন্ধ্যাব সময় দাদাবাবু বসতেন আমাদেব সকলকে নিয়ে। এই পূজাব ছুটিতে দাদাবাবুকে যতটা কাছে পেয়েছিলাম তেমনটি পাই নি কখনো এর আগে। তিনি ছিলেন আইনজীবী। বছবেব বেশিব ভাগ সময়ই তাঁব কাটত আইন-আদালতেব নীরস আবহাওয়াব মধ্যে। তৎসত্ত্বেও তাঁব অন্তরে সৌন্দর্যবোধ ও কাব্যবসেব যে সরস উৎসটি ছিল তা শুকিয়ে যায় নি। ইংবেজ কবিদের মধ্যে ব্রাউনিংএব কাব্যে তখন দাদাবাবু মশগুল হয়ে থাকতেন। প্রতিদিন ব্রাউনিংএর একটা করে কবিতা পড়তেন এবং তার ভাব-সৌকুমার্য

ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। 'লস্ট লাভার'এর প্রথম দুটি ছত্র—

Just for a handful of silver he left us

Just for a ribbon to stick in his coat···

পড়তে গিয়ে 'Just' কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন যে স্পষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 'হাউ দে ব্রট দি গুড নিউজ ফ্রম ঘেণ্ট টু এই' কবিতাটি দাদাবাবু পড়লেন এমন তাড়াতাড়িতে যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম তিনটি ঘোড়সওয়ারের সবেগ গতি, ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে যেন ধুলা ছিটকিয়ে উঠেছিল। দাদাবাবুর গলায় 'ল্যাবরেটরি' কবিতাটিতে উপেক্ষিতা রমণীর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে মর্মন্তুদ বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবটি যেরকম ফুটে উঠেছিল তার তুলনা মেলে না। মেয়েটি যখন বললে—

Grind away, moisten and mash up thy paste

Pound thy powder I am not in haste···

তখন বোঝা গেল তার বিদ্বেষের গভীরতা কতখানি। তার পর শেষের দিকের চারটি লাইনে ব্রাউনিং কী নিপুণ হস্তেই না ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেমাস্পদ-পরিত্যক্ত প্রণয়িনীর জিঘাংসাবৃত্তি—

Not that I bid you spare her the pain ;

Let death be felt and the proof remain :

Brand, burn up, bite into its grace—

He is sure to remember her dying face.

পরের দিন পড়া হল 'দি লাস্ট রাইড টুগেদার'। কী আকাশ-পাতাল তফাৎ লাগল এই কবিতাটি ও আগের দিনের পড়া কবিতাটির মধ্যে। এখানে প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী একটি বর ভিক্ষা করে নিলেন শেষবারের মতো একসঙ্গে ঘোড়ায় অভিযান। এই সামান্য দানের জন্যে প্রণয়িনীর কাছে এর কত কৃতজ্ঞতা এবং নিজের অন্তরে কী অসীম আনন্দ—

So, one day more am I deified

Who knows but the world may end to-night.

ব্রাউনিংএর কবিতা খুবই দুর্বোধ্য বলে শুনেছিলাম। কিন্তু দাদাবাবুর পড়ার কায়দায় ভাবের অভিব্যক্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে প্রতিভাত হত। কত-না কবিতা দিনের পর দিন পড়া হয়েছিল। সবগুলির কথা

মনেও নেই। কিন্তু সেই পূজার ছুটিটায় দাদাবাবুর মনের একটা দিক উন্মুক্ত হয়ে যেতে দেখেছি। কাব্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ব্রাউনিংএর অপূর্ব প্রতিভা দাদাবাবু আমাদেব কাছে এমন চিত্তাকর্ষকরূপে তুলে ধরেছিলেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

দাদাবাবুব কণ্ঠে সাগর-সংগীত এবং তাঁব লেখা অন্যান্য কবিতাগুলি যেন কথা বলত। সাগর-সংগীতেব প্রচ্ছদপত্রেব পবেব পাতায় বৈষ্ণবপদাবলী থেকে উদ্ধৃত—

গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তুঁহু কববি বিচাব।

এখনো মনে আছে। এই উদ্ধৃত উক্তিটি যে কত বড়ো সত্য তা পবজীবনে বেশ ভালো কবেই জেনেছিলাম। সাগব-সংগীতের মুখবন্ধে যে বলেছেন—

হে আমাব আশাতীত, হে কৌতুকময়ি
দাঁড়াও ক্ষণিক, তোমা ছন্দে গেঁথে লই।

তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে কবিতাগুলিব মধ্যে। প্রথম কবিতাব এই কটি পদ

আজিকে পাতিয়া কান
শুনেছি তোমাব গান
হে অর্ণব, আলো-ঘেবা প্রভাতেব মাঝে

থেকে আবম্ভ কবে সমুদ্রেব শোভা সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যাব কবিচিত্তে যে বিচিত্র বাগিণী বাজিয়ে তুলেছে তা পব পর নানা কবিতায় সুন্দর ফুটে উঠেছে। সমুদ্রেব চেহাবাব বদলেব সঙ্গে সঙ্গে কবিব ভাববিন্যাস বদলে গেছে তা কে বলবে। সাগবেব পবিবর্তনশীল সৌন্দর্যে অবগাহন কবে কবিব হৃদয় যেন টেব পেল যে এত দেখেও তো শেষ পাওয়া গেল না। তখন শেষ কবিতাটিতে কবিকে স্বীকাবই কবতে হল—

এপাব ওপাব কবি পাবি না ত আব
আজ মোরে লয়ে যাও অপাবে তোমাব।

দেখে দেখে কবির চোখের তৃষ্ণা তো মিটল না। হাব মানলেন কবি এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন কবে দিলেন এই শেষ কথা বলে—

হে মোব আজন্ম সখা, কাণ্ডাবী আমাব।
আজ মোরে লয়ে যাও অপাবে তোমার।

এই শেষ কবিতাটি দাদাবাবু যখন পড়লেন তখন তাঁর চোখে মুখে এবং

কণ্ঠস্বরে আত্মনিবেদনের এমন-একটি অনির্বচনীয় ভাব ও ছবি ফুটে উঠেছিল তা ভাষায় বোঝানো সহজসাধ্য নয়। নৈনিতালের সান্ধ্যসাহিত্য-সভায় স্পষ্ট অনুভব করলাম যে কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকের আত্মিক যোগ হলে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি উৎসারিত হয়ে উঠে শ্রোতাদের শ্রবণ ও মননকে অভিভূত করে ফেলতে সমর্থ হয়। পাঠকের কণ্ঠস্বরে কবিতার ভাবব্যঞ্জনা যে কত মধুর হতে পারে তা বুঝলাম দাদাবাবুর ব্রাউনিং ও নিজের কবিতা-পাঠ শুনে।

নৈনিতালে আমি সব সময়েই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম মোনা বেবীর কৌতূহলী ও সন্দিগ্ধ কথার ইঙ্গিতে। আমার ৭৮ নং ল্যান্সডাউন রোডে যাতায়াতের কথা এবং মজুমদার-গৃহিণীর কন্যাদের নিয়ে পুরুলিয়াতে বায়ু-পরিবর্তন করতে যাবার কথা তাঁদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। আমার আমেরিকা যাবার আগ্রহটা তাঁদের কাছে কেমন কেমন ঠেকেছিল। তা ছাড়া দু-একটু আভাস হয়তো তাঁরা পেয়েছিলেন ঝুনু বিবুনুর বেফাঁস কথাবার্তা থেকে। সেইজন্যে তাঁদের ব্যাপারটা তলিয়ে জানবার ঔৎসুক্য এড়িয়েই চলতাম। অবাঞ্ছিত আলোচনাকে বন্ধ করতে হলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে অন্য বিষয়ের অবতারণা করা বহু প্রাচীন কায়দা। বেশ কিছুদিন মোনা বেবীকে ঠেকিয়েও রাখা গিয়েছিল। কিন্তু যখন চব্বিশে অক্টোবরের প্রাতে প্রথম সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আগের বছরের এই দিনটির কথা ভাবছিলাম ও মনে মনে সেই প্রভাতী সুরটুকু গুনগুনিয়ে উঠছিল ঠিক সেই সময়ে পেছনে মোনা বেবীর খিলখিল হাসিতে স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। 'কি, কাকা? এইবার ধরে ফেলেছি। কিসের ধ্যান করা হচ্ছে? আজ বুঝি অ্যানিভারসারি?' এইসব প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে উঠলাম। 'হ্যাঁ, সকালে বুঝি উঠতে নেই' জবাবটা তেমন জোরাল বলে যেন শোনাল না। তাঁরা বাড়ির ভেতর গিয়ে বৌঠানের কাছে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে রিপোর্ট দাখিল করলেন যে তাঁদের কাকা সকালে উঠে নাকি সূর্য প্রণাম করছিল। বৌঠানের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা গেল। আমি তখন 'কি যে আকথা কয়' বলে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলাম। চাপা ঠিক পড়ল না। সারাটা দিনই কথা কাটাকাটি চলতেই লাগল। মোনা না বেবী বিজ্ঞের মতো বললেন—

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে পূজার ছুটির দিনগুলি হু হু করে কোথা দিয়ে কেটে গেল। তার পর একদিন সদলবলে আমরা কলকাতায় ফিরলাম। পথে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নি। ফিরে এসে কলেজের ক্লাস আবার শুরু হল। যখন আমরা প্রথম তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়া আরম্ভ করলাম তখন দেখেছিলাম যে প্রায় বিশজন ছাত্র আমারই মতো ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছেন। পূজার ছুটির পর ফিরে এসে দেখলাম যে ইংরেজি অনার্স ক্লাসে হাজিরা দেন মোটে জন-বারো ছাত্র। তার পর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী থেকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে দেখলাম ইংরেজি অনার্স ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা নেমে গেছে চারে। আমি কখনো কলেজ পালাই নি প্রক্সি দিয়ে। ক্লাসে যেতাম নিয়মিত এবং মাস্টারদের পড়ানোটাও শুনতাম মন দিয়ে। কিন্তু সব সময় মনটা কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে সুধাংশুদের বাড়ি যেতাম ৭৮নং বাড়ির সামনের মাঠটার উপর দিয়ে। সে বাড়ির দিকে যে আড়চোখে দু-একবার চাই নি তা বলতে পারব না।

যাই হোক বাড়িতে বসে পড়াটা যতটুকু করা উচিত ছিল তা করা হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া অনার্সের সম্বন্ধে আমার তেমন আগ্রহও ছিল না। এমন-কি অনার্সের বইগুলিও কেনা হয় নি। যখন বি. এ. পরীক্ষার সময় এল তখন ভাবলাম যে পড়া যখন হয়ই নি এবং বইও কেনা নেই তখন অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাস-কোর্সের পরীক্ষাই দিয়ে ফেলি। অনর্থক ফি দাখিল করে কেন বাপের অর্থ ব্যয় করি? বাবাকে বললাম যে ফি দেবার সময় এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত লাগবে?' বললাম, 'অনার্স পরীক্ষা যখন দিচ্ছি না তখন খানিকটা কমই লাগবে।' বাবা 'কেন দিচ্ছ না?' বলে মুখ তুলে চাইলেন। বললাম, 'বই কিনি নি এবং তৈরিও হয় নি।' বাবা বললেন, 'বই না কিনলে তৈরি না হওয়ারই কথা। আচ্ছা দেখা যাবে।' আর কিছু বললেন না।

ডাক পড়ল দাদাবাবুর কাছে। কালীমোহন আলয়ের ভিতর দিকের লম্বা বারান্দায় দাদাবাবু সকালবেলায় একটু হাঁটছিলেন—বোধ হয় ব্যায়ামের জন্যে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তুই নাকি অনার্স পরীক্ষা দিবি না? আই. সি. এস. পড়তে বিলেত যাবি, অনার্স না নিলে লোকে হাসবে যে।' অনার্স নিয়ে

বিলেত গিয়ে আই. সি. এস. আমি পড়ব— কথাটা শুনে মুহূর্তে মনটা কেমন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। উৎসাহভরে কেমন বলেই ফেললাম, 'ভাবছি অনার্সটা দিয়েই দি।' দাদাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ সে-ই ভালো, একজন ভালো কোচ ঠিক কর। যা লাগে দেব'খন।' চলে এলাম। ভেবে অবাক হলাম যে আমাব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথা বাবা দাদাবাবুকে সব বলতেন এবং দাদাবাবুও বিনা বিবক্তিতে যথোচিত ব্যবস্থা করে দিতেন। নদিদির স্বামী শবৎবাবুও কথাটা শুনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা কবলেন, 'অনার্স দেবে না কেন?' জবাব দিলাম 'তৈবি নেই— তা ছাড়া বইও নেই।' তিনি বললেন, 'বই আজই কিনে আনো গে।' বলে আমাব হাতে একশো টাকা গুঁজে দিলেন। শবৎবাবুব উদারতা দেখে বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল কবে খানিকটা চেয়ে থেকে টাকাটা নিয়ে চলে গেলাম। সেইদিনই কলেজ স্ট্রীট থেকে বই কিনলাম কতকগুলি— তার মধ্যে বেশ মনে আছে ছিল ডাউডেনেব শেক্সপীয়বেব সমালোচনা, ওয়াটস্ সাহেবেব ইংবেজি ভাষাব ইতিহাস এবং আবো কি কি।

এখন প্রশ্ন হল ভালো কোচ কোথায় পাওয়া যায়। এই সময় সুধাংশুর এক বন্ধু প্রিয়কুমাব গুহবায় আমাদেব বাডিতে থাকতেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসেব ছাত্র। বি. এ. পাস কবে ল' পডছিলেন। আমি তাঁব কাছে ইতিহাস পডায় খুবই সাহায্য পেতাম। অত্যন্ত সদাশয় ও বসিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমাব মা তাঁকে খুব স্নেহ কবতেন। প্রিয়বাবুব কোনো কথা অগ্রাহ্য কবলেই তিনি আমাকে শাসাতেন যে 'মাব কাছে সব কথা ফাঁস করে দেব।' সবটা যে কতটুকু তা তিনিও জানতেন এবং আমিও জানতাম। তাঁর মোক্ষম অস্ত্র ছিল যে ৭৮ নং-এব মজুমদাব-পবিবাব জাতিতে কায়স্থ। বৈদ্য-সন্তানেব মা এটা শুনে বিচলিত হবেন এটাই ছিল প্রিয়বাবুব ধাবণা। এবং সেইজন্যেই প্রিয়বাবু মাঝে মাঝে হুমকি দিতেন— 'মাকে বলে দেব।'

যাই হোক এই প্রিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'একজন ভালো কোচেব সন্ধান দিন-না। সময় তো নেই হাতে। মোটে মাস দেড়েক কি বডো জোর দুমাস।' তিনি শুনেই বললেন, 'কেন, প্রেসিডেন্সিব ডাক্তাব প্রফুল্ল ঘোষই তো রয়েছেন। তবে দক্ষিণাটি একটু চড়া হবে।' আমি প্রিয়বাবুকে বুঝিয়ে দিলাম যে টাকার জন্যে ভাবনা নেই— যা লাগে

দাদাবাবুই দেবেন। প্রিয়বাবুর সঙ্গে গিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন যে তখন তাঁর হাতে নেপালের রাণাদের ছুটি ছেলে রয়েছে, তাঁব একেবাবেই সময় নেই। ফিরে এলাম ব্যর্থমনোরথ হয়ে। প্রিয়বাবু বললেন, 'দাঁড়াও, সিটি কলেজে আমি পড়েছি হরেন মুখুজ্যেব কাছে। চমৎকাব ইংবেজি পডান। তিনি এখন সিটি কলেজ ছেড়ে ইউনিভাবসিটিতে গিয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে পডাচ্ছেন। চল, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই।'

গেলাম প্রিয়বাবুর সঙ্গে হবেন মুখুজ্যেব বাড়ি। যতদূব মনে আছে ইনটালীর দিকে ছিল তাঁব বাড়ি। প্রিয়বাবু আমাকে পবিচয় করিয়ে দিলেন, 'সি. আব. দাশেব ভাই।' বোধ হয় তাঁব মনে হয়েছিল যে অধ্যাপকটি একটু থমকে যাবেন। তাঁব মনে সত্যি কী প্রতিক্রিয়া হল ঠিক তক্ষুনি তা বুঝতে পাবি নি। তিনি থেলো হুঁকোয় মৃদু টান দিতে দিতে বললেন, 'কী অভিপ্রায়?' প্রিয়বাবু ব্যাপাবটা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'এ কয়দিনে ইংবেজি অনার্স পডা তৈবি কবানো যায় কি? আমি যদি ইংবেজি লেখকদেব নামগুলি এবং প্রত্যেক নামের পাশে পাশে তাঁদেব মাত্র দুখানি বইয়েব শিবোনামা লিখে দি, তবে সেই লিস্টিটা মুখস্থ কবতেই তো এঁব দেডমাস কেটে যাবে। তবে সে-সব বই পড়বেন কখন?' আমি বললাম, 'না, স্যাব, আমি পাবব। শুধু আপনি আমাকে পডাব লাইনটা বাতলিয়ে দেবেন। দাদা বললেন যে আই. সি. এস. পডতে গেলে অনার্স না হলে চলবে না।' হবেনবাবু বললেন, 'ও, আপনি বিলেতে যাবেন? এই দেখুন, আমরা এখানে আপনাকে ওয়াটস্ সাহেবের ইংবেজি সাহিত্যেব ইতিহাস বইখানি পড়াব। আপনি বিলেতে গিয়ে একেবাবে স্বয়ং ওয়াটস্ সাহেবের কাছেই পডবেন সেই ইতিহাস। কাজেই না-ই বা হল অনার্স এখানে। আপনাব কিছু ক্ষতি হবে না। এই ধরুন, বি. এ. পবীক্ষা দেবাব সময় আমার মা গত হলেন। আমাব পড়ায় বাধা পড়ল। সেই কাবণে আমার ভালো বেজাল্ট হয় নি। কিন্তু এম. এ.-তে আমি ভালো করে পড়ে ভালো বেজাল্ট করলাম। ক্ষতি তো কিছু হয় নি।' প্রিয়বাবুকে জনান্তিকে একটু টিপে দিতেই তিনি স্যাবকে বুঝিয়ে দিলেন যে দক্ষিণার জন্যে তিনি যেন চিন্তা না করেন। যা লাগে সি. আব. দাশই দেবেন। হরেনবাবু থেলো হুঁকোয়

বড়ো একটা সুখটান দিয়ে সেটা দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখো প্রিয়, তোমায় বলি। আমি অনেক ছাত্র পড়িয়েছি গৃহশিক্ষক হিসেবে। আমার কোনো ছাত্র আজ পর্যন্ত ফেল হয় নি। এঁকে দিয়ে সেটা কেন আরম্ভ করি এই বয়সে?' বুঝলাম যে কথাটায় সত্যার্থ আছে। নমস্কার করে দুজনে বের হয়ে এলাম। অপমানে অপদস্থ হয়ে মনে মনে যে অপ্রস্তুত লাগছিল না তা-ও বলতে পারি নে।

বহুদিন পরে এই প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তখন বাংলাদেশের রাজ্যপাল আর আমি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের জজ। তিনি দিল্লী এসেছিলেন রাজ্যপালদের কি একটা কনফারেন্সে। সেখানে দেখা হলে ওই পুরানো গল্পটা তাঁকে বলায় তাঁর মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। আমরা দুজনে হেসে আর বাঁচি নে। একটু তামাকে দম দিয়ে— হুঁকোটা তিনি সঙ্গেই দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন— বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'মিথ্যে তো বলি নি, মশায়। অনার্স না হওয়ায় আপনার তো সত্যি কোনো ক্ষতি হয় নি।'

হরেনবাবুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরে এলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় দাদাবাবুকে জানালাম যে ভালো কোচ পাওয়া গেল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোদের নিজের কলেজে ইংরেজির মাস্টার কে? তাঁকে পাওয়া যায় না?' বলেই একটা সরু কচুগাছের ডাল দিয়ে নিজের কানটাতে দুই আঙুলে ঘোরাতে লাগলেন। এটা দাদাবাবুর একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— কচুর ডগায় কান চুলকানো। তাঁকে জানালাম যে আমাদের সিনিয়ার প্রফেসার হলেন ললিত বাঁড়ুয্যে। দাদাবাবু বললেন কালই যেন তাঁর চিঠি নিয়ে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করি। দাদাবাবুর কথামত পরদিন কলেজেই ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করে দাদাবাবুর চিঠিখানা দিলাম। তিনি চিঠি পড়ে তাঁর অভ্যাসমত আমার মুখে একবার চেয়ে চোখটা ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে বললেন—'তাই তো মুশকিল হল। কলেজে যা পড়াই সেটা নিজে পড়ে তৈরি হতে সারা সকালটা কেটে যায়। সারা দুপুর তো কলেজেই থাকি। সন্ধ্যার সময়টা আমার নিজের একটু লেখার কাজ থাকে কিনা। তাই তো। অথচ দাশ-সাহেব চিঠি লিখেছেন। কি করি বুঝছি না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো। আমার ছেলে তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন কি কি বই পড়তে হবে এবং তিনি তোমাকে প্রশ্ন করে পাঠাবেন। তুমি সেইসব বই পড়ে প্রশ্নের জবাবটা

তাকেই তাঁব কাছে পাঠিয়ে দিও। তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করবেন। এব জন্যে দাশ-সাহেবেব কাছে কী নেব। না, না, সে-সব কিছু লাগবে না।' নমস্কাব কবে চলে এলাম। তার পবদিন অনার্স পরীক্ষা দেব বলে কলেজে ফি দাখিল করে দিয়ে এলাম। দেখলাম যে আমাদেব হারাধনেব চাবটি অনার্সেব ছেলেব মধ্যে ফিস দাখিল কবলাম আমি আব সেই ধর্মদাস ঘোষেব ভাই। বাকি দুজন শেষ মুহূর্তে বণে ভঙ্গ দিলেন।

খুব উৎসাহেব সঙ্গে শুরু কবলাম চিঠিপত্রে অনার্স পডা। বিস্তব খেটে-ছিলাম। মবিয়া হয়ে পড়েছিলাম দেড়টা মাস। হিসেব কবে দেখলাম যে ইংবেজি সাহিত্যের ইতিহাস ও ইংবেজি ভাষাতত্ত্ব বলে যে ষষ্ঠ পেপাবটা আছে সেটাতে শূন্যি পেলেও অন্য পাঁচটা পেপাবে টেনে-মেনে যা নম্বব তোলা যাবে তাতে ছটা পেপারেব পূবা নম্ববেব শতকবা চল্লিশ নম্বব উঠে আসবে। পবীক্ষাও দিলাম। বসে বইলাম ফলাফলেব আশায়। মনে তেমন ভবসা পেলাম না। যাই হোক যথাসময়ে ফল বেব হল। সেই ঘোষ ছেলেটি ফেল। আমি অনার্স পেলাম না— তবে পাস-কোর্সে নাম বেরুল। যাকে বলে কানেব কাছ দিয়ে গেল। কয়েকদিন গা-ঢাকা দিলাম কি বলব ভেবে না পেয়ে। মার্কসীট নিয়ে এলাম— ৩৮ পার্সেন্টেব একটু উপবে উঠেছিল নম্ববটা। একদিন বুকে সাহস বেঁধে গেলাম বৌঠানেব কাছে। উঠেই দেখি দাদাবাবু বাবান্দায় হাঁটছেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি বে বেজাল্ট বেরুল?' বললাম, 'হ্যাঁ, পাস কবেছি।' তুরন্ত প্রশ্ন এল 'কোন্ ক্লাস?' কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, 'অনার্সটা পেতে পেতে পাই নি। অল্পের জন্য ফসকে গেছে।' দাদাবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, 'যা, যা হয়েছে, ঢেব হয়েছে।' পাশ কাটিয়ে বৌঠানেব ঘবে ঢুকে পডলাম। সেখানে যে অভ্যর্থনাটা হল তা লোক ডেকে ডেকে বলবাব মতো নয়। যাই হোক, এইখানেই সাঙ্গ হল আমাব কলকাতায় কলেজে পডাব পালা।

ষোড়শ অধ্যায

বিলেতে আইন পড়া

১

অনার্সে ফেল কবে ববাত জোরে ও বাপেব পুণ্যে পাস-কোর্সে বি. এ. পাস করে বিলেত যাবাব কথাটা উত্থাপন কবাটা নিছক আবদাবের মতো শোনাবে ভেবে দিনকতক বিমর্ষ হয়েই বইলাম। যখন দেখলাম যে সুধাংশু ডিগ্রি না পেয়েও দাদাবাবুব দৌলতে বিলেতে আইন পডতে যাবার তদ্‌বির করছেন তখন মনে হল যে তবে আমিই বা যাব না কেন। তা ছাড়া বৌঠানেব কাছে আমার বায়নাক্কাব সীমা ছিল না। তাই ভাবলাম যে একবার চেয়ে দেখলেই বা ক্ষতি কি। বোজ যেমন যেতাম বৌঠানের কাছে তেমনি সহজভাবেই একদিন হাজিবা দিতে গিয়ে কথাটা পেড়েই ফেললাম। বৌঠান আমার কৃতিত্বেব অভাবেব কথা কিন্তু একবারও তুললেন না। তিনি খালি বললেন, 'যাবি তাতে আমার কি আপত্তি? তবে যুদ্ধ যেমন চল্‌তেছে তাতে ভয় কবে। যদি তোব কিছু অঘটন ঘটে তবে আমি কেন তাব নিমিত্তেব ভাগী হই। কাকা, খুড়িমা কি বলেন?' বৌঠানকে বললাম, 'বাবা মাব আপত্তি হৈবো না।' তিনি বললেন, 'মনগডা বলতেছিস, না, জিজ্ঞেস কইর্‌বা বলতেছিস?' বস্তুত বাবা মাকে জিজ্ঞাসা কবাই হয় নি, কেননা বৌঠানের ভবসা না পেয়ে বলেই বা কি হত। যাই হোক কথাটা ঘুবিয়ে বললাম, 'আজই জিজ্ঞাসা করুম অনে।'

হৃষ্টচিত্তে ১৪নং মল্লিক লেনে ফিরে গেলাম। মনে কবলাম যে আগে মায়েব মতটা পেলে বাবাব মতটাও পেতে অসুবিধা হবে না; সেই রাত্রেই মাকে বেশ জডিয়ে ধবে আদব করলাম। মা বললেন, 'কিবে, খোকা?' আমি বললাম, 'মা, আমি বিলাত যাইমু। তুমি রাজি হইলেই বৌঠাইন টাকা পয়সাব ব্যবস্থা কইরা দিবেন কইলেন।' তখন খবরেব কাগজে নিত্য জার্মান ডুবো জাহাজেব টবপেডোতে ইংরেজদের বড়ো ছোটো জাহাজ সব ফুটো করে সাগরেব অতলে ডুবিয়ে দেবার খবর বেব হচ্ছিল। মা খবরেব কাগজ পডতেন না, কিন্তু পরম্পবায় সে-সব খবর মোটামুটি তাঁর

অজানা ছিল না। তা ছাড়া তখন আবার জার্মান জেপেলীনের হামলাও দু-একবার বিলেতের উপর হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'ওবে খোকা, সর্বনাশেব কথা কইছ্ না। যাবি কেমনে? জাহাজ ডুবাইয়া দিলে কি সর্বনাশই হইব।' আমিও বেশ বিজ্ঞেব মতো মাকে বোঝাবাব চেষ্টা করলাম—'দেখ মা, বাঁচন, মবণ কি মাইনসেব হাতে? বাখে কৃষ্ণ মাবে কে? এই ধব না ক্যান, কলেজে যাইতে গিয়া মটব কি ট্রাম চাপাও তো পডতে পাবি। ছোঁয়াচ লাইগ্যা হাম, বসন্তে তো মবতে পাবি। কলেবায়ও কত হাজাব হাজাব লোক মরে প্রত্যেক বছব। আমাব ভাইগ্যে যদি মবণই লেখা থাকে, তবে তুমি, মা, ঠেকাইবা কেম্‌নে? সবই ভগবানের ইচ্ছা।' মায়েব মনটা একটু যেন ভিজেছে মনে হল। তখন আবাব বললাম, 'দেখ মা, এ সুযোগ কিন্তু জীবনে একবাবেব বেশি দুইবাব আইব না। দাদাবাবু, বৌঠাইন যখন বাজি হইছেন তখন তুমিও বাজি হইয়া যাও।' আমাদেব মা ছিলেন প্রকৃতই ঈশ্ববিশ্বাসী। তিনি বুঝলেন যে মানুষের জীবন-মবণ নিয়ন্ত্রণ করবাব মালিক অদৃশ্যে বসে যা ব্যবস্থা কববেন তা কেউ-ই খণ্ডাতে পাববে না। মা ধীবে ধীবে আমাব মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'দেখি, উনি কি কয়ন্।' অর্ধেক বাজিমাৎ বুঝে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম সে বাত্রে নিজের বিছানায় না গিয়ে একেবারে মায়ের কোলে।

দু-একদিন পবে মা জানালেন যে বাবাব ও তাঁব নিজেবও আপত্তি নেই আমাব বিলেত যাওয়ায়। উল্লসিত হয়ে বৌঠানকে সুখববটা দিলাম। তিনি হেসে বললেন, 'খুড়িমাব যখন মত আছে, তখন আব কথা কি? যাবি ত যা।' ব্যস আমাকে আব পায় কে? ইতিমধ্যে হয়েছে কি, দিদিমণি তবলা জার্মান সাবমেবিনেব কুকার্যেব বহব দেখে সুধাংশুকে সঙ্গে নিয়ে একেবাবে সুদূব হাজাবীবাগে চলে যাবাব সংকল্প কবলেন। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল যে সুধাংশু আর আমি একসঙ্গে থাকলেই যত গোল বাধে। সুতরাং সুধাংশু কলকাতায় না থাকলেই বিলেত যাবার তাল আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রথমটা মনটা কিছু দমে গেল, কেননা সুধাংশুব আবদাবেব ধাক্কায় বেশ জোর ছিল এবং সে জোবটা থেমে গেলে আব কি আমার যাওয়া হবে? কিন্তু দেখলাম বৌঠানের মনে সে ভাবটা জন্মে নি। সুধাংশু যদি না-ই যায় তার

মায়ের নির্দেশে, তাতে করে আমার যেতে বাধা কি, যখন আমার বাপ-মায়ের অমত নেই? বৌঠানেব এই উদাব মনোভাব আমার কাছে যে খুবই ন্যায্য ও শুভবুদ্ধিব পবিচায়ক বলে মনে হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। নিশ্চিত মনে বাড়িতে বসে কাপডচোপড়েব তালিকা ঠিক করতে লাগলাম এবং লালবাজাবের পুলিস অফিসে গিয়ে ছাডপত্র জোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। তখনকাব দিনে আজকালেব মতো পাসপোর্টেব হাঙ্গামা ছিল না। তখন দবকাব হত সামান্য একটি সার্টিফিকেট অব আইডেনটিটি। এটা যোগাড কবা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। দেখতে দেখতে দিদিমণি ও সুধাংশুর হাজাবীবাগে যাবাব দিন এল। সুধাংশুকে বললাম, 'ভাই, যাবাব আগে একবাব তোর জ্ঞানদামাসিমাকে জিজ্ঞেস কববি আমি বিলেত থেকে বুবুকে চিঠি লিখতে পাবি কি না?' সুধাংশু বললেন, 'গাছে না উঠতেই এক কাঁধি। সে-সব কথা দেখা যাবে যাবাব আগে। আমি তো যাচ্ছি হাজাবীবাগে। দেখিস যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল না হয়।' কাষ্ঠ হাসি হেসে বন্ধুকে বিদায় দিলাম।

মানুষ ভাবে এক হয় আব। সুধাংশু চলে যাওয়ায় দিদিমণিব আপত্তির জেব আব রইল না। আমাব বাপ-মায়েব মত ছিল আমাব যাবাব সপক্ষে। সুতবাং এখন খালি কাপড়চোপড় তৈবি কবা আব জাহাজেব টিকিট কিনে জাহাজে উঠে পডা। যখন এইবকম একটা অতি-সম্ভাব্য অবস্থায় মশগুল হয়ে আছি আমাব মায়েব এক বৃদ্ধ মাসী এলেন আমাদেব বাড়ি। তিনি একেবাবে ভণিতা না কবেই শুরু কবলেন, 'আলো, বিনি, তব পোলায় বলে বিলাত যাইব? কছ কি? জানছ না ডুবাজাহাজে ইংবাজ গ সব জাহাজেব তলা ফুটা কইব্যা ফেলাইতে আছে জার্মানবা?' মা বললেন, 'হ, মাসিমা, পোলা ত যাওনেব লেইগ্যা ক্ষেইপ্পা উঠছে। যাউক, ভগবানেব হাতেই অরে সইপ্যা দিছি।' মাসী বললেন, 'পোলা ক্ষেপছে দেইখ্যা তুই-ও কি পাগল হৈলি? গিহ্য পোলাবে যাইতে দিছ না। সর্বনাশ ডাইক্যা আনিছ না।' আমাব এত কষ্টেব তোডজোড সব ভেস্তে যাবার যোগাড হল। মা বাত্রে বললেন, 'না বে খোকা, মাইন্‌সে বড কুডাক ডাকতে আছে। তা ছাড়া দেখছত ভাসুরঝি তাব পোলা সুধাংশুবে যাইতে দিব না বইল্যা কইলকাতা থনে সবাইয়া লইয়া গেল। চিত্ত বাসন্তী যখন টাকা দিব কইছে তখন তাবা দিবই। কিছুদিন পবেই না হয় যাইছ।' সেদিন রাত্রে

আর কিছু তর্ক করলাম না। ঠিক বুঝলাম যে ঐ ঠারাইন যতদিন আছেন বাড়িতে ততদিন বলে কিছু লাভ নেই। মায়েব মাসিমা চলে যাবার পব আবাব মায়েব ভাঙা মন জোড়া দিতে আমাব লেগেছিল নিদেন পক্ষে দিন-দশেক। এইবকম সাময়িক বাধা আবো একবাব এসেছিল। দেখলাম যে আমাব উপবে মাব একটু দুর্বলতা ছিল। আমাব সাধে বাদ সাধতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিত না। শেষ পর্যন্ত মা আমাব কথা শুনতেন। ভগবানেব অসীম দয়ায় ও আমাব মায়ের আন্তবিক আশীর্বাদে আমার সাধ-গুলি কখনো উদ্ভট বা অকল্যাণপ্রসূ হয় নি।

যখন আমাব ছাড়পত্র এসে গেল তখন কলেজেব সর্বাধ্যক্ষ গিবিশ বোস-মশায়েব কাছে গিয়ে প্রণাম কবে জানালাম যে আমি বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়তে যাচ্ছি। তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বলা মাত্র তিনি আমাকে একটি সুন্দব সুপাবিশপত্র দিয়ে দিলেন। তাব পব ছুটলাম শান্তিনিকেতনে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমেব প্রাক্তন ছাত্র বলে গুরুদেব ববীন্দ্রনাথও আমাকে অজস্র তাবিফ কবে একটি সার্টিফিকেট তক্ষুনি হাতে হাতে লিখে দিলেন। কলকাতায় ফিবে এসেই ছুটলাম বৌঠানেব দববাবে। বললাম, 'বৌঠান, এবাব তবে যাই।' বৌঠান বললেন ঐ একই কথা, 'যাবি তো যা।' আমি একটু অসহিষ্ণুতাসহকাবেই বলে ফেললাম, 'আপনে তো বলেন 'যাবি তো যা'। আমি কি পায়ে হাইট্যা জাহাজে গিয়া উঠুম? কাপড়-চোপড় কবাতে হৈবো না? জাহাজেব টিকিট কিনতে হৈবো না? সে-সবেব কি ব্যবস্থা হৈবো?' বৌঠান বললেন, 'ও হবি, টাকার লেইগ্যা তোর যাওয়া আইট্‌কা আছে নে কি?' আমি তখনো বললাম, 'না তো কি?' সেদিন সন্ধ্যায় দাদাবাবু উপবেব ঘবে আসতেই বৌঠান তাঁকে বললেন, 'খোকাব যাবার খবচেব ব্যবস্থা না কবলে ও যাইব কি কৈরা? দেরি হৈয়া যাইতেছে। যাইবই যখন তখন শুভস্য শীঘ্রম্‌ই তো ভালো।' দাদা বললেন, 'কাইল সকালেই আইসা চিঠি নিয়া যাইছ।'

সকালে গিয়ে দেখলাম যে দাদাবাবু তাঁব ব্যাঙ্ক গ্রিণ্ডলে কোম্পানিকে একেবাবে ঢালা অর্ডাব দিয়েছেন যে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানিব মেইল বোটে লণ্ডন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীব টিকিট এবং কলকাতা থেকে বম্বে পর্যন্ত বেল টিকিট এবং আমার সঙ্গে ট্র্যাভেলার্স চেক মোটাবকমের বন্দোবস্ত যেন যত শীগ্‌গির সম্ভব করা হয়। তাব পব আবো লিখেছেন যে লণ্ডনে পৌঁছবার পর

আমাকে মাসে মাসে ২৫ পাউণ্ড করে পাঠাতে হবে। একটা চেকও আমাকে দিলেন এবং বললেন যে ভাঙিয়ে কাপড়চোপড় ইত্যাদি যেন কিনে নি। আমায় আব পায় কে ?

খেয়েদেয়ে দুপুববেলা হাইকোর্ট পাড়ায় গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কে চলে গিয়ে ম্যানেজাবকে দাদাবাবুব চিঠি দিলাম। তিনি চাপরাশি দিয়ে আমাকে তাঁদেব জাহাজ ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দিলেন। তখন প্রতি সপ্তাহে ববিবারে বম্বে থেকে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানিব জাহাজ এডেন, সুয়েজ, মার্সাই, জিব্রাল্টার হয়ে লণ্ডনে টিলবেবী ডকে যেত। যাত্রীবা ইচ্ছে কবলে মার্সাইতে নেমে বেলে কবে ফ্রান্সেব মধ্যে দিয়ে গিয়ে ছোটো জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পাব হয়ে লণ্ডনে যেতে পাবত। ফবাসি ভাষা জানি না বলে আমি সোজা জলপথে লণ্ডনে যাওয়াই পছন্দ কবলাম। যেদিন গেছি ব্যাঙ্কে তাব পবেব ববিবাবেব পবেব ববিবাব যে জাহাজটা বম্বে থেকে ছাড়বে তাব নাম শুনলাম 'ক্যালিডোনিয়া'। গ্রিণ্ডলে কোম্পানিব সাহেব আমাকে সেই জাহাজটার একটা নক্সা দেখিয়ে বললেন কোন্ কেবিনটা আমাব পছন্দ। কেবিনেব নাকি এ, বি, সি ক্লাস আছে তাদেব জায়গা বুঝে। আমি বিনয় করে বললাম যে আমি কী আব বলব। তিনিই যেন সস্তা দেখে একটা কেবিন ঠিক কবে দেন। তিনি বললেন যে টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্র তিনি দু-একদিনেব মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন। চেকটা ভাঙিয়ে নিলাম।

সেইদিনই বাবাব সঙ্গে গিয়ে কলকাতাব নিউ মার্কেটে দুটো চামড়াব বড়ো মজবুত বাক্স কিনলাম। টাই, মোজা, গেঞ্জী, ড্রয়ার্স, সার্ট, কলাব, রুমাল সব কেনা হল। সে সময়ে পয়সা থাকলে দুদিনেব মধ্যে বাজাব কবে একটা বিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, বিলেত যাবাব কেনাকাটা তো ছাড় কথা। সেই পুবানো সেপার্ড অ্যাণ্ড হফেনেব দোকানে একটা ওভারকোট ও দুটা গবম সুটেব অর্ডাব দিলাম। তার পরদিনই ট্রায়েল এবং তার তিনদিন পরেই জিনিসগুলি পাওয়া যাবে।

কেনাকাটা শেষ কবে জিনিসগুলি বাক্সে ভালো করে সাজিয়ে আমি দিন গুনতে লাগলাম। যে রবিবাব জাহাজ ছাড়বে তার আগেব বৃহস্পতিবার আমাকে বম্বে মেলে কলকাতা ছাড়তে হবে। একবার ভাবলাম যে সুধাংশুকে খবরটা দিয়ে রাখি যদি হাজারীবাগ রোড স্টেশনে এসে দেখা

করে। বুবুর কাছে চিঠি লিখবার অনুমতি পাবার জন্যে তাঁর জ্ঞানদা-মাসিমাকে সুপারিশ কববার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেও বটে। চিঠিটা ডাকে দিয়েই মনে হল যে হয়তো ভালো করলাম না, কেননা সুধাংশু হয়তো হন্যে হয়ে তাব মায়ের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য কবে কলকাতায় চলে আসবে, আমাব সঙ্গে জুটে পডবার জন্যে। কে জানে হয়তো আমাব যাওয়াটাও ভেস্তে যাবে। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি— চিঠি তো ডাকেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। দিন আব যেন যায় না। কে জানে মায়েব কোনো শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়া এসে আবাব না বিপদ বাধায়। এইবকম যখন মনেব অবস্থা তখন খবব এল দাদাবাবুব সঙ্গে দেখা কববাব জন্যে। কি আবাব হল? যাওয়াটা ফসকে যাবে না তো? না, সে কি হয়? টিকিট তো কেনা হয়েই গেছে? সেকালে ছোটোবা বিলেত গেলে বডোবা, মদ না খাওয়া, মেয়েদেব সঙ্গে বেশি না মেশা, মন দিয়ে পডাশুনা কবা, ঠাণ্ডাব মধ্যে টৈ টৈ কবে বাত্রিতে থিয়েটাব পাডায় না ঘোবা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন শুনেছিলাম। ভাবলাম যে দাদাবাবুও ঐ ধবণেব কিছু উপদেশ-টুপদেশ দেবেন। হাজার হোক এতগুলি টাকা যিনি খরচা কববেন তিনি দুচাবটে ঐ ধবণের উপদেশ দিতেই পাবেন। গেলাম তাঁব কাছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা কবলেন আমার সব কেনাকাটা হয়ে গেছে কি না, কোন্ জাহাজে যাচ্ছি ইত্যাদি। যথাযথ উত্তব পেয়ে ধীবে ধীবে বললেন, 'দেখ্, এই কথাটা ভুলিস না যে তুই মানুষ হৈলে তোব ভাই দুটিবও হিল্লা হৈব। মনে রাখিস যে তব বাপ মা তর দিকেই চাইয়া থাকবেন।' আব কিছুই বললেন না। কোথায় গেল তত্ত্বকথা, হিতোপদেশ। কিন্তু আমাব দাদাবাবুব ঐ কটি কথা আমাব মনেব মধ্যে গেঁথে গেল। আমাব কাছে তিনি নিজেব জন্যে কিছুই কখনো প্রত্যাশা করেন নি। কিন্তু ঐ কটি কথা দিয়ে তিনি আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিলেন সেদিন সন্ধ্যায়, সে দায়িত্ব-ভাব যদি আমি পালন কবতে পেবে থাকি তবে নিশ্চয়ই জানি দাদাবাবুব বিদেহী আত্মা তৃপ্তিলাভ করেছে এবং পরলোক থেকেও আমাকে আশীর্বাদ কবেছে।

২

অবশেষে বৃহস্পতিবার ২৫শে জুলাই সমাগত। সেদিন যে আমার কি

চিত্তবিক্ষেপ হয়েছিল তা বলা যায় না। দেশ ছেড়ে একলা সাত সমুদ্র পাড়ি দেবার চিন্তায় মনে কত ভয়-ভাবনাই না হচ্ছিল। বাড়ি ছেড়ে যেতে মনে মনে দুঃখও পাচ্ছিলাম। অথচ যাবার উৎসাহে মনটা কেমন নেচে উঠছিল। ভয় সর্বদাই হচ্ছিল যে কে জানে, আবাব কি বাধা পড়ে। সন্ধ্যাব আগেই গিয়ে দাদাবাবু ও বৌঠানকে প্রণাম কবে এলাম। বাবা-মাও স্টেশনে এসেছিলেন। নসু, বুধা ও বুড়িও ছাড়ে নি বোধ হয়। স্টেশনে লোক গিজ গিজ কবছিল। মোনা ও সুধীবেব বিয়ে তখন একবকম ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। তাবাও এসেছিলেন আমাকে এগিয়ে দিতে। মোনা হেসে বললেন, "কাকা বি গুড।" মা-বাবাকে প্রণাম কবলাম। মা আমাব মাথাটা দুহাতে ধবে আঘ্রাণ কবে একটু "থু থু" আওযাজ কবলেন। বোধ হয় তাঁব বিশ্বাস ছিল যে তাঁব থুথুতে উচ্ছিষ্ট হলে অশুভকব ভূতপ্রেত আমাকে ছোঁবেই না। ট্রেন ছাডল। অনেক হাত নাড়লাম। আস্তে আস্তে ট্রেন প্ল্যাটফবম ছাড়িয়ে অন্ধকাবেব মধ্যে ছুটে চলল বম্বেব দিকে। সেই নিকষঘন অন্ধকাবেব মধ্যে আমার মনে ফুটে উঠল উজ্জ্বল দুটি তাবার মতো আমাব মায়েব করুণায় বিগলিত দুটি চোখের চাহনি। বেলগাড়িব বিবামবিহীন ক্রমবর্ধমান গতি-বেগের একঘেয়ে তালে তালে ধীবে ধীরে আমার ক্লান্ত দেহ ও শ্রান্ত মন এলিয়ে পডল সুষুপ্তিব অতল গভীবতায়। সুধাংশুব কোনো সাডাশব্দই পেলাম না। এমন-কি কখন যে আমাদেব বেলগাড়ি হাজাবীবাগ রোড স্টেশন পেরিয়ে গেল তা টেবই পেলাম না।

ভোব হতে না হতেই ঘুম ভাঙল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম যে লাইনের দুধাবেব গাছগুলিব চেহারা বাংলাদেশেব গাছপালাব মতো সবুজ ও জোবালো নয় এবং দিগন্তবিস্তৃত মাঠগুলিও বাংলাদেশেব শস্যক্ষেত্রের মতো শ্যামল, সজীব ও নয়নাভিবাম নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল যে আমরা বাংলাদেশ ছাডিয়ে অন্য প্রদেশে এসে পডেছি বাত্রির অন্ধকাবের মধ্য দিয়ে। এখানে দুধাবেব মাঠগুলি রুক্ষ ও উষব, মানুষগুলি যাবা মাঠে কাজ কবছে তাদেব যেন কেমন শক্ত কাঠ-কাঠ চেহাবা। বলদগুলির চেহারাও কিছু বদলেছে। বাংলাদেশেব বলদেব কুঁজেব বাহার এদেশের বলীবর্দের নেই। বেশ কটা মহিষও দেখলাম। কিন্তু শৃঙ্গ-দুটি বাংলাদেশের মোষেব শিংয়ের মতো সুঠাম বাঁকানো নয়। কানেব দুই দিকে লম্বা হয়ে বাইরের দিকে যেন উঁচিয়ে আছে। এইরকম কবে চলতেই লাগল আমাদের

রেল-গাড়িখানা ঘন্টার পর ঘন্টা। লম্বা লম্বা পাড়ি দেবার পর এক একটা বড় স্টেশনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জল ও কয়লাব ইন্ধন জুগিয়ে আবার শুরু হয় লম্বা দৌড। স্টেশনের নাম লেখারও ঢং বদলে গিয়েছে দেখলাম।

পথে স্মরণীয় ঘটনা বা অঘটন কিছু ঘটে নি। একটা অস্বস্তি যা হয়েছিল তা বলেই ফেলি। বম্বে মেলে একটা বড়ো রেস্টুরেন্ট ডাব্বা থাকে এবং যাত্রীবা সেখানে বসে বেশ আরামে সময়মত আহারাদি করে থাকে। আমি বাডি থেকে এই প্রথম দূব পথে বের হয়েছি। আমাব কেবলি মনে হতে লাগল যে সেই খাবার ডাব্বায় গেলে আমাব অনুপস্থিতিকালে কেউ যদি আমার বাক্সপ্যাঁটবা ও অ্যাটাচি কেস নিয়ে লম্বা দেয় তবে বাডিব লোকেরা কি বলবে? জিনিসগুলি হাবানোব সম্ভাবনাব ভাবনা তো ছিলই কিন্তু তার চেয়ে বড়ো ভাবনা ছিল যে বাডিব লোকেবা বলবে 'ট্যালা ছেলে'। ফলে দাঁডাল এই যে আমি আব গাডিব কামবা ছেডে বেরই হই নি। খাবাব ঘরেব উর্দিপবা 'বয়'দেব ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কবে কামরায় খাবাব আনিয়েই খেতাম। প্রথমবাবেই যৎকিঞ্চিৎ বকশিশ দেওয়াতে সেই 'বয়টি' আপনা হতেই এসে খাবাবেব অর্ডাব নিয়ে যেত। এজন্যে পথে আর অস্বস্তি হয় নি। তখনকাব দিনে বম্বে পৌঁছাতে প্রায় দুইদিন লাগত। রেল যখন বম্বের কাছাকাছি জায়গায় এসে পডেছে তখন দুধাবেব দৃশ্য খুবই মনোরম বলে মনে হয়েছিল। ঘন জঙ্গলেব মধ্যে দিয়ে বেল চলেছে উদ্দাম গতিতে। মাঝে মাঝে এক এক ধারে ভয়াবহ খাডা পাহাড। গাড়ি উল্টে পড়লে যে কোন রসাতলে গিয়ে ঠেকবে তাব ঠিকানাই নেই। ওই-সব দৃশ্য দেখলে ভয় হয় বটে তবে তা যে নয়নাভিবাম তাতেও সন্দেই নেই।

অবশেষে আমাদের বেলগাডি এসে দাঁড়াল বম্বাইয়েব বিখ্যাত ব্যালার্ড পিয়ারে। স্টেশন লোকে লোকাবণ্য। যাত্রীবা নামছে তাদেব জিনিসপত্র নিয়ে। কুলির হাঁকডাকে স্টেশন মুখরিত। যাত্রীদেব বন্ধুবান্ধবও এসেছেন অনেক। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক যাত্রীদেব মুখ চেয়ে চেয়ে এক কামরা থেকে অপর কামরার সামনে হেঁটে চলেছেন। আমাকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খোকা, এসে গেছ? বাবাঃ, তুমি কত লম্বা হয়ে গেছ। আর একটু হলে তোমাকে চিনতেই পাবতাম না। বাডিব সবাই কেমন আছেন?' চেয়ে দেখি বম্বে-প্রবাসী আমাদেব মৃত দাসীপুত্র হরিচরণ ঘোষ ওরফে ইন্দুর কাকা। বুঝলাম যে পাছে আমি হারিয়ে যাই বা ঠিক সময়ে

ঠিক জায়গায় না যেতে পারি এই-সব দুর্ভাবনায় বাবা তাঁকে খবর দিয়েছেন আমাকে মদত দেবার জন্যে। এঁকে আমরা কাকার মতোই ভাবতাম। প্রণাম করতে যাওয়ামাত্র তিনি কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পেছিয়ে গেলেন। এমন সময় গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের একটি ক্যাপপরা কর্মচারী আমাকে খুঁজে বার করে আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলেন। 'টেলিগ্রাম আবার কি রে বাবা, ফিবে যেতে বলে নিত'—এই ভাবনা যখন আমার মাথায় ক্ষণিক তড়িতপ্রভার মতো খেলে গেল তখন সেই ভদ্রলোক বললেন, 'ট্রেনটা দেবিতে এসেছে। সময় একেবারেই নেই। এক্ষুনি কাস্টমসে গিয়ে জিনিসপত্র দেখিয়ে তাব পর ছাড়পত্র ও টিকিট স্টীমার কোম্পানির লোকদের দেখাতে হবে।' কাছেই একটা স্টীমলঞ্চ প্রস্তুত রয়েছে আমাদেব মাঝদরিয়ায় লঙ্গর করা জাহাজে তুলে দেবার জন্যে। ভদ্রলোকেব তাডনার সুযোগ নিয়ে না খোলা টেলিগ্রামটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুবে ইন্দুব কাকাব কাছে বিদায় নিয়ে মালপত্রসহ সেই ক্যাপধারী ভদ্রলোকের পিছু পিছু গিয়ে যা কবণীয় সব শেষ কবে সেই লোকটিকে গোটা তিনেক টাকা ও বেলে পেতে শোবার জন্যে যে বালিশ ও বিছানার চাদর এনেছিলাম তা উপহার দিয়ে স্টীমলঞ্চে নামলাম ঝোলানো সিঁড়ি দিয়ে।

লঞ্চটা ছাডল আমাদেব বড়ো জাহাজে তুলে দেবাব জন্যে। বাস্ বে বাস্! সে কি উত্তাল তবঙ্গ! সেদিন ছিল জুলাই মাসের ২৭শে তারিখ। একেবাবে ভবা মৌসুম। ছোট্ট স্টীমাবটি যেন আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল। ঢেউয়ের দোলায় আমাবও যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। স্টীমাব গিয়ে ভিড়ল বড়ো জাহাজেব গায়ে। বেশ শক্ত সিঁড়ি নামিয়ে দিল বড়ো জাহাজ থেকে ছোট্ট স্টীমাব পর্যন্ত। আমরা সন্তর্পণে মোটা দড়ির হাতল ধরে সিঁড়ি বেয়ে বড়ো জাহাজে উঠলাম। যাত্রীদেব মালপত্রগুলি একটা মস্ত বড়ো জালের মধ্যে একসঙ্গে ক্রেন দিয়ে বড়ো জাহাজে তোলা হল দেখলাম। বড়ো জাহাজে উঠে ডেকে দাঁডাবার পরই বাব দুই মোটা গলায় হুঙ্কার দিয়ে জাহাজখানা মোড় ঘুরে চলতে শুরু করল। পকেটে হাত দিতেই সেই টেলিগ্রামটিতে হাত ঠেকল। খুলে পড়ে দেখলাম যে ফিরে যাবার কোনো ইঙ্গিতই ছিল না সে টেলিগ্রামে। বাবা লিখেছেন— 'God speed, my boy'— চোখটা কেমন ছল ছল করে এল। মনে পড়ল

মায়ের করুণাভরা মুখখানি। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি বোম্বাই বন্দরটি আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে। আমরা বন্দরের সীমা পেরিয়ে একেবারে মহাসমুদ্রের অকূলে গিয়ে পড়লাম। বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আমার যাত্রা হল শুরু। অন্তরালে আমার জীবনের কর্ণধার যে হাল ধরে বসে ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

৩

খানিকটা উদাস মনে সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তারের দিকে চেয়ে থেকে নীচে নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে নিজের কেবিনের খোঁজে। জাহাজের নানা অলিগলি ঘুরে অবশেষে নিজের কেবিনে উপনীত হলাম। দেখলাম যে কেবিনটিতে দুজনের শোবার জায়গা। একটি বিছানা নীচে এবং অন্য একটি বার্থ ঠেলে তুলে রেখেছে। বোঝা গেল যে সে কেবিনে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসবে না। মনে মনে সেজন্য বেশ আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু প্রথমেই মনে হল যে ঐটুকু ঘরে এত জিনিসপত্র নিয়ে কী করে থাকব। একরাত্রি কাটিয়েই ওই অপরিসর ঘরে থাকতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ঘরের আসবাব-পত্র এমন সুন্দর করে ঠিক ঠিক স্থানে বসানো যে যখন যেটার প্রয়োজন তখনই সেটা হাতের কাছে পাওয়া যায়। ক্ষিদে পাচ্ছিল। একটা বোতাম টিপতেই কেবিন স্টুয়ার্ড—গোয়ানিবাসী—এসে সেলাম করে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম দুপুরের খাওয়াটা কখন হবে। সে বলল লাঞ্চ তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। এর পরের খাওয়া হবে বিকেলের চা। অচেনা জায়গার গোলেমালে আমি খাবার সময়টা সেদিন খেয়ালই করি নি। কি আর করা যাবে। এরকম ভুল আর কখনও হয় নি আমার এবং একটি খানাও আমার আর বাদ যায় নি।

ইতিমধ্যে মনে হল যেন জাহাজটা খুব দুলছে। পি. অ্যাণ্ড ও কোম্পানির 'ক্যালিডোনিয়া' জাহাজটা ছিল ছোট্ট, মাত্র ন হাজার টন জাহাজ। তবে এর গতিবেগ নাকি ছিল ঐ কোম্পানির সব জাহাজের চেয়ে বেশি। জাহাজটা ছোটো হওয়ায় এবং খুব জোরে চলায় এর দোলানিটা হত বেশ দুর্জয় রকম। দোলাটা আবার হত দোটানা—অর্থাৎ জাহাজটা আগে-পিছে উঠছে আর নামছে। এই দোলাকে বলে 'পিচিং।' এইরকম দোলায় অভ্যেস হয়ে যায় এবং তখন আর খারাপ

লাগে না। কিন্তু ওই 'পিচিং'-এর সঙ্গে সঙ্গে আসে আর একরকম দোলা। সেটা হল ডাইনে-বাঁয়ে দোলা যাকে বলে 'রোলিং।' এই 'পিচিং' আর 'রোলিং' একসঙ্গে হলেই বেশির ভাগ যাত্রীদেরই প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থাটার নাম হচ্ছে 'সি-সিকনেস'। আমার ধাতই বোধ হয় অন্যরকম। আমার সি-সিকনেস হল না। পরেও অনেকবার জাহাজে ঝড বাদলের মধ্যে এমন-কি চীন সমুদ্রেও গিয়েছি। কিন্তু টাইফুন ঝড উঠে জাহাজটা যখন মোচার খোলাব মতো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে তখনো আমার বমি-টমি হয় নি। যাদের সি-সিকনেস হয় তাদেব কাছে শুনেছি যে দোলানির ঠেলায় সাবা পেট গুলিয়ে সমস্ত অজীর্ণ খাদ্য বমিব সঙ্গে বের হয়ে যায় এবং পেট যখন খালি তখনো বমিব বেগ হয় এবং সেই অবস্থাটা নাকি ভীষণ কষ্টকব। সে ভোগান্তি আমাকে ভুগতে হয় নি কখনো।

চায়ের সময় গেলাম খাবাব-ঘবে। খাবার-ঘরটা "ক্যালিডোনিয়া" জাহাজের মাথাব দিকে ছিল। দুপাশের সব কটা গোলাকৃতি জানালা যাকে বলে 'পোট হোল' তা একেবাবে সেঁটে বন্ধ করা এবং সমুদ্রের জলেব ঢেউ সেই জানালাব পুরু কাঁচের উপর আছডিয়ে আছড়িয়ে পডছিল। দেখলাম একটা টেবিলেব উপর একটা খাবার টেবিলগুলির প্ল্যান পড়ে আছে। যাত্রীদেব অনুবোধ জানানো হয়েছিল যে তাঁবা কোন্ খানে বসতে চান তা সেই প্ল্যানে লিখে যেন জানিয়ে দেন। একটা টেবিলের ধারের চেয়ারটা বেছে নিলাম, কেননা যদি শরীব খাবাপ হয় তবে তক্ষুনি অন্য কাউকে বিপর্যস্ত না করে উঠে যাওয়া যাবে। তাব পব বসলাম চা খেতে।

স্টুয়ার্ড এসে আমাব মুখেব দিকে চেয়ে বললে, 'ইণ্ডিয়া, চায়না অব সিলোন?' ভাবলাম বুঝি জিজ্ঞেস কবছে আমি কোন দেশেব লোক। আমাকে চীনেব বা সিংহলেব বাসিন্দা বলে ভুল কবার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না বলে একটু অবাক লাগল। যাই হোক বললাম, 'ইণ্ডিয়া'। লোকটা চলে গেল এবং অচিরে বেশ ঝকঝকে রূপার টি-পট ও পেয়ালা পিরিচ, দুধের ও চিনির বাটি একটি ছোটো ট্রেতে কবে আমার সামনে দিয়ে গেল। কেক, পেস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচও নানারকমেব ছিল। সারা দিন না খেয়ে ক্ষিদেও পেয়েছিল। বেশ ভালোকরেই চা-টা খেয়ে নিয়ে ধাতস্থ হওয়া গেল। পবে জাহাজের সহযাত্রী একটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম যে স্টুয়ার্ড যখন—'ইণ্ডিয়া চায়না অর সিলোন' বলে আমার মুখের দিকে

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল তখন সে নাকি জানতে চেয়েছিল কোন্ দেশের চা খেতে চাই। আমি তখন জানলাম যে ইণ্ডিয়া, চায়না ও সিংহল এই তিন দেশেরই চা-বাগানে চা জন্মে এবং যাত্রীরা তাদের অভিরুচিমত যে কোনো দেশের চা পেতে পাবেন। সুতরাং আমি যে জবাব দিয়েছিলাম—'ইণ্ডিয়া' সে জবাবটা একেবারেঅ প্রাসঙ্গিক হয় নি। মন থেকে একটা ভার নামল।

রাত্রে কালো ডিনার সুট পরে খেতে গেলাম। গিয়ে নিজের জায়গায় বসলাম। বেশির ভাগ চেয়ারই দেখলাম খালি পড়ে আছে। স্টুয়ার্ড বললে যে সমুদ্রটা ভীষণ তরঙ্গাকুল হওয়ায় বেশির ভাগ যাত্রীরাই কেবিনে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং খাওয়া তো দূরের কথা খাবারের গন্ধ পেলে, এমন-কি খাবারের নাম শুনলেই নাকি তাঁদের বেদম বমি এসে যায়। আমাদের টেবিলের ওপাশে যে বৃদ্ধটি বসেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে খেয়ে চললাম। মুশকিল হয়েছিল মেনু-কার্ডটা নিয়ে। খাবারগুলির নাম ও বর্ণনা সব লেখা ছিল ফরাসী ভাষায় যা আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। বৃদ্ধটি আমাকে কিছু কিছু বাতলে দিলেন এবং তার পর হেসে বললেন—'ব্যাপারটা খুবই সোজা। তুমি আঙুল দিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস চেয়ে নিও এবং যখন জিনিসটা নিয়ে আসবে তখন দেখে বা মুখে একটু দিয়ে যদি ভালো লাগে খাবে, নয়তো ঠেলে দেবে।' আমি বললাম, 'ওরকম করলে অনেক খাবার যে নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কি ঠিক হবে?' বৃদ্ধ বললেন, 'দোষ তো ওদেরই। কেন দুর্বোধ্য ফরাসী ভাষায় মেনু লিখতে গেল।' যাই হোক চুচারটে মাছের নাম, পুলে মানে মুরগী ইত্যাদি জেনে ফেলায় খাবার অর্ডার দিতে অসুবিধে হয় নি। খাওয়াটা খুব জোর হল। সেকালে পি অ্যাণ্ড ও জাহাজে খাবারের বহর আর বৈচিত্র্য যে অসাধারণ ভালো ছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

খাবার শেষ করে সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিদায় নিয়ে উপরের ডেকের উপর একটু পায়চারি করে খানিক পরে নীচে নিজের কেবিনের মধ্যে গিয়ে কাপড় ছেড়ে রাত-কাপড় পরে শুয়ে পড়লাম। বাইরের সমুদ্রের গর্জনটা আমার বন্ধ ঘরে খুব বেশি পৌঁছচ্ছিল না বটে কিন্তু জাহাজটা যে উলটে-পালটে আছাড় খেয়ে পড়ছিল তা বেশ অনুভব করছিলাম। প্রথম দিনের

সমুদ্রযাত্রা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম নিঃসঙ্গ কেবিনের নীরবতার মাঝে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল স্টুয়ার্ডের দরজার গায়ে টোকা দেবার আওয়াজে। আসতে বলায় সে হাতে করে নিয়ে এল আমার জন্যে একটা ছোটো ট্রেতে করে চা, বিস্কুট ও কলা। ওটা নাকি ইংরেজদের বেড-টি। হাতমুখ না ধুয়ে চা খাওয়া আমার অভ্যেসই ছিল না, ভালোও লাগত না। লোকটি চলে গেলে দাঁত মেজে খাটেই বসে গেলাম চা খেতে। দরজার বাইরে আমার জুতো জোড়াটাকে পালিশ করে রেখে দিয়েছিল। সেটাকে ঘরে নিয়ে এলাম। তার পর উঠে দাড়ি কামিয়ে গেলাম স্নানেব ঘরের দিকে। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নানের ঘরে ঢুকলাম স্নান কববার জন্যে। দেখলাম একটা পোর্সিলেনের বড়ো টব এবং তার এক মাথায় ছোট্ট একটা অ্যালু-মিনিয়মের টবে গরম জল। বড়ো টবটায় যে দুটো বড়ো কল লাগানো তাতে একটাতে গরম জল এবং অন্যটাতে আসে ঠাণ্ডা জল এবং মাথাব উপরে ঠাণ্ডা ও গরম মেশানো জলেব শাওয়ার অর্থাৎ ঝাঁঝরি। সে-সব জল একেবারে নোনা এবং হাতে আঠা আঠা মতো লাগল। স্নানেব ঘবেব যে পরিচাবক যাকে বলা হয় 'টোপাস' সে বললে যে নোনা জলে স্নান কবে তার পব সামনের ছোটো টবের মিঠে জল দিয়ে গায়ের নুন সব ধুইয়ে দিতে হবে। মিঠে জল ওই ছোটো এক টব ভরতি ছাডা দেবার হুকুম নেই। কি আব করা যাবে। বড়ো টবটা ফুটন্ত নোনা জলে ভর্তি করে তাকে সহনীয় করবার জন্যে কিছু ঠাণ্ডা নোনা জল দিয়ে টবে নেমে পড়লাম। চমৎকার আরাম। জলের গরমে সারা অঙ্গটাতে একেবাবে সেক দেওয়া হয়ে গেল। তার পর উঠে মিঠে জলে গাটা ধুয়ে বড়ো বড়ো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিয়ে নিজের কেবিনে গিয়ে কাপড় পরলাম। সমস্ত শবীবটা যেন ঝর-ঝরিয়ে হালকা হয়ে গেল।

খাবার-ঘরে গিয়ে দেখি গেল বাত্রিতে যতজন লোক এসেছিলেন তার চেয়ে কিছু বেশি লোকসমাগম হয়েছে। কয়েকজন লোক রাত্রির বিশ্রামে কতকটা ধাতস্থ হয়েছিলেন। আমার পাশে এসে বসলেন একটি মহিলা। আমার চেয়ে বেশ ক-বছরের বড়ো বলেই মনে হল। দেখতে সুশ্রীই বলতে হয়। আমার সামনেব বৃদ্ধটি মেয়েটিব সঙ্গে আলাপ জুডে দিল। পি অ্যাণ্ড ও জাহাজের প্রাতরাশের মেনুটি ইংরেজিতে লেখা এবং তাতে নানাবিধ সুস্বাদু খাবারের নাম ছাপানো। বেশ কবে খেয়ে নিয়ে উপরের ডেকে গেলাম।

আস্তে আস্তে কিছু যাত্রীও আসতে লাগল। এক-একবার স্মোকিং সেলুন এবং ড্রইংরুমে ঘুরে এলাম। চমৎকার সাজানো। কিছু বইও আছে। স্মোকিং সেলুনে নানাবিধ পানীয় জিনিসও থাকে। ডেকের উপর এক-এক জায়গায় খড়ি দিয়ে দাগ কাটা রয়েছে। অনেকে সেখানে শক্ত বিড়ে ছুঁড়ে 'ডেক কয়েটস' খেলছে। কোনো জায়গায় ঐ বিড়ে দিয়ে মাঝেব একটা জালেব ওপব দিয়ে এপার ওপাব ছুঁড়ে ব্যাডমিন্টন খেলাব মতো খেলছে। মাঝে মাঝে কেউ একলা বা দোকলা জাহাজটাকে প্রদক্ষিণ করে আসছে। কেউ বা ডেকের উপর নরম ইজিচেয়াবে বই কোলে করে যত না পডছে তাব চেয়ে অন্যান্য যাত্রীদেব দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে। বেলা সাড়ে দশটা কি এগাবোটাব সময় ডেকের প্রত্যেকের কাছে স্টুয়ার্ডরা ছোটো পেয়ালাতে করে গবম স্থপ ও নোনতা বিস্কুট পবিবেশন কবে গেল। খেয়ে ফেললাম— ভালোই লাগল, গবম চায়ের মতো। শুনলাম ওটা নাকি বীফ টি। প্রথমটা কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। পবে অভ্যেস হয়ে গেল।

একটি ইংরেজ আমাব পাশে এসে বসলেন। কোথায় যাচ্ছি, কি করতে যাচ্ছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কবলেন। প্রশ্ন কবে জানলাম যে তিনি অস্ট্রেলিয়ার লোক। একথা ওকথা জিজ্ঞাসা কববাব পব ভদ্রলোকটি বললেন, 'তোমাব খাবাব-ঘবে অচেনা মেয়েমানুষের পাশে বসতে হয়তো একটু বাধো-বাধো লাগছে, সে মেয়েটিবও নিশ্চয়ই লাগছে। তা তুমি যদি আমার সঙ্গে জায়গা বদলা-বদলি কবতে চাও তবে আমাকে বলো। আমি সব ব্যবস্থা কবে দেব।' বলেই তিনি নির্বিকারভাবে উঠে গেলেন। অল্প পবেই সেই বৃদ্ধটি— তিনিও অস্ট্রেলিয়াব লোক— তিনি এসে শুধালেন— 'ওই লোকটা তোমাকে কী বলছিল হে?' জবাব দিলাম যে অচেনা মেয়েব পাশে বসে যদি আমাব অস্বস্তি বোধ হয় তবে তাঁব সঙ্গে জায়গা বদল কবতে চাইলে তাঁব আপত্তি নেই। লোকটি কথাটা শেষ হতে না হতেই বললেন, 'রাবিস্‌, তুমি কিছুতেই তোমাব জায়গা ছেড়ো না। আস্পর্ধা!' বুঝলাম যে আগের লোকটিব ওই মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার বাসনা হয়েছে। পরের সাধে বাদ সাধবার আমার কোনো স্পৃহা ছিল না। সুতরাং বৃদ্ধের কথা না শুনে আমি একটু দূরে সেই লোকটির টেবিলে গিয়ে নতুন সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম সেইদিনই দুপুরে।

দুপুরের ভোজের বহব দেখে অবাক। ঠাণ্ডা, গরম— এ হেন খাবার নেই যা চাইলে পাওয়া যায় না। শুনলাম কেউ যদি ইচ্ছে করে তবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খেয়ে গেলেও জাহাজ কোম্পানিব আপত্তি হবে না। তবে কেউই সে চেষ্টা করে না, কেননা তা একেবাবেই অসম্ভব।

৪

এইবকম কবে দিন-চাবেক অবিশ্রাম ঝড়তুফানেব মধ্যে জাহাজ চলছে তো চলছেই। পাঁচদিনের সকালে জাহাজ ঢুকল এডেন বন্দবে। অনেক দিন পরে মাটিব কিনাবা দেখে মনটা খুশি হল। যাঁরা সি-সিকনেসে শয্যা নিয়েছিলেন তাঁবাও সেজেগুজে উঠে এলেন প্রোমেনেড ডেকে। জাহাজটা থামবাব পবই যাত্রীবা পিল পিল কবে শহব দেখতে চলল। আমিও জুটে গেলাম একদলেব সঙ্গে। এডেন শহরটি ছোটোই। কিবকম যেন রুক্ষ মাঠ ও পাহাড়েব চেহাবা। তেমন দেখবাবও কিছু ছিল না। আমবা কজন বেড়িয়ে ফিবে জাহাজেই দুপুবেব খাওয়া খেলাম। কিন্তু উৎসাহী অনেকে শহবেব কোনো বেস্টুবেণ্টে খেতে বসে গিয়েছিলেন।

চব্বিশ ঘণ্টাবও একটু উপবে বোধ হয় জাহাজ ছিল এডেনে। তাব পব আস্তে আস্তে ভেঁপু বাজিয়ে আবাব আমাদেব চলা শুরু হল। এসে পড়লাম লোহিত সাগবে। সেদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমেব নেড়া পাহাড়গুলির উপর দিয়ে যখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল তখন লোহিত সাগবেব জলরাশি যে কী গভীর বক্তিম আভায় বঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তা বর্ণনা কবা শক্ত। মনে হয়েছিল যে-ব্যক্তি ঐ সাগবেব নামকবণ করেছিলেন 'লোহিত সাগর' বলে তিনি বোধ হয় ঐ সাগবটিকে সন্ধ্যাব সময় প্রথম দেখেছিলেন। জাহাজ এখন বেশ সহজ গতিতেই চলছিল। আববা উপসাগবেব মৌসুম ঝড়ের কোনো চিহ্নই এখানে ছিল না।

লোহিত সাগবে পড়বাব পব যে ববিবাব এল সেদিন একটি উপাসনাব ব্যবস্থাও হয়েছিল। একজন পাদবি বাইবেল থেকে পাঠ কবলেন ও উপদেশ দিলেন। পবনে ছিল তাঁব লম্বা সাদা আলখাল্লা ও কোমরে লাগানো ছিল কালো দড়ির কোমববন্ধ। বুকের উপরে তাঁর ঝুলছিল ক্রুশে বিদ্ধ খৃস্টের মূর্তি। পাদবিটি জাহাজেরই পাদরি, না, যাত্রীদের মধ্যে একজন তা বুঝতে পারলাম না। বেশ লাগল সেই উপাসনার ভঙ্গি ও

সমবেত গান। ক্যালিডোনিয়া জাহাজটির গতিবেগ খুবই দ্রুত ছিল। তিন-সাড়ে তিনদিনেই লোহিত সাগর পার হয়ে আমরা সুয়েজ খালের দক্ষিণ মুখে এসে দাঁড়ালাম। সেখানকার নিয়মানুসারে আমাদের যখন খালে ঢোকবার পালা এল তখন জাহাজটি ধীব মন্থরগতিতে খালে প্রবেশ করল।

খালটি খুব বেশি চওড়া নয়। দুইধারে উঁচু বাঁধ। দেখলাম অনেক ইংরেজ সৈন্যেরা খালের দুধারে মোতায়েন। অনেকে সাঁতাবের কাপড পবে খালে নেমে অবগাহন কবে শবীরটা জুড়োচ্ছে। তাবা দেশের ও তাদের রাজাব জন্য প্রাণপণ কবে লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বলে সবাই তাদের খাতিব করে হাতছানি দিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। কেউ কেউ বা বন্ধ সিগারেট বা বিস্কুটেব টিন তাদেব দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। টিনগুলি জলে নেচে নেচে ভাসছিল আব সেগুলিব দিকে স্নানার্থীরা তীববেগে সাঁতবে যাচ্ছিল কে সেটা আগে ধববে এই মতলবে। এইবকম কবে জাহাজ এগিয়ে চলতে লাগল খাল বেয়ে। মাঝে মাঝে খালটা যেন বড়ো একটা হ্রদেব মধ্যে এসে পড়ে সেটা পেবিয়ে আবার ছোটো খাল হয়ে গেল। প্রায় দেড দিন লাগল খালটি পাব হতে। লোহিত সাগবেই গবম বোধ হচ্ছিল। এই খালেব ভিতর গরম যেন আবো বেডে গেল। বাত্রে কেবিনে শোওয়া দুর্ঘট হয়েছিল। অনেক বাত্রি পর্যন্ত প্রোমেনেড ডেকে বসে বা পায়চাবি করে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও গবম হাওয়াব সাথে তপ্ত বালুকণা এসে গায়ে যেন ছুঁচেব মতো বিঁধছিল। শেষে পোর্ট সেডে এসে যেন বাঁচলাম।

আবার সবাই চলল ভ্রমণে। আমিও জুটে গেলাম একদলে। সৈয়দ বন্দরটি একটি আন্তর্জাতিক শহব—অর্থাৎ দুনিয়ার সব দেশেবই লোক সেখানে ঘোবাঘুবি কবে। কেউ-বা আসে কাজে, কেউ-বা আসে অকাজে অর্থাৎ ফন্দিফিকিব কবে দুপয়সা হাতাতে। শুনেছিলাম জায়গাটা বিপজ্জনক হতেও পাবে, বিশেষ কবে সন্ধের পব। কাজ কি হাঙ্গামায়। বেশ দিনে দিনেই ফিবে এলাম জাহাজে। ভালো ইজিপসিয়ান ও টার্কিস সিগাবেট খুব সস্তায় পাওয়া গেল। পথেব জন্যে সংগ্রহ কবে নিলাম, কেননা জাহাজে বিলিতি সিগাবেটেব দাম ছিল খুব চড়া। জাহাজে যখন ফিবলাম তখনো সূর্য অস্ত যায় নি। দেখলাম যে জাহাজের গায়েই কতকগুলি ছেলে সাঁতার দিচ্ছে, ডুব দিচ্ছে, আবার উঠে এসে হাত বাড়িয়ে কী দেখাচ্ছে আর অবোধ্য ভাষায় কী বলছে। বুঝলাম যে জাহাজ থেকে

পয়সা ফেলে দিলে ঐ-সব ছেলেরা সেই ডুবন্ত পয়সার সাথে সাথে ডুব দিয়ে সে পয়সাটা উদ্ধার করে হাত বাড়িয়ে সেই পয়সাটা ধরে নিজেদের কেরামতি জানিয়ে দেয়। আমিও দু-চারটে পেনি ফেলেছিলাম সেদিন জলে। আর-একদল লোক জাহাজে উঠে এসে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটার সুরে হাত-অর্গান বাজিয়ে কী একটা গান জুড়ে দিল। কেউ কেউ তাদেবও কিছু বক্‌শিস দিলেন।

জাহাজ যখন বন্দবে দাঁড়ায় তখন জাহাজে কয়লা ভরে .নেয়। সে সময় কয়লার গুঁড়োতে বেশ অসুবিধাই বোধ হয়। যাই হোক, সেই অসুবিধা কাটিয়ে জাহাজ পোর্ট সেড ছেড়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়ল। সমুদ্রেব মধ্যে পাব থেকে অনেকটা দূবে একটি বিবাট মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। সেটি হল ডি. লেসেপেব মূর্তি। এই সুয়েজ খালেব পরিকল্পনা নাকি ঐ ইঞ্জিনিয়াব সাহেবই কবেছিলেন। ডি. লেসেপের মূর্তির পাশ দিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম ভূমধ্যসাগবেব ঘন নীল জলে। জাহাজের জীবন-যাত্রা বেশ সহজভাবেই চলতে লাগল। আমি বেশির ভাগ সময় উপরের ডেকে ডেক-চেয়াব পেতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। সমুদ্রেব জলের নীলাভ বঙ যে কত বকম-বেবকমের হতে পাবে তা দেখলে অবাক হতে হয়। কোথাও পাতলা নীল, কোথাও গাঢ়, আবার আরো দূরে প্রায় কালো। জাহাজের দুই পাশে জল ফেনিল হয়ে উঠছিল। সূর্যকিরণ ঢেউয়েব মাথায় ঠিকরিয়ে পড়ছিল হীবাব মধ্যে আলো পড়লে যেমন করে ঝলমলিয়ে ওঠে। সমুদ্রেব চেহারা সকালে একরকম, দুপুরে আব-একরকম। সমুদ্রের মধ্যে সন্ধ্যাটা পূববী বাগিণীব করুণ সুব জাগিয়ে মনটাকে বিকল কবে ফেলে। চাঁদ উঠবার আগে অন্ধকার নিঝুম রাতে কাছের ও দূরেব ঢেউগুলির মাথায় ফস্‌ফরাসেব আলো দেখায় যেন ফণীব মাথায় মণির মতো। আবাব জ্যোৎস্না বিবশ বাতে সে যেন কী স্বপ্নমায়া নেমে আসে সাগরেব ঘুমন্ত মুখে। মনে পড়ে গেল দাদাবাবুব সাগর-সংগীতের কবিতাগুচ্ছ। সাগর ও কবিচিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস যেন মূর্ত হয়ে উঠত আমার চোখের সামনে।

একদিন রাত্রে জাহাজটার মোটাগলার ভেঁপু ক্রমাগত বেজেই চলল। 'কী হল? কী হল?' যে যেমন পোশাকে ছিল সবাই ছুটল প্রোমেনেড ডেকে। জার্মানদের ডুবোজাহাজ নাকি? জাহাজের বড়ো বড়ো কর্মচারীরা

হেসে বললেন মা ভৈঃ। দারুণ কুয়াশায় কিছু দেখা যায় না বলে ঐ ফগ সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে যাতে অন্ত জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা না লাগে। সবাই ফিরে গেল নিজ নিজ কেবিনে।

একদিন হল আপদকালীন কুচকাওয়াজ। অর্থাৎ যেই তিনবার ভেঁপু বাজবে তক্ষুনি নিজ নিজ কেবিনে রক্ষিত লাইফ-বেল্ট পবে প্রোমেনেড ডেকে গিয়ে নিজ নিজ নির্ধারিত লাইফবোটেব সামনে সাব করে দাঁড়াতে হবে। লাইফবোট নামালে তাতে চড়তে হবে। এই ড্রিল কবানো হল যদি ডোবাজাহাজেব টবপেডোতে আমাদেব জাহাজটা ফুটো হয়ে ডোবার দাখিল হয় তবে যাত্রীদেব বোটে কবে সরিয়ে নিতে যাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্তে। সেদিন ড্রিলেব সময় সবাই হাসাহাসি করছিল। আমার মনে হচ্ছিল বিপদ যদি সত্যি সত্যি আসে তখন এ হাসি আর রবে কি? এ কথা দু-একজন গম্ভীর প্রকৃতিব লোকও বললেন দেখন-হাসিদেব।

আব হবি তো হ তাব পরদিনই দিনে-দুপুবে আমাদের জাহাজের ইঞ্জিনেব ধুকধুক আওয়াজ থেমে গেল। জাহাজটার গতিবেগ ক্রমশ কমে গিয়ে শেষে একেবারেই থেমে গেল। যে যার লাইফবেল্ট পবে ছুটলাম উপরেব ডেকে। দক্ষিণেব দিকে দূব দিগ্বলয়েব প্রান্তে দুটো ছোটো চোঙা দেখা গেল। সবাই বললে যে ওটা শত্রুপক্ষেব ডুবোজাহাজেব ফানেল। ভয়ে সবাই কাঠ হয়ে গেলাম। কাবো মুখে হাসি নেই তখন। ক্রমশ সেই চোঙা দুটো বড়ো হতে লাগল এবং খানিকটা পরে আস্তে আস্তে একটা ছোট্ট জাহাজের মতো দেখা গেল বাইনাকুলাবে। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নেমে এসে বললেন 'এসব কি হচ্ছে?' কাপ্তেন হেসে বললেন, 'ওটা তো একটা মালজাহাজ মাস্তুল খাড়া কবে পোর্ট সেডেব দিকে যাচ্ছে।' একজন যাত্রী বললেন, 'তবে যে আমাদেব জাহাজ থামল?' কাপ্তেন বললেন, 'আমাদেব জাহাজেব হালেব চেনটায় কী গোল হয়েছে সেইটে মেরামত কববার জন্তে জাহাজ থামানো হয়েছে। সত্যি সত্যি বিপদ হলে তো ভেঁপু বাজত।' 'হ্যাঁ, তাই তো, ভেঁপু তো বাজে নি। আমরা সবাই সে কথাটা লক্ষ্যই কবি নি তো', এইরকম বলাবলি কবতে করতে আমরা নিজ নিজ কেবিনে গিয়ে লাইফবেল্ট খুলে ভাঁজ করে রেখে দিলাম। কাপ্তেনের কথা শুনে যাত্রীদের মুখে হাসি ও বেপরোয়া কথা ফিরে এলো। আমাব এক-একবার মনে হয়েছিল যে সত্যি সত্যি যখন বিপদ আসবে এবং

ঘন ঘন যখন ভেঁপু বাজবে তখন হয়তো যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই 'বিরক্ত কর না' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়বে। যাই হোক, সেরকম অঘটন কিছু হয় নি।

যথাসময়ে আমাদের জাহাজ ফরাসী দেশের দক্ষিণে মার্সাই বন্দরে এসে ভিড়ল। জাহাজে একটা সোরগোল পড়ে গেল। জাহাজের স্টুয়ার্ডরা বিদায়ী যাত্রীদের কেবিন থেকে তাদের বাক্স-প্যাঁটরাগুলি এনে ডেকের একটা জায়গায় জমা করার পর সেগুলিকে একসঙ্গে একটা বড়ো জালে জড়িয়ে ক্রেনে করে পারের উপর নিয়ে গেল। যে-সব যাত্রীরা নামবে তারা সেজেগুজে ডেকে এসে দাঁড়াল। দেখে অবাক লাগল যে প্রথম শ্রেণীতে আমি এবং জনকতক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য সবাই বড়ো ছোটো সামরিক অফিসার। তাদের কাঁধের উপর ঝকঝকে পিতলের তারা বা মুকুট দেখেই বোঝা গেল যে তারা কোন পর্যায়ের অফিসার। এ-সব লোক জাহাজে একেবারে অসামরিক পোশাকে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। জার্মান টরপেডোতে আমাদের জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিলে হয়তো বিলিতী কাগজে লিখত যে এতগুলি অসামরিক লোককে মেরে ফেলল দুষ্টু দুশমনেরা। আস্তে আস্তে জাহাজটা প্রায় খালিই হয়ে গেল। ফরাসীদেশে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছে জেনে আমি আর বন্দরে নামলামই না। বম্বে থেকে মার্সাই পর্যন্ত জাহাজটা এসে গিয়েছিল প্রায় তের-চোদ্দ দিনেই। অল্প সময়ের পরেই বিকেলের দিকে আবার আমরা চললাম পশ্চিমের দিকে।

আড়াই-তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়লাম জিব্রাল্টার দ্বীপে। জিব্রাল্টার ও স্পেনের দক্ষিণের মধ্যে যে সরু প্রণালী আছে সেটাই হল বন্দর এবং সেখানেই জাহাজ দাঁড়াল। আমরা সকালবেলার খাবার খেয়ে চললাম জিব্রাল্টার দেখতে। বেশ ভালো লাগল সেই পাহাড়ের উপরে ছোট্ট শহরটি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সারি সারি বাংলো ধরণের বাড়ি। একটা জায়গায় বেশ বড়ো বড়ো বাড়িতে সুন্দর-সুন্দর দোকান। একটা দেখলাম চশমার দোকান। মনে হল হাতের কাছে যখন চোখের ডাক্তারটা পাওয়াই গেল তখন চোখটা দেখিয়ে নিই। ঢুকে গেলাম সেই দোকানে। অন্ধকার ঘরে একটা ছুঁচের মতো আলোকরেখা আমার চোখে ফেলে ডাক্তার কী বুঝলেন তা তিনিই জানেন। তার পর বাতি জ্বালিয়ে দূরের

দেয়ালে লটকানো একটা কার্ডবোর্ডে বড়ো থেকে ছোটো কালো অক্ষরগুলি পড়তে বললেন। পড়ে ফেললাম বোধ হয় প্রায় শেষ পর্যন্তই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তারটি বললেন যে চোখটা সামান্য একটু খারাপ হয়েছে এবং কিছুদিন চশমা পরলেই সেটুকুও সেরে যাবে। চশমা নিতে রাজি হতেই তিনি নানারকমের ফ্রেম দেখালেন। এখনকার মতো মোটা মোটা শিং কিংবা সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমার রেওয়াজ তখনো হয় নি। বেশ স্টাইল হবে ভেবে আমি একটা স্প্রিংয়ের চশমা বেছে নিলাম। দাম দিয়ে চশমাটা চোখে লাগিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে এলাম। এখন বলতে বাধা নেই যে চোখের ব্যারামের চেয়ে স্টাইলটা ভালো হবে— এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চশমার দোকানে ঢুকেছিলাম। পথে খুব বড়ো বড়ো কালো কালো আঙুর সস্তা দরে কিনে নিয়ে জাহাজে ফিরে এলাম। জিব্রাল্টারে জল ও কয়লা নিয়ে জাহাজটা অল্প সময়ের মধ্যেই আবার চলল।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পড়েই জাহাজটা উত্তর দিকে মোড় ফিরল। বে অব বিস্কেতে সমুদ্র আবার অশান্ত হয়ে উঠল। তবে আরব উপসাগরের মৌসুম ঝড়ের তুলনায় এখানকার ঢেউগুলি কিছুই নয়। আমাদের আর কোনো চিন্তা ছিল না, কেবল ছিল ভয় কখন কোন ডুবোজাহাজ থেকে টরপেডো এসে আমাদের জাহাজটাকে ফুটো করে দেয়। কদিন পরে মোড় নিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম ইংলিশ চ্যানেলে। বিপদের আশঙ্কা আরো বেড়ে গেল, কেননা শোনা গেল যে ইংল্যাণ্ডের আশেপাশে চারি দিকেই নাকি জার্মান সাবমেরিনগুলি ঘুপটি মেরে আছে। আমাদের জাহাজটা সমস্ত চ্যানেলটা অতিক্রম করে তবে টেমস্ নদীতে ঢুকে টিলবেরি ডকে গিয়ে দাঁড়াবে। আমাদের জাহাজ তখন প্রায় প্লিমাথের কাছে এসে গেছে। ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি বেতারে জানাল যে আমাদের জাহাজ যেন অবিলম্বে প্লিমাথ বন্দরে ঢুকে যায় এবং আবার খবর না পাওয়া পর্যন্ত যেন চ্যানেলে বের না হয়, কেননা আর-একটু আগেই জার্মান সাবমেরিন দেখা গেছে। ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে গেলাম।

প্লিমাথ বন্দরে ঢুকে জাহাজ নোঙর ফেলল। আর ভয় নেই। কাপ্তেন বললেন যে যাঁদের ইচ্ছে তাঁরা প্লিমাথে নেমে যেতে পারেন। যাঁরা জাহাজে থাকতে চান থাকতে পারেন। তবে কবে জাহাজ বের হয়ে টিলবেরি

ডকে যাবে বলা যায় না। দেখলাম সব যাত্রীরাই প্লিমাথে নেমে পড়বার ব্যবস্থা করছেন। আমিও ভাবলাম কাজ কি গোলমালে। রেলভাড়া বাঁচাতে গিয়ে শেষে কি চ্যানেলে ভরাডুবি হবে। যখন একবার ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দেওয়া গেছে তখন আর জলপথে যাওয়া নয়। পরে শুনেছি প্লিমাথ থেকে বেরিয়ে টিলবেরীতে যেতে কিংবা টিলবেরী থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যাবার সময় 'ক্যালিডোনিয়া' জাহাজটি জার্মান টরপেডোতে সমুদ্রের অতলে ডুবে গেছে।

যাই হোক আমিও প্লিমাথে নেমে পড়লাম অন্য সকলের সঙ্গে। একটি বোট ট্রেন স্টেশনে হাজির ছিল। জিনিসপত্র কাস্টমস থেকে খালাস করে ট্রেনে চেপে লণ্ডনে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পব। আমাদের কলকাতায় যেমন দুটো স্টেশন আছে যেমন হাওড়া ও শিয়ালদা, লণ্ডনে অনেকগুলি ট্রেন টার্মিনাস আছে যেমন চেরিং ক্রশ, ওয়াটাবলু, প্যাডিংটন ইত্যাদি। আমবা কোন স্টেশনে নেমেছিলাম মনে নেই। একটি কুলিকে দিয়ে মালপত্র একটি ট্যাক্সিতে তুলে চলে গেলাম ২১নং ক্রমওয়েল রোডে। সেটা ছিল ভারতীয় ছাত্রদেব আড্ডা এবং তখন সেখানে ভারতীয় ছাত্রদেব উপদেষ্টা ছিলেন বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মশায়েব কনিষ্ঠপুত্র নির্মল সেন, যিনি পাইকপাড়াব বিধবা রানী মৃণালিনীকে বিয়ে কবেছিলেন। তিনি সেখানে তখন ছিলেন না। সন্ধ্যার পর নিজ বাসায় চলে গিয়েছিলেন। অন্য একটি কর্মচারীকে আমাব ঐ বাত কবে আসাব ইতিহাসটা বুঝিয়ে বলায তিনি বললেন যে শোবাব ঘর একেবারেই নেই, তবে একেবাবে সব চেয়ে উপবের ঘরে— যাকে অ্যাটিক বলে— সেখানে এক বাক্সের মতো জায়গা করে দিতে পাবেন। আমি এসে পড়েছি খবর না দিয়ে অনাহূতের মতো, সুতরাং চোরের রাত্রিবাসই লাভ— এই নীতি অনুসরণ করে অ্যাটিকেই থাকতে রাজি হলাম। ট্রেনেই খেয়ে এসেছিলাম। কাপড়-চোপড ছেড়ে বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে আমি অবশেষে বিলেতে এসে পৌঁছলাম। সেদিন ছিল ১৫ই আগস্ট ১৯১৫। ঘুম আসছিল না। ভাবছিলাম যে যদি জার্মান জেপেলীন আসে এবং লণ্ডনের যে অঞ্চলে ক্রমওয়েল বোড সেখানে বোমা ফেলে তবে তো ঐ অ্যাটিক ঘরে সে বোমা আমার ঘাড়েই প্রথম পড়বে! শেষে ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ায় সকল দুশ্চিন্তার শেষ হল।

৫

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সম্পন্ন করলাম ৩১নং ক্রমওয়েল রোডের রিফেকটরিতে। যুদ্ধ তখন বেশ জমে এসেছে এবং খাদ্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তখনো সরকারিভাবে প্রয়োগ না করা হলেও খাওয়াদাওয়াটা বেশ সাবধানেই করা হচ্ছিল। সেদিন সকালে খেতে দিল একটা প্লেটে খানিকটা পরিজ। তাইতে দুধ ও চিনি দিয়ে খেয়ে নিলাম। পরে এল টোস্টের উপর জলে পোচ করা একটি ডিম। সব শেষে পেলাম আব একটি টোস্ট এবং অল্প একটু মারমালেড। বাস্। পি অ্যাণ্ড ও জাহাজের প্রাতরাশের পর এখানকাব এই খাওয়াটা কৃচ্ছ্রসাধনের মতোই ঠেকল। মনে হল এই যদি হয় সকালেব খাওয়া তবে দুপুর ও রাত্রে আবাব কী খেতে দেবে? এই খেয়ে বাঁচব কী কবে?

যাই হোক, খেয়ে দেয়ে উঠে শুনলাম নির্মল সেন মশায় তাঁর আফিসে এসেছেন। গেলাম তাঁব কাছে। একটা চিবকুট কাগজে নিজেব নাম লিখে পাঠালাম। অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই বললেন, 'তুমি এসেছ? আমি কাগজে যাত্রীদের নামেব তালিকায় এস. আব. দাশ দেখে ভাবলাম যে সতীশ আসছেন। তা বেশ। পথে কোনো কষ্ট হয় নি তো?' আমার মধ্যের বাড়িব সতীশদাদাব সঙ্গে ভদ্রলোকেব চেনাশুনা বেশ আছে দেখে আশ্বস্ত হলাম। কী করব, কোথায় থাকব ঠিক করেছি ইত্যাদি প্রশ্ন কবলেন। বললাম যে আমার আই. সি. এস. পডবার কথা এবং থাকব ভোলাদাদা যেখানে থাকতেন সেই 'কেট্‌ল্' বলে ভদ্রলোকেব ক্ল্যাপ হ্যাম কমনের বাড়িতে। 'বেশ, বেশ,' বলে তিনি আমাকে বাতলিয়ে দিলেন ক্রমওয়েল রোড থেকে কী কবে ক্ল্যাপ হ্যাম কমনে যেতে হবে।

বিদায় নিয়ে সোজা চললাম ক্ল্যাপ হ্যাম কমনে। এই প্রথম লণ্ডনেব টিউবে চড়লাম। উপরে টিকিট কিনে বৈদ্যুতিক খাঁচায় নেমে গেলাম পাতালে। সেখানে কোন খিলেন-করা সুরঙ্গ-পথে হেঁটে যেতে হবে তা পরিষ্কার লেখা থাকায় কোনো অসুবিধেই হল না। প্ল্যাটফরমের সামনে লাইন পাতা এবং দুই প্রান্তে দুটো মস্তবড়ো প্রায় গোলাকৃতি সুরঙ্গ। প্ল্যাটফরমের উপর বৈদ্যুতিক আলোয় কাঁচের বাক্সে লেখা উঠল অব্যবহিত পরের ট্রেনটা কোন কোন স্টেশনে থামবে। একটা গুম গুম আওয়াজ হতে

লাগল এবং খানিকটা বাতাসের ধাক্কা যেন গায়ে লাগল। সুরঙ্গের এক দিক থেকে গোটা দুই লাল বাতির চোখ-রাঙানি প্ল্যাটফরম থেকে দেখা গেল। অবিলম্বে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে এসে দাঁড়াল গোটা একটা ট্রেন। কম্পার্টমেন্টগুলির দরজা সব খুলে গেল। পিল পিল করে লোক নামল এবং তার জায়গায় বহু লোকের সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম। দরজা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়ল। নিঃশব্দে যেন একটা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে গেল। কোনো গোলোযোগ, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি শুনলাম না। খালি মনে হল যে কোনো লোক অর্ধেক ঢুকেছে এমন সময়ে যদি দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় তবে সে তো চেপ্টে যাবে। তিন বছরের কিছু উপরে বিলেতে ছিলাম কিন্তু সেরকম অঘটন ঘটতে তো কখনো দেখি নি, শুনিও নি। টিউবের মধ্যে ক্লাস ভেদ নেই। সবই এক ক্লাস। বসবার জন্যে বেশ গদি-আঁটা বেঞ্চ দুজন করে বসবার জন্যে। মাঝে একটা সরু পথ। উপরে দুটো শক্ত গোল হাতলের মধ্যে চামড়ার ছোটো ছোটো বেষ্টনী। যাঁরা বসবার জায়গা না পেয়ে সরু গলিতে দাঁড়াবে, তাঁরা তার মধ্যে হাত গলিয়ে ধরে থাকবেন এই ছিল ব্যবস্থা। তখন দেখলাম এবং খুব শীতের সময়ও দেখেছি যে টিউবের মধ্যে বাইরের কনকনে ঠাণ্ডাটা অত পৌঁছয় না।

ক্ল্যাপ হ্যাম কমন স্টেশনে নেমে লিফটে করে পাতাল থেকে মর্তে উঠে রাস্তায় বের হলাম। বেশ পদাতিকের ভিড়। রাস্তায় নানারকমের সাজানো দোকান। কমনটা হল একটা মস্ত বড়ো খোলা-মাঠ। মাঝে মাঝে ছোটো-খাটো পুষ্করিণীও আছে। কমনের পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা যার নাম নর্থ সাইড। তার উপর এক ধরণের চেহারাওয়ালা তিনতলা বাড়ি। কমনে এখানে-ওখানে ছেলেরা বা মেয়েরা খেলছে। কেট্‌ল্ সাহেবের ২২নং নর্থ সাইডের বাড়ি খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। রাস্তা থেকে বাড়িগুলি একটু পিছিয়ে তৈরি করেছিল। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই এক চিলতা জমিতে ছোটো একটু করে বাগান, বাইরের লোহার রেলিং-এর ফটকটা ঠেলে চিলতা বাগান পেরিয়ে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়ির প্রবেশদ্বারে লোহার কড়াটা দিয়ে দুতিন বার ঠুকে দিতেই মাথায় সাদা টুপি, কোমরে সাদা অ্যাপ্রন-পরা একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখতে যেন হাসপাতালের নার্স। সে হল বাড়ির ঝি। নামধাম বাতলিয়ে বললাম যে কেট্‌ল্ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। 'ভেতরে আসুন,' বলে সে দরজাটা

ফাঁক করে ধরে রইল। ঘরে ঢুকলাম।

কেট্‌ল্‌ সাহেব এলেন। বেশ সৌম্য চেহারা। মুখে একজোড়া গোঁফের জন্যে একটু ভারিক্কি ধরণের মানুষ বলে মনে হল। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখলাম যে জনসাধারণ যেমন ধরণের নেকটাই পরে তিনি সেরকম পরেন নি। তাঁর ডবল কলারের ভিতরে ছিল বেশ নরম ধরণের সিল্কের রুমালের মতো ফালি ন্যাকড়ায় ঢিলে গিঁট করে বাঁধা। দাদাবাবু কেট্‌ল্‌ সাহেবের নামে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেটি তাঁর হাতে দিলাম। পড়ে তিনি বেশ খুশিই হলেন এবং বললেন যে তাঁর ওখানে থাকবার অসুবিধে হবে না। বললেন যে আরো দুজন ভারতীয় আছেন ওঁর বাড়িতে এবং তাঁদের সঙ্গেও পড়াশুনার সুবিধে হবে। সেই ঝিটিকে দিয়ে ভদ্রলোক তাঁর সহধর্মিণীকে খবর দিলেন। মহিলাটি ঘরে ঢুকতেই কেট্‌ল্‌ সাহেব আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'দাশেজ কাজিন' বলে। কেট্‌ল্‌-গৃহিণীর মুখখানা বেশ হাসিখুশি। সর্বোপরি বেশ মাতৃপর্যায়ের মানুষ বলেই মনে শ্রদ্ধা হল। যেমন অন্যান্য ইংরেজ মহিলারা স্কার্ট ও ব্লাউজ পড়ে থাকেন ইনিও সেইরকমই পড়েছিলেন। তখন ছোটো স্কার্টের রেওয়াজ হয় নি। গোড়ালির খানিকটা উপর পর্যন্ত লম্বা সার্জের স্কার্ট। একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম। ইনি গলায় একটি প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া ভেলভেটের ব্যাণ্ড লাগিয়েছিলেন যেমন দেখা যায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের মেয়েদের ছবিতে। বুঝলাম যে এঁরা একটু সাবেক-কালের চালই পছন্দ করেন। ঠিক হল যে আমি ২১নং ক্রমওয়েল রোডে ফিরে গিয়ে সেখানে দুপুরের খাওয়া খেয়ে আমার জিনিসপত্র নিয়ে কেট্‌ল্‌ সাহেবের ক্ল্যাপহ্যাম কমনের বাড়িতে সেইদিনই বিকেলে উঠে আসব। দুটি ভারতীয় ছাত্রেরা তখন বাড়ি ছিলেন না বলে দেখা হল না। হৃষ্টচিত্তে কেট্‌ল্‌ সাহেবকে নমস্কার করে উঠে পড়লাম।

২১নং ক্রমওয়েল রোডে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে মিঃ নির্মল সেনকে জানালাম যে আমি বিকেলেই কেট্‌ল্‌ সাহেবের বাড়ি যাব। তিনিও খুশি হয়ে বললেন যে কেট্‌ল্‌ সাহেবের পরিবারটি ভালো এবং আমার সেখানে থাকা ভালোই হবে। তার পর দুপুরের খাওয়া খেতে বসলাম। প্রথমে এল সুপ। গরম খুবই ছিল কিন্তু তেমন সুস্বাদু লাগল না। সেটা নাকি স্কচ ব্রথ— অর্থাৎ নানা-রকম তরকারির কুচি হাড়ের সঙ্গে সিদ্ধ করা জল। তার পর এল একটা

প্লেটে পরিবেশন করা কয়েকটি মাংসের পাতলা স্লাইস এবং তার সঙ্গে বাঁধাকপি ও আলুসিদ্ধ। মাছের চেহারাও দেখলাম না। শুনলাম যে যুদ্ধেব জন্যে মাছ ও মাংস একসঙ্গে দেওয়া হয় না। মাংস থাকলে মাছ পাবে না, মাছ দিলে মাংস দেবে না। খাওয়া শেষ হল রাইস পুডিং অর্থাৎ খুব কম করে দুধ দিয়ে পায়েস। মিষ্টিবও প্রাচুর্য ছিল না। পবে একটু কফি। পি অ্যাণ্ড ও জাহাজের খাবাব ঘটাব পর এই মেনু দেখে মনটা যে দমে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সত্যিই মনে হয়েছিল যে এই খেয়ে পেট ভরবে কি কবে। পবে অভ্যেস হয়ে যেতে দেখলাম যে ওই খাবাবেই পেট চলনসই ভবে যায়। তা ছাডা ইংরেজবা তখন জীবনমরণ পণ করে যুদ্ধ কবছিল। কোনো কৃচ্ছ্রসাধনেই তাঁবা পরাঙ্মুখ ছিল না। আমবা বাইরেব লোক, আমাদেব খাওয়া নিয়ে ওজর নালিশ কবাটা নেহাৎ অশোভন বলেই তাদেব মনে নিশ্চয়ই ঠেকবে ভেবে চুপ কবে থাকাই কর্তব্য বলে মনে হল। দুদিনেব খবচাব টাকাটা দিয়ে মালপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে ক্ল্যাপ-হ্যাম কমনে চলে গেলাম।

৬

বিকেলে কেট্‌ল্ দম্পতিব সঙ্গে চা খেয়ে উপরেব তলায় যেখানে আমার জন্যে একখানা ঘব তৈবি ছিল সেখানে উঠে গিয়ে বাক্স খুলে আমার জিনিস-পত্রগুলি কাপড়েব দেবাজে, আলমাবিতে গুছিয়ে বাখলাম। ক্ল্যাপহ্যামকমনের বাডিগুলি ছিল বহু পুবাতন। সেখানে ঘরে ঘরে তখনো গ্যাসেব বাতি ছিল। নীচে বৈঠকখানা ও খাবাব ঘবে বিজলী বাতিও ছিল। গ্যাসের বাতিটা আমার খুবই দুশ্চিন্তাব কারণ হয়েছিল, কেননা যদি ভুলক্রমে বাতি না জ্বালিয়ে খালি গ্যাসটা খুলে বাখা হয় তবে সাবা ঘবটা গ্যাসে ভরে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে ঘবের বাসিন্দাটি মরে যেতে পাবে। সেজন্যে পরে রোজ নিজে গ্যাসেব ছিপিটা আটকিয়ে শুতে যেতাম। ঘবটিকে গুছিয়ে যখন নীচে নেমে এলাম তখন প্রায় ডিনারেব সময় এসে গেছে।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখি কেট্‌ল্ দম্পতি ছাড়াও জন-চারেক ছেলে-মেয়ে। কেট্‌ল্ সাহেবেব ছেলে ছিল না। ছিল দুটি মেয়ে— ম্যাজ ও হিল্ডা। মেয়ে দুটিকে পরে দেখেছি একেবারে বিপরীত আকৃতির ও প্রকৃতির। ম্যাজ

ছিলেন ছিপছিপে লম্বা, হিল্ডা বেঁটে গোলগাল। ম্যাজের মুখময় রঙের বাহার, হিল্ডা সামান্য একটু পাউডারেই কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। দুজনের চুল বাঁধাও ভিন্ন রকমের। ম্যাজের লেখাপড়ার বালাই ছিল না এবং তিনি একটা কি থিয়েটারে কোরাস গার্ল অর্থাৎ নাচের দলে কাজ করেন কিন্তু হিল্ডা ছিলেন পড়ুয়া মেয়ে, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ডিগ্রি কোর্সে পড়ছিলেন। ম্যাজ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন এবং হিল্ডা বোধ হয় আমারই বয়সী ছিলেন।

ভারতীয় দুজনের সঙ্গেও আলাপ হল। বড়োটি হলেন বিখ্যাত আই. সি. এস. ও বাংলাদেশের তখনকার দিনের একটা ডিভিশনের নাম-করা কমিশনার বি. দে মশায়ের ছেলে হেমন্ত দে। হেমন্ত দে, যাঁর ডাকনাম পরে জানলাম 'হেম্‌তা'— তিনি বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। রঙটা আমার চেয়ে অনেকটা ফরসা হলেও ইংরেজ মহলে কালোই দেখাত। বেশ চোখা টিকল নাক। দাড়িগোঁফ কামানো। শুনলাম ইনি ব্যারিস্টারী পড়ছেন। অপরটি হল নাম-করা সিভিল সার্জেন ডাঃ ভারতচন্দ্র ধর মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতকুমার ধর। রোগা বেঁটেখাটো মানুষ, রঙ ময়লা, গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন। শুনলাম ইনিও আইন পড়ছেন ব্যারিস্টার হবার জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এল. এল বি. পড়ছেন। এই দুটি ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায় তিন বছর একসঙ্গে বসবাস করেছি লণ্ডনে। এঁদের মতো সত্যিকারের সুহৃদ কমই পেয়েছি। এঁদের ব্যবহারের শালীনতা ও আন্তরিকতার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। আমি এঁদের দুজনেরই কাছে সব সময় যে স্নেহ প্রীতি পেয়েছি তার জন্যে এঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে অজিত আমাকে আপন ভাইয়েরই মতো দেখতেন। অজিত ছিলেন আদর্শবাদী ছেলে। খুব বই পড়তেন। কত সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে সোস্যালিজ্‌ম্‌, ফেবিয়ান আন্দোলন ও নানা বিষয়ের আলোচনা হত। তাঁর মনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি আমাকে বলতেন। হেম্‌তার মনে ছিল সহজ আনন্দের উৎস। কোনোরকম. স্বার্থপর নীচতা তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে কখনো দেখি নি। অত্যন্ত সাদা মন ছিল ওঁদের দুজনেরই। বেশ পরিণত বয়সে হেমন্ত এই সেদিন কলকাতাতেই দেহরক্ষা করেছেন। পরম আনন্দের কথা যে অজিত এখনো জীবিত রয়েছেন। নমাসে ছমাসে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে খুবই আনন্দ পাই।

আমাদেব পবিবারেব অনেক সন্তানই ছিলেন ব্যারিস্টাব এবং তাঁদের মধ্যে সবাই না হলেও বেশিব ভাগই ছিলেন 'ইনাব টেম্পল'-এব ছাত্র। সুতবাং বংশানুগত প্রথা অবলম্বনে আমাব 'ইনার টেম্পল'-এ যোগ দেওয়া বীতিসংগত হত। কিন্তু হেম্‌তা ও অজিত উভয়েই ছিলেন গ্রেজ্‌ইন -এব ছাত্র। গ্রেজ্‌ইনে ভর্তি হলে ওঁদেব সঙ্গে একসঙ্গে সেখানে যাওয়া যাবে এটা কম সুবিধেব কথা নয়। পবদিন সকালে প্রাতবাশ খেযে আমবা তিনজনেই গেলাম চ্যানসাবি লেনেব কাছাকাছি অবস্থিত গ্রেজ্‌ইনে; মিঃ ডাউথওয়েট তখন সেখানকার সম্পাদক। তিনি বললেন যে ভর্তি হবাব আগে আমাকে ইণ্ডিয়া আফিস থেকে একটি সুপাবিশপত্র আনতে হবে। বুঝলাম যে ইণ্ডিযা আফিস তখন ভাবতীয় ছেলেদেব উপব নিজেদেব কডা শাসন বিস্তাব কববাব প্রয়াস শুরু কবে দিয়েছে। তিনজনে অগত্যা গেলাম ইণ্ডিয়া আফিসে। ভাবতীয় ছাত্রদেব উপদেষ্টা যতদূব মনে আছে, ছিলেন ম্যালেট সাহেব। কার্ড দিতেই ডাক এল। ভেতবে ঢুকতেই খুব আপ্যায়িত কবে আমাব সঙ্গে কবমর্দন কবে কবে লণ্ডনে পৌঁছলাম ইত্যাদি সব জিজ্ঞাসা কবলেন এবং গ্রেজ্‌ইনে ঢুকবাব কথা বলাতেই বললেন, 'সে তো চমৎকার হবে। তোমাদেব দেশের এলাকাব ম্যাজিস্ট্রেটেব চিঠি এনেছ?' বললাম, সেটা জানা ছিল না বলে আনি নি। তিনি বললেন, 'তাই তো, বড়োই আক্ষেপেব কথা। সেটা না পেলে আমি কি কবে কি কবব বুঝছি না। আচ্ছা, আমি কলকাতায় চিঠি লিখিযে খবব নি। জবাবটা এলেই আমি চিঠি দিয়ে দেবখন।' আমি বললাম, 'এই চিঠি যাতাযাতে যে বেশ সময লাগবে। সেপ্টেম্বরে ভর্তি হতে না পাবলে আমাব মিকেলমাস টার্মটাই যে চলে যাবে।' তিনি তবু বললেন যে তিনি যত শিগগিব পারেন সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বুঝলাম যে কলকাতাব পুলিসেব কাছ থেকে আমাব সুনাম না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু কববেন না। ভাবতীয ছাত্রদেব উপদেষ্টাব কাজই মনে হল বাগডা দেওয়া। সেখান থেকে বেবিয়ে এসে আবাব তিনজনে গ্রেজ্‌ইনে ফিবে গিয়ে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়ালাম। ডাউথওয়েট সাহেব বুঝলেন যে একটা টার্ম বাদ গেলে শেষেব দিকে বারে কল্‌ড্‌ হতে আমাব বিলেতে তিন বছরের পবও তিন চার মাস থাকতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে তোমাদের দেশের নামকবা কাবো সুপারিশপত্র কিছু আছে?' জবাবে বললাম, 'আজ্ঞে, খালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমার

কলেজেব অধ্যক্ষ ডাঃ জি. সি. বসুব দুটি সার্টিফিকেট আছে।' ভদ্রলোক চোখ বিস্ফারিত কবে বললেন, 'ট্যাগোর? সেই মহাকবির সার্টিফিকেট আছে?' বললাম, 'হ্যাঁ, আছে বই কি। এই দেখুন না।' বলেই সার্টিফিকেট দুখানা তাঁকে দিলাম। তিনি বললেন, 'চমৎকাব। এতেই কাজ চলে যাবে। তুমি দরখাস্তখানা ভর্তি কবে টাকাটা আফিসে জমা করে দিয়ে এক্ষণি আমাব কাছে ফিবে এসো।' তক্ষুণি দরখাস্তটা ভর্তি করে সই করলাম এবং সেখানা ও টাকাটা জমা দিয়ে আবাব সম্পাদকেব ঘরে ফিরে গেলাম। আফিসেব কেবানীটি এসে তাঁকে দিযে কি সব কাগজে সই করিয়ে নিলেন। তার পব সম্পাদক বললেন, 'আব কোনো হাঙ্গামা কবতে হবে না। তুমি ভর্তি হযে গেছ। তোমাব সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা কবছি।' ভদ্রলোকের সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে করমর্দন কবে আমবা বাড়ি ফিবলাম। তাব পরদিন ইণ্ডিয়া আফিসে গিযে ম্যালেট সাহেবকে সেলাম কবে বলে এলাম, 'আপনি কষ্ট কবে আব চিঠি লেখালেখি কববেন না। আমি গ্রেজ্‌ইনে ভর্তি হয়ে গেছি।' তিনি উল্লাসেব প্রশংসন কবে বললেন, 'শুনে বড়ো খুশি হলাম' বলেই হাত বাড়িযে দিলেন কবমর্দনেব জন্যে। কবমর্দন হল কিন্তু হাতের চাপটা যেন একটু হালকাই হয়েছিল। যাক গে সে কথা। আসল কথাটা হল এই যে আমার ব্যারিস্টাবী পড়া শুরু হল।

৭

ইন্‌স্ অব কোর্টে ঢোকাব পর খোঁজ নিতে লাগলাম যে আই. সি. এস. পড়তে হলে কি কি ব্যবস্থা কবতে হবে। আমাব ভাগ্যে সুধাংশু, যাঁকে হাজারীবাগে ফেলে আমি বিলেত চলে এসেছিলাম— তাঁব আপন জ্যাঠামশায় সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তখন সেক্রেটারী অব স্টেটের কাউন্সিলেব সভ্য। এত বড়ো একজন মুরুব্বি থাকতে বাইবে কাবো কাছে পবামর্শ নেবাব আগে তাঁব কাছে যাওযাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কবলাম। এব কিছুদিন পূর্বেই তাঁব সহধর্মিণী পবলোকগমন করেছিলেন। তিনি একাই থাকতেন। তবে মধ্যে মধ্যে কেম্ব্রিজ থেকে তাঁব ছোটো ছেলে শৈলেন গুপ্ত বাপেব কাছে আসতেন। সার্ কৃষ্ণেব মেয়েব ঘবেব একটি নাতনী থাকতেন তাঁর সঙ্গে। মেয়েটির নাম শুনেছিলাম কমলা এবং তিনি ছিলেন সার্ অ্যালবিয়েন

ব্যানার্জির কন্যা। একদিন টেলিফোনে সময় ঠিক করে গেলাম সার্ কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। হাত উঁচু করে নমস্কার করে দাঁড়াতেই দেশে কে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেন। শিষ্টাচারের পরে বললাম যে আমি আই. সি এস. পড়তে চাই। তার জন্যে তিনি আমাকে কি কি বিষয় নিয়ে পড়তে উপদেশ দেন তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বি. এ.তে তুমি কি কি বিষয় পড়েছিলে।' জবাব দিলাম, ইংরেজি, ইতিহাস, ইকনমিক্স ও বাংলা। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ বিষয়ে অনার্স নিয়ে কোন্ ক্লাস পেয়েছ।' খানিকটা ঢোক গিলে অপ্রস্তুত হাসি হেসে জানালাম যে অনার্স ইংরেজিতেই নিয়েছিলাম তবে নেহাৎ দুর্ভাগ্যবশত অনার্স পাই নি। তিনি বিস্ফারিত চোখে মুচকি হেসে বললেন, 'অনার্স পাও নি? তবে আই. সি. এস. পড়বে কি করে?' বলেই আবার একটু হেসে ফেললেন যাতে করে কথার চেয়েও অনেক স্পষ্টতর রূপে বুঝিয়ে দিলেন যে ও ধাষ্টামিটা না করাই ভালো। আলোচনাটা আর এগুলো না। কেমন যেন মনমরা ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, 'খেয়ে যেয়ো।' কি করা যায়, বসেই পড়লাম। খাবার ঘণ্টা পড়ল। একেবারে দিশী পঞ্চব্যঞ্জন রান্না। মাস খানেকের উপর হয়ে গেছে বাড়ি ছেড়েছি। সেদিনকার লাঞ্চ খাওয়াটা যে কি মুখরোচক হয়েছিল তা বলা যায় না। পাশেই সার্ কৃষ্ণের নাতনীটি বসেছিলেন। আমার আই. সি. এস. পড়ার ধৃষ্টতার কথা মেয়েটি হয়তো শুনেই গেছে এই মনে করে মনটার মধ্যে কেমন খচ্ খচ্ করছিল। কালিদাসের সেই 'গমিষ্যাম্ উপহাস্যতাম্'এর বেদনাবোধটা বেশ ভালো করেই অনুভব করছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সার্ কৃষ্ণ বললেন, 'রবিবার রবিবার আমার এখানে লাঞ্চ খেয়ো।' ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

অনেকদিন পর্যন্ত এই নিমন্ত্রণের সুযোগ নিয়েছিলাম। প্রতি রবিবার সকালে নির্মল সেন মশায়ের বাড়ি কি অন্য কারো বাড়ি ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন ছেলেরা আসতেন। পিয়ানোতে কেউ একটি ব্রহ্মসংগীত করতেন এবং নির্মল সেন মশায় তাঁর পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভাষণ থেকে কিছু কিছু পাঠ করতেন। উপাসনান্তে আমি এবং পরে সুধাংশু এসে পৌঁছবার পর আমরা দুজনে যেতাম সার্ কৃষ্ণের বাড়ি লাঞ্চ খেতে। তাঁর রাঁধুনীটি লেডি গুপ্তার কাছ থেকে শুক্তনি থেকে শুরু করে যাবতীয় দিশী রান্না ও নানাবিধ মিষ্টান্ন করতে শিখেছিলেন। পরম উপাদেয় সেই দিশী রান্না

খেয়ে আই. সি. এস. পড়ার ধৃষ্টতার বেদনাটা কিছুটা উপশম হত।

পরম্পরায় জানলাম যে 'বেন' বলে আই. সি. এস. পড়াবার একটি বিখ্যাত কোচিং ইস্কুল ছিল। গেলাম সেখানে। সেখানকার সম্পাদকের সঙ্গে যে কথাবার্তা হল সংক্ষেপে তা এই ধবণের—

আমি— আমি আই. সি. এস. পডতে চাই। আপনাবা আমাকে সাহায্য কববেন কি? কি কি বিষয় নেব সে সম্বন্ধে একটু উপদেশ পেলে বাধিত হব।

সম্পাদক (সোৎসাহে)— নিশ্চযই আমবা তোমাকে তৈবি কবে দেব। তোমার কি কি বিষয় পডা আছে?

আমি— ইংবেজি, ইতিহাস, ইকনমিক্স ও বাংলা। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সংস্কৃতও পড়েছি।

সম্পাদক— তুমি ফ্রেঞ্চ জান, গ্রীক জান?

আমি— না।

সম্পাদক— তবে তো ইতিহাস, তা মডার্নই বল আব প্রাচীনই বল, সে তো কিছুতেই নেওয়া চলবে না। সংস্কৃত যদি অক্সফোর্ডেব ডিগ্রিব সমান মান পর্যন্ত জান তবেই নিতে পাব।

আমি— সেটা দাবি কবতে পাবব না। তা হলে আপনি কি পরামর্শ দেন?

সম্পাদক— তা হলে জিওগ্রাফী ও জিওলজি নিতে হবে।

আমি— আচ্ছা, ভেবে বলব'খন।

বলেই উঠে পড়লাম। জিওগ্রাফী সেই যে স্কুলে পডেছিলাম, তার পব সবই ভুলে গেছি। জিওলজি মানে ভূতত্ত্ব, এ ছাডা ও সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না। সুতরাং জিওগ্রাফী ও জিওলজি নিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলে যে 'গমিস্যাম্‌ উপহাস্যতাম্‌' অনিবার্য তাতে সংশয ছিল না আমার মনে এতটুকুও। শেষে কি আই সি. এস. ফেল্‌ ব্যাবিস্টাব হয়ে দেশে ফিরব? একটা ভালো আইনের ডিগ্রী পেলে অন্তত: কলকাতাব ল কলেজে একটা মাস্টাবী চাকবী পাওয়া যেতে পাবে। দু চারদিন খুব খানিকটা ভেবে ভেবে ঠিক করলাম যে আই. সি. এস. পডাব ধাষ্টামো না কবে মনোযোগ দিয়ে আইন পড়াই বিধেয়।

অজিত পডতেন এল. এল. বি. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। চলে গেলাম

গাওয়ার স্ট্রীটের ইউনিভার্সিটি কলেজে। দেখা করলাম প্রভোস্টের সঙ্গে। তিনিও বললেন যে ইণ্ডিয়া আফিসের সার্টিফিকেট আনতে হবে। ম্যালেট সাহেবকে যে ভাবে ঠুকে দিয়ে এসেছি তাতে তিনি যে কিছু করবেন তা দুরাশা মাত্র। কি মনে করে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'মশায়, আপনাদের ইন্‌স অব কোর্টের ছাত্র হবার যোগ্যতা থাকলেও কি আমি আপনাদের কলেজে ঢোকবার যোগ্য নই?' লোকটি বললেন, 'তুমি কোন্ ইনে ঢুকেছ?' বললাম যে আমি গ্রেজ্‌ইনের ছাত্র। তিনি বললেন, 'তবে আর কোনো কথাই নেই।' বলে আমাকে তিনি ভর্তি করে নিলেন। ইণ্ডিয়া আফিসের ফাঁড়াটা কেটে গেল। কে সেদিন জানত যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আমি লণ্ডনের সেই ইউনিভার্সিটি কলেজেরই একজন 'ফেলো' মনোনীত হব।

আমি যখন ১৯১৫ সালে বিলেত যাই তখন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এইচ. এইচ. অ্যাস্‌কুইথ। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজের নামকরা ছাত্র। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যেও অনেকগুলি স্বনামধন্য ব্যালিয়লের কৃতী ছাত্র ছিলেন— যেমন সার্ এডওয়ার্ড গ্রে, সার্ জন সাইমন, লর্ড রোজবেরী ইত্যাদি। মনে হল যে ব্যালিয়লে পড়ে অক্সফোর্ডের বি সি. এল. ডিগ্রিটা পেলে খুব ভালো হবে। গেলাম অক্সফোর্ডে। সেখানেও ইণ্ডিয়া আফিসের মনোনীত এক ব্যক্তি ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের উপদেষ্টা। তিনি বললেন যে ব্যালিয়লে স্থান নেই। চেষ্টা করে ওয়াঢ্যাম কলেজে স্থান করে দিতে তিনি সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে জানাব বলে লণ্ডনে ফিরে এসে ইউনিভার্সিটি কলেজের ল ফ্যাকালটির ডীন বৃদ্ধ ডাঃ মিউরিসনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের ক্ল্যাপহ্যাম কমনের বাড়ির কাছেই থাকতেন; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আইন পাস করে আমি কি করব ভেবেছি। মাস্টারি করব, না, কোর্টে প্র্যাকটিস করব? বললাম যে প্র্যাকটিস করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তবে আমাদের ল কলেজে চাকরি পেলে সুবিধে হবে; তিনি বললেন, 'দেখ, আমি লণ্ডনে পড়াই আবার অক্সফোর্ডেও পড়াই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইন্‌স্ অব কোর্টে পেশাদারী ব্যারিস্টারেরাই পড়ান। অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে ছেলেমেয়ে যায় বিশেষ করে সেখানকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষের টানে। এখন আমাদের দেশের সব শক্ত সমর্থ ছেলেরাই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ইংরেজ ছেলে প্রায় নেই বললেই

চলে। সুতরাং সেখানে গিয়ে ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার কোনো সুযোগই এখন পাবে না। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন বলে কিছুই নেই। তা ছাড়া যদি সত্যি সত্যি প্র্যাক্‌টিসই করতে চাও তবে লণ্ডনেই তোমার থাকা উচিত। তবে তোমার বাপের যদি পয়সা বেশি থাকে এবং অক্সফোর্ডে গিয়ে যদি ফুর্তি করে পয়সা উড়িয়ে কেবলমাত্র চালিয়াতিটাই শিখতে চাও তবে সেখানে নিশ্চয়ই যেতে পার।' বলেই বৃদ্ধ একটু মুচকি হাসলেন। আমি তক্ষুণি মন ঠিক করলাম যে লণ্ডনেই থেকে যাব।

বাবাকে ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে লম্বা চিঠি দিলাম যে আমি আই. সি. এস. পড়ব না এবং লণ্ডনেই এল. এল. বি. পড়ব। আমার মনের মধ্যে যে-সব যুক্তিতর্ক কাজ করছিল দেশে শুনলাম সকলে তা সঠিক বোঝেন নি। দাদাবাবু খবরটা পান অমরাবতী যাবার পথে। পরে জেনেছি যে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন শুনে যে আমি আই. সি এস. পড়লামই না। আমাদের দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ বিলেতে গিয়ে ইন্‌স্‌ অব কোর্টে ভর্তি হন এবং সেই সঙ্গে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে আই. সি. এস পড়ছেন বলে প্রচার করেন এবং ফুর্তি করে আই. সি. এস. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অথবা একেবারে পরীক্ষা না দিয়ে শুধু ব্যারিস্টার হয়েই দেশে ফেরেন। কিন্তু আমি যখন গোড়া থেকেই আই সি. এস. পড়লামই না তখন আমার বাড়ির লোকেদের ভাবা অস্বাভাবিক হয় নি যে আমি এমন তৈরি ছেলে যে প্রথম থেকেই বখে গেছি। বৌঠানের কাছে পরে শুনেছি যে দাদাবাবু অত্যন্ত রাগ করে তাঁর কর্মচারী ললিতবাবুকে বললেন, 'টেলিগ্রাফ করে দাও কাকার খোকাকে যে সে যেন এক্ষুণি দেশে ফিরে আসে।' ভাগ্যে বৌঠান ছিলেন দাদাবাবুর সঙ্গে তাই সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তার পর দাদাবাবুর রাগ উপশম হতে মোটেই সময় লাগে নি, কেননা ললিতবাবু সে টেলিগ্রামটা করেছিলেন কি-না সে সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধানই দাদাবাবু আর করেন নি। আমি লণ্ডনে বসে এ-সব ভয়াবহ গোলযোগের কোনো হদিসই পাই নি এবং সেইজন্যে দিব্যি নিশ্চিন্ততার মধ্যে এল. এল. বি. পড়ায় মন দিলাম।

আমি আই. সি. এস. পড়ব বলে মাসিক খরচ আমার বরাদ্দ ছিল পঁচিশ পাউণ্ড। সুধাংশু বিলেতে এসে পেতেন পনেরো পাউণ্ড। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বাবু হে, আই. সি. এস. যখন পড়লেই না তখন ওই পঁচিশ আর পনেরোর মধ্যে উদ্বৃত্ত দশ পাউণ্ডটা তো ভাগাভাগি করতে হয়। হাজার

হোক আমি ভাগনে তো বটে।' আমি বললাম, 'আহা কী কথাই না বললে। তোমাকে দেবার চেয়ে দাদাবাবুকেই দশ পাউণ্ড ফিরিয়ে দেব।' শেষ পর্যন্ত দাদাবাবুকে লিখে দিলাম যে আমার পঁচিশ পাউণ্ড খরচ লাগবে না। পনেরোতেই বেশ চলে যাবে। সেই থেকে পনেরো পাউণ্ডই আসত এবং সে আমলে তাতে আমার অতি স্বচ্ছন্দেই চলে যেত।

৮

এই সময়ে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। জার্মানরা বেলজিয়াম দখল করে ফরাসী দেশের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। মহাসমুদ্রে তাদের সাবমেরিন, যাকে 'ইউ বোট' বলত, তার আক্রমণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য জাহাজগুলি খুব বিপর্যস্ত হতে লাগল। প্রথমে কাগজে হিসেব বেরত আগের দিন কোন্ কোন্ জাহাজ ডুবেছে। তার পর ছাপা হত গত সপ্তাহে কোন্ কোন্ জাহাজ গেল। মানুষেরা পাছে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে জাহাজ ডোবার বহর দেখে সেইজন্যে পরে গভর্নমেণ্টের নির্দেশে খবরের কাগজগুলি কেবলমাত্র খবর দিত যে গেল সপ্তাহে মোট এত হাজার টন ডুবেছে। জনসাধারণ বুঝতেই পারত না যে কটা জাহাজ ডুবেছে এবং তাইতে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকত। এই ডুবোজাহাজের দৌরাত্ম্য ছাড়া আর-এক বিপদ হল আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ। লণ্ডনে তখন রাস্তাঘাটের সব বাতিগুলির কাঁচ আলকাতরা দিয়ে লেপে দিয়েছিল। বাতি জ্বালবার আগে ঘরের জানালার কাঁচ বন্ধ করে পুরু পর্দা টেনে দিতে হত যাতে করে ঘরের ভিতরের আলোর একটি রশ্মিও বাইরে না দেখা যায়। দেখা গেলেই পাহারাওয়ালা দরজা ধাক্কিয়ে সাবধান করে দিয়ে যেত। বার দুই তিনের বেশি সাবধান করে দিতে হলে কোর্টে ডাক পড়ত এবং জরিমানাও হত। ট্রামে বাসে হেডলাইট তো জ্বলতই না, ভেতরের বাতিগুলি সব আলকাতরা দিয়ে লেপে দিয়েছিল, খালি একটা পেনির মাপের ফুটো থাকত বাতিগুলির ঢাকনার নীচের দিকে। সেই ফুটো দিয়ে যে অল্প আলোটুকু আসত তারই নীচে হাত বাড়িয়ে কণ্ডাকটর টিকিট কাটত। লণ্ডনের দোকানগুলির জাঁকজমক ও আলোর ঘটা যা বইয়ে পড়া যায় তার কিছুই ছিল না। সন্ধ্যার পর সারা লণ্ডনটাই অন্ধকারেই ঢাকা থাকত, কিন্তু সেই অন্ধকারের

মধ্যেই অতোবড়ো শহরটার জীবনযাত্রা চলত। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়ার মধ্যে বরফগলা কাদার উপর দিয়ে বাসগুলি খুব সন্তর্পণেই চলত। এক কথায় আমি লণ্ডনে পৌঁছিয়েই দেখলাম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট।

এরই মধ্যে মাঝে মাঝে হামলা দিত জার্মান জেপেলিন। যেই খবর আসত অমনি পুলিসের লোকেরা নিজ নিজ গণ্ডির রাস্তাগুলিতে বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁকত—'Take cover, Take cover' অর্থাৎ ভেতরে যাও, ভেতরে যাও। নির্দেশ ছিল যে এইরকম সতর্কবাণী শুনলেই নিজ নিজ বাড়ির ভেতরে ঢুকে একেবারে মাটির নীচতলায় (সেলারে) গিয়ে বসতে হবে। নিজ বাড়ি থেকে দূরে যদি বেপাড়ায় থাক তবে নিকটবর্তী টিউব স্টেশনে নেমে যেতে হবে। অবিশ্যি বোমা যদি সোজা একটা বাড়ির উপর কি টিউব স্টেশনের উপর পড়ে তবে টিউবই বা কি সেলারই বা কি আর দোতলাই বা কি! এইরকম আশ্রয় নিলে দূরে যে বোমা পড়ত তার টুকরো থেকে অন্ততঃ রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু দেখেছি যে এইরকম সতর্কবাণী শুনলেই ছেলে-ছোকরারা, বিশেষ করে ভারতীয় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ছেলেরা, বাহবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখত জেপেলিন আসছে কিনা। হাওয়াই আক্রমণের সংকেত এলেই লণ্ডনের চারিপাশ থেকে অসংখ্য বৈদ্যুতিক জোরালো সার্চলাইট সারা আকাশটার মধ্যে যেন আঙুল বুলিয়ে যেত শত্রুর হাওয়াই জাহাজ খুঁজে খুঁজে। যেই-না একটা সার্চলাইট সেটাকে ধরেছে অমনি অন্য সব সার্চলাইটগুলি গিয়ে পড়ত তারই উপরে। সেই আলোর ঔজ্জ্বল্যে জেপেলিনটিকে দেখাত সাদা রাঙতা দিয়ে মোড়া খুব দামী চুরুটের মতো। দুই প্রান্ত দেখাত একটু ছুঁচল। তার পরই শুরু হত নীচে থেকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট কামানের গর্জন আর তার গোলাগুলি ফেটে যেত আগুনের ঝিলিক মেরে। মাঝে মাঝে এক একটা ভুস্‌ভুসে ফাঁকা ফাঁকা আওয়াজ শোনা যেত। সে শব্দটা ছিল উপর থেকে ফেলা বোমার উপর যে পাখা (প্রপেলার) থাকত তারই ঘোরার আওয়াজ। আমি বিলেত পৌঁছবার পর বহুবার এইরকম জেপেলিনের হামলা দেখেছি। একবার একটা জেপেলিনকে ঘায়েল করে মাটিতে এনে ফেলাও হয়েছিল। শেষের দিকে আসত লড়ুইয়ে হাওয়াই জাহাজ—ফকার বিমানপোত। দেখা গেছে জার্মানরা টেমস্‌ নদীর উপর দিয়ে চাঁদের বা তারার আলোয় পথ চিনে এসে লণ্ডনের আশেপাশে বোমা ফেলে ধ্বংসকাণ্ড করত। তাদের বিশেষ

লক্ষ্যবস্তু ছিল উল্‌উইচের গোলাবারুদের কারখানাটা। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধে হাওয়াই জাহাজের ধ্বংসাত্মক কার্যের যা বিবরণ পড়েছি তার তুলনায় প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের হাওয়াই হামলা যা আমরা দেখেছি সেটা কিছুই নয় বলতে হয়। মনে মনে যথেষ্ট ভয় শুধু আমাদের বিদেশীদের নয়, ইংরেজদেরও হত। কিন্তু ঐ জাতটার অসাধারণ আত্মবিশ্বাস দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রতিদিন সকালে দেখা হলেই প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে মুখ গম্ভীর করে বৃদ্ধ ইংরেজ, কি পুরুষ কি মহিলা, বলতেন, 'বড়ই দুঃসংবাদ মশায় আজকে। কিন্তু কিছু ভাববেন না, শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।' এই অসাধারণ বিশ্বাসের জোরেই ইংরেজরা সর্ব স্বার্থত্যাগ করে জয়ী হতে পেরেছিল। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস শেখবার জিনিস।

আমি বিলেতে পৌঁছবার দেড় মাস কি দুই মাস পরে একদিন লাঞ্চ খাবার পর বৈঠকখানা ঘরে বসে গল্পগাছা করছি, এমন সময় দেখলাম একটা কালা আদমী রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে বাড়িগুলির নম্বর দেখছে। একটু নজর করে দেখতেই স্পষ্ট দেখলাম যে আমার ভাগনে সুধাংশুই বটে। জানালাটা একটু তুলে ধরে চেঁচিয়ে নাম ধরে ডেকে জানালাম 'আয়, আয়। আমি এক্ষুনি আসছি!' বলেই সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমেই দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করা গেল। বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলাম সুধাংশুকে এবং অন্য সবাইয়ের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিলাম। কেট্‌ল্‌ দম্পতিও খুব খুশি হলেন আর-একটা ভাড়াটে পেয়ে। ঠিক হল সুধাংশু সেইদিনই গিয়ে তার জিনিসপত্র স্টেশন থেকে খালাস করে আমাদেরই বাড়ি চলে আসবে। সুধাংশুর সঙ্গে তখন বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না দেশে বাড়ির কে কেমন আছেন ছাড়া। বিকেলেই সুধাংশু চলে এল। উপরের তলায় কাপড়-চোপড় গোছাতে গোছাতে ওঁর সঙ্গে নিভৃতে বিশ্রম্ভালাপ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

প্রথমেই সুধাংশু বললে, 'আচ্ছা লোক তো তুই। আমাকে ফেলে একলা চলে এলি?' হেসে জবাব দিলাম, 'দিদিমণি তোকে বগলদাবা করে হাজারীবাগে নিয়ে গেলে আমি আর কি করব? আমার আসাটা পণ্ড হলে কি-ই বা লাভ হত তোর? আর তা ছাড়া, বুঝলি তো— আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি চলে না এলে তো তোর আসাই হত না।' শেষ কথাটা খুবই সত্যি, কেননা আমি চলে আসবার পরই সুধাংশু একেবারে

হন্যে হয়ে উঠল আসবার জন্যে এবং আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছি এবং লণ্ডনে বেঁচেও আছি দেখে দিদিমণিও শেষ পর্যন্ত সুধাংশুকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। এ কথা সে কথার পর সুধাংশু বেশ ভাবিক্কি চালে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখ্, চিঠি লিখতে পারিস। তবে বন্ধুভাবে লিখবি, বুঝলি, প্রেম-ট্রেম করে ফেলিস নে যেন।' প্রশ্ন করে যা জানলাম তা এই: বিলেত রওনা হবার আগে মজুমদার-গৃহিণীর সঙ্গে দেখা করে সুধাংশু আমার আরজিটা পেশ করায় তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু আমাদের দিদিমণি (তবলার) সঙ্গে দেখা করে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। বলাই বাহুল্য যে দিদিমণি তাঁকে একেবারেই উৎসাহ দেন নি, কেননা সাদামাঠা বি. এ পাস ছোকরা, মানুষ হয়ে দেশে ফিরবে কিনা কে জানে এবং ওইটুকু মেয়েকে এখন থেকেই এই অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমার বাবা-মায়ের মত কি হবে কে জানে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই সুধাংশুর জ্ঞানদামাসীমা কোনোরকম পাকা কথা না দিয়ে ঐরকম ভাসা-ভাসা জবাব দিয়েছেন সুধাংশুকে। আমার পক্ষে চিঠি লেখার অনুমতিটাই তখন ছিল বড়ো কথা এবং সে অনুমতি পেয়ে পরের মেলেই বুবুকে নাতিবৃহৎ একটি চিঠি লিখলাম। যথাসময়ে জবাবও এসে যাওয়ায় বেশ বোঝা গেল যে বাণিজ্যটা একেবারে আমার একতরফার নয় এবং তা অনুভব করে যে নিতান্তই নিশ্চিন্ত হলাম তা বলাই বাহুল্য। সে-সময়ে হাওয়াই জাহাজে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা তখনো হয় নি। প্রতি সপ্তাহে একটি করে মেল যেত। বাড়িতে মা কি বাবার কাছে আমি অতি নিয়মিত একখানা করে চিঠি লিখতাম প্রতি সপ্তাহে। এবার থেকে দুখানা করে চিঠি, বাড়িতে একখানা, বুবুকে একখানা, লেখা চলতে লাগল একটানা নিয়মিত ভাবে। মাঝে মাঝে সুধাংশু গম্ভীর চালে মনে করিয়ে দিত, 'বন্ধুত্বের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না তো?' জবাব দিতাম, 'যা, যা। গার্জেনী করতে হবে না।'

বুবুর চিঠিগুলিতে বেশ উৎসাহিত হতাম নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেশে ফেরবার জন্যে। আমি যে আই. সি. এস. পড়লাম না তাতে তাঁর কোনো উদ্বেগ লক্ষ্য করি নি। কিন্তু বাবার চিঠিগুলি হত একটু ঝাঁঝালো। বাইরের লোকেরা আমার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলে বাবার মনে আঘাত লাগত এবং সেই জ্বলুনির ঝাঁঝটা এসে পড়ত আমার উপর বাবার চিঠির মারফত। একটা চিঠির কথা খুব মনে আছে। বাবা লিখলেন যে সম্বন্ধভাবে এক পৃষ্ঠা

চিঠি লিখতে তাঁর সময় লাগে আধঘণ্টা। তিনি আশা করেন যে আমি বুবুকে সম্বন্ধভাবে চিঠি লিখি। তা হলে তাঁর সময়ের মাপকাঠিতে বাইশ পাতা চিঠি লিখতে আমার এগারো ঘণ্টা সময় লাগার কথা। যদি সপ্তাহে এগারো ঘণ্টা চিঠিই লিখি তবে পড়াশুনা করছি কখন? ভাবলাম এ আবার কি হল? ঝুনু বিরনুর সঙ্গে বাবার নাতনী দাদামশায়ের সম্পর্ক। পরে শুনেছি যে বাবাকে টালাবার জন্যে ঝুনু নাকি বাবাকে বলেছিলেন— 'জানো, ছোটদাদা-বাবু, দেখে এলাম মামু বুবুকে বাইশ পাতা চিঠি লিখেছে।' তাঁরা তো মন্তব্য করেই খালাস। ঝালটা এসে পড়ল আমারই উপরে। একে তো আই. সি. এস. পড়লামই না। তার উপরে বাইশ পাতা প্রেমপত্র লেখার অভিযোগ। যে-কোনো বাপের ধৈর্যচ্যুতি হতেই পারে।

৯

সুধাংশুও আমার দেখাদেখি লণ্ডনের গ্রেজ্‌ইন এবং ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হল। হেম্‌তা, অজিত, সুধাংশু এবং আমি একসঙ্গেই যেতাম গ্রেজ্‌ইনে সান্ধ্যভোজ খেতে। আমরা যারা কলেজেও পড়তাম তাদের প্রতি টার্মে তিনদিন করে সান্ধ্যভোজে যেতে হত এবং যারা কলেজে পড়ত না কেবল ইনেই পড়ত তাদের প্রতি টার্মে ছয় দিন ইনে যেতে হত। কালো পোশাকের উপর ব্যারিস্টারের জোব্বা (গাউন) পরে ডিনার খাওয়াটা প্রথম প্রথম বেশ মজার বলে মনে হত। পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। গ্রেজ্‌-ইনের সান্ধ্যভোজে আমাদের খুব চাহিদা ছিল। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। গ্রেজ্‌ইন খুব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। শুনেছি যে ঐ বাড়ির কড়ি-বরগা ও দেয়ালের উপরের কাঠের অস্তরগুলি তৈরি করা হয়েছিল রানী এলিজা-বেথের আমলে স্প্যানিস নৌ-বাহিনী (আরমাডা) বিধ্বস্ত করে সেইসব জাহাজের মোটা কাঠ কেটে ও প্রয়োজনমতে চেঁছে-ছুলে। ইংরেজরা খুবই রক্ষণশীল জাত এইসব ব্যাপারে, অন্যান্য বিষয়ে তারা যতই প্রগতিশীল হোক। কিম্বদন্তী ছিল যে গ্রেজ্‌ইনের মাটির তলার ঘরে (সেলারে) এক শতাব্দীরও বেশি পুরানো শ্যাম্‌পেন মজুত ছিল। প্রতি সান্ধ্যভোজে হাই টেবিলে বসতেন ইনের প্রবীণ বেঞ্চারগণ। তাঁদের মধ্যে থাকতেন ঘাগি ব্যারিস্টার ও জজেরা। আর আড়াআড়ি টেবিলগুলিতে ছাত্রেরা চারজন

করে এক একটি মেস করে বসত। প্রত্যেক মেসে এক বোতল করে শ্যাম্পেন এবং দু বোতল করে শেরি বরাদ্দ ছিল। এখন চারজনের মধ্যে কেউ যদি মদ না খায় তবে বাকি কজন মিলেই সেই তিন বোতল মদ পরমানন্দে সেবন করতে পারে। আমরা মদ খেতাম না বলে যাবা পাঁড তারা আমাদের সেধে সেধে তাদের মেসে ভাগাভাগি কবে বসতে অনুরোধ করত। একবার আমি কালো কোট না পরে একটা ব্রাউন স্যুট পড়ে গ্রেজ্ইনে গিয়েছিলাম এবং কাপড়ের ব্রাউন রঙটা যাতে দেখা না যায় তাব জন্যে কালো ব্যাবিস্টাবের গাউনটা বেশ জডিয়ে বসেছিলাম। দু-একজন ঘুণ ছোকরা আমাব ব্রাউন কোটের সম্বন্ধে একটা নালিশ ঠুকে দিল বেঞ্চাবদের কাছে। নিয়মভঙ্গ অপরাধে আমার না জানি কি শাস্তি হয় বলে মনে বেশ একটু ভয় হল। বেঞ্চাববা রায় দিলেন যে আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেন জবিমানা কবা হোক। আমাব খরচায় সেই ফরিয়াদী ছোকরাব মেসে এক বোতল বেশি শ্যাম্পেন সেদিন জুটে গেল। তখন বুঝলাম যে এত সাত তাড়াতাডি নালিশের ভিতরকাব কাবণটা কি। এবকম ভুল আর কখনো হয় নি।

আমাদের কলকাতা হাইকোর্টে তখন নিয়ম ছিল যে সেখানে প্র্যাকটিস কবতে হলে ব্যাবিস্টাব তো হতেই হবে, তার উপবে আবাব বিলেতের একজন ব্যাবিস্টার যিনি কোর্টে প্র্যাকটিস কবেন তাব চেম্বারে এক বছর ডেভিলিং অর্থাৎ বেগাব কাজ কবেছে বলে সার্টিফিকেট দাখিল কবতে হবে। এই এক বছব ডেভিলিংটা যারা বিশ্ববিদ্যালয়েব ডিগ্রি পায় তারা কলেজে তিন বছব পড়তে পড়তেই সেবে নিতে পারে। কিন্তু যারা ডিগ্রি পাবে না তাদেব ইনের তিন বছরের পডাব পব আব-এক বছব কোনো ব্যারিস্টারের চেম্বাবে পডতে হবে। ডিগ্রি যে পাব তাতে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। সুতরাং কলেজে তিন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেম্বাবে এক বছর পডব ঠিক করলাম। তখন শুনলাম যে এমন-সব ইংরেজ ব্যাবিস্টারও খুঁজে পাওয়া যায় যাদের কোর্টে কাজকর্ম কিছুই নেই বলে যে-কটা টাকা পাওয়া যায় তাই পেলেই ছাত্র ভর্তি করে বৎসবান্তে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থায় টাকাও কম লাগে এবং সত্যি সত্যি চেম্বাবেও যেতে হয় না। আমি মনে করলাম যে যখন কলকাতায় ফিরে প্র্যাকটিসই করব তখন একজন ভালো লোকের চেম্বারে গিয়ে কাজ শেখাই বিধেয়। এতে দক্ষিণাটা বেশি দিতে যদি হয় তাতে আমার অসুবিধে নেই, কেননা যা টাকা লাগে

তা তো দাদাবাবুই দেবেন।

আমাদেব আইন ফ্যাকালটির ডীন বৃদ্ধ ডাঃ মিউরিসন সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোনো ভালো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না। তিনি বললেন, 'দেখো বাবা, যাব কোর্টে খুব বেশি কাজ তার কাছে গিয়ে কোনো লাভই নেই, কেননা সে তোমার দিকে নজব দেবার সময়ই পাবে না। এমন লোকের কাছে যাওয়া দবকাব যার কাজ কিছু আছে কিন্তু বেশি নয়।' বললাম, 'সেবকম কাউকে জানেন কি?' তিনি একটু ভেবে বললেন, 'আমার বন্ধু ফ্রান্সিস ওয়াটেব ১নং মিডল টেম্পল লেনে চেম্বাব। তুমি তার কাছে যাও।' মিউবিসন সাহেবেব চিঠি নিয়ে গেলাম ওয়াট সাহেবের চেম্বাবে। তিনি বললেন যে তিনি ছাত্র নিতে পারেন তবে তাঁর ফি হবে একশো গিনি এবং তাঁব মুহুবীকে দিতে হবে এক গিনি, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে একশো ছ পাউণ্ড এক শিলিং। চেক বইটা সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিলাম। চেক কেটে সাহেবেব হাতে দিযে করমর্দন করে সেদিনেব মতো বাড়ি ফিবে এলাম। তাব পবদিন থেকে বেশ নিয়মিত ওয়াট সাহেবেব চেম্বাবে যাওয়া আবম্ভ কবলাম। অল্পদিনেই দেখলাম যে তাঁর কোর্টে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অনেকদিন অন্তর অন্তর দু-চারটে আবজি মুসাবিদা কববাব ব্রীফ আসে। সাবা বছবে এসেছিল দুটা ডক ব্রীফ অর্থাৎ যে মামলায় গবিব আসামীব তবফে সবকাবই কৌসুলী ঠিক কবে দেয় তাদের প্যানেল থেকে। মনটা একটু দমে গেল। কি আব কবা যাবে। টাকাটা তো দিয়েই ফেলেছি।

আমি চেম্বাবে গিয়ে আইনেব পাঠ্যপুস্তকগুলিই বসে বসে পড়তাম। অল্প পরে ওয়াট সাহেব আমাকে আইন পড়তে সাহায্য করতে লাগলেন। অর্থাৎ তিনি আমার কোচ বা মাস্টারই হয়ে পড়লেন। এটাতে আমার ভালোভাবে পাস কববাব পক্ষে সুবিধেই হয়ে গেল। আমি বিকেল পর্যন্ত চেম্বাবে তাঁব কাছে পড়ে, বাস্তায কোনো রেস্টুরেন্টে এক পেয়ালা চা খেয়ে সন্ধ্যার সময়ে কলেজে এবং পবে ইন্‌স্ অব কোর্টে ক্লাস করে বাড়ি ফিরতাম। কলেজ শুরু হবাব অল্পদিন পবেই অধ্যাপক ডাঃ হিবার্ট রেজিস্টারী ধরে নাম ডাকতে গিয়ে যখন 'গুস' বলে ডাকলেন, তখন পেছন ফিরে দেখি আব-একটি কালা আদমী জুটে গেছে ক্লাসে। ক্লাসের শেষে তাঁব সঙ্গে আলাপ কবলাম। তিনি কলকাতার নাম-কবা হাবমোনিয়াম নির্মাতা

ডোয়ারকিন অ্যাণ্ড সন্স-এর মালিক দ্বাবিক ঘোষ মশায়ের ছেলে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। সেই যে তাঁব সঙ্গে পরিচয় হল তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে অটুট ছিল যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ও কলকাতায় প্র্যাকটিস কবতেন।

১০

আই. সি. এস. না পড়াব দরুণ বাড়িতে আমার যে অখ্যাতি হয়েছিল তার জেব চলেছিল যতদিন না আমি বেশ ভালো ভাবে এল এল. বি. পবীক্ষাব প্রাথমিক খণ্ডটা পাস কবলাম। এই ভালো পাসেব খবব পেয়ে বাবা দাদাবাবু ও বৌঠান বোধ হয় একটু আশ্বস্ত হলেন যে আমি বিলেতে নিছক বকাটেপনা কবছি না। তাব পব যখন ইন্‌স্ অব কোর্টেব প্রাথমিক পবীক্ষাগুলিতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হতে লাগলাম বাড়িতে আমার সুনামেব মান স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠে আসতে লাগল। বারেব প্রাথমিক পবীক্ষা হত নিজ নিজ অভিরুচি মতো বেছে নেওয়া চাবটে বিষয়ে। এই চাবটে বিষয়েব পবীক্ষা একসঙ্গেও দেওয়া যেত কিংবা একটা একটা কবেও দেওয়া যেত। প্রায় শতকবা নব্বই ভাগ ছাত্রই একটা একটা কবে পবীক্ষা দিত। প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষাব ফিস তখন ছিল দশ শিলিং। নিয়ম ছিল যে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস কবলে সে দশ শিলিংটা ফেবত পাওয়া যেত। আমি একটা বিষয় ছাড়া অন্য তিনটে বিষয়েই পবীক্ষার ফিসটা ফেরত পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই দশটা করে শিলিং আমাব একাব ভোগে কখনো আসে নি। সুধাংশু বলতেন, 'তোব যা এলেম তাতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হবাব তো কথা নয়। ওটা বেড়ালেব ভাগ্যে ফোকোটে হয়ে গেছে। সুতবাং চল যাই থিয়েটাব দেখে আসি।' যুক্তি অকাট্য বলেই সুধাংশুব বিশ্বাস ছিল বলে তাঁব কথা মেনে নিয়ে আমবা চাবজনে থিয়েটার দেখে আসতাম।

বাব পবীক্ষাব কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ছে। সেবার আমি বাবেব প্রাথমিক পবীক্ষায় ফৌজদারী আইন বিষয়ে পবীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা দিয়ে মনে হল যে সেকেণ্ড ক্লাসের বেশ উঁচু জায়গা তো পাবই, চাই কি প্রথম শ্রেণীও হতে পারে। বাবাকে এবং বুবুকে বেশ ঘটা করে খবরটা জানিয়ে দিলাম। অবশেষে একদিন সকালবেলায় টাইম্‌স্ কাগজে ফল বেরুল।

আমাব নামই নেই! এত গলাবাজি করে কি না একেবারে ফেল! আবে ছ্যাঃ। এখন বন্ধুমহলে মুখ দেখাই কি কবে? বাড়িতেই বা সবাই কি ভাববে? নিরুপায়, অপমানটা সহ্য করতেই হবে। বাড়িতে বাবাকে লিখলাম— 'আমি কিছুই বুঝতে পাবছি না। টাইম্‌স্‌ কাগজে দেখছি আমি ফেল হয়ে গেছি।'

পবদিন ওয়াট সাহেবেব চেম্বাবে গিয়ে দাঁড়ালেম। তিনি গভীব সহানুভূতি জানিয়ে বললেন যে তিনি অত কবে পবিশ্রম কবে পড়ানো সত্ত্বেও আমি ফেল হলাম দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। আমি আম্‌তা আম্‌তা কবে বলে ফেললাম, 'দেখুন সার্‌, আমার হাতেব লেখাটা বড়ো বড়ো বলে আমি দু-তিনটে খাতায় প্রশ্নেব জবাব লিখেছিলাম। তাব মধ্যে কোনো একটা খাতা কি সেলাই খুলে হাবিয়ে যেতে পাবে?' তিনি আমাব মুখেব দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখো, ওইবকম ঘটনা তোমাদেব দেশে হয কি না জানি নে, কিন্তু আমাদেব দেশে তা হয না হে।' আমি তবু বললাম, 'কাউন্সিল অব লিগেল এডুকেশনেব ডিবেকটাব ডাঃ ব্লেক অজার্সকে একটু চিঠি দিয়ে বিষয়টিব অনুসন্ধান কবতে বললে হয় না?' তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ওবকম বোকামি কবা ঠিক হবে না।' আমি তখনো ছাড়ি নি। বললাম, 'দেখুন মশায়, টাইম্‌স্‌ কাগজে বলছে এতগুলি ছেলে পাস কবেছে কিন্তু নামগুলি গুনে দেখুন, একটা তো কম দেখছি। আপনি দয়া কবে অজার্স সাহেবকে একটা চিঠি দিন।' আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে তিনি অজার্সেব নামে একটা চিঠি আমাকে দিলেন।

আমি তক্ষুনি সে চিঠি নিয়ে অজার্স সাহেবেব সঙ্গে দেখা কবতে ছুটলাম। কার্ড দিতেই তলব এল। ঘবে ঢুকে চিঠিখানা দিলাম তাঁব হাতে। তিনি যেন হকচকিয়ে গেলেন। একটা বেল টিপে কাউন্সিলেব সেক্রেটাবিকে ডাকালেন। সেক্রেটাবিকে বললেন ফাইলটা নিযে আসতে। সে ভদ্রলোক ফাইল নিয়ে ফিবে এসে সেটা অজার্স সাহেবেব হাতে দিলেন। পাতা উল্‌টে দেখে অজার্স সাহেব কবমর্দন কববাব জন্যে হাত বাড়িযে বললেন, 'ওহে, দাস, আমি ভাবি খুশি হয়েছি। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি তো প্রথম হয়েছ, যদিও সেকেণ্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসটা তোমাব কানেব কাছ দিয়ে গেছে হে।' আমি তখন এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে প্রথমটা মুখে কথাই বেব হচ্ছিল না। খানিকটা সামলিয়ে নিয়ে বললাম,

'টাইম্‌স্‌ কাগজে তো আমাব নাম বেরল না।' তিনি যেন অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? সে কি?' বলে সেক্রেটারির দিকে তাকালেন। সেক্রেটারিও হতভম্ব। আমতা আমতা কবে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, ভুলই তো হয়ে গেছে।' চেঁচিয়ে উঠলেন অজার্স সাহেব, 'এ যে মারাত্মক ভুল। কি না হতে পাবত। এই ছেলেটি যদি হতাশ হয়ে বেফাঁস কিছু কবে ফেলত তবে কে তাব জন্যে দায়ী হত?' আমাব দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কি বাডিতে ফেলেব কথাটা লিখে ফেলেছ?' আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলায় তিনি বললেন, 'তুমি এক্ষুনি বাডিতে টেলিগ্রাফ কবে দাও যে তুমি ফার্স্ট হয়েছ। খবচাটা কাউন্সিলই দেবে।' আমি বললাম, 'খবচা কিছু দিতে হবে না, সার্‌। পাস হয়েছি সেটা ছাপা হলেই যথেষ্ট হবে।' সেলাম কবে বেবিয়ে পডলাম। সোজা গেলাম ওয়াট সাহেবেব চেম্বাবে। সব বিবরণ শুনে তিনি বিস্ফাবিত নয়নে চেয়ে বললেন, 'বল কি হে? তাজ্জব কথা। এমন তো শুনি নি কখনো!' মৌকা বুঝে বললাম, 'সার্‌, ভুলচুক সব দেশেই হয়ে থাকে।' ওয়াট সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তা বলতেই পাব। যাই হোক, সব ভালো যাব শেষ ভালো।' বাডি ফিবেই আবাব দুখানা চিঠি লিখলাম সুখবরটা দিয়ে।

১১

যুদ্ধেব অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল। কে হারে কে জেতে বলা যায় না। খাবাব জিনিসেব টানাটানি দেখা দিল। রেশনেব কড়াক্কড হতে লাগল। তাব উপবে ঝি চাকবেব অভাব হল। চাকববা তো গেল যুদ্ধে লডাই কবতে। ঝিয়েবা গেল গোলা-বারুদ তৈবিব কাবখানায় বা ফ্যাকটাবিতে বা ট্রামে বাসে বা পোস্টাফিসে কাজ নিয়ে। আমাদের বাডিব এতগুলি অতিথিব কাজকর্ম ও খাওযা যোগানো কেট্‌ল-গৃহিণী আব কবে উঠতে পাবছিলেন না। খুব দুঃখেব সঙ্গে বিনীত ভাবে কেট্‌ল সাহেব আমাদের কাছে তাঁদেব অসুবিধেব কথা জানিয়ে বললেন যে আমরা যেন কোনো বোর্ডিংয়ে যাবাব বন্দোবস্ত কবি। হেমতা চলে গেল একটা মেসে যেখানে থাকত যত রাজ্যের ব্যাঙ্ক বা অফিসের বুড়ো বুড়ো কর্মীরা। সুধাংশু ও আমি প্রথমে গেলাম ক্ল্যাপহ্যামেই অন্য একটা বাসায় যেখানে

গৃহকর্ত্রী ছিলেন মিসেস টার্নার। সে বাড়িটা ছোটো বলে মিসেস টার্নার আর্লস কোর্টে ২৩ নম্বর ট্রেবোভার রোডে একটা বড়ো বাড়ি নিলেন। অজিতও সেখানে এলেন। এই ট্রেবোভার রোডের মিসেস টার্নারের বাড়িতেই আমরা শেষ পর্যন্ত ছিলাম।

ভদ্রমহিলাটি আমাদের খুব যত্ন-আত্তি করতেন খাওয়া-দাওয়া থাকা-শোওয়া ব্যাপারে। মিসেস টার্নারের স্বামী মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি বোধ হয় গ্রেট বৃটেনের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন কারবারের কাজে। তাঁদের ছেলে ছিল না, ছিল একটি মেয়ে— আইরিনী টার্নার সংক্ষেপে রিনী। বেশ গোলগাল মৃদুস্বভাবসম্পন্ন মেয়েটি। লেখাপড়া বেশি ছিল না। যুদ্ধের বাজারে কি একটা আফিসে কাজ নিয়েছিলেন। এক ঢিলে দুই পাখিই মারা হল। অর্থাৎ দেশসেবাও হল, কিছু টাকাও ঘরে এল। আমরা ট্রেবোভার রোডে ছিলাম বলে আমাদের জানা-শোনা আরো বাঙালি ছেলে জুটে গেল। সুধীন্দ্র দাস, বৌঠানের ভগ্নীপতি ময়না দাস ব্যারিস্টারের বৈমাত্রেয় ভাই, এলেন কেম্ব্রিজের পড়া শেষ করে। আর-একজন কলকাতার খুব নামকরা ভালো ছেলে বীরেন বিশ্বাস। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র। তিনি কলকাতায় ম্যাট্রিকে ও আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম কি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। সুযোগ-সুবিধে পেলেই তিনি কেম্ব্রিজের থেকে লণ্ডনে আমাদের ট্রেবোভার রোডের বাসায় এসে উঠতেন ও থাকতেন। একজন অবাঙালী মদ্রদেশীয় ছাত্র কে. পি. মেনন— মহীশূর সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পারদর্শী হতে। মেনন আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়েছিলেন। তাঁর রসবোধ ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উত্তরকালে তিনি দেশে ফিরে মহীশূরে সরকারি উচ্চ-পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে এখন অবসর নিয়ে বাঙ্গালোরে নিজ বাড়িতে বসতি করছেন।

ট্রেবোভার রোডের বাড়িতে মিসেস টার্নার, যাঁকে আমরা সবাই 'মা' (মাদার) বলতাম, তাঁর উদ্যোগে খুব ঘটা করে খ্রীস্টোৎসব পালন করা হত। টার্নার-পরিবারের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকে আসতেন। একজনকে বেশ মনে আছে যদিও তাঁর নামটা ভুলে গেছি। তিনি আগে একটা ক্যাভেলরি বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমরা যখন বিলেতে ছিলাম তখন তিনি অবসর নিয়েছিলেন। সেই ক্যাপ্টেনটি একেবারে তাঁর পুরা সামরিক

পোশাকে সেজে আসতেন। কোটের বুকে ও হাতায় ঝকঝকে করে মাজা বোতাম এবং কাঁধের উপর পালিশ-কবা তিনটে তারা থেকে যেন আলো ঠিকবিয়ে পডত। একটা চামডাব বেল্ট ডান কাঁধের উপর থেকে বুক পিঠ ঘিবে বাঁ হাতেব তলায় গিয়ে মিশে যেত। তাবই উপরে অনেকগুলি খাপে খাপে বন্দুকেব গুলি ভবা থাকত। কোটেব বাঁ হাতেব কাঁধ ও বগল ঘিবে মোটা সোনালী দড়িব কী বাহাব। চকচকে ব্রাউন বুট-জুতার উপবে পালিশ-কবা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত চামডাব পা মোড়া গেটাব দেখতে অপূর্ব সুন্দব হত। সেই বুটেব গোডালিব সঙ্গে জোড়া ছিল চকচকে ইস্পাতেব চোখা খোঁচা (স্পাব) যাব গুঁতো দিয়ে ঘোডাকে দৌড করানো হত। সব চেয়ে আবো জাঁদরেল লাগত ঝকঝকে চামডাব খাপে প্রকাণ্ড তলোয়াবখানা ও তাব হাতলেব বাহার। প্রথম বছরেব খ্রীস্টোৎসবে ভদ্রলোকটি যখন 'চার্জ অব দি লাইট বিগ্রেড' আবৃত্তি কবতে কবতে ঝাঁ করে ডান হাত দিয়ে তবোয়ালটা একটানে খুলে ফেললেন তখন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পব পর আবো দুবছব ক্যাপ্টেন সাহেব ঐ একই কবিতা আবৃত্তি কবেছিলেন। বোধ কবি তিনি এই একটাই কবিতা জানতেন। এই আবৃত্তি ছাডা পিয়ানো বাজিয়ে গান হত অনেক। আমন্ত্রিত মেয়েবা তাদেব নিজ নিজ গানেব স্ববলিপি নিয়ে আসতেন। খ্রীস্টমাস ভোজটা হত দুর্দান্ত অর্থাৎ অনেক দিনেব সযত্নে সঞ্চিত খাবাব দিয়ে।

নববর্ষও পালন কবা হত সমাবোহ কবে। বছবেব শেষ দিনে সান্ধ্যভোজেব পব গান-বাজনায় ঘড়িব কাঁটা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেত মধ্যবাত্রি পর্যন্ত। বাত বাবোটা বাজবাব মিনিট কয়েক আগে আমাদেব মধ্যে একজন কালা আদমিকে বাডিব বাইবে যেতে হত। ঠিক বাবোটা বাজলে সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল গির্জের বড়ো ঘণ্টাটাব সঙ্গে অসংখ্য টিনেব ক্যানেস্তারা বেজে উঠত। ঠিক একই সঙ্গে টেম্‌স্ নদীতে দণ্ডায়মান বড়ো ছোটো সব জাহাজেব সাইবেনগুলি একযোগে ঐকতান শুরু করত। সঙ্গে সঙ্গে বাইবের কালা আদমিটি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় ঘা দিত। ইংরাজদের নাকি বিশ্বাস যে নূতন বছরের প্রথমক্ষণে কালোমানুষ কি কালো বিড়াল দেখা খুবই শুভলক্ষণ। তাই অজিত, সুধাংশু ও আমার মধ্যে একজনকে ঐ শীতের রাতে দরজাব বাইবে দুর্ভোগ ভুগতে হত। সদর দরজায় ঘা দিলেই গৃহকর্ত্রী মিসেস টার্নার নিজে দরজাটাব দুই পাটই একেবারে

উন্মুক্ত কবে খুলে ধবতেন এবং তাঁর পেছনে বিকশিত দন্ত একদল লোক প্রাণভরে সেই শীতার্ত কালো মানুষটিকে দেখে শুভলক্ষণ দেখাব আনন্দ লাভ করতেন। এইবকম কবে পুবানো বছবকে বিদায় দিয়ে নতুন বছবকে আবাহন কবা হত ট্রেবোভাব বোডে।

১২

যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড প্রকোপে চলেছে তখন এমন একটা কাণ্ড হল ব্যারিস্টাবী পড়ুয়া গ্রেজ্‌ইনেব ছাত্রদেব মধ্যে যা ভোলবার নয়। ছাত্রদেব মধ্যে অনেকে গ্রেজ্‌ইন লাইব্রেরিব গবম ঘবেব মধ্যে বসে পডতে যেতেন। দারুণ শীতেব মধ্যে বাড়ি না ফিবে কিংবা বাস্তায় বেবিয়ে বেস্টুবেণ্টে খেতে না গিয়ে ঐসব পড়ুযাবা গিযে বসতেন সাধাবণ বৈঠকখানায় অর্থাৎ কমনরুমে। সেই কমনরুমে হাজিরা দিত যে attendantটি তাব নাম ছিল চার্লস। চার্লসেব কাছে চাইলে গবম চা বা কফি এবং টোস্ট ডিম জ্যাম ইত্যাদি খাবাব সস্তায় পাওয়া যেত। এতে ছেলেদেবও সুবিধে হত এবং চার্লসেবও দুপযসা হত। এখন হল কি, বাধ্যতামূলক সমবসেবা আইনানুযায়ী চার্লসেব বয়সেব লোকেদেব যুদ্ধে যাবাব ডাক এল। শোনা গেল চার্লসও চলে যাবে যুদ্ধে। চার্লসই ছেলেদেব উসকে দিয়েছিল, না, ছেলেবা নিজেবাই গুঞ্জন কবতে লাগলেন যে চার্লস চলে গেলে তাঁদেব অনেক সময নষ্ট হয়ে যাবে বাইবে গিয়ে খেয়ে আসতে এবং তাঁদেব পডাশুনাব সমূহ ক্ষতি হবে তা জানি নে।

ইংবেজ ছেলেবা প্রায় সবাই চলে গেছে যুদ্ধে এবং পড়ুয়াদেব মধ্যে ছিল ভাবতীয় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজেব কাফ্রী ছেলেবা। মৃদু গুঞ্জন অচিবেই স্পষ্টতর কোলাহল হযে উঠে বেশ একটি ঘোঁট দেখা দিল। মেমোবিয়েল লেখা হয়ে গিয়ে আবম্ভ হল সই সংগ্রহেব পালা। বহু ছেলে চোখ বুজে সই কবে ফেললেন, মায় আমাদেব অজিত ও হেমতা। আমাকে সই কবতে বলায় আমি রাজি হলাম না। বললাম যে এমন কিছু অসুবিধে হবে না যাব জন্যে এরকম আবদাব কবা যায। সুধাংশুও সই কবেন নি। আমাকে ও আমার মতো যাঁবা সই কবতে গববাজি হলেন তাঁদেব সবাইকে সই-কবা ছেলেবা সমস্বরে ভীরু (কাওযার্ড) বলে আপ্যায়িত কবে ইনেব সেক্রেটাবি ডাউথওয়েট সাহেবের কাছে সেই মেমোবিযেল দাখিল কবে দিয়ে এল। আমবা যাবা

সই করি নি তারা নিজেদের মুখরক্ষা করবার জন্যে বললাম, তোমাদের ঐ আবেদন না পড়েই ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দেবে।

একদিন যায়, দুদিন যায়। কমনরুমে বেশ গরম গরম বাক্যবিন্যাস চলতে লাগল। সই-না-করার দল আমরা কদিন কোণঠাসা হয়ে রইলাম। অবশেষে তৃতীয় দিনে চিঠি এল সই-করার দলের দলপতির কাছে যে ইনের ট্রেজারার আবেদনকারীদের সবাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। সে কি উল্লাস তাদের! যেন অর্ধেক যুদ্ধই তাঁরা জিতে ফেলেছেন, বললেন, 'কি, দেখলি তো? ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়, না? বুঝলি তো সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।' জবাব দেবার মুখ ছিল না আমাদের। চুপ করেই রইলাম এবং ওদের সাক্ষাৎ মোকাবিলার আগের দিন পর্যন্ত কমনরুম থেকে গা ঢাকাই দিলাম, কেননা ওদের হুল্লোড়ে ও জয়ধ্বনিতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

তখন এফ. ই স্মিথ ছিলেন গ্রেজ্ইনের ট্রেজারার। তখনো তিনি লর্ড বার্কেনহেড নামে লর্ড চ্যান্সেলার হন নি। তখন তাঁর নাম ছিল সার্ ফ্রেডারিক স্মিথ। তিনি ছিলেন আইরিশ হোমরুল বিরোধী আলস্টারের অন্যতম নেতা যার ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল গ্যালপিং স্মিথ। তিনি ছিলেন সার্ এডওয়ার্ড কার্সনের ডান হাত এবং অতি দুর্মুখ বলে ছিল তাঁর অখ্যাতি। এ হেন গ্যালপিং স্মিথকে ওঁরা পেড়ে ফেলেছেন। আমাদের মনটা তখন বেশ দমেই গিয়েছিল। সাক্ষাৎকারের দিন এল। কেমন যেন কৌতূহল হল। ভাবলাম যাই শুনে আসি স্মিথ সাহেবের সঙ্গে ওদের কি রফা হয়। গেলাম কমনরুমে। আবেদনকারীদের মুখে আনন্দের দীপ্তি। দু-একজন ছিলেন একটু সাবধানী মানুষ। তাঁরা তাঁদের দলপতিকে দু-বার তিনবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'দেখো মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বোলো। উত্তেজনা যত গভীরই হোক না কেন, মাথাটা ঠিক রেখো।' তারা একযোগে সবাই গেল ট্রেজারারের ঘরের দিকে। আমরা বসে রইলাম কমনরুমে। ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। এক এক মিনিট না যেন এক যুগ।

বেশ মিনিট পনেরো কি কুড়ির পর দলপতি সদলবলে একে একে কমনরুমে ঢুকলেন। কারো-বা হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করা— ভাবনায় পড়লে লোকে যেমন করে রাখে। কারো মুখে নেই রা। আমরা সই-না-করার দল সাহস করে খবর কি জিজ্ঞেসও করতে

পারছিলাম না। এমন সময় একজন বাঙালি ছেলে নিজের মনের ক্ষোভ আর আটকে ফেলতে না পেরে একটা বড়ো দম ফেলে খালি বললেন, 'শালা'। এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম যে বাবুদের সাক্ষাৎকারটা জুতসই হয় নি। হেমন্তা অজিতকে জিজ্ঞাসা করে যা জানলাম তার চুম্বক হচ্ছে এই: স্মিথ সাহেব মেমোরিয়ালিস্টদের সম্বোধন করে বললেন, 'Gentlemen, আপনারা দূর দেশ-দেশান্তর থেকে আমাদের দেশে পড়াশুনা করতে এসে আমাদের দেশের আতিথ্য লাভ করেছেন। পৃথিবী জুড়ে একটা জীবনমরণ যুদ্ধ চলেছে। আমাদের ছেলেরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পড়া-শুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে যুদ্ধে গেছে তাদের রাজা, তাদের দেশ এবং সাম্রাজ্য, যেখানকার লোক আপনারা, তা বাঁচাবার জন্যে। এই দারুণ শীতে সে-সব ছেলেরা ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়ছে। মাথায় তাদের পড়ছে বরফ এবং সেই বরফগলা জলের কাদায় গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে তারা যুদ্ধ করছে আপনাদের কল্যাণের জন্যেও। আপনাদের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগছে না। চার্লসের যুদ্ধে যাবার সময় হয়েছে। আরো অনেক ইংরেজ মায়ের ছেলেরই মতো সে-ও যাবে। হাজারে হাজারে সৈন্যরা প্রাণ বলি দিচ্ছে। কত পরিবার তাদের বাপ ভাই আত্মীয় হারিয়েও মুখ বুজে সকল কষ্ট সইছে এবং যতটুকু তাদের সামর্থ্য তারা দেশের কাজ করছে। আর আপনারা নিশ্চিন্ত আরামে বসে আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। এতই আপনাদের পড়ার চাড় যে আপনারা চ্যান্সেরি লেনে গিয়ে চা-টুকুও খেয়ে আসতে পারবেন না। আপনারা তো পড়ে' ভরে' দিয়েছেন। আপনি মিঃ ···, আপনি রোমান ল'তে ডুবার, কনস্টিটিউশনাল লয়ে একবার ফেল। আপনি মিঃ ···, আপনি বার ফাইনাল পরীক্ষায় এযাবৎ চারবার ফেল করেছেন।' এর পর প্রত্যেকটি আবেদনকারীর নাম ও প্রত্যেকের অকৃতিত্বের লম্বা তালিকা দিলেন স্মিথ সাহেব। দেখা গেল আমাদের এক অজিত ধর ছাড়া একটি ছেলেরও রেকর্ড নীরন্ধ্র ও অক্ষত ছিল না। প্রত্যেকেই এক কি একাধিক বার ফেল-করা ছেলে। স্মিথ সাহেব কাগজ গুটিয়ে শেষে বললেন, 'এই তো আপনাদের গুণপনা ও পড়াশুনার রেকর্ড। আপনাদের মতো দিগ্‌গজ ছেলে আমাদের ইনে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এখন যেতে পারেন।' বাবুরা হতমান নতশির হয়ে আহত জন্তুর মতো নিজ নিজ ক্ষতস্থান লেহন করতে করতে বাড়ি ফিরে চলে গেলেন। তাঁদের

মানসিক অবস্থা দেখে 'কি ভাই কি হল আবেদনপত্র সই করে'— এই কথাটা জিভের আগায় এলেও মুখে বলতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত চার্লস চলে গেল যুদ্ধে ইংলণ্ডেব হাজাব হাজার অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে।

এই ঘটনাব অল্পদিন পবেই অজিত ধব এল.এল. বি. পবীক্ষা দিলেন। একটা বিষয়ে প্রশ্নেব ভালোভাবে জবাব না দিতে পেবে অজিতেব মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে গিযেছিল এবং তিনি তাঁব বাবাব টাকাগুলি নষ্টই কবেছেন বলে আক্ষেপ কবতে লাগলেন। আমাকে বললেন যে তিনি আর বিষয়গুলিব পবীক্ষায় বসবেনই না। শুধু ব্যাবিস্টাব হয়েই দেশে ফিববেন। অজিত আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। সেইজন্যে তাঁর তখনকাব মানসিক দুঃখ আমাকে খুলেই বলেছিলেন। আমি অনেক কবে তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম এবং জোব কবলাম যে বাকি পবীক্ষাগুলিতে বসতেই হবে। আমি নিজে অজিতেব সঙ্গে গিয়ে তাঁকে পবীক্ষাব হলে পৌঁছে দিযে এলাম। অজিত আমাব কথায় সব কটা পবীক্ষাই দিলেন এবং যথাসময়ে দেখা গেল যে তিনি পাসও হযে গেছেন। বাবে কল্‌ড্‌ হযে এল. এল. বি. পাস কবে অজিত দেশে ফিবে গেলেন। আমার একটি পবম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুকে তখনকাব মতো হাবালাম। পবে আবাব তাঁকে পেয়েছিলাম কলকাতায় প্র্যাকটিস কববাব সময। অজিতের শবীব বেশ কম-জোবই ছিল এবং সেইজন্যে কোর্টেব প্র্যাকটিসেব ধকল তাঁব শবীবেব পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অজিত হাইকোর্টেব অ্যাপেলেট সাইডে ফৌজদাবী মামলা বেশ নৈপুণ্যেব সঙ্গেই কবতেন। তিনি কলকাতাব একটি কলেজে অধ্যাপনাও কবতেন এবং সেইটেই তাঁব ভালো লাগত। ভগবানেব অসীম দযায় অজিত এখনো জীবিত বযেছেন। মাঝে মাঝে দেখা পেলে পুবানো দিনেব কত কথাই হয তাঁব সঙ্গে।

এই সময ববাবব অকস্মাৎ ভোম্বল বিলেতে চলে এলেন। ট্রেবোভাব বোডেই উঠলেন। শুনলাম যে ব্যবস্থা হযেছে তিনি অক্সফোর্ডে একজন শিক্ষকেব বাড়িতে তাঁব তত্ত্বাবধানেই থাকবেন ও ইংবাজি সাহিত্যটা ভালো কবে পডবেন এবং সেই সঙ্গে সুবিধা হলে ইতিহাস ও অর্থনীতিব চর্চা কবতে পাবলে তো কথাই নেই। আমাদেব সঙ্গে দিনকতক থেকে ভোম্বল চলে গেলেন সে গৃহশিক্ষকেব বাড়ি। ভোম্বলেব মাসিক বরাদ্দ টাকাটা আমাবই ব্যাঙ্কে আমাবই নামে আসত। ভোম্বল ছিলেন ববাববই খবচে। হাতে টাকা থাকলে এবং কেউ চাইলে— সে সত্যিকারের

দুঃস্থই হোক, কি, নেহাৎ নচ্ছারই হোক— সবকটা টাকা তাকে দিয়ে দিতে ভোম্বলের এতটুকুও দ্বিধা হত না। মনের দয়া এবং দেবার হাত ভোম্বলের সহজ স্বভাব ছিল। বোধ হয় এটা তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। যাই হোক, এজন্যে ভোম্বলকে আমি খুব হিসেব করে টাকা দিতাম এবং অনেক সময় নগদ টাকা না দিয়ে যে জিনিস তাঁর দরকার তা কিনে দিতাম। একবার বললেন, 'কাকা, একটা প্লাশের ভালো টুপি কিনতে হবে। বোধ হয় দুপাউণ্ড লাগবে। টাকাটা দাও না।' টুপি তাঁর দরকার ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর হাতে দুপাউণ্ড নগদ দিলে বাড়ি থেকে দোকানে পৌঁছবার আগেই হয়তো কাউকে দান করে দেবেন। তাই বললাম, 'চলো যাই, টুপি দেখে আসি।' দুজনে দোকানে গেলাম। ভোম্বল একটি টুপি পছন্দ করে নিলেন এবং আমি দামটা দিয়ে দিলাম। টুপিটা যে বেশ উঁচু-দরের দামী জিনিস ছিল তাতে ভুল নেই। ভালো জিনিসে ভোম্বলের সুরুচি ছিল সর্বদা। যাই হোক, আমি এইরকম সাবধানে টাকা দিতাম বলে সুধাংশু আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'পিতাপুত্রের আজ কি বাজার হল? ভ্যালা প্রহরী দেবদূত (গার্ডিং এঞ্জেল)।' তিনি সংক্ষেপে গার্জেন বলেও ডাকতেন আমাকে।

ভোম্বল অক্সফোর্ড চলে যাবার মাসখানেক পর থেকেই দেখতাম ভোম্বল প্রায়ই লণ্ডনে আসতেন এবং ফিরবার অব্যবহিত পূর্বে আমাদের বাড়ি এসে কে কেমন আছি জেনে এবং কিছু টাকা নিয়ে অক্সফোর্ড চলে যেতেন। এই অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে টানাপোড়েন করে এবং নাওয়া-খাওয়ার সময় ঠিক না থাকায় রাস্তার রেস্টুরেন্টে সামান্য একটু টুকিটাকি খেয়ে ভোম্বলের শরীরটা বেশ খারাপই হতে লাগল। ভোম্বল ছিলেন লম্বা-চওড়া যুবক। একটু থস্থসে মোটা বললেও অত্যুক্তি হত না। সেই ভোম্বল যেন চুপসে গিয়ে রোগাই হয়ে গেল এবং তাঁর গালেও যেন 'টোল' দেখা দিল। মাস ছয় পরে ভোম্বল লণ্ডনে এসে বললেন, 'কাকা, আমার বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা করে।' আমি তো প্রমাদ গণলাম। ছোটো বয়সে ভোম্বলকে একবার শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়বার জন্যে। অল্প কিছুদিন পরেই তার শরীর খারাপ হয়েছিল। ভালো ভালো ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে ওঁর হৃদ্‌যন্ত্রটা বেড়ে গিয়েছে এবং তখনকার দিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন ওঁর চলবে না। ভোম্বলের হৃদ্‌যন্ত্রের এই প্রাচীন ইতিহাসটা

আমার জানা ছিল বলে আমি ওঁর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ একটু চিন্তান্বিতই হয়ে পড়েছিলাম। স্থানীয় ডাক্তার পরামর্শ দিলেন একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো দরকার। তিনি একজনের নামও দিলেন। সে ভদ্রলোকের সঙ্গে টেলিফোনে সময় ঠিক করে গেলাম তাঁর চেম্বারে লণ্ডনের বিখ্যাত হার্লে স্ট্রীটে। ডাক্তারের নাম ভুলে গেছি। তিনি খুব যত্ন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন যে তখনো হৃদ্‌যন্ত্রে বা ফুসফুসে কোনো ক্ষতিকর দাগ পাওয়া যাচ্ছে না বটে তবে এঁর জীবনীশক্তি (ভাইটালিটি) এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সামনের শীতকালে ওঁর বিলেতের মতো স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করা বিপজ্জনক হবে। ডাক্তারটি বললেন যে এঁর দেশে ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সুধাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। দুজনেই মনে করলাম যে বাড়িতে সব কথা জানিয়ে খবর দেওয়া নিতান্তই কর্তব্য, কেননা দৈবে অঘটন কিছু ঘটলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। সুধাংশুকে বললাম দিদিমণির কাছে চিঠিতে সব কথা লিখে সুধাংশু যেন তাঁকে অনুরোধ জানান দাদাবাবু ও বৌঠানকে ব্যাপারটা বলতে। সুধাংশু দিদিমণিকে এর মধ্যে টেনে আনতে রাজি হলেন না এবং টিপ্পনী কেটে বললেন, 'তুই গার্জেন থাকতে আমি কেন লিখতে যাব।' কি করা যায়। অগত্যা আমিই বৌঠানকে কি দাদাবাবুকে মস্ত চিঠি লিখে ডাক্তারের মতামত জানিয়ে দিয়ে তাঁদের নির্দেশ চাইলাম। অচিরে তার এল ভোম্বলকে দেশে পাঠিয়ে দিতে। ভোম্বল দেশে ফিরতে আপত্তি করলে তাঁকে আমরা কিছুতেই পাঠাতে পারতাম না, কেননা তিনি তো শিশু ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেশে ফিরতে কোনো ওজরই করলেন না। এতেই বুঝলাম যে তিনি নিজেই বুঝেছিলেন তাঁর শরীরের দুর্বলতার কথা। যাই হোক, অবিলম্বে জাহাজের টিকিট কিনে দিলাম। যাবার দিন গড়িমসি করতে করতে স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল যে বোট ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। অব্যবহিত পরের ট্রেনে টিলবেরী ডকে গিয়ে জানলাম যে জাহাজটাও ছেড়ে গেছে। তবে সেখানকার লোকেরা বললে যে জাহাজটা টেমস্-এর মোহনার কাছে জোয়ারের জন্যে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। সেখানে গিয়ে সেটাকে ধরা যেতে পারে। তক্ষুনি পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে একটি টেণ্ডার অর্থাৎ স্টীমলঞ্চ জাতীয় মালের নৌকো ভাড়া করে ছুটলাম জাহাজের পেছনে। জাহাজটা সত্যি সত্যি তখন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের টেণ্ডারটা জাহাজের পাশে দাঁড়াতেই জাহাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা

করল, 'কি চাও?' টেণ্ডার থেকে আমাদের মাঝি চিৎকার করে জানাল যে জাহাজ ফেল-করা এক যাত্রী এসেছে। বড়ো জাহাজটা থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দিতেই ভোম্বল তাঁর মালপত্তর নিয়ে জাহাজে উঠে গেলেন। আমরা খানিকটা অপেক্ষা করে সেই টেণ্ডারেই ফিরলাম টিলবেরী ডকে। ভোম্বল জাহাজের ডেক থেকে হাতছানি দিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে বাড়ির আদরে-যত্নে আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। আমি যে বৌঠানকে চিঠি লিখেছিলাম ভোম্বলের অসুখের কথা জানিয়ে তা নিয়ে, পরে শুনেছি, দেশে আমার নামে খুবই নিষ্ঠুর সমালোচনা হয়েছিল নানারকমের এবং অনেক দিন ধরে কত কথাই নাকি বলেছিল কত লোক। এইসব সমালোচনা বাবাকে পীড়া দিয়েছিল এবং তারই ঝাঁজ আমি খানিকটা পেতাম বাবার চিঠিতে। ভগবান জানেন, পাপ মনে সেই চিঠি লিখি নি। এবং আমার গভীর সান্ত্বনা এই ছিল যে, এসব সমালোচনায় আমার উপর ভোম্বলের যে ভালোবাসা ছিল তাতে আঁচড় লাগে নি এতটুকুও। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার প্রীতির যোগসূত্রটি বরাবরই অটুট ছিল।

১৪

ক্ল্যাপহ্যাম কমনের বাড়ি থেকে হেমতা যে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন সেখানে পড়ুয়া ছেলে কেউই ছিলেন না। সর্বভাড়াটেরাই ছিলেন চাকুরে। সুতরাং সেখানে পড়াশুনার কোনো আবহাওয়াই ছিল না। হেমতা মধ্যে মধ্যে আমাদের ট্রেবোভার রোডের বাড়ি এসে গল্পগুজব করে যেতেন। পরে ঠিক হল তিনি আমাদের বাড়ি উঠে আসবেন এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়ব। হেমতা আমাদের বাড়ি আসার পর দেখা গেল যে বারের প্রাথমিক পরীক্ষার চারটের মধ্যে তিনটেতেই তিনি পাস হয়ে গেছেন। বাকি ছিল হিন্দু ও মহামেডান ল এবং ফাইনাল। হেমতার মতলব ছিল ওই দুই বিষয়েই একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে ল্যাঠা চুকিয়ে দেওয়া। আমারও ছিল ওই দুটো পরীক্ষা বাকি। আমি বললাম যে দুটো বিষয় একসঙ্গে তৈরি করা শক্ত হবে। একটা একটা করে শেষ করলে আখেরে ভালো হবে। শেষ পর্যন্ত হেমতাও আমার কথা মেনে নিলেন। আমরা দুজনে তখন পড়া আরম্ভ করলাম হিন্দু ও মহামেডান ল। সকালে দুপুরে বেশ পড়া হত। কোনো গোল হত

না। কিন্তু রাত্রে খাবার পর যখন নীচতলা থেকে গানের কিংবা তাসের হর্ষধ্বনির রেশটুকু ভেসে আসত উপরতলার ঘরে যেখানে আমরা পড়তাম তখন হেমন্তাকে আটকে রাখা হত এক কঠিন ব্যাপার। তখন বাধ্য হয়ে বলতে হত, 'যাবে তা যাও, মর গিয়ে। কিন্তু আমি তোমার জন্যে পড়া বন্ধ করে বসে থাকব না। আমি পড়েই যাব, তুমি পেছিয়ে থাকবে।' বেচারী কি করুণ চোখেই না চাইতেন আমার দিকে এবং কি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই না বলতেন, 'গাপিটা কি মজাই না লুটছে।' 'গাপি' কথাটা সুধাংশু গুপ্তের পদবীটার অপভ্রংশ। আমি সান্ত্বনা দিতাম, 'পরীক্ষার পর আমরাও ফুর্তি করব।' এইরকম করে বেশ কিছুদিন পরে আমরা দুজনেই পরীক্ষা দিলাম। দুজনেই পাস করলাম। হেমন্তাকে পড়াটা বোঝাতে গিয়ে আমার পড়াটা বেশ পাকা রকমেরই হয়েছিল বলে আমি প্রথম শ্রেণীতেই পাস করে দশ শিলিং ফিরে পেয়ে তাই দিয়ে তিনজনে মিলে 'রোমান্স' না কি একটা নাটক দেখে এলাম।

সে আমলে বিলেতী থিয়েটারের অভিনয় দেখবার মতো ছিল। যেমন ছিল স্টেজ সাজাবার ধরণ তেমনি ছিল অভিনয়-কৌশল। তা ছাড়া জনসাধারণের সুনজরে ঠেকলে এক-একটা বই এক বছরেরও বেশি সমানে এক নাগাড়ে চলতে দেখেছি। চু চিন্ চাউ বলে একটা নক্সা বোধ হয় প্রায় তিন বছর পর্যন্ত চলেছিল। রোমান্সও চলেছিল বহুদিন। নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় তখন দেখেছি। সার্ ফোর্ব্স্ এবং লেডি রবার্টসন, ম্যাথিসন্ ল্যাং, জেরাল্ড ডুমরিয়ে, গ্লাডিস কুপার ইত্যাদিকে নানা ভূমিকায় দেখেছি। ফে. কম্পটন বলে এক অভিনেত্রীর নামও মনে পড়ে।

১৯১৬ সালে বিলেতের থিয়েটার-জগতে এক হৈ হৈ কাণ্ড লেগেছিল। শেক্সপীয়রের তিন শত বৎসর পূর্তির আনুষ্ঠানিক উৎসব। স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে বিস্তর আয়োজন হয়েছিল এবং জনসমাগমও হয়েছিল এত যে হোটেলে জায়গাই হয় নি বহুলোকের ভাগ্যে। আমরা আর সেদিকে যাই নি ঐ সব অসুবিধের জন্যে। লণ্ডনেও অনেক আয়োজন হয়েছিল। যে থিয়েটারটাকে বলে ওল্ড ভিক্ সেখানে শেক্সপীয়রের অনেক নাটক নক্সা মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে একটি অনুষ্ঠান। যেসব প্রবীণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা শেক্সপীয়রের নাটকে নানা ভূমিকায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তখন যাঁরা জীবিত ছিলেন

তাঁদের সবাইকে সেই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছিল। সেইসব বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা শেক্সপীয়রের যে যে নাটকের যে যে দৃশ্যের অভিনয়ে নাম করেছিলেন তাঁরা সেই সেই দৃশ্য অভিনয় করলেন। সেই রাত্রে প্রথম এবং শেষবারের মতো দেখলাম বিশ্ববিশ্রুত এলেন টেরীকে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোর্শিয়ার ভূমিকায় তিনি যৌবনে যে অভিনয় করেছিলেন সেই দৃশ্যটাই তিনি অভিনয় করলেন। বয়স খুবই বেশি হয়েছিল। চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই পুরানো লাল গাউন ও লাল টুপী পরেছিলেন। বিখ্যাত পোশাকটা বেশ ঢিলে ঢালা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়াতেও বোধ হয় একটু কষ্ট হচ্ছিল। তিনি একটা চেয়ারের পিঠটা ধরে দাঁড়িয়ে যখন সেই করুণ লাইনগুলি (mercy) বলে যেতে লাগলেন ক্ষণিকের মতো তাঁর মুখে চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, গলায় যেন ফিরে এল যৌবনের হারানো সুর। অপূর্ব লাগল। তার পর দেখলাম ম্যাথিসন ল্যাং-এর সাইলকের ভূমিকায় অভিনয়। 'Hath not a jew' বলে যখন তিনি নিজের বুকের উপর তাঁর দুহাত মুঠো করে রাখলেন তখন সেই ভঙ্গীটি তাঁর বিখ্যাত সাজপোশাকে ও চোখের চাহনীর সঙ্গে অতুলনীয় মনে হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে যখন একবার সস্ত্রীক বিলেতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখনও দুচারটে থিয়েটার দেখেছি। সেসব কিন্তু আগের মতো লাগে নি। তবে সেটা আমার বিগত যৌবনের দোষ না, অভিনয়-চাতুর্যের সত্যিকার অভাব তা বলতে পারি না।

১৫

গ্রীষ্মকালে ইংল্যাণ্ডের সব জায়গাই খুব মনোরম সুন্দর হয়ে ওঠে। শীতের সময় এভারগ্রীন গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছে পাতা বলে কিছু থাকে না। শীতের প্রারম্ভে সব পাতাগুলি হলদে হয়ে সারাদিন টুপটাপ পড়তেই থাকে। এই হলদে পাতা যখন গাছে থাকে তখন দেখতে বেশ সুন্দর হয় এবং ইংরেজরা এসব পাতাকে 'অটম্ লীভস্' বলে এবং খুব ভালোবাসে। যখন সব পাতাগুলি ঝরে পড়ে তখন গাছগুলি একেবারে নেড়া দেখায়। শীতের সময় বরফ পড়ে মাঠ-ঘাট যখন একেবারে সাদা হয়ে যায় তখন তার

উপর এইসব গাছ পত্রহীন ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের ডালেও অনেক সময় বরফ জমে যায়। তার পর শীতের প্রকোপটা কমে বসন্ত-সমাগমে নূতন পাতা যখন গজায় তখন বিচিত্র সৌন্দর্য বের হয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঠে বরফ গলে যাবার পর কচি দূর্বাদল দেখা দেয় সমস্ত উঁচু-নিচু ঢালু মাঠময়। বসন্তের বাহার ইংল্যাণ্ডে সত্য সত্যই নয়নাভিরাম। এই সময়ে দিনগুলিও বেড়ে যায়। খেলাধুলা চলে শহরের ও গ্রামের পার্কে ও কমনে সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত। এই সময়ে ইংরেজরা যারা পারে একবার কিছু না হোক অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে হলেও বেড়িয়ে আসে। যারা তা-ও না পারে তারা আগস্ট মাসের ব্যাঙ্ক ছুটির দিন অন্তত বেড়িয়ে পড়ে খুব ভোরবেলা থেকে। আমি যে তিন বছর বিলেতে ছিলাম সে সময় প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে কোনো-না-কোনো জায়গায় বেড়াতে গেছি। কোন্ বছর কোন্ জায়গায় গিয়েছি তা ঠিক করে বলতে পারব না। স্মরণশক্তির ক্ষীণতাবশত জায়গাগুলি কালক্রমান্বয়ে আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে।

একবার গিয়েছিলাম মনে পড়ে ইলফ্রাকুম্‌ব্ বলে সমুদ্রধারে অবস্থিত একটা ছোট্ট শহরে। সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতীব সুন্দর। সমুদ্রের উপর উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ের প্রস্তরগাত্র। উপর থেকে কোনোরকমে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। পায়ে হেঁটে বেড়াবার অনেক নির্জন অলিগলি ছিল। সকালবেলা প্রাতরাশ সেরেই দল বেঁধে আমরা বেরিয়ে পড়তাম এবং তাজা বাতাসে বেরিয়ে এক পেট খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা পরম উপাদেয় লাগত। যেখানে যেখানে ছুটি কাটাতে লোকেরা যায় সে-সব জায়গার ছোটো ছোটো হোটেল বা বোর্ডিংগুলিতে খেতে দিত ভালো অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে যতটা ভালো হয় সেইমতো।

ইংরেজরা গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে সাঁতার কেটে স্নান করতে ভালোবাসে। কিন্তু ইলফ্রাকুম্‌বে তেমন বালুকাময় দিগন্ত-বিস্তৃত তীরভূমি ছিল না। সেখানে ছিল একটি পাহাড়ঘেরা ছোট্ট 'বে' অর্থাৎ বৃত্তাকার ছোট্ট একফালি বালু-তীর যার উপর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়িয়ে পড়ে আর ফিরে যায়। সেই 'বে'টুকুতেই অসংখ্য নরনারী, বালকবালিকা, নানা রঙের বিচিত্র সাঁতারের কাপড় পরে স্নান করত। জলে পা দিতেই দেখি জল অসম্ভব ঠাণ্ডা, যেন কেটে কেটে যায় যেখানে লাগে। চোখকান বুজে উপুড় হয়ে একটা ঢেউ খেয়ে নিতে ঠাণ্ডাটা কথঞ্চিৎ সহ্য হয়ে গেল। তার পর সমুদ্রের মধ্যে একটু দূর পর্যন্ত

সাঁতাব দিয়ে যাওয়ায় শবীরটা একটু গরমও হয়ে উঠল। এমন সময় ফিরে দেখি সুধাংশুব মুখ চোখ কেমন যেন হয়ে গেছে এবং মনে হল যে সে ডুবে যাচ্ছে। আমাদেব দলেব একজন মেয়ে খুব ভালো সাঁতাব দিতে জানতেন। তিনি সুধাংশুব কাছাকাছিই ছিলেন। সুধাংশুব অবস্থা দেখামাত্র তিনি সবেগে ওব কাছে গিয়ে ওব স্নানেব কাপডেব ঘাডেব ধাবটা ধবে ওব মাথাটা জলেব উপব তুলে বেখে ঠেলতে ঠেলতে পাবেব দিকে নিয়ে চললেন। অল্পক্ষণ পবেই আমবাও গিয়ে পডলাম এবং সবাই মিলে সুধাংশুকে ঠেলে পাবেব বালিব উপব তুলে আনলাম। সুধাংশুব কালো মুখ তখন ফ্যাকাশে হযে গেছে। বেশ খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে সুধাংশু ধাতস্থ হল। পবে জানা গেল যে সমুদ্রেব ঠাণ্ডা জলে কেমন যেন তাঁব পায়েব শিব টেনে ধবেছিল। ঐ মেয়েটি কাছে না থাকলে একটা অঘটনই ঘটে যেতে পাবত।

একবাব গ্রীষ্মেব ছুটিতে আমবা টেম্স্ নদীব উপব স্টেন্স্ বলে ছোট্ট শহবে একটি আসবাবপত্রসমেত বাড়ি কয়েক সপ্তাহেব জন্যে ভাডা নিয়েছিলাম। সমস্ত বন্দোবস্ত আমরা অত্যন্ত গোপনে গোপনে কবে ফেললাম। ঠিক হল আমবা চাবজন, হেমতা অজিত সুধাংশু ও আমি তিন সপ্তাহ অজ্ঞাতবাস কবব। জানাজানি হয়ে গেলে বন্ধুবান্ধববা এসে যে শান্তি-ভঙ্গ কববেন সে আশঙ্কা খুবই ছিল। তাব উপবে খাবাবেব ভাগে ঘাটতি পডতে পাবে। কাজকর্মগুলি একবকম ভাগাভাগি কবে ফেলা গেল যোগ্যতা হিসেবে। মেজদাদা প্রফুল্লবঞ্জনেব বান্না সম্বন্ধে খ্যাতি ছিল। তাঁব কিছু কিছু গুণ সুধাংশুতেও বর্তেছিল। হাজাব হোক ভাগনে তো বটে। বাস্তবিকই সুধাংশু বন্ধনে দ্রৌপদীবই মতো গুণী ছিলেন। ঠিক হল যে সুধাংশু আমাদেব চাব বেলাব খাবাব তৈবি কববেন। হেমতা নিলেন বাইবেব কাজ অর্থাৎ হাটবাজাব কবা, ধোপা বাড়িতে ময়লা কাপডেব গাঁটবি ঘাডে কবে বয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল তাঁব কবণীয। আমাব অদৃষ্টে পডল বান্নাঘরেব কাজ অর্থাৎ হাঁডি-কুঁডি প্লেট কাঁটা-চামচ মাজা। বাকি সব কাজ দেওয়া গেল অজিত ধবকে। অর্থাৎ ঘব ঝাঁট দেওযা, বিছানা পাতা, ঝাড়পোঁছ কবা ইত্যাদি সব কাজই তাঁকে কবতে হত। একটা পান্ট জাতীয় নৌকাও ঠিক কবা হল। প্রথমে খুব সুষ্ঠুভাবেই ছুটিটা শুরু হল। অতি উপাদেয দিশী রান্না সুধাংশু দুপুব ও রাত্রিব জন্যে বানিয়ে তুলতেন। সকালে বিকেলের জলযোগটাও ভোজ বললেই চলে। একঘেয়ে রোস্ট মাংস, মটন

বা খরগোশের স্টু ইত্যাদি বিলিতী রান্নার পর সুধাংশুর হাতের বেশ ঝাল কারি ও পরোটা লাগত যেন অমৃত। আলুব চপটাও হত অপূর্ব। বিকেলে চায়ের পর আমবা সেই পান্টে করে টেম্‌স্‌ নদীতে বেডিয়ে আসতাম বেশ খানিকটা। টেম্‌স্‌ নদীব দুপাশে ঢালু পাড় দেখতে ছিল চমৎকার। অনেক বাডিব পিছনেই থাকত ছোটো একটি জেটিতে ছোটো ডিঙি-নৌকা বাঁধা।

একদিন আমবা দুপুবে খেতে বসবাব তোড়জোড় কবছি। সেদিনকাব বান্না কারিব গন্ধে সমস্ত বাডিটা যেন ম'ম' করছিল। এবকম চিত্তাকর্ষক গন্ধে ক্ষিদে না হয়ে যায় না। সুধাংশু তখনো পবোটা ভাজছে। একেবাবে আসল ঢাকাই পবোটা, কত পাতলা ছিল তাব পবলগুলি। আমবা কজনে বসে পডলাম আপন আপন চেয়াবে। এমন সময় জানালা দিযে দেখি বাডিব নম্বব দেখে দেখে একটা কালা আদমি দাঁডাল আমাদেবই সদব দবজাব সামনে। নজব কবে দেখা গেল আগন্তুকটি অচেনা নয়, আমাদেবই বীবেন বিশ্বাস ওবফে বানি। মুখখানা তাব যেন ক্লান্তিতে ভবে গিয়েছিল। বেশ বোঝা গেল যে বেচাবা প্রায কাঠফাটা বোদে আমাদেব বাডি খুঁজে খুঁজে ঘুরে মবেছেন অনেকটা পথ। চুপ কবে ঘাপটি মেবে বসে থাকলে হয়তো তিনি আবো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শেষে নিবাশ হয়ে একপেট ক্ষিদে নিয়ে ফিবে যেতেন। মায়া হল আমাদেব সবাইযেব। দরজাটা খুলতেই তাঁব সে কি দন্ত বিস্ফাবিত হাসি। সোজা ঘবে ঢুকে টুপিটা রেখে খাবাব-ঘবে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পডলেন। এক গ্লাস জল খেযে একটু ধাতস্থ হলে আমবা সমস্বরে জিজ্ঞাসা কবলাম কি কবে আমাদেব ঠিকানা তিনি পেলেন। তিনি কিছুতেই সে কথাটা ভাঙলেন না। বললেন যে মোটামুটি আঁচ করেই এসেছেন। কি আর করা যায়। অজিত আব একটা প্লেট লাগিযে জায়গা কবে দিলেন। সেদিনকার ডিমের কাবি আব ঢাকাই পবোটা যে কি অপূর্ব হয়েছিল তা বলবাব নয়। মুখে যেন লেগে বয়েছে। সুধাংশু আমি ও অজিত বাঙাল এবং ঝাল খাওযা আমাদেব অভ্যেসই ছিল। হেমতাব ঝাল খাওয়াটা এবই মধ্যে বেশ বপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বানি ময়মনসিং-এব লোক হলে কি হয়, তিনি তেমন ঝাল খেতে পাবতেন না। কিন্তু কাবিটা সেদিন এত সুস্বাদু হয়েছিল যে বানিব চোখে জল ঝরে পডা সত্ত্বেও তিনি খেয়েই চললেন। খাওয়া শেষ করে বললেন যে এর পবে ঝালটা একটু কম দিলেই ভালো হবে। হেমতা

সুর করে জবাব দিলেন, 'কেন, তোমার সুবিধের জন্যে বুঝি? সে আর হবে না। ঝালেব মাত্রা কিছুতেই কমানো হবে না।' কোনো ফল হয় নি, কেননা বানি এর পবেও দুবাব এসেছিলেন আমাদেব বসভঙ্গ করতে এবং তাঁর কাছ থেকে হদিশ পেয়ে সুধীন্দ্র দাশ এবং সুধাংশুর এক বন্ধু মণি রায়ও একবার করে কাবি পবোটা খেয়ে গেছেন। এসব অত্যাচাব সত্ত্বেও সেবার স্টেন্স্-এ ছুটিটা বেশ আনন্দেব মধ্যে দিয়েই কেটে গিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডেব দক্ষিণ-পুব কোণায় অবস্থিত কর্নওয়ালেব ছোট্ট শহর নিউকীতে একটা ছুটিতে গিয়েছিলাম। শহবেব দক্ষিণে ছিল ইংলিশ চ্যানেলেব মোহনা আব পশ্চিম দিকে ছিল দিগন্তবিস্তৃত অ্যাটলান্টিক মহাসাগব। সেবাব আমবা মোটব-বাসে কবে ডেভন ও কর্নওযালটা বেশ ঘুবে দেখেছিলাম। ডেভনে একটা নামকবা ফলেব বাগান আছে যাকে বলে ট্রুবো বাগান। এর কথা পডেছিলাম ওয়েসেক্স নভেল সিবিজেব বচয়িতা টমাস হার্ডিব কি-একটা নভেলে। ট্রুরোর বাগানেব বর্ণনাটা এমন ভালো লেগেছিল যে গিয়েছিলাম মোটব-বাসে সেই বাগানটা দেখতে। চমৎকাব সাজানো বাগান। দুধাবে বেশ উঁচু পাকা ধরণেব মাচাব মাঝখান দিয়ে সরু সরু পায়ে-হাঁটা বাস্তা। মাচাব উপবে টকটকে লাল ব্যাপ্সবেবি ও স্ট্রবেবি থোকা থোকা ঝুলছে দেখলাম। সেখানে একটা চা খাবার জাযগাও আছে। আমবা যেদিন যাই সেদিন চমৎকাব শুকনো দিন ছিল। আমবা বেশ কবে ঘুবে বেড়িয়ে নিযে সেখানে গিয়ে চায়েব অর্ডাব দিলাম। বসবাব জন্যে বেত না উইকাব চেয়াব বাগানে একটা টেবিলের চাবি দিকে পেতে দিল। খেতে দিল বাগান থেকে সদ্য তোলা গাছপাকা র‍্যাপ্সবেবি ও ডেভনক্রীম পর্যাপ্ত পরিমাণে। এই ফল ও ক্রীম যে খেযেছে একবাব সে আর ভুলবে না কখনো। এই ছুটিটাও যেন দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

১৬

এই নিউকী বেডানোব পব শুরু হল আমাব ফাইনাল বার পরীক্ষাব প্রস্তুতিপর্ব। হেমতা ও আমি দুজনে মাথা গুঁজে পডতে লেগে গেলাম। আমি ঠিক করলাম যে প্রথমে বার ফাইনাল দিয়ে বুঝব যে কেমন তৈবি হয়েছে পড়াটা। তার পর আবার ফিবে ফিবতি পড়াটা ঝালিযে নিয়ে এল. এল. বি.

ফাইনাল পরীক্ষা দেব। অর্থাৎ বার ফাইনালটা আমার হবে এল. এল. বি. পরীক্ষার ফাইনালের ড্রেস রিহার্সেল। উদ্দেশ্য ছিল যে এল. এল. বি. পরীক্ষায় খুব ভালো করে পাস করতে হবে। হেমতার সঙ্গে পড়তাম না যেন আমি তাঁর কাছে কলেজের মাস্টারদের মতো বক্তৃতা দিতাম। হেমতার সঙ্গে পড়ায় আমার খুবই উপকার হয়েছিল। দুজনে একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম। যেদিন সকালে টাইম্‌স্‌ কাগজে ফল বেরুবে তার আগের রাত্রে হেমতার মনটা উচাটন হওয়ায় তিনি গুঁজতে গুঁজতে আমার বিছানায় ঢুকে পড়লেন এবং সারারাত নিজেও ঘুমলেন না, আমাকেও ঘুমতে দিলেন না। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকেই পাশ ফিরতে ফিরতে বলেন, 'সুধী, তুমি ভাই বলছ বটে, কিন্তু আমি ঠিক ফেল হব।' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ভাবছ কেন? ঠিক পাস হয়ে যাবে।' তবু তার মন মানে না। অল্প পরেই বলে উঠল, 'পাস হতেই পারে না। কেমন করে হবে?' আমি আবার বললাম, 'হ্যাঁ, আলবৎ হবে, নিশ্চয়ই পাস হবে।' এইরকম করে চলে সারারাত। শেষে হতাশ হয়ে বললাম, 'ফেল যদি হবেই তবে আজকে ঘুমিয়ে নাও ভালো করে, কাল থেকে রাত জেগে পোড়োখন।' তখনও তিনি বলেন, 'সুধী, তুমি বলছ আমি পাস হব?' শেষ বারের মতো বললাম, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হবে, হবে, হবে।' বোধ হয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে কিংবা নেহাৎ ক্লান্ত হয়ে বেচারী ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালবেলায় দরজায় টোকা মেরে টাইম্‌স্‌ কাগজটা হাতে নিয়ে টার্নার-গিন্নী ঘরে ঢুকেই, 'ও আমার ছেলেরা, তোমাদের আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুপ্রভাত।' হেমতার মুখে তখন হাসির ঢেউ খেলিয়ে চলল এক গাল থেকে আর এক গাল। 'বাপস্‌' বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুড় সুড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। আমি আর একজন ছেলের সঙ্গে একযোগে প্রথম হয়েছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীতে কেউই ছিলেন না। বার ফাইনালে প্রথম শ্রেণী পেলেই পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রাইজ পাওয়া যেত। সেই রুলটা যাতে লাগু না হয় তাই জন্যে কি আমরা দুজন প্রথম শ্রেণী পেলাম না? সে কথার জবাব কে বলবে? এইখানে বলে রাখি যে সেই যুদ্ধের সময় বার ফাইনালে প্রথম শ্রেণী বোধ হয় কাউকেই দেওয়া হয় নি। হেমতা পাস করে বেশ কয়েকদিন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে বারে কল্‌ড্‌ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। দেশে নামকরা

ব্যারিস্টার শৈলেন সেনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ফৌজদারী প্র্যাক্‌টিস্‌ করে হেমতা কলকাতার একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে অবসর-জীবন উপভোগ করে সম্প্রতি মারা গেছেন। এরকম অমায়িক, শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বিরল এ সংসারে।

অতঃপর আমি আপন মনে নিবিষ্টচিত্তে এল. এল. বি. ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। সুধাংশুও সেবার প্রাথমিক এল. এল. বি. পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। দুজনেই পরীক্ষা দিলাম। মনে হল পরীক্ষাটা ভালোই হয়েছে। খালি একুইটি পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এত সহজ মনে হয়েছিল এবং তার জবাব এমন সংক্ষেপে দিয়েছিলাম যে মনে সন্দেহ হয়েছিল বুঝি বা প্রশ্নগুলির তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি নি। এইজন্যে মনের ভেতরটাতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এই শেষ পরীক্ষাটার ভালো ফলের উপরে। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেলে কলকাতার ল কলেজে একটা চাকরি পাওয়া যাবে এবং তা হলে প্র্যাকটিসের জন্যে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা সম্ভব হবে। সুধাংশু গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন—'যা হবার হবে। ভাবছিস্‌ কেন। ভেবে মরলে তো ফলটার উন্নতি হবে না।' খাঁটি কথা, কিন্তু মন মানে কই।

শুনলাম যে অমুক তারিখে সকালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের হলটায় আমাদের পরীক্ষার ফলাফল টাঙিয়ে দেবে। প্রাতরাশ সমাধা হতেই সুধাংশু হুকুম করলেন, 'ওঠ, চল্‌। গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি দাঁড়াল।' আমি বললাম, 'না, ভাই, আমি যাব না। তুই একাই যা। আমার ফলটাও দেখে আসিস।' সুধাংশু মুখ ঝামটা দিয়ে ঝংকার করে উঠলেন, 'নে, ন্যাকামো করিস নে। চল্‌ বল্‌ছি।' উঠে পড়লাম। দুজনে গিয়ে হাজির হলাম সেনেট হলের সামনে। বাপ রে, ধাপে ধাপে কতগুলি চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। তার ওপারে নোটিসবোর্ডে কি লেখা আছে কে জানে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুধাংশু 'ন্যাকা' কথাটা উচ্চারণ করে লাফিয়ে লাফিয়ে একাই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। হলের ভিতরে ঢুকে আর যেন বেরয় না। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ আওয়াজটা যেন কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। অল্পক্ষণ পরে সুধাংশু বেরিয়ে এসে সবচেয়ে উপরের ধাপ থেকে একগাল হেসে চেঁচিয়ে বললেন,

'ওরে, আমি পাস হয়ে গেছি।' বলেই চুপ। আমার কি হল তা আর বললেন না। তখন মনের সমস্ত জোর সঞ্চয় করে আমি খালি দুটি কথা বের করলাম— 'আর আমি?' তখন তিনি বললেন, 'তুই-ও পাস হয়েছিস।' তখনো বলে না যে আমি অনার্স পেয়েছি কিনা এবং পেয়ে থাকলে কোন্ ক্লাস পেয়েছি। যাই হোক, পাস হয়েছি জেনে মনের বিহ্বলতা খানিকটা কমে যাওয়ায় তর্‌তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হলে ঢুকলাম। পাসের তালিকাটাতে দেখলাম যে কেবল আমিই প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছি। প্রবোধ ঘোষও অনার্স পেয়েছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। হল থেকে বের হয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে আবার ফিরে হলের মধ্যে গেলাম। কে জানে, কোনো ভুল যদি হয়ে থাকে। আবার দেখলাম তালিকাটা। না, ভুল তো হয় নি। হৃষ্টচিত্তে সুধাংশুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্‌সি যাচ্ছিল দেখে সুধাংশু তাকে হাত বাড়িয়ে থামালেন এবং আমাকে প্রায় টেনে তার মধ্যে তুলে নিলেন। বাড়ির ঠিকানা দিতে ট্যাক্‌সি রওনা হল আর্লস কোর্টের দিকে। পথে একটা ডাকঘরের সামনে ট্যাক্‌সিটা দাঁড় করিয়ে সুধাংশু আমাকে নিয়ে সেখানে ঢুকে ঝট্ করে একটা কেব্‌ল্ লিখে দিলেন বুবুর নামে। যতদূর মনে আছে লিখেছিলেন— 'পাসড সলিটারী ফার্স্ট ক্লাস।' হাতে তুড়ি দিয়ে বললেন, 'টাকাটা দে।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো যা চাইলেন দিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্‌সিতে করে ট্রেবোভার রোডের বাড়ি পৌঁছলাম। এতক্ষণে আমার সম্বিত ফিরে এসেছে কিছুটা। ট্যাকসি থেকে নেমেই আবার সেই তুড়ি মেরে সুধাংশু হুকুম দিলেন—'ভাড়াটা দিয়ে দে।' আমি তখন আপত্তি জানালাম— 'আমি দেব কেন? ট্যাক্‌সি ধরলি তুই, আর ভাড়া দেব আমি? মজা মন্দ নয়।' বাড়ির সদর দরজার সামনের সিঁড়ির এক ধাপ উঠে ফিরে তাকিয়ে সুধাংশু বললেন, 'লজ্জা করে না। ফার্স্ট ক্লাস পেলি। আর ট্যাক্‌সি ভাড়া দিবি নে? তুই তো ফোকটে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস্। যা, দিয়ে দে ভাড়াটা।' বলেই সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ওদিকে ট্যাক্‌সি-ওয়ালাটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিঃশব্দে টাকাটা দিয়ে দিলাম।

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে বা ইন্‌স্ অব কোর্টে যে-সব মাস্টারদের

কাছে পড়েছি তাঁদের কারুর কারুর কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। রোমান ল পড়াতেন বৃদ্ধ ডাঃ মিউবিসন, যিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি কলেজের ল' ফ্যাকালটির ডীন এবং যাঁর কথা আগেই বলেছি। ডাঃ হিবার্ট পড়াতেন জুরিসপ্রুডেন্স। ইনিই প্রবোধ ঘোষেব নামটা 'মিঃ গুস' বলে ডেকে আমাদেব চমকে দিয়েছিলেন। কনস্টিটিউশ্যানাল ল পড়েছি বিখ্যাত প্রফেসব খোদ জন মর্গেন সাহেবেব কাছে। তখনকাব দিনে তিনি যে ঐ আইনেব শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আইবিশ স্বাধীনতার নেতা সার্ বোজাব কেসমেণ্ট একটা জার্মান সাবমেবিন থেকে ছোটো একটা ডিঙি করে আয়র্ল্যাণ্ডে নেমেছিলেন সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই খবর পেয়ে তাঁকে ধরবার জন্যে ওৎ পেতে ছিল। সার্ বোজাব কেসমেণ্ট ধবা পড়লেন এবং তাঁকে treason অর্থাৎ বাজদ্রোহেব অভিযোগে আদালতে আসামী কবা হল। সেই কোর্টে বসেছিলেন তখনকাব দিনে ইংল্যাণ্ডেব চীফ জাস্টিস লর্ড বেডিং। তাঁব সঙ্গে আবো এক বা দুইজন বিচাবকও বসেছিলেন। স্যার বোজাবেব পক্ষে কৌসুলী দাঁড়ালেন আইবিশ বাবেব নামকবা নেতা সার্জেণ্ট ও সালিভ্যান এবং আবো অনেকজন ছোটো কৌসুলী। এঁদেব মধ্যে একজন ছিলেন আমাদেব প্রফেসাব জন মর্গেন। সার্ বোজাবকে অভিযুক্ত কবা হয়েছিল বহু প্রাচীন একটা প্রায়-ভুলে-যাওয়া আইনেব কোনো একটা ধাবায়। কনস্টিটিউশ্যানাল ল-এব খুব গূঢ় তর্ক-বিতর্ক উঠেছিল। বাজার বাজত্বেব বাইরে অর্থাৎ জার্মানীতে বসে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করলে বৃটিশ বাজ্যেব আদালতে ট্রিজন চার্জ করা চলে কিনা— এই ছিল একটা প্রশ্ন। জানাই ছিল যে ব্রিটিশ জুরিব হাতে সার্ বোজাবেব কোনো আশাই নেই খালাস হবাব সে সময়ের আবহাওয়াব মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। দণ্ড দেবার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা কবা হল যে তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হবে না কেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চান কি না। সাব্ বোজার কেসমেণ্ট সুদূরনিবদ্ধ চোখে সে সময়ে যে একটি ভাষণ দেন সেটা শুনিয়েছিল সেই অপরিসর বিচাবগৃহের চারটি দেয়াল ছাড়িয়ে আয়র্ল্যাণ্ডেব সমস্ত দেশবাসীব কাছে দেশেব জন্যে উৎসর্গীত-প্রাণ দেশপ্রেমিকের অভয় ঘোষণা ও অন্তিম বিদায়বাণীতে অত্যন্ত মর্মন্তুদ হয়েছিল সে সংক্ষিপ্ত ভাষণটি। যা হবার তা-ই হল। সার্ রোজার কেসমেণ্টের প্রাণদণ্ড

হল। বৃটিশ সরকার এতেই সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর Knighthood প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। নির্ভীক বীর দেশমাতৃকার কাছে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করে দিলেন ফাঁসিকাষ্ঠের উপব দাঁড়িয়ে। মর্গেন সাহেব প্রতি সন্ধ্যায় এসে আমাদের শোনাতেন সেদিন কোর্টে কি সওয়াল জবাব হল। শেষদিনেব কথা বলতে গিয়ে মর্গেন সাহেববও গলা কেঁপে গিয়েছিল। মর্গেন সাহেব বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন। ফিট্‌ফাট ছিল তাঁর পোশাক এবং শীতকালে জুতার উপবে একটা চামডাব কি ফেলটের স্প্যাট পড়ে পা দুটাকে গবম রাখতেন। ক্লাসে বক্তৃতা দিতে দিতে গবম দুধ খেতেন বলে মনে পড়ে।

ইন্‌স্ অব্ কোর্টে একুইটি পডাতেন নামকরা অধ্যাপক স্ট্রাহান সাহেব। ছাত্রদেব পডাবাব ধবণ ছিল তাঁর খুব চমৎকাব। তিনি ক্লাসেব কালো বোর্ডেব উপব খড়ি দিয়ে লিখে বিষযটা বুঝিয়ে দিতেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ কবতেন এবং আমাকে যে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তা আমাব খুবই ববণীয় সম্পদ। হিন্দু ও মহামেডান ল পড়াতেন অবসবপ্রাপ্ত আই. সি. এস. এবং সিন্ধুদেশেব জুডিসিয়াল কমিশনাব ও'নীল সাহেব। একজন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট জজ, আমেদ সাহেব, অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন বি. সি. এল. পড়তে। তিনি মাঝে মাঝে ইন্‌স্ অব কোর্টে ও'নীল সাহেবেব ক্লাসে আসতেন। এক এক সময়ে এই আমেদ সাহেব বেশ গোল বাধিয়ে দিতেন। ও'নীল সাহেব তাঁব পুবানো যেটুকু জানা ছিল তাই বলতেন ক্লাসে ; আমেদ সাহেব উঠে পডতেন এবং বলতেন, না সার্, আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা ছিল যে কেসেব ভিত্তিব উপরে সে কেসটাই উলটিয়ে গেছে পরের একটা হাইকোর্টেব সিদ্ধান্তে। আমি একটা কেসেব বিচার করতে গিয়ে এই পবের কেসটাকে অনুসবণ করেছিলাম। আমাব বায়েব কপিটা থাকলে আপনাকে দেখাতাম। তিনি যে জজ ছিলেন সে কথাটা মাস্টার ও ক্লাসশুদ্ধ ছেলেদের জানিয়ে দিয়ে আমেদ সাহেব বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ কবতেন। আমি পরে এল. এল. বি. পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছিলাম দেখে তিনি আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন আমি কি কি বই পডেছিলাম।

আমার বারে কল্‌ড্ হওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। এল. এল. বি. পরীক্ষার ফল বের হতেই বাড়ি ফেরাব তোড়জোড় শুরু কবলাম। অল্প কয়দিন পরেই অর্থাৎ উনিশ শো আঠারো সালের এগারোই নভেম্বর খবরের কাগজে বের

হল যুদ্ধবিরতির অভাবনীয় খবর। সেইদিনই বেলা এগারোটার সময় চুক্তিপত্র সই হবে। ইংল্যাণ্ড ও মিত্রগোষ্ঠীর জয়জয়কার পড়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের ছেলে-বুড়ো পুরুষ-মেয়েরা সবাই যেন আনন্দে উন্মাদ হয়ে পড়ল। রাস্তায় দলে দলে নরনারীর ভিড। ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে, লণ্ডনের সমস্ত পার্কে, কমনে সেদিন হাত-ধরাধরি করে ছেলে-বুড়োদের সে কি নৃত্যের বহর। কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ ইউনিয়ান জ্যাকের ছোটো বড়ো পতাকা উড়ল প্রতিটি দোকানে ও গৃহচূড়ায়। এইরকম উন্মাদনা জীবনে কখনো চক্ষে দেখি নি। ইংরেজদের চরিত্রের দৃঢ়তা, স্থৈর্য এবং একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি জয়যুক্ত হল। এই বিজয়সম্মান তাদের সত্যই প্রাপ্য ছিল সব দিক থেকেই। সেইদিন থেকেই রাস্তার বাতির কাঁচগুলি ঘষা শুরু হল। ক্রমে ক্রমে রাস্তায় আলো দেখা গেল। বড়ো ছোটো দোকানপাটের সামনের জানালা তীব্র আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল। আমি বিলেতে আসার পর থেকে এই যুদ্ধবিরতির সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত লণ্ডন শহরের আলোর বাহার দেখিই নি। আমি লণ্ডন ছাড়বার আগে সব বাতিগুলির আলকাতরা পুরাপুরিভাবে পরিষ্কার করা হয়ে ওঠে নি।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় জাহাজের টিকিটের চাহিদা বেড়ে গেল। জায়গাই পাওয়া যায় না। নাম লিখিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে। আমার বরাতটা বরাবরই সদয় দেখেছি। হঠাৎ আমার ব্যাঙ্ক গ্রিন্‌ডলে কোম্পানি থেকে খবর পেলাম যে অ্যাঙ্কার লাইনের ছোটো একটা জাহাজ নাকি নভেম্বর মাসের শেষের দিকেই ছাড়বে লিভারপুল থেকে। যদি যাই তবে অবিলম্বে টিকিট কিনতে হবে। এর আবার মতামত কি? বাড়ি যেতে পারলেই হল। জাহাজ ছোটো হলেই বা ক্ষতি কি? যুদ্ধ তো থেমেই গেছে। সুতরাং ডুবোজাহাজের হামলার ভয় আর নেই। খালি ভয় ভাসমান আগ্নেয়খনি (ফ্লোটিং মাইন)। যা থাকে বরাতে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে। চলে গেলাম ব্যাঙ্কে। টিকিট কেনা হল। নেহাত কপালগুণে জায়গা পাওয়া গেল স্টীমারে। আমার সতীর্থ প্রবোধ ঘোষকে প্রায় চার মাস বসে বসে জাহাজে জায়গা পাবার দিন গুণতে হয়েছিল।

চললাম ট্রেনে করে লিভারপুল শহরের দিকে। স্টেশনে পৌঁছলাম রাত্রিতে। উঠেছিলাম বোধ হয় লিভারপুল ডকের কাছাকাছি একটা অত্যন্ত সাধারণ হোটেলে। সকালে উঠেই গেলাম জাহাজঘাটের দিকে।

রাস্তাটা ছিল বড়ো বড়ো পাথরে বাঁধানো, যেমন দেখা যায় কলকাতায় স্ট্র্যাণ্ড রোডে। গাড়িটা যেন লাফাতে লাফাতে সশব্দে চলল। ঘাটের কাছে নেমে একজন কুলি দিয়ে মালগুলো নিয়ে ছাড়পত্র দেখিয়ে বেড়ার ভেতরে ঢুকে গেলাম। জাহাজে উঠে দেখলাম জাহাজটা খুবই ছোটো, হাজার তিন-চার টনের জাহাজ। কেমন না-জানি দুলবে। কিন্তু ভাবনা করে লাভ ছিল না। মোটা ভেঁপু বাজিয়ে জাহাজটা মোড় ঘুরে চলতে লাগল। ডেকে একটি ভারতীয় দেখলাম। তিনি আমার জানা পরেশ গুপ্ত। শুনেছিলাম যে তিনি তখনই কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কলের বিভাগে বেশ উচ্চপদ পেয়েছেন। পরেশ গুপ্ত খুব গপ্পি মানুষ। কথা বলতে এক-এক সময়ে জিভের একটু জড়তা লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু যখন গান করতেন তখন সে জড়তার লেশও থাকত না। আর পরেশ গান করতেন খুব সুন্দর। বিলেতে রবিবারে রবিবারে নির্মল সেন মশায়ের পরিচালনায় যে উপাসনা হত তাতে পরেশ প্রায়ই গান করতেন। তাঁকে জাহাজের ডেকে দেখে আমার মনটা বেশ খুশিতেই ভরে গেল। ভাবলাম ডেকের কোনো নিরিবিলি কোণায় বসে পরেশের অনেক গান শুনে নেব। মানুষ ভাবে এক হয় আর। জাহাজটা নদী ছাড়িয়ে সমুদ্রে যেই পড়ল ডেকে আর পরেশের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। খোঁজ করে গেলাম তাঁর কেবিনে। দেখলাম বিছানায় কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে তিনি গোঙাচ্ছেন। ব্যাপার কি? তাঁকে সামুদ্রিক পীড়ায় পেয়ে বসেছে। আমাকে দেখেই কাতরকণ্ঠে শুধালেন, 'একি, সুধীরঞ্জন, তুমি শোও নি এখনো?' আমি জবাব দিলাম, 'শোব কেন হে? আমার বমি-টমি হয় না।' 'তুমি কি সৌভাগ্যবান' বলে পরেশ পাশ ফিরে উপুড় হয়ে খানিকটা জল-বমি করে ফেললেন। বুঝলাম যে তাঁকে উঠিয়ে উপরের ডেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম হবে। ভায়া সেই লিভারপুলের নদী থেকে সমুদ্রে পড়ে সেই যে শুলেন গাত্রোত্থান করলেন একেবারে এডেনে পৌঁছে। পথে জিব্রালটার এবং পোর্ট সেদেও তিনি আপন কেবিনে অজ্ঞাতবাসই করেছিলেন। একদিনের জন্যেও তিনি খাবার ঘরে গিয়ে বা ঘরে খাবার আনিয়ে খেতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গের মাহেশ্বরদির মানুষ খুঁজে খুঁজে জাহাজের চট্টগ্রামের মুসলমান খালাসীদের ডাকিয়ে এনে তাদের মোটা চালের ভাতের সঙ্গে অল্প একটু শুঁটকী মাছের ঝাল তরকারি দিয়ে কোনোমতে প্রাণধারণ করতেন। ঐ শুঁটকী মাছের

গন্ধটায় নাকি বমিটা একটু দমে থাকত।

বাড়ি ফেরার পথে জাহাজে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নি। আমরা অবশেষে ২৯শে ডিসেম্বব সকালে বম্বে বন্দরে নোঙর ফেললাম। জাহাজ থেকে নেমে কাস্টম্‌স্ খোঁয়াড থেকে বেবিয়েই দেখি সেই ইন্দুরেব মার ছেলে ইন্দুর এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা কবে নিতে। তাঁর সঙ্গে তাঁব বাড়ি গিয়ে দেশী খাওয়া খেয়ে মুখটা যেন জুড়ল। অনেক গল্প হল। আমার বোন খুকী নাকি কিছুদিন বম্বে না পুণায ছিলেন তাঁব স্বামীব সঙ্গে। উপেনবাবু তখন ফৌজেব অস্থায়ী কমিশনপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন পর্যাযেব ডাক্তাব। ইন্দুব বললেন খুকীর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে হয়েছে। দুটি সন্তানই নাকি বেশ গোলগাল মোটাসোটা। নিজেব বাঁ হাতটা দেখিয়ে হেসে ইন্দুব বললেন যে তাঁব ডেনাটা কনুই পর্যন্ত নাকি খুকীব মেয়েব ভাবে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আমাব তখন ভাগনে ভাগনীকে দেখবাব খুব জোব ইচ্ছা হল। বিকেলেব দিকে ইন্দুবেব সঙ্গে বম্বেব সমুদ্রতীবে বেশ খানিকটা বেবিয়ে এলাম। সন্ধ্যাব পবেই খাওয়া-দাওয়া কবে বোধ হয় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে বম্বে মেল ধবে বাড়িব দিকে ছুটলাম। দুটো দিন নানা ভাবনায় দেখতে দেখতে কেটে গেল। হাওডা স্টেশনে অভ্যর্থনাটা কেমন হবে তা মনে মনে ভাবতে লাগলাম। হাজাব হোক, লণ্ডনেব প্রথম শ্রেণীর এল. এল. বি তো বটে এবং তাব উপবে আবাব ব্যাবিস্টাব। বাড়িতে এবং ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে যে পাত্তা পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ ছিল না মনে মনে।

বেশ রাত্রিতে হাওড়া স্টেশনে নামলাম। বাবা, মা, নস্থ, বুধা, বুড়ি সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন। বোধ হয় সুধীব, মোনা, ভোম্বল ও বেবীও এসেছিলেন স্টেশনে। মোনাব তখন সুধীবেব সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। নেমে বাবা মাকে প্রণাম কবলাম। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধবে বইলেন অল্পক্ষণ। ভাই বোন ও মোনা ভোম্বল বেবীবা আমাকে স্বাগত জানালেন। সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানালাম। তাব পর মালপত্র নিয়ে ভাইবোনেবা বাড়ি ফিবে গেলেন। আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে সোজা স্টেশন থেকে কালীমোহন আলয়ে গেলাম দাদাবাবু ও বৌঠানকে প্রণাম কবতে। সে বাত্রিতে কত গল্পই না হয়েছিল বৌঠানের সঙ্গে। আমি আই. সি. এস. না পড়ার জন্যে মায়াবতী যাবার পথে দাদাবাবুর বিরক্তি, বৌঠানের মধ্যস্থতা, বুবুকে আমার চিঠি লেখা ইত্যাদি কতরকম গল্পগাছা। দাদাবাবু বললেন, 'প্রেমটাকে দিন

কতক জিইয়ে বেখে কাজে মন দে।' বৌঠান আজ পর্যন্তও এই কথাটা আমাকে বলে খুব হাসাহাসি কবেন। কত বঙ্গ-বস হল মোনা ভোম্বল ও বেবীর সঙ্গে। ভোম্বলেব সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণখোলা হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সে বাত্রিটা। আমি তাঁর মায়েব কাছে তাঁব অসুখের কথা লেখায় তাঁকে যে বিলেত ছেড়ে দেশে ফিবে আসতে হয়েছিল তাব জন্যে তাঁর কথাবার্তায় তাঁব মনেব এতটুকুও বিকাব দেখলাম না। মনটা খুবই হাল্কা হয়ে গেল। বাত দুপুব বেজে গেল দেখে আমবা উঠে পড়লাম। আবাব দাদাবাবু ও বৌঠানকে প্রণাম করে চলে এলাম নিজেদেব বাড়ি ১৪নং মল্লিক লেনে। ইংবেজি হিসেবমতে তখন এসে গেছে পয়লা জানুয়ারি বুড়ির জন্মদিন। আমাব লেখাপডাব পালা শেষ কবে আমি ফিবে এলাম মায়েব কোলে।